প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক
সমীরকুমাব নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রক
ও'নিল অফসেট
১২ বি বেলেঘাটা রোড
কলকাতা ৭০০০১৫

সৌমী

ও

ঊর্মিকে

টেম্পেষ্ট

একটি দ্বীপ। চারিধারে জল আর জল — অথৈ সমুদ্র। সে দ্বীপের অধিবাসী বলতে একটি বৃদ্ধ। নাম তার প্রসপেরো আর তাঁর উদ্ভিন্নযৌবনা এক অপরূপা কন্যা, মিরান্ডা যার নাম। এই দ্বীপে সে যখন প্রথম আসে মেয়েটি তখন খুবই ছোট, তাই তার মনেই পড়েনা একমাত্র তার বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষের মুখ।

শিলার ভিতর ঘরের মতো বানিয়ে নেওয়া একটা গুহা বা কুঠুরীর মধ্যে বাস করতেন প্রসপেরো তাঁর মেয়েকে নিয়ে; ওরই ভিতর ছিল কয়েকটি কক্ষ, তারই একটাকে প্রসপেরো বলতেন তাঁর পড়ার ঘর। তাঁর বইপত্রগুলি তিনি ঐ ঘরেই গুছিয়ে রাখতেন, অবশ্য বেশির ভাগ বই-ই ছিল যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত। যাদুবিদ্যা বিষয়টি তখনকার কালে শিক্ষিত মানুষ মাত্রেরই ছিল গৌরবের বস্তু। আর ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যে অদ্ভুত পরিস্থিতির ফলে প্রসপেরোকে ঐ দ্বীপে এসে পড়তে হয়েছিল তাঁর পক্ষে ঐ যাদুবিদ্যার কলকাঠি তো হয়ে উঠল এক মস্ত প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। কারণ, ঐ দ্বীপটি আসলে ছিল সাইকোবাক্স নামে এক ডাইনির সম্মোহনের যাদুতে বশীভূত। প্রসপেরো যখন ঐ দ্বীপে আসেন তার অল্প কিছুকাল আগেই মারা গিয়েছিল সেই ডাইনি। প্রসপেরোর যাদুবিদ্যা কাজে লাগলো, তিনি ঐ বিদ্যার প্রয়োগে মুক্ত করে দিলেন এমন অনেক সৎ প্রকৃতির অশরীরী আত্মাকে যাদের ঐ ডাইনি বন্দী করে রেখেছিল মস্ত মস্ত গাছের কাণ্ডের ভিতরে। তাদের অপরাধের মধ্যে এই ছিল যে তারা ডাইনির বদমায়েসী হুকুমগুলোকে তামিল করতে রাজি হয়নি। কাজেই ঐ শিষ্ট ও সুমতিসম্পন্ন প্রেতাত্মাগুলি এর পর থেকে চিরকালের জন্যে হয়ে রইলো প্রসপেরোর একান্ত অনুগত। আর সেই প্রেতাত্মাদের মধ্যে যে ছিল সবার উপরে তার নাম এরিয়েল।

এরিয়েল প্রেতাত্মা বটে কিন্তু তার প্রকৃতি ছিল খুবই ভাল, কারো অমঙ্গল বা ক্ষতির কথা সে ভাবতো না, আর সে ছিল ভারী প্রাণচঞ্চল। তবে একটা বিষয়ে সে খুব মজা পেত — ক্যালিবান নামে একটা কিম্ভূতকিমাকার দৈত্য ছিল ঐ দ্বীপে। ঐ দৈত্যটাকে সে নানাভাবে উত্যক্ত করত। এর অবশ্য একটা কারণও ছিল। ক্যালিবান ছিল তার পরমশত্রু সাইকোরাক্সেরই ছেলে। ক্যালিবানকে প্রসপেরো পেয়েছিলেন জঙ্গলের মধ্যে কুড়িয়ে; এক তাজ্জব জীব, যতটুকু না মানুষের মত তার চেয়ে অনেক বেশি এক বাঁদরের মতই ছিল তার আকৃতি। প্রসপেরো তাকে নিজের বাড়ি অর্থাৎ শিলার সেই কুঠুরীতে নিয়ে এলেন এবং মানুষের মত কথা বলতে শেখাতে লাগলেন। প্রসপেরো ছিলেন অতি সদাশয় ব্যক্তি এবং ক্যালিবানকে তিনি

স্নেহে ও যত্নেই বড় করে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ক্যালিবানের প্রকৃতির মধ্যে ছিল তার মা সাইক্লোরাক্স-এর অসৎপ্রকৃতির প্রভাব, কাজেই ভাল করতে চাইলেই সে ভাল হবে কেন? কোন ভাল কাজ শেখা কিংবা একটু ভাল হতে চেষ্টা করা — এ তার ধাতে সইবে কেন? ভবি কিছুতেই ভোলার নয় দেখে প্রসপেরো অগত্যা তাকে ক্রীতদাসের মত নানা শ্রমসাধ্য কাজে লাগিয়ে দিলেন— বললেন, যা কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আয়, অথবা এইরকম আরো সব দৈহিক খাটুনীর কাজ। আর এরিয়েলের উপর দায়িত্ব রইল ক্যালিবানের এই সব কাজের তদারকির, অর্থাৎ সে তাকে ঠিকমত খাটিয়ে কাজগুলো করে নেবে।

মজাটার শুরু এখানেই। যখনই ক্যালিবান একটু কুঁড়েমি করেছে কিংবা কাজে ঢিলে দিয়েছে অমনি এরিয়েল খুব সন্তর্পনে তার গায়ে কাটল একটা চিমটি — প্রেতাত্মা হিসাবে এরিয়েলের একটা সুবিধে ছিল এই যে একমাত্র প্রসপেরো ছাড়া কেউই তাকে চোখে দেখতে পেতনা। আবার কখনো বা এরিয়েল ধাক্কা দিয়ে ক্যালিবানকে ফেলে দিত পাঁকের মধ্যে, আর নিজে তখন বাঁদরের মূর্তি ধরে ক্যালিবানকে লক্ষ্য করে মুখ ভ্যাংচানি দিতে থাকতো। একটু পরেই চটপট নিজের আকৃতিটা পালটে নিয়ে সে হয়ে যেত কাঁটাচুয়া আর ডিগবাজি খেয়ে শুয়ে পড়তো ক্যালিবানের যাওয়ার রাস্তায়। ক্যালিবান বেচারা ভয়ে সিঁটিয়ে যেত, তার খালিপায়ে শজারুব ধারালো কাঁটার খোঁচা লাগার ভয়ে। এইরকম সব নানাপ্রকার গা-জ্বালানি উৎপাতের সাহায্যে এরিয়েল প্রায়শই উত্যক্ত করত ক্যালিবানকে — প্রসপেরোর হুকুমে যে কাজগুলি ক্যালিবানকে করতে হত তার পান থেকে চুন খসলেই ঐ শাস্তি।

এতগুলি সব শক্তিশালী প্রেতাত্মাকে নিজের ইচ্ছার অধীনে সম্পূর্ণ বশীভূত করার ফলে প্রসপেরো তাদের সাহায্যে প্রভুত্ব করতে পারতেন আকাশের বায়ুমণ্ডল এবং সমুদ্রের তরঙ্গরাশির উপরে। একদিন প্রসপেরোর আদেশে ওরা প্রচণ্ড ঝড় তুললো সমুদ্রে আর প্রসপেরো তাঁর মেয়ে মিরান্ডার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সেই উথাল পাথাল ঢেউ-এর দিকে, দেখালেন কেমন অসহায়ের মতো জীবন মৃত্যুর দোলায় হাবুডুবু খাচ্ছে একটা মস্ত বড় জাহাজ—মিরান্ডাকে তিনি বললেন, ঐ জাহাজে রয়েছে একজাহাজ জীবন্ত মানুষ যারা অবিকল তাঁদেরই মত। মিরান্ডার বড় মায়া হল সেই অসহায় মানুষদের জন্যে—সে বলল : বাবা, তুমি আমার কথা রাখ, তোমারই যাদুর কৌশলে তুমিই তো সাগরে ঐ ভয়ঙ্কর ঝড় তুলেছ, এবার তুমি একটু বাঁচাও ওদের, দেখছোনা ওরা কেমন অসহায়, আর দেরি নয়, দেখছোনা, জাহাজটা এখুনি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে আর ঐ অসহায় প্রাণীগুলো, ওরা তো একজনও প্রাণে বাঁচবে না। আমার যদি তোমার মত ক্ষমতা থাকতো তবে আমি এখুনি ঐ সমুদ্রটাকে পৃথিবীর মাটির তলায় ঢুকিয়ে দিতাম, তাহলে

আর অতগুলি প্রাণ নিয়ে ঐ সুন্দর জাহাজটা চুরমার হয়ে যেতনা।

লক্ষ্মী মেয়েটি, কেন এতো উতলা হচ্ছ, বললেন প্রসপেরো; ওদের গায়ে আঁচড়টি লাগছে না। আরে, আমি তো সেই রকমই আদেশ দিয়েছি যাতে ঐ জাহাজের কোন প্রাণীর গায়েই একটুও আঘাত না লাগে। আর আমি যা করেছি তা তোমার কথা ভেবেই করেছি, বুঝলে লক্ষ্মীটি। তুমি তো কিছুই জানোনা—কে তুমি, কিংবা তুমি এখানে এসেছই বা কোথা থেকে। আর আমার বিষয়ে তুমি শুধু এইটুকুই জানো যে আমি তোমার পিতা এবং এই অতি দরিদ্র কুঠুরীই আমার বাড়িঘর। তোমার একটুও স্মরণে আসে কি এই কুঠুরীতে আসার আগে আমরা কোথায় ছিলাম, কেমন ছিলাম? আমি জানি তোমার তা মনে পড়ার কথা নয়, তুমি তো তখন এতটুকু—তিন বছর বয়সও হয়নি তোমার।

হ্যাঁগো মশাই জানি, জানি—বলল মিরান্ডা। সে কি কেমন করে? জানতে চাইলেন প্রসপেরো—নিশ্চয়ই অন্য কোন বাড়ি থেকে বা অপর কারো কাছে শুনেছ? বলতো কী তোমার মনে পড়ে, লক্ষ্মীটি বলো তো।

আমার মনে হয় সে কেমন যেন এক স্বপ্ন, বললো মিরান্ডা, আচ্ছা তখন কি চার পাঁচজন স্ত্রীলোক ছিল যারা সারাদিন আমার কাছে কাছে থাকতো, আমাকে দেখাশোনা করতো?

প্রসপেরো বললেন: বটেই তো, আরো অনেক কিছুই ছিল, অবাক কাণ্ড, কি করে আজও সেসব কথা তোমার মনে আছে? বলতে পারো, তুমি কি করে এলে এখানে?

না বাবা, আর কিছু আমার মনে পড়ছে না, বললো মিরান্ডা।

এবার প্রসপেরো শুরু করলেন—শোনো তবে, এখন থেকে বারো বছর আগে আমি ছিলাম মিলান নগরীর ডিউক আর তুমি ছিলে ডিউক দুহিতা রাজকন্যার মত, সেই ডিউকের যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমার এক ছোট ভাই ছিল, অ্যান্টোনিও তার নাম, আর তার হাতেই আমার সব কিছু দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমি একা থাকতেই ভালবাসতাম, কেননা আমার ঝোক ছিল পড়াশোনায় ডুবে যাওয়ার, আর সেইজন্যেই আমি বিষয় সম্পত্তির যাবতীয় ব্যাপারই ছেড়ে দিই তোমার কাকার হাতে, অর্থাৎ আমার সেই অসৎ সহোদরের হাতে, (অসৎ কথাটা বললাম, কেননা তার কাজে সে সেটাই প্রতিপন্ন করেছিল)। জাগতিক যা কিছু ভালোমন্দ তার সব কিছুর প্রতিই আমি ছিলাম উদাসীন, আর আমার একমাত্র নেশা ছিল বই। আমার সবটুকু সময়ই আমি সমর্পণ করে ছিলাম চিত্তের উৎকর্ষ লাভের সাধনায়। আর ক্ষমতা হাতে পাওয়ার এই সুযোগে আমার ভাই অ্যান্টোনিও ভাবতে লাগলো সে-ই বুঝি যাবতীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, সে-ই বুঝি ডিউক। আর প্রজাপুঞ্জের মধ্যে নিজেকে তুলে ধরার এই যে সুযোগটুকু সে

আমার কাছে পেল তারই ফলে জেগে উঠলো তার চরিত্রের ভিতরে সুপ্ত অসৎ অভিপ্রায়, আমাকে বঞ্চিত করে আমার ভূসম্পত্তি গ্রাসের গর্বিত উচ্চভিলাষ—আর অচিরেই সে কার্যে পরিণত করলো তার সেই আকাঙ্ক্ষা, সে চক্রান্তে লিপ্ত হল আমারই এক শত্রুর সঙ্গে, যে ছিল নেপলস্-এর রাজা।

তাই যদি হবে তাহলে তখন আমাদের ওরা মেরে ফেলতেও তো পারতো, বললো মিরান্ডা।

প্রসপেরো বললেন, তা ওরা সাহস করেনি, বুঝলে খুকু, কেননা আমার প্রজাসাধারণের কাছে আমি ছিলাম অতি প্রিয়জন, আমাকে ভালবাসতো তারা। আর সেইজন্যেই অ্যান্টোনিও চুপিচুপি একটা জাহাজে চালান করে দেয় আমাদের এবং যখন জাহাজটা সাগরে অনেক দূরে পাড়ি জমাল তখন সে একটা ছোট নৌকোয় জোর জবরদস্তি করে চাপিয়ে দিল আমাদের দুজনকে। সেই নৌকোয় না ছিল পাল টাঙানোর খুঁটি, না ছিল পাল বা মাস্তুল, ঐ ভাবেই ওরা আমাদের ফেলে চলে যায়, ওরা ভেবেছিল সহজেই আমরা শেষ হয়ে যাবো। কিন্তু রাখে .কৃষ্ট মারে কে? অর্থাৎ, আমার রাজসভার এক অতি সদাশয় লর্ড, তার নাম ছিল গনজেলো—সে বড় ভালবাসতো আমাকে। আর চুপি চুপি সে আমাদের সেই ছোট নৌকোতে দিয়ে দিয়েছিল পানীয় জল, কিছু খাবার দাবার, প্রয়োজনীয় পোশাক-আশাক এবং আমার কিছু বইপত্র, যেগুলি ছিল আমার কাছে আমার রাজতক্তের চেয়েও মূল্যবান।

মিরান্ডা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—দেখতো বাবা, আমাকে নিয়ে তখন তোমার কী মুস্কিলেই না পড়তে হয়েছিল?

না রে না পাগলী, আমার সেই দুঃসময়ে তুই-ই শুধু ছোট্ট এক স্বর্গের পরীর মত আমার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিলি। তোর নিষ্পাপ হাসিটুকু নিয়েই আমি ভাগ্যের সব বিড়ম্বনাকে ভুলে যেতাম। জানিস্ যে খাদ্যটুকু আমাদের হাতে ছিল তা শেষ হতে হতে আমরা পৌঁছে যাই এই দ্বীপটাতে, আর তারপর থেকে আমার একটিই মাত্র সুখ, তা তোকে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তোলা। মিরান্ডা, আমার সেই শিক্ষার ফলেই আজ তুই এমনটি হয়েছিস।

মিরান্ডা বললো, বাবা তুমি এত ভালো, ঈশ্বরই তোমাকে রক্ষা করবেন, কিন্তু এবার বলো দেখি ঐ যে সমুদ্রে ঝড় তুলেছিলে ওটার পিছনে তোমার কি অভিসন্ধি ছিল?

প্রসপেরো বললেন: তাহলে শোনো বলি, ঐ ঝড়ের দাপটে আমার যারা শত্রু, অর্থাৎ নেপেলস্-এর রাজা আর আমার পাষণ্ড ভাইটা—জাহাজ ডুবিতে কোন রকমে ভাসতে ভাসতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমাদের এই দ্বীপে।

এই কথাটুকু শেষ করেই প্রসপেরো আলতো ভাবে তাঁর জাদুদণ্ডটি ছুঁইয়ে দিলেন

মেয়ের গায়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল মিরান্ডা। প্রসপেরো এটা করলেন, কেননা, এই সময়ে তাঁর সামনে হাজির হয়েছিল এরিয়েল, সে তার প্রভুর কাছে বিবরণ দিতে এসেছিল ঐ ঝড়ের ব্যাপার-স্যাপার, আর তাঁকে জানাতে ঐ ডুবে যাওয়া জাহাজে যারা ছিল তাদের সে কোথায় কীভাবে রেখেছে সেই ব্যবস্থার কথা। এটা ঠিকই যে এরিয়েল অথবা অন্য কোন আত্মাকে মিরান্ডা কখনই দেখতে পেতনা, কিন্তু প্রসপেরো চাইতেন না যে মেয়ে দেখুক কেউ নেই, অথচ তিনি আকাশের হাওয়ার সঙ্গে কথা বলেন। মিরান্ডার পক্ষে সেটা ভাবাই তো স্বাভাবিক কেননা কোথাও কেউ নেই অথচ বাবা কথা বলে যাচ্ছে।

প্রসপেরো এরিয়েলকে বললেন, ঠিক আছে, বাহাদুর এরিয়েল, কিন্তু এবার গুছিয়ে বলতো কীভাবে এই কাজটি তুমি নিপুণ হাতে করলে?

এবার এরিয়েল আনন্দে আটখানা হয়ে জুড়ে দিল তার গল্প—ঝড়টার দাপট কেমন ছিল, নাবিকদের সে কী পরিত্রাহি চিৎকার—আর রাজকুমার ফার্ডিনান্ড কেমন করে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে। তার বাবা, অর্থাৎ রাজামশাই তো ভেবেই নিয়েছিলেন তার চোখের মণি ঐ ছেলেকে গ্রাস করে নিয়েছে সমুদ্র, আর সে ফিরবে না। এরিয়েল বললো, ভাববেন না, ছেলেটিকে তোফাই রেখে দিয়েছি, আমাদের এই দ্বীপের এককোণে বেচারা হাতজোড় করে বসে আছে। আর কান্নাকাটি করছে তার বাবার জন্যে—সে ধরে নিয়েছে এই ভরাডুবিতে তার বাবা তলিয়ে গেছে সাগরের অতলে। কিন্তু সম্পূর্ণই অক্ষত আছে তার বাবা, সামান্যতম ক্ষতিও হয়নি তার, এমন কি তার রাজকীয় বেশবাস সমুদ্রের জলে ভিজে সপসপে হয়ে যেন আরো খোলতাই হয়েছে—ঝক্‌ঝক্‌ করছে।

তুমি না হলে এমনটি কেউ পারে, সাবাস এরিয়েল, তা ঐ ছেলেটিকে এখানে হাজির কর দেখি, আমার মেয়েটিকে একবার দেখাই ঐ যুবাপুরুষ রাজপুত্রটিকে। হ্যাঁ, রাজাটিকে কোথায় রেখেছ, আর আমার সেই সুযোগ্য ভাইটিকে?

আমি ওদের দুজনকেই ছেড়ে দিয়েছি দ্বীপের পথে পথে ঘুরতে, ওরা হন্নে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে ফার্ডিন্যান্ডকে, যদিও ওদের বিশ্বাস তাকে পাওয়ার কথা নয়, কেননা ওরা তো নিজেদের চোখেই দেখতে পেয়েছে সে ডুবে গেল। আর জাহাজের যত মাঝিমাল্লা তার একজনও নিখোঁজ হয়নি, যদিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা প্রত্যেকেই ভাবছে সে-ই একমাত্র প্রাণে বেঁচেছে। আর জাহাজটির কথা—সেটি নিরাপদেই রয়েছে বন্দরে ভিড়ানো, যদিও ওরা কেউ-ই সেটিকে দেখতে পাচ্ছে না।

খুশী হয়ে প্রসপেরো বললেন, খুব মন দিয়েই তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করেছ, এরিয়েল, তবে আরও কিছু কাজ তোমাকে করতে হবে।

এরিয়েল বলে উঠলো-আরও কাজ? কিন্তু প্রভু অপরাধ নেবেন না, আপনাকে

স্মরণ করিয়ে দিই, আপনিই অঙ্গীকার করেছিলেন আমাকে আপনি মুক্ত করে দেবেন। দয়া করে ভেবে দেখুন, আপনাকে আমি যথার্থ সেবা করেছি কী না, আর মুখ বুঁজে হাসিমুখে সদাসর্বদা আপনার আজ্ঞা পালন করেছি কী না।

প্রসপেরো বললেন, এ আবার কেমন কথা? তুমি বোধহয় ভুলে গেছ কী নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে তোমাকে আমি একদিন মুক্ত করেছিলাম। সেই জঘন্য ডাইনিটা, যার নাম সাইকোরাক্স, সে যতই বুড়ি হচ্ছিল ততই তার আক্রোশ দিন দিন কেমন বেড়ে চলেছিল সে কথা ভুলে গেলে নাকি? বল দেখি কোথায় জন্মেছিল সে? কি হল? বল?

আজ্ঞে বলছি, হ্যাঁ সে জন্মেছিল অ্যালজিয়ার্স-এ, বলল এরিয়েল।

বটে? প্রসপেরো বললেন, তাহলে শোনো খুলে বলছি, দেখছি তুমি সবই ভুলে বসে আছ। ঐ পাজী ডাইনি সাইকোরাক্স-এর ডাইনি বিদ্যা ছিল এতই নৃশংস যে সেকথা কাণে গেলেও ভয় হয়। অ্যালজিয়ার্স থেকে তাকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয় এবং নাবিকেরা তাকে ধরে এনে রেখে যায় এই দ্বীপে। তুমি ছিলে খুবই নরম প্রকৃতির, তাই ডাইনিটার মায়ামমতাহীন জঘন্য হুকুমগুলো তামিল করার সামর্থ্য তোমার ছিলনা। তারই শাস্তিস্বরূপ সে তোমাকে আটক করে রেখেছিল একটা গাছের গুঁড়ির মধ্যে, আর তোমার সেই বুকফাটা কান্না শুনেই আমি গিয়ে তোমায় আবিষ্কার করি। ভেবে দেখ সেই যন্ত্রণার কথা, যে যন্ত্রণা থেকে তোমাকে মুক্ত করেছি আমিই।

এরিয়েল একথা শুনে নিজেকে অকৃতজ্ঞ ভেবে লজ্জিত হল। বলল, আমাকে মাপ করুন। আমি আপনার আদেশ মাথা পেতে নেব, বলুন, কী আদেশ?

বেশ কথা, বললেন প্রসপেরো, আমার কথামত কাজ করলে আমি তোমাকে অবশ্যই মুক্ত করে দেব। একথার পর প্রসপেরো বুঝিয়ে দিলেন অতঃপর কী কাজ করতে হবে এরিয়েলকে। সব শুনে এরিয়েল প্রস্থান করলো এবং প্রথমেই সে হাজির হল যেখানে সে ছেড়ে গিয়েছিল ফার্ডিন্যান্ডকে। গিয়ে দেখল সেখানেই বসে রয়েছে ফার্ডিন্যান্ড ঘাসের উপর, আর তেমনই মনমরা হয়ে।

তাকে দেখে এরিয়েল বলল, আরে এই তো নওজোয়ান বাবুমশাই, চলুন আমার সঙ্গে। তা দেখছি আপনাকে নিয়ে যেতেই হচ্ছে মিরান্ডাদেবীর কাছে, তিনি দেখবেন কেমন অপরূপ যুবাপুরুষ আপনি। উঠুন, উঠুন, আমার পিছন পিছন আসুন। বলতে বলতে এরিয়েল গান ধরলো :—

পুরোই তিরিশ হাত
জলের তলায় ঘুমোয় তোমার বাপ
পলা দিয়ে তৈরী হাড় আর
চোখ দুটো তার মুক্ত হয়ে গেছে

সবই আছে কিচ্ছু খোয়া যায়নি
আকাশ মাটির ফারাগ—এই যা মোটে
মাটি ছিল সোনা এখন বটে
জলপরীরা প্রহর গুণে গুণে—
মরণ ঘন্টা বাজায় তোমার বাবার
ঐ শোনো সেই ঘন্টা বাজছে—
ঢং ঢং ঢং আবার।

এই আজব খবর, তার বাবা তাহলে বেঁচে আছেন! রাজপুত্রের এতক্ষণের লুপ্ত বোধ ফিরে এল---বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সে পিছু নিল এরিয়েলের ঐ গানের সুরের, অবশেষে এসে উপস্থিত হল প্রসপেবো আর মিরান্ডার সামনে। পিতা ও পুত্রী বসে ছিলেন এক বিশাল বৃক্ষের ছায়ায়। সেই মিরান্ডা—যে আগে কখনো একটিও মানুষ দ্যাখেনি, একমাত্র তার বাবাকে ছাড়া।

প্রসপেরো এবার বললেন: মিরান্ডা, বলো দেখি মা, কী দেখছো ঐ যে দাঁড়িয়ে।

মিরান্ডা তো বিস্ময়ে হতবাক---হ্যাঁ বাবা ও কোন স্বর্গের দূত হবে। হে ঈশ্বর, ও আবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে। আমি সত্যিই বলছি, বাবা, ভারী সুন্দর ঐ প্রাণীটা---নিশ্চয়ই দেবদূত হবে, তাইনা?

আরে না, না, স্বর্গের হতে যাবে কেন? ও আমাদেরই মত খায়, দায়, ঘুমোয়, আমাদেরই মত সব অনুভূতিই আছে ওর শরীরে। ও একজন যুবাপুরুষ—ও ছিল ঐ ডুবে যাওয়া জাহাজটার মধ্যে। মনোকষ্টের ফলে ওকে একটু ম্লান লাগছে, নাহলে তুমি অবশ্যই বলতে ভারী সুন্দর ওর রূপ। ওর সব সঙ্গীসাথীরা হারিয়ে গেছে, আর তাদেরই সন্ধানে ও এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মিরান্ডার ধারণা ছিল সব মানুষেরই চেহারা তার বাবার মতো—রাশভারী গম্ভীর মুখ, আর একমুখ পাকা দাড়ি। কাজেই এই অতি সুদর্শন যুবা রাজপুত্রকে দেখে সে স্বভাবতই রীতিমত পুলকিত হয়ে উঠলো: আর ফার্ডিন্যান্ডের তো কথাই নেই—এ হেন এক জনমানবশূন্য স্থানে এমন এক অপরূপা নারীকে দেখে এবং তার মধুর কণ্ঠস্বরে সে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ভাবলো বুঝিবা সে এসে পড়েছে এক জাদুমুগ্ধ দ্বীপে, আর মিরান্ডা নিশ্চয়ই এই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই না ভেবে সে শুরু করল দেবী বন্দনা।

মিরান্ডা ভয়ে ভয়ে বলল—না, না, আমি দেবীটেবী নই, একটি সাধারণ মেয়ে আমি। এই বলে সে শুরু করতে যাচ্ছিল তার নিজের কথা, কিন্তু প্রসপেরো বাধা দিলেন তার কথায়। প্রসপেরো কিন্তু খুব খুশি হলেন, কেননা ওরা পরস্পরকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছে, তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন ওদের মধ্যে সেই তুক্‌ই লেগেছে—মানুষ যাকে বলে প্রথম দর্শনেই মন-দেওয়া-নেওয়া। কিন্তু প্রসপেরো

একটু বাজিয়ে দেখতে চাইলেন ফার্ডিনান্ডকে—কতটুকু সাচ্চা সে। তাই তার প্রণয়ের পথে একটু কাঁটা বিছিয়ে তাকে যাচাই করতে মনস্থ করলেন। ফার্ডিনান্ডের দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি রূঢ়ভাবে বললেন, বুঝেছি, তুমি এখানে এসেছ গুপ্তচরের কাজ নিয়ে, তোমার মতলব এই দ্বীপের প্রভুত্ব থেকে আমাকে হটিয়ে এটা কুক্ষিগত করা। এসো বাছাধন, তোমাকে আমি আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রাখবো—তুমি পান করতে পাবে শুধু সমুদ্রের জল, খেতে পাবে গেঁড়ি কিংবা চিংড়ী, শুকনো মূল অথবা ওক ফলের ভূষি। ফার্ডিনান্ড বলে উঠলো—সেটি হচ্ছে না, ঐ সব সুস্বাদু বস্তুগুলি মুখে তোলার আগে আমিও একটু পরখ করে দেখতে চাই কে সে শক্তিমান যে আমাকে বাধ্য করতে পারে এই হীনতায়—এই বলে সে কোষ মুক্ত করল তার তরবারি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রসপেরো তাঁর যাদুদণ্ড সঞ্চালন করে ফার্ডিনান্ডকে নিশ্চল করে রেখে দিলেন সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই—এক পা নড়ে এমন ক্ষমতা রইলো না ফার্ডিনান্ডের।

বাবাকে জাপটে ধরে মিরান্ডা এবার বায়না ধরল—তুমি কেন এমন রাগ করছ ওর ওপরে—না হয় একটু দয়াই করলে, আমিই ওর জামিন থাকছি। আমার চোখে দ্বিতীয় যে মানুষ দেখেছি সে তো ওকেই, আর আমি ভাবতেও পারিনা ওর মধ্যে কোন ছল চাতুরী আছে।

প্রসপেরো বললেন, চুপ—আর একটি কথা বলেছ কী তোমাকে আমি ভর্ৎসনা করব। কী দুঃসাহস তোমার, একটা জুয়াচোর ভণ্ডের হয়ে আমার কাছে ওকালতি করছ! এই ছোকরাটাকে আর ক্যালিবানকে দেখেই তোমার ধারণা হল দুনিয়ায় আর এমন সুন্দর কেউ নেই। ওহে অর্বাচীন, তোমাকে বলছি জেনে রাখ ঐ ক্যালিবানটার চেয়ে এই ছেলেটি যতটা উৎকৃষ্ট বেশির ভাগ মানুষ তার তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর। প্রসপেরোর একথা বলার উদ্দেশ্য তাঁর কন্যার নিষ্ঠা পরখ করা, তিনি বুঝতে চান তাঁর মেয়ে প্রকৃতই ওকে ভালবাসে কী না। মিরান্ডা বাবার কথায় বলল : আমার সামান্য ভালবাসাটুকু ওরই জন্যে—এই বিশাল দুনিয়ার অপর কোন রূপবান মনুষ্যকে দেখার আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।

তখন রাজপুত্রকে প্রসপেরো বললেন : ওহে ছেলেটি, এস, এদিকে এগিয়ে এস দেখি, তোমার এত হিম্মৎ নেই যে আমার আদেশ অগ্রাহ্য করবে।

ফার্ডিনান্ড উত্তরে বলল : সত্যিই আমি অক্ষম। সে একটুও বুঝতে পারেনি যে সে জাদুমন্ত্রের ফলে হারিয়ে ফেলেছে প্রতিরোধ করার সবটুকু শক্তি, নিজেই অবাক হয়ে দেখছে কেমন সুবোধ ছেলেটির মতো গুটিগুটি সে পিছু নিয়েছে বৃদ্ধ প্রসপেরোর, আর পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখছে মিরান্ডাকে, যতক্ষণ তাকে পাওয়া যায় দৃষ্টি সীমার মধ্যে—এইভাবে প্রসপেরোর পিছন পিছন গুহার ভিতর প্রবেশ করতে করতে সে বলল : কে যেন আমার সবটুকু শক্তি হরণ করে আমাকে একটা স্বপ্নের

কুটিরে বন্দী করেছে—তবু ঐ বুড়োটা যতই ভয় দেখাক, অথবা যে দুর্বলতাই আমাকে আচ্ছন্ন করুক—সবই আমার কাছে মনে হবে স্বর্গের দ্যুতি যদি আমার বন্দীশালা থেকে দিনান্তে একটি বারও দেখতে পাই ঐ অপরূপা কন্যাকে।

এবার প্রসপেরো আরও একটু যাচাই করতে চাইলেন ফার্ডিনান্ডকে। আর বেশিক্ষণ কুঠুরীতে আটক না রেখে বাইরে ছেড়ে দিলেন তাকে, আর তাকে দিলেন এক অতি শ্রমসাধ্য কাজ যা করতে তাকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হবে। এদিকে মিরান্ডাকেও হাবে ভাবে বুঝিয়ে দিলেন কী খাটুনির কাজ তিনি চাপিয়েছেন ফার্ডিনান্ডের ঘাড়ে। ব্যবস্থা পাকা করে প্রসপেরো নিজের পড়ার ঘরে গিয়ে ঢোকার ভাণ করলেন, অথচ লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন দুটিতে কী করে।

প্রসপেরো যে আদেশ করেছিলেন তা হল ভারী ভারী সব গাছের গুঁড়িগুলো এক জায়গায় জমা করে রাখতে হবে ফার্ডিনান্ডকে। বেচারা রাজার ছেলে—ভারী কাজ সে কোনকালেই করতে শেখেনি, অভ্যস্তও নয়। মিরান্ডা দেখলো তার ভালবাসার মানুষটির এই পরিশ্রমের ফলে খাবি খাওয়ার উপক্রম হয়েছে, সে মৃতপ্রায়। সে বলল, হা ভগবান! আর ফার্ডিনান্ডকে উদ্দেশ্য করে বলল, অত কষ্ট আর করতে হবে না এখন মশাই, বাবা তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকেছেন, আপাতত ঘন্টা তিনেক নিশ্চিন্ত হতে পার—একটু জিরিয়ে নাও এই সময়টুকু।

ফার্ডিনান্ড উত্তরে বলল—কী আর বলব সুন্দরী—আমার সে সাহস নেই, বিশ্রাম করার আগে একাজ আমাকে শেষ করতেই হবে।

মিরান্ডা বলল : তা একটু বসে নাও না বাপু, ততক্ষণ আমিই না হয় তোমার ঐ কাঠগুলো বয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ফার্ডিনান্ড কিছুতেই ওর কথা মানতে চাইলো না। আর ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে মিরান্ডার উপস্থিতিতে কাজে সাহায্য হওয়া তো দূরের কথা, বেগড়াটাই হল বেশি—এর কারণ, ওদের কথার আর শেষ নেই, দুজনের যেন কত কথাই জমা আছে। এদিকে কাঠ সংগ্রহ করার কাজে আর তেমন তেজী ভাব দেখা যাচ্ছে না, যেন ধীরে ধীরে মন্দা নেমে আসছে।

বুঝতেই পারা যায়, প্রসপেরো যে ফার্ডিনান্ডকে ঐ কাজে জুড়ে দিয়েছিলেন সেটা আসলে কাজের জন্যে নয়, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মিরান্ডার প্রতি ফার্ডিনান্ডের ভালবাসাকে পরখ করা। আর সেইজন্যেই ঐ সময়ে তিনি আদৌ পড়াশুনায় ব্যস্ত ছিলেন না, যদিও মিরান্ডার ধারণা ছিল তার বাবা বই নিয়েই আছেন। ওদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রসপেরো এবং শুনছিলেন ওদের কথোপকথন। অবশ্য ওদের কাছে অদৃশ্যই ছিল তাঁর উপস্থিতি, জাদুর সম্মোহনে।

ফার্ডিনান্ড মিরান্ডার কাছে জানতে চাইল কী ওর নাম। ও বলল বাবার কিন্তু স্পষ্ট নিষেধ আছে তোমাকে আমার নাম বলার, তবু বলে ফেললাম—মিরান্ডা আমার নাম।

কন্যার এই সর্বপ্রথম পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনের নিদর্শনে প্রসপেরো একটু মৃদু হাসলেন নিজের মনে। কন্যার আর দোষ কি, তিনি নিজেই তো জাদুবলে কন্যার মনে এই আকস্মিক প্রেমের সঞ্চার করিয়েছেন, কাজেই সে যদি পিতৃআদেশ ভুলে গিয়েই থাকে, অথবা অমান্য করে থাকে তবে তার ওপর রাগ করা যায় না। বরং তিনি বেশ অভিনিবেশ ও আনন্দ সহকারেই শুনতে লাগলেন ফার্ডিনান্ডের প্রেম নিবেদনের দীর্ঘ বক্তৃতা যার সারমর্ম তাবৎ দুনিয়ার যত রমণীকে সে আজ অবধি দেখেছে তার মধ্যে মিরান্ডাই চ্যাম্পিয়ন, অর্থাৎ সবার সেরা, এবং তাকে ভালবাসাই ফার্ডিনান্ডের একমাত্র কাম্য।

ফার্ডিনান্ডের মুখে নিজের রূপ ব্যাখ্যানের উত্তরে, অর্থাৎ দুনিয়ার সে-ই সেরা সুন্দরী একথা শোনার পর মিরান্ডা বলল—কোন রমণীকে আমি কখনো দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না, আর দুটি পুরুষকেই শুধু আমি সারাজীবনে দেখেছি—একজন তুমি যে আমার প্রাণের মানুষ, আর একজন আমার পিতা যাকে আমি ভালবাসি। বাইরের জগতে কার কতো রূপ আছে তা আমি জানিনা, তবে বিশ্বাস করো, সারা বিশ্বে তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি জীবনসাথী বলে ভাবতে পারিনা, তোমাকে ছাড়া আর একটি মানুষেরও মুখ সুন্দর হয়ে আমার কল্পনায় ভেসে ওঠেনা। কিন্তু এ আমার কি হলো, আমি কী সব এলোমেলো বকে চলেছি—একেবারেই ভুলে বসে আছি বাবার দেওয়া সেই নৈতিক উপদেশের কথা।

একথা শুনে প্রসপেরো একটু হাসলেন, একটু মাথা নাড়লেন সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে, যার অর্থ—আমার যা অভিপ্রেত ছিল তা হতে চলেছে—আমার কন্যা রাণী হতে চলেছে নেপলস্-এর।

অতঃপর ফার্ডিনান্ড আরও একটি দীর্ঘ বক্তৃতা ফেঁদে বসলো—(হবু রাজা স্বভাবতই রীতিমত জাঁকালো ও শিষ্টাচারী শব্দরীতির পক্ষপাতী হয়ে থাকে), সরলস্বভাবা মিরান্ডাকে সে বলল নেপলস্-এর সিংহাসনের সে-ই উত্তরাধিকারী, আর তার রাজমহিষী হতে চলেছে মিরান্ডা।

মিরান্ডা বলল—আমি তো জানিনা কোন্ ভাষায় কেমন করে হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করতে হয়, তাই আমার চোখে জল আসে। তোমাকে আমার নিষ্কলুষ অন্তর দিয়ে আর নিরাভরণ ভাষা দিয়ে এটুকুই শুধু বলে দিলাম—যদি আমাকে তুমি গ্রহণ করো আমি তোমারই পত্নী হব।

ইত্যবসরে মিরান্ডার কথার উত্তরে ফার্ডিনান্ডের ধন্যবাদ দেওয়ার পালা শুরু হতে না হতেই অদৃশ্য প্রসপেরো ওদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন সশরীরে।

তিনি বললেন—কিছু ভাবতে হবে না তোমাদের। আমি আড়াল থেকে সব কথাই শুনেছি—আমার পূর্ণ সম্মতি রইল তোমাদের এই পরস্পরের প্রতি অনুরাগে। আর বাবা ফার্ডিনান্ড, তোমার প্রতি আমি খুবই কঠিন আচরণ করেছি ঠিকই, তবে

তার বিনিময়ে আমি দুর্লভ এক সামগ্রী দিয়ে তোমার ঋণ শোধ করতে চাই—সে আমার কন্যা। তোমার উপর যা কিছু পীড়ন করেছি তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমার ভালবাসার পরীক্ষা করা। বলতে বাধা নেই, তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ সেই পরীক্ষায়। আর সে পরীক্ষার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে দিলাম আমার এই কন্যা যাকে তুমি জয় করেছ তোমার ভালবাসার অগ্নিপরীক্ষায়—আর আমি যদি অহংকার করে বলি যে আমার এই কণ্যাটি সব প্রশংসার উর্ধে, তাহলে তা একটুও ভুল বলা হবে না। এরপর প্রসপেরো বললেন তাঁর আর একটু কাজ আছে যেখানে তাঁর না গেলেই নয়। অতএব, ফার্ডিনান্ড ও মিরান্ডাকে তিনি বললেন দুজনে বসে বসে গল্পগুজব করতে যতক্ষণ না তিনি ফিরে আসছেন। এই কঠিন পিতৃআজ্ঞাটুকু অমান্য করার লোভ মিরান্ডার অবশ্য আদৌ ছিল না।

ওদের ওখানে বসিয়ে দিয়ে প্রসপেরো তলব করলেন অশরীরী এরিয়েলকে, এবং অচিরেই এসে হাজির হল এরিয়েল—প্রসপেরোর ভাই অ্যান্টোনিও এবং নেপলস্-এর নৃপতিকে সে এতক্ষণ কী নাস্তানাবুদ করেছে তার সবিস্তার বর্ণনা দেওয়ার আগ্রহে সে ব্যাকুল। এরিয়েল বলল ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে এযাবৎ সে ঐ দুটি মানুষকে প্রায় অচেতন করার উপক্রম করেছে—তাদের চোখ ভয়ের দৃশ্য দর্শনে ও কান ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে একেবারে জর্জরিত। যখন তারা ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্তিতে একেবারে নাজেহাল এবং ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, তখন তাদের সামনে সে হাজির করেছে অনেক সব অতি সুস্বাদু ভোজের সামগ্রী, আর যে মুহূর্তে তারা আহার গ্রহণের জন্যে হাত বাড়িয়েছে অমনি সে দেখা দিয়েছে তাদের সামনে পক্ষবিশিষ্ট এক বিকট রাক্ষসীর মূর্তি নিয়ে, যে সব কিছু উদরস্থ করতে চায় লোভের জ্বালায়। চোখের নিমেষে যাবতীয় আহার্য সামগ্রী অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে শূন্যে। এবার সেই রাক্ষসীর মূর্তিধারী প্রাণীটি এমন সব কথা বলতে লাগল যা শুনে ঐ রাজা আর অ্যান্টোনিওর তো চোখ ছানাবড়া—রাক্ষসী ওদের স্মরণ করিয়ে দিল কী নিষ্ঠুরভাবে তারা প্রসপেরোকে তাঁর বিশাল জমিদারী থেকে হটিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁকে আর তাঁর শিশুকন্যাকে কেমন করে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিল। রাক্ষসীরূপী বলল সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্যেই তাদের ঐ বিভীষিকার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

নেপলস্-এর রাজা আর প্রসপেরোর কপট ভাই অ্যান্টোনিও এরপর অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে প্রসপেরোর প্রতি অবিচারের জন্যে। এরিয়েল বলল তাদের অনুশোচনা প্রকৃতই স্বতঃস্ফূর্ত বলে সে উপলব্ধি করেছে এবং সে যদিও মানুষ নয়, বিদেহী আত্মা মাত্র, তথাপি ঐ অনুতপ্ত লোকদুটির জন্যে তারও চোখে জল আসছিল।

ওদের এখানে নিয়ে এস, এরিয়েলকে বললেন প্রসপেরো— তুমি শুধুমাত্র একটি বিদেহী আত্মা হয়েও যদি তাদের জন্যে এতটা দুঃখবোধ কর তাহলে আমি

তাদেরই মত যে একটি মানুষ, সে কেমন করে ব্যথিত না-হয়ে থাকতে পারে? যাও, আর দেরি কোরনা, লক্ষ্মীটি এরিয়েল, শীগগির করে ওদের নিয়ে এস।

অনতিবিলম্বে এরিয়েল সদলবলে হাজির করল নেপলস্-এর রাজা, অ্যান্টোনিও এবং সেই বৃদ্ধ গনজেলোকে। আকাশের পথে ভেসে আসা নাম-না-জানা গানের সুরের পিছন পিছন এগোতে এগোতে তারা এরিয়েলকে অনুসরণ করে পৌঁছে গেল তার প্রভু প্রসপেরোর সমীপে। এ সেই একই গন্জেলো যে কী না প্রসপেরোর প্রতি ভালবাসায় দূর সমুদ্রের নৌকাতে দিয়ে গিয়েছিল বইপত্র আর খাবার দাবার যখন তার অমানুষ ভাই তাকে অমন নৃশংস ভাবে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

মর্মযন্ত্রণা ও ভীতি ঐ আগন্তুকদের এতটাই অভিভূত করেছিল যে তারা প্রসপেরোকে চিনতেই পারেনি। প্রসপেরো প্রথমে নিজেকে প্রকাশ করলেন বিশ্বাস পরায়ণ গন্জেলোর কাছে এবং তাকে অভিবাদন করলেন তাঁর প্রাণরক্ষাকারী বলে। তারপর তাঁর ভাই অ্যান্টেনিও এবং নেপলস্-এর রাজাও তাঁকে চিনতে পারলেন প্রসপেরো বলে, যাকে তাঁরা একদিন মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিয়েছেন।

অ্যান্টোনিও অনেক চোখের জল ফেললো এবং তার আন্তরিক অনুশোচনার প্রকাশ পেল তার মুখে অনেক দুঃখের কথায়—সে অনুনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করল নিজের সহোদরের কাছে, আর নেপলস্-এর রাজাও অ্যান্টোনিওকে প্রতারণায় সাহায্য করার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন। এর ফলে প্রসপেরো তাঁদের ক্ষমা করলেন এবং যখন সবাই তাঁর জমিদারী প্রত্যর্পণের ব্যবস্থায় ব্যস্ত তখন তিনি নেপলস্-এর রাজাকে বললেন — আপনাকে দেওয়ার জন্য আমারও একটি উপহার আছে। এই কথার পরই তিনি একটি দরজা উন্মুক্ত করলেন— দেখা গেল তার সন্তান অর্থাৎ নেপলস্-এর রাজপুত্র আর প্রসপেরো কন্যা মিরান্ডা দাবার দান নিয়ে ব্যস্ত।

এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে পিতা ও পুত্রের যে আনন্দ হয়েছিল তার তুলনা নেই, কেননা তারা কেউই ভাবতে পারেনি আবার তাদের দেখা হবে, একজন ধরে নিয়েছিল অন্যজনের সলিল সমাধি হয়েছে সমুদ্রের সেই ঝড়ের ফলে জাহাজডুবিতে।

কী বিস্ময়! বলে উঠলো মিরান্ডা — কী অপূর্ব্ব এরা — এই মানুষেরা! কী অপরূপ এই পৃথিবী যার দিকে দিকে ছড়ানো এমন সব মানুষেরা!

এদিকে নেপলস্ এর রাজা তো অবাক— যেন রূপলাবণ্য ঝরে পড়ছে কিশোরী মিরান্ডার দেহ থেকে— তার ফার্ডিনান্ডের যত রূপ, এ মেয়ের রূপও ততো। তিনি বললেন, কে এই মেয়েটি? তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সে এক দেবী যে আমাদের পিতাপুত্রকে একদিন বিচ্ছিন্ন করেছিল, এবং আজ আবার কাছে এনে দিল। ফার্ডিনান্ড একটু হেসে বলল, তা নয় বাবা, আমি দেখছি সেই একই ভুল

তুমিও করেছ যে ভুল আমি করেছিলাম একে প্রথম যখন দেখি। ওর নাম মিরান্ডা, ও ঈশ্বরী নয়, একটি মেয়ে মাত্র। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে আজ ও আমার স্ত্রী হতে চলেছে— আমি তো আগে তোমার সম্মতি নিতে পারিনি কেননা আমি জানতাম তুমি বেঁচে নেই। মিলানের স্বনামধন্য ডিউক প্রসপেরো, যিনি ঐ দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সামনে, ও তাঁরই কন্যা। ডিউকের গুণগান আমি লোকমুখে অনেক শুনেছি, আজ তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হল। তাঁর কাছেই আমি লাভ করেছি এক নতুন জীবন, তাঁর এই কন্যাকে দান করে তিনিও আজ আমার পিতৃস্বরূপ।

তাহলে আমিও তো ওর বাবা, ও আমার কন্যা সন্তান— কিন্তু ত্র কেমন বেখাপ্পা শোনাবে বলতো, বাবা হয়ে আমি মেয়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করব।

প্রসপেরো বললেন— ওসব কথা এখন থাক— যে দুর্দিন গত হয়ে গেছে তার কথা আর নাইবা মনে রাখলাম, বিশেষ করে যার শেষ ভাল তার সব ভাল। এতক্ষণে প্রসপেরো বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর ভাইকে এবং আরও একবার তাকে আশ্বস্ত করলেন যে তিনি তার অপরাধকে মার্জনা করেছেন। তিনি আরও বললেন যে এক সর্বজ্ঞ বিধাতার বিধানেই তাঁকে মিলানের সামান্য জমিদারী থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল— সেই ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল তাঁর মেয়ে হবে নেপলস্-এর রাজরাণী এবং সেইজন্য এই বালুকাময় দ্বীপখণ্ডে তাঁর মেয়ের জীবনে আবির্ভাব ফার্ডিনান্ডের।

নিজের অনুতপ্ত ভাইকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রসপেরোর এই মধুর কথাগুলির ফলে অ্যান্টোনিও লজ্জা ও দুঃখে কান্নায় ভেঙে পড়ল— সব কথা হারিয়ে সে চুপ করে বসে রইল। সহৃদয় বৃদ্ধ গঞ্জেলোর চোখে জল এলো এই প্রীতিপূর্ণ পুনর্মিলনে, সে নবদম্পতির কল্যাণে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করল।

অতঃপর প্রসপেরো তাঁর এই নতুন করে পাওয়া আত্মীয়দের বললেন যে তাঁদের সেই জাহাজখানি নিরাপদেই ভিড়ানো আছে বন্দরে, মাঝি মাল্লারাও সব ঐ জাহাজেই গিয়ে উঠেছে। তিনি আরও বললেন আগামীকাল সকালে তিনি ও তাঁর কণ্যা ঐ জাহাজেই তাঁদের সঙ্গী হয়ে দেশে ফিরবেন, ইত্যবসরে যেন তাঁরা তাঁর এই পার্বত্য গুহায় যে সামান্য আহারের আয়োজন আছে তাই অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেন এবং সমাগত সন্ধ্যায় তিনি তাঁদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও করবেন তাঁর বিচিত্র রূপকথায়— সে রূপকথার কাহিনী হবে তাঁর এই দ্বীপে প্রথম পদার্পণ করা থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে তার আনুপূর্বিক বর্ণনা। এই বলে তিনি ডেকে পাঠালেন ক্যালিবানকে এবং তাকে বললেন খাদ্যাদি প্রস্তুত করে গুহার ভিতরটা ঠিকমত গোছগাছ করে দিতে। সমাগত অতিথিরা তো ক্যালিবানের কিম্ভুতকিমাকার আকৃতি দেখে অবাক, আর প্রসপেরো বললেন ঐ ক্যালিবানই এই জনমানবহীন দ্বীপে তাঁর একমাত্র সহকারী।

প্রসপেরোর দ্বীপান্তরের কাল অবসান হতে চলেছে— এবার তিনি মুক্ত করে

দিলেন এরিয়েলকে তার নির্ধারিত কাজের দায়িত্ব থেকে। প্রাণোচ্ছল সেই ছোট্ট আত্মাটির তখন কি আনন্দ, কেননা যদিও সে তার প্রভুর কাজে কখনই গাফিলতি করেনি, একনিষ্ঠভাবে সেবা করেছে তাঁর, তবুও তার প্রাণের মধ্যে সবর্দাই সে শুনতে পেত আনন্দের সুর, যে আনন্দ মুক্তির, সে শুধু চাইত বাধাবন্ধনহীন হাওয়ার বুকে ডানায় ভর দিয়ে একটা বুনো পাখির মত সে উড়ে যাবে সেখানে যেখানে ছায়া নেমেছে সবুজ ডালপালার নিচে, আর থোকা থোকা ফলে নুয়ে পড়েছে ডাল, ফোটা ফুলের মৃদু সৌরভে ভরে গিয়েছে সমস্ত বনভূমি। এরিয়েলকে মুক্তি দেবার সময় প্রসপেরো বললেন, আমার আদরের সুন্দর এরিয়েল, তোমাকে হারানোর অভাব আমার বড় কষ্টের, তবুও তোমাকে মুক্তি তো দিতেই হবে। এরিয়েল উত্তরে বলল, আমি কৃতার্থ হে প্রাণাধিক প্রভু, আমাকে আমার শেষ সেবাটুকু করতে দিন— সাগরের বুকে অনুকূল হাওয়া তুলে আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো আপনার তরণী — তারপর আমার ছুটি যে ছুটি আমার কাছে আনন্দধারায় স্নান। এরিয়েল সংগে সংগে গেয়ে উঠলো :

মৌমাছিদের মাতাল করা ফুল আমাকে ডাকে
ঘুমিয়ে পড়ি কাউস্লিপের পাপড়ি মুড়ি দিয়ে,
ভয়ে মরি যখন পেঁচা ডাকে ;
উড়ে বেড়াই বাদুড়— ঘোড়া চেপে
বসন্তকে তেড়ে বেড়াই হুররে— রেরে— রেরে
আনন্দে আর আনন্দে আজ বাঁধব ছোট ঘর
শাখায় শাখায় দোলে বকুল, থাকব তলায় তার।

মাটি খুঁড়লেন প্রসপেরো, গভীর সেই গহ্বরে তিনি চিরদিনের জন্যে প্রোথিত করলেন তাঁর জাদুবিদ্যার পুঁথিগুলি আর জাদুদণ্ড— তিনি স্থির সংকল্প করেছিলেন আর কখনও কোন কাজে তাঁর জাদুবিদ্যার প্রয়োগ করবেন না। তাঁর শত্রুদের তিনি জয় করেছেন, পুনর্মিলন হয়েছে তাঁর ভাই এবং নেপলস্-এর রাজার সংগে—কাজেই আর কোন কাজই বাকী নেই সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য। এবার তাঁর ফেরার পালা আপন দেশে, পুনরায় নিজের জমিদারীর অধিকার প্রাতিষ্ঠিত করা, আর নিজের কন্যা ও রাজপুত্র ফার্ডিনান্ডের শুভ-পরিণয়ে আনন্দোৎসব করা। রাজার ইচ্ছা নেপলস্-এ ফেরার অব্যবহিত পরেই বিশাল সমারোহে এই বিবাহের অনুষ্ঠান করবেন। অতএব আর দেরি নয়—এরিয়েলের নিরাপদ সুরক্ষায় পালতুলে তাঁদের জাহাজ অচিরেই পৌঁছে গেল নেপলস্ নগরীতে।

আ মিডসামার নাইটস্ ড্রিম

এথেনস্ নগরীর আজব এক আইন। সে আইনের বলে নাগরিক মাত্রেরই অধিকার ছিল তার কন্যাকে পিতার ইচ্ছামত বিবাহে বাধ্য করার। যদি কোনো মেয়ে পিতার পছন্দমত পাত্রকে বিবাহ করতে অস্বীকার করত তবে এই আইন অনুসারে তার পিতা ইচ্ছা করলে কন্যাকে প্রাণদণ্ডের আদেশও দিতে পারতেন। তবে স্বেচ্ছায় নিজের কন্যার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে পারে এমন পিতা আর'কজনই বা হয় এবং যদ্যপি কন্যাসন্তানেরা একটু আধটু অবাধ্যতা করেই থাকে তথাপি এই আইন কখনো বলবৎ হয়েছে এরূপ শোনা যায়নি। হ্যাঁ, তবে এমন হতে পারে যে ঐ নগরীর যুবতী কন্যাদের পিতারা প্রায়শই তাদের মেয়েদের এই আইনের ভয় দেখাতে কার্পণ্য করত না।

এমন একজন পিতার কথা অবশ্য আমরা জানি যে প্রকৃতই তার কন্যার প্রাণদণ্ডের নালিশ নিয়ে আর্জি জানিয়েছিল এথেনস্ নগরীর তদানীন্তন ডিউক থিসিয়াস্-এর দরবারে। এই পিতার নাম ঈজিয়াস। ঈজিয়াসের নালিশ ছিল তার কন্যা হারমিয়াকে সে পাত্রস্থ করতে চায় এথেনস্-এর এক উচ্চকুলোদ্ভব যুবক ডিমিট্রিয়াসের সংগে বিবাহের মাধ্যমে, কিন্তু কন্যাটি সে প্রস্তাব নাকচ করেছে কেননা সে ইত্যবসরেই মন দিয়ে বসে আছে এথেনস্-এরই অপর এক যুবক লিসান্ডারকে। ঈজিয়াস আইনের ন্যায়বিচারের দাবী জানাল থিসিয়াস্-এর কাছে এবং তার কন্যার ক্ষেত্রে এই কঠিন আইন প্রয়োগ করা হোক বলে ইচ্ছা প্রকাশ করল।

পিতার ইচ্ছার প্রতি অবাধ্যতার কারণ হিসাবে হারমিয়া তার সওয়ালে বলল যে ডিমিট্রিয়াসকে সে বিবাহ করতে স্বীকৃত হয়নি কেননা ডিমিট্রিয়াস পূর্বেই তার প্রেম নিবেদন করেছে হেলেনা নামে অপর একটি মেয়েকে। ঐ হেলেনা আবার তারই বান্ধবী এবং সে জানে যে ডিমিট্রিয়াসকে পাওয়ার জন্যে হেলেনা উন্মাদ। পিতাকে অমান্য করার জন্যে হারমিয়ার এই উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন কিন্তু ঈজিয়াসের কঠোরতাকে বিন্দুমাত্র নাড়া দিলনা।

একথা ঠিক যে থিসিয়াস্ ছিলেন অতি মহৎ ও দয়াপ্রবণ রাজপুরুষ, কিন্তু দেশের আইনকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করার শক্তি তাঁর ছিলনা। কাজেই তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর ক্ষমতা অনুসারে হারমিয়াকে চারদিনের সময় দিলেন তার নিজের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্যে। যদি এই চারদিন গত হওয়ার পরও সে ডিমিট্রিয়াসকে বিবাহ করতে স্বীকৃত না হয় তবে তার প্রাণদণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

ডিউকের এই আদেশের পর হারমিয়াকে তাঁর সম্মুখ থেকে হটিয়ে দেওয়া হল। গত্যন্তর না থাকায় সে তার প্রণয়ী লিসান্ডারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল এবং তার কাছে এই বিপদের কথা খুলে বলল। সে বলল এখন হয় তাকে লিসান্ডারকে

ভুলে গিয়ে বিয়ে করতে হবে ডিমিট্রিয়াসকে, নতুবা আর চারটি দিন বাদেই তাকে মৃত্যুদন্ড নিতে হবে।

এই সমূহ দুঃসংবাদে লিসান্ডারের তো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল, কিন্তু এই বিপদে তার মনে পড়ল এক মাসির কথা যে কী না বাস করত এথেন্স শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক জায়গায়। ঐ অঞ্চল এথেন্স নগরীতে প্রচলিত আইনের আওতার বাইরে, কেননা ঐ অমানুষিক আইনটি শুধুমাত্র নগরসীমার মধ্যেই বলবৎ ছিল। কাজেই কোনরকমে সেখানে উপস্থিত হতে পারলে হারমিয়া রক্ষা পেতে পারে ভেবে লিসান্ডার হারমিয়াকে বলল, আজই রাতে তুমি চুপি চুপি তোমার বাবার কাছ থেকে পালিয়ে চলে এস, তারপর আমরা দুজন মাসির বাড়িতে চলে যাব এবং সেখানে তোমাকে আমি বিয়ে করে ফেলব। কাজেই, চলে এসো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষায় থাকবো নগরের বাইরে দূরের সেই বনের ভিতর—সেই মনোরম বনভূমি যেখানে বসন্তের মৃদু হাওয়ায় তুমি আর আমি কতদিন ঘুরেছি হেলেনাকে সাথে নিয়ে।

প্রস্তাব শুনে হারমিয়া তো আনন্দে আটখানা, তার এই বাড়ি ছেড়ে পালানোর অভিসন্ধিটা সে একমাত্র তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেলেনা ছাড়া আর কাউকেই জানালো না। হেলেনা কিন্তু বন্ধুর এই বিশ্বাসটুকুর মর্যাদা দিতে পারলনা। ভালবাসায় পড়লে কুমারীরা অনেক সময়েই বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তাই সে হারমিয়ার পালানোর কথাটা ডিমিট্রিয়াসকে বলবে বলে মনস্থ করল। বন্ধুর এই গোপণতাটুকু প্রকাশ করার ফলে সে যে কিছু লাভবান হবে তা সে ভাবেনি বটে তবে তার মিথ্যা প্রণয়ী ডিমিট্রিয়াসের পিছু নিয়ে ঐ বনে পৌঁছানোর সামান্য একটু লোভ সে সম্বরণ করতে পারলনা—সে বুঝতে পেরেছিল এ কথা শুনলে ডিমিট্রিয়াস অবশ্যই হারমিয়ার সন্ধানে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

যে কাননে লিসান্ডার আর হারমিয়া দেখা করবে বলে স্থির করেছিল সেই কাননটি ছিল ছোট ছোট একশ্রেণীর প্রাণীদের বিচরণভূমি—আর, তাদের সবাই বলত পরী।

ঐ বনে জমত মধ্যরাতের আনন্দ মেলা, সে মেলায় থাকত পরীদের রাজা ওবেরণ আর তার রাণী টিটানিয়া—আর তাদের ঘিরে থাকতো ছোট ছোট অন্য সব পরী যারা ছিল সহচরীবৃন্দ।

এদিকে আবার ঠিক ঐ সময়টাতেই ওবেরণের সংগে তার রাণী টিটানিয়ার চলছিল একটু মনকষাকষি। ফলে তারা কখনই চাঁদনি রাতে ঐ বনের ছায়াঢাকা পথে কেউ কারো সংগে দেখা করতো না—তাদের মধ্যে কেবলই ঝগড়া লেগে থাকতো যার জন্যে যাবতীয় ভূতুড়ে পরীর দল হামা দিয়ে ঢুকে পড়ল ওকফলের আধারে এবং ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে রইলো তার মধ্যে।

এই দুঃখজনক বিবাদের আসল কারণ একটি অপহৃত ছোট শিশু, যেটিকে

টিটানিয়া কিছুতেই ওবেরণকে দিতে রাজী নয় কেননা শিশুটি ছিল টিটানিয়ারই এক বান্ধবীর বাচ্ছা। ওর মা মারা যাওয়ার পর টিটানিয়া ওকে চুরি করে নিয়ে আসে তার দাই-এর কাছ থেকে এবং তাকে সে প্রতিপালন করতে থাকে ঐ বনে।

এখন, হারমিয়া ও লিসান্ডারের যে রাতে ঐ বনে দেখা করার কথা ঠিক সেই রাতেই টিটানিয়া তার রাজসখীদের নিয়ে সেখানে বেড়াতে বেরিয়েছিল। এদিকে আবার ওবেরণও বেরিয়েছে তার সভাসদবৃন্দকে সংগে নিয়ে—আর মুখোমুখি দেখাও হয়ে গেছে দুই দলের।

রাজা বলল, চাঁদের আলোয় দেখা হবে টিটানিয়া। টিটানিয়া রেগে আগুন, সে বলল—ও, ওবেরণ, তুমি—হিংসুটে কোথাকার। এই বলে সে তার সহচরীদের বলল, চলো আমরা চলে যাই এখান থেকে, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি ওর সংস্পর্শে আর থাকবো না। ওবেরণ বলে উঠল—আরে একটু দাঁড়াও, দাঁড়াও, রগচটা রাণী আমার, আমিই তো তোমার স্বামী—নিজের স্বামীর উপর কেন এমন গোঁসা করছ। তোমার ঐ বাচ্চা ছেলেটাকে দাও না আমাকে, আমার ফাই ফরমাস খাটবে।

টিটানিয়া সংগে সংগে বলল—ঐ আশাটা ভুলে যাও, তোমার গোটা পরী রাজত্বের দামেও তুমি ওকে আমার কাছ থেকে কিনে নিতে পারবে না। এই বলে রাগে গরগর করতে করতে সে রাজার সামনে থেকে চলে গেল। ওবেরণ বলল—ঠিক আছে, যাও যেখানে খুশি, সকাল হওয়ার আগেই আমি বুঝিয়ে দেব আমাকে অপমান করার কি মজা।

এই বলে ওবেরণ তলব করে পাঠাল তার অতি প্রিয়পাত্র এবং একান্ত সচিব পাক-কে।

পাক-এর আর একটা নামও অবশ্য ছিল, লোকে তাকে কখনো 'রবিন গুড ফেলো' বলেও ডাকতো। পাক-এর স্বভাবটা ছিল ধূর্তামি আর বদমায়েসীর, আর তার অভ্যাস ছিল আশপাশের গ্রামে গিয়ে মজা করার ছলে মানুষকে ফ্যাসাদে ফেলা। কখনও বা গয়লার বাড়িতে ঢুকে দুধের উপরের সরটুকু খেয়ে নিল, আবার কখনও বা তার হালকা আর অদৃশ্য শরীরটা নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাখনের গামলার মধ্যে। আর ঐ গামলার মধ্যে তার অদ্ভুত আকারে নাচের জ্বালায় গোয়ালিনী কিছুতেই সর থেকে ঘি মাখন বানাতে পারত না। গ্রামের চাষাভুষোদেরও অবস্থা তথৈবচ, তাদেরও কাজে উৎপাত করা ছিল পাক-এর অদ্ভুত খেয়াল। পাক করত কী, সে তাদের দিশি মদ বানানোর সময় চোলাই পাত্রে এটা ওটা উৎপাত করে মদটাকেই নষ্ট করে দিত। আবার যখন পাড়ার শান্তশিষ্ট ভালো মানুষেরা একটু আরাম করে একসাথে বসে মদ খেতে চাইত পাক্ অমনি একটু রোষ্ট করা কাঁকড়া হয়ে গিয়ে ঝুপ করে পড়ত সেই মদের পাত্রে, কিংবা যখন কোনো নিরীহ গোছের বুড়ি মানুষ গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছে পাক গিয়ে ঝাঁকুনি লাগাল তার ঠোঁটে, ফলে

মদটুকু ছলকে বেচারার শুকনো গালে মাখামাখি হয়ে গেল, আবার হয়তো একটু পরেই যখন ঐ বৃদ্ধাটি বেশ গুরুগম্ভীরভাবে বসে পাড়ার লোকেদের কাছে কোনো একটা দুঃখের গল্প বলতে যাচ্ছে পাক তৎক্ষণাৎ তার বসার তিনপায়া টুলটা টেনে নিল পায়ের নিচে থেকে আর সংগে সংগেই বেচারী বুড়ো স্ত্রীলোকটি একেবারে চিৎপটাং, তার ফলে তাকে ঘিরে যে সংগী সাথীরা বসে ছিল তারা তো হেসেই লুটোপুটি—যেন এমন মজা তারা আর কখনই পায়নি।

এই স্ফূর্তিবাজ রাত্রিচরকে ওবেরণ বলল—পাক এদিকে এসো, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—আমাকে এনে দিতে হবে, ঐ যে কী যেন একটা ফুল যাকে কুমারী মেয়েরা বলে 'আলিস্যির ভালবাসা'—যে ক্ষুদে লালরঙা ফুলের দু-এক ফোঁটা রস যদি ঘুমন্ত কোনো মানুষের চোখের পাতার উপর ফেলে দেওয়া যায় তাহলে আর কথা নেই—জেগে ওঠার সংগে সংগে সে যাকেই দেখতে পাবে তাকে পাওয়ার জন্যে আকুল হয়ে ছট্‌ফট্‌ করবে। ঐ ফুলের দু-চার ফোঁটা রস আমি ফেলতে চাই টিটানিয়ার চোখের পাতায় যখন সে ঘুমিয়ে থাকবে। এর ফলে চোখ খোলা মাত্রই যাকে সে দেখতে পাবে তারই প্রেমে পড়বে, তা সে সিংহই হোক বা ভালুকই হোক; অন্যের কাজে কাঠি দেওয়া বাঁদরই হোক কিংবা লাফ ঝাঁপ করা উল্লুকই হোক। তারপর অন্য একটা ওষুধ দিয়ে আমি তাকে অবশ্যই তার ঘোরটা কাটিয়ে দেব এবং সে ওষুধটা আমার হাতেই আছে, তবে ঐ মতিভ্রম থাকার ফাঁকে সেই বাচ্ছাটাকে আমি তার কাছ থেকে বাগিয়ে নেব। আমার ফাই ফরমাস খাটার জন্যে।

কোনো নষ্টামির সন্ধান পেলে পাক-এর মন আনন্দে নেচে উঠতো, অতএব তার প্রভুর এই খামখেয়ালী খেলায় সে তো আর সব ভুলেই গেল এবং তৎক্ষণাৎ দৌড়ল ঐ ফুলটার সন্ধানে। এদিকে ওবেরণ যখন পাক-এর ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করছে তখন তার চোখে পড়ল ডিমিট্রিয়াস আর হেলেনা প্রবেশ করল ঐ বনে। তার কানে এল ডিমিট্রিয়াস বকাবকি করছে হেলেনাকে ঐ বনে তার পিছু নিয়ে আসার অপরাধে, এবং তার অসংখ্য কটুকথার উত্তরে কেমন অসহায়ের মত অনুযোগের সুরে হেলেনা তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে একদিন ডিমিট্রিয়াস তাকে কীভাবে ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং পরে কীভাবে তার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ডিমিট্রিয়াস এরপর হেলেনাকে একা ফেলে চলে যাওয়ার সময় বলতে বলতে গেল, তোমাকে এখানে বাঘ ভালুকের পেটে যেতে হবে, তুমি মর। হেলেনা ভয় পেয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল তার পিছনে।

পরীরাজ বরাবরই একনিষ্ঠ প্রণয়ীদের সাহায্য করতে ভালবাসত, কাজেই হেলেনার জন্যে তার বড় মায়া হল। তাছাড়া, তার মনে হল আগে যখন চাঁদনি রাতে হেলেনা তার সুখের দিনে ডিমিট্রিয়াসের সংগে ঐ বনে বেড়িয়ে বেড়াত হয়তো বা সেই

সময়ে তিনি তাদের সেই অবস্থায় দেখে থাকবে। আমরা তো আগেই লিসান্ডারের মুখে শুনেছি এই বেড়ানোর কথা। সে যাই হোক, পাক যখন সেই ছোট্ট লাল ফুলটি নিয়ে ফিরে এলো, তখন ওবেরণ তার প্রিয়পাত্রটিকে বলল: এই ফুলের দু-একটা পাপড়ি ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাও—দেখবে কিছুদূরে একটি সুন্দরী মেয়ে যাচ্ছে যে এসেছে এথেন্স থেকে, মেয়েটি ভালবাসে একটি যুবককে যার কাছে সে পায় শুধু অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্য। তুমি দেখবে, যদি দেখতে পাও সেই নচ্ছার যুবকটি কোথাও ঘুমিয়ে আছে তবে আলগোছে তার চোখের পাতায় একটুখানি এই প্রেমরসের ফোঁটা ফেলে দিও—কিন্তু সাবধান, খেয়াল রাখতে হবে যেন তখন ঐ মেয়েটি কাছাকাছি থাকে ঐ যুবকের, কেননা বাছাধন তাহলে জেগে উঠেই দেখতে পাবে তার দুয়োরাণী প্রেমিকাকে। লোকটাকে চেনার নিশানা হচ্ছে দেখবে তার পরনে আছে এথেন্স-এর প্রচলিত পোশাক। পাক্ জোর দিয়ে বলে গেল এই অঘটনটি সে সুকৌশলেই ঘটিয়ে ফেলবে। অতঃপর ওবেরণ চুপিচুপি তার বিশ্রামকুঞ্জে গিয়ে প্রবেশ করল—টিটানিয়াকে লুকিয়ে। টিটানিয়া এই সময় ঘুমোতে যাওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। তার পরীসুলভ কুঞ্জবনটি ছিল একটা নদীর ধারে যেখানে ফুটতো বুনো সব থাইম ফুল, কাউস্লিপ, ভায়োলেট আর ঐ কুসুমকুঞ্জের মাথায় চাঁদোয়ার মত ছিল উডবাইন, মাস্করোজ এবং ইগল্যানটাইন। ঐ মনোরম স্থানে টিটানিয়া ঘুমত প্রতি রাত্রেই মাত্র কয়েক প্রহর, আর তার শয্যার আচ্ছাদন ছিল উজ্জ্বল এক সাপের চামড়ায় তৈরী। আবরণটি যদিও ছিল নাতিদীর্ঘ তবু একটি পরীর দেহকে তা দিয়ে স্বচ্ছন্দেই ঢাকা যেত।

ওবেরণ সেখানে পৌঁছে শুনতে পেল টিটানিয়া একে একে তার সহচরী পরীদের আদেশ দিতে ব্যস্ত, তার নিদ্রা কালে কে কোন কাজের দায়িত্ব নেবে। কয়েকটি পরীর উপর সে ভার দিল মাস্করোজ ফুলের ভিতর পোকাগুলি মারতে, কাউকে কাউকে সে বলল বাদুড়ের সঙ্গে লড়াই করে তাদের চামড়ায় তৈরী ডানাগুলো কেটে আনতে, কেননা ঐ ডানায় ছোট ছোট কোট বানালে পরীদের গায়ে দেওয়ার কাজে লাগবে। কয়েক জনের উপর আবার দায়িত্ব পড়ল হট্টগোল বাধানো পেঁচাগুলো যাতে ঘুমের কাছে না আসতে পারে তা লক্ষ্য রাখতে, রাত বাড়লেই ওরা ডাকতে শুরু করে—সে ডাকের অর্থ আমি বাপু পেঁচা একলাসেড়ে—আমাকে কেউ উত্যক্ত কোরনা। সে কথা থাক, টিটানিয়া বলল—এখন একটা গান করো দেখি, আমি শুনতে শুনতে ঘুমই—।

'ডোরা কাটা সাপ তোমরা এক এক জোড়া জিভ।
কাঁটাভরা সজারুরা লুকিয়ে থাকো ঝোপে;
গোল কোরনা গোসাপ কিংবা কুতকুতে চোখ পোকা,
পরীর রাণীর ঘরের ছায়ায় পা পড়েনা যেন।

ফিলোমেল ভাই গান গেয়ে যাও, ঘুমপাড়ানি গান
আয় ঘুম আয়, আয় ঘুম আয়, আয়রে ঘুম আয়
ক্ষতি কারো, জাদু কিংবা গুণ কোরনা কাউকে।
এসো এসো, বোস এসে এ সুন্দরীর চোখে।
ঘুম এসেছে এবার, এসো, বিদায় জানাই, গান।'

এই মিষ্টি গানটি গেয়ে পরীরা ঘুম পাড়িয়ে দিল তাদের মহারাণীকে, আর তারপর রাণীমা তাদের যাকে যেমন কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল সেই কাজ করতে যে যার চলে গেল। এই ফাঁকে ওবেরণ এসে চুপি চুপি কয়েকফোঁটা প্রণয়রস ফেললো টিটানিয়ার দুই চোখের পাতার উপর, আর বিড়বিড় করে বললো :

'ঘুম ভাঙ্গলে সামনে তোমার চোখে পড়বে যাকে
আঁকড়ে ধরবে তাকে তুমি ভালবাসবে তাকে।'

এবার আমরা ফিরে আসি হারমিয়ার কথায়। আমরা জানি সে ডিমিট্রিয়াসকে বিয়ে করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করার ফলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল এবং সেই দন্ডের ভয়ে হারমিয়া সেদিন রাতেই তার বাবার আশ্রয় ত্যাগ করে এই বনেই পালিয়ে এসেছিল।

একা একা বনের ভিতর প্রবেশ করে হারমিয়া দেখল তার প্রাণাধিক প্রিয় লিসান্ডার তারই জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করে আছে সে এলে দুজনে একসাথে তার মাসির বাড়িতে যাবে। দেখা হওয়ার পর দুজনে চলতে লাগল বনের পথ দিয়ে, কিন্তু বনের পথটা বড় কম নয়, তারা চলছে তো চলছেই। মাঝামাঝি এসে হারমিয়া ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তার পা আর চলেনা। লিসান্ডার এতই ভালবাসত হারমিয়াকে যে সে তার কষ্ট দেখে বড়ই ব্যথিত হল—নিজের মনে মনে ভাবল, আহা বেচারা আমার জন্যেই শুধু নিজের জীবন এমন করে বিপন্ন করেছে। এই ভেবে সে হারমিয়াকে বলল—থাক্, আজ আর হেঁটে কাজ নেই, এস, একটু বিশ্রাম করো আর আজকের রাতটার মত এই নদীর ধারে শ্যাওলাঢাকা নরম জায়গায় একটু ঘুমিয়ে নাও, কাল সকালে উঠে আবার আমরা হাঁটতে শুরু করব। হারমিয়া তার কথামত সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এবং লিসান্ডারও একটুখানি দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় মাটির ওপর শুয়েই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। এমন সময়ে পাক এসে উপস্থিত সেখানে। সে দেখল ভারী সুন্দর এক যুবক ঘুমিয়ে আছে আর তার পোষাক-আশাকে তাকে তার এথেনসবাসী বলেই বোধ হল, আরও সে দেখতে পেল কাছেই ঘুমিয়ে রয়েছে একটি রূপসী মেয়ে। ব্যাস্-পাককে আর পায় কে? সে সংগে সংগে ধরে নিল তার রাজামশাই তার উপর যাদের খোঁজার ভার দিয়েছেন এরা নিশ্চয়ই তারা হবে, অর্থাৎ সেই ভাগ্যবিড়ম্বিতা হেলেনা আর তার প্রতারক প্রণয়ী ডিমিট্রিয়াস। পাক মনে মনে ভেবে নিল এখানে যখন এই দুটি ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই, তখন স্বভাবতই

ছেলেটির যখন ঘুম ভাঙ্গবে সে তখন প্রথম দেখতে পাবে ঐ মেয়েটিকেই—কাজেই আর ইতিউতি না করে যেমন ভাবা তেমন কাজ—পাক আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সেই লালটুকটুকে ছোট্ট ফুলের কয়েক ফোঁটা রস ফেলে দিল লিসান্ডারের চোখের পাতায়। এদিকে কাহিনীর সুতোয় পড়ে গেল আর একটা জট, কেননা অপ্রত্যাশিত ভাবে ঐ সময় সেখানে এসে পড়ল হেলেনা, আর তার ফলে লিসান্ডারের ঘুম ভাঙ্গতেই চোখ মেলে সে দেখতে পেল হারমিয়ার বদলে হেলেনাকে। ফলে যা হওয়ার নয় তাই হোল, অর্থাৎ ঐ বশীকরণের পুষ্পনির্যাসের গুণে হারমিয়ার প্রতি লিসান্ডারের সব ভালবাসাটুকু উবে গেল—সে প্রণয়াসক্ত হল হেলেনার প্রতি।

যদি এমনটি হোত যে লিসান্ডারের ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পড়ত হারমিয়ার উপর তাহলে পাক-এর এই ভুলটাতে কোণ ক্ষতিবৃদ্ধি হতনা, কেননা হারমিয়াকে তো লিসান্ডার এমনিতেই যারপরনাই ভালবাসত। কিন্তু হতভাগ্য লিসান্ডারের সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল হেলেনা এসে পড়ায়—ঐ বশীকরণ নির্যাসের গুণে। সে বেমালুম ভুলে গেল হারমিয়ার কথা, তার সরল ভালবাসার কথা, এবং পরিবর্তে তার মন গিয়ে পড়ল অপর একটি মেয়ের উপর। হারমিয়াকে সে ঐ মাঝরাতে একলাটি বনের মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেল—হায়রে অদৃষ্ট!

এরই নাম অদৃষ্টের পরিহাস। আমরা তো আগেই শুনেছি কেমন অবস্থায় হেলেনা পাগলের মত পিছু নিয়েছিল ডিমিট্রিয়াসের যখন সেই অসৎ ছেলেটি তার প্রতি নির্দয় আচরণ করে চলে আসে তাকে ছেড়ে। কিন্তু বেচারী হেলেনা ছুটতে ছুটতে পিছনে পড়ে গিয়েছিল কী করেই বা পারবে সে? এতখানিটা দূর পাল্লার পথে কোনো মেয়েই কী পারে পুরুষের সাথে দৌড়ে তাল রাখতে? স্বভাবতই অল্পক্ষণের মধ্যেই হেলেনা পিছিয়ে পড়ার ফলে ডিমিট্রিয়াস হারিয়ে গেল তার দৃষ্টির বাইরে—সে তখন এদিক ওদিক তাকে খুঁজতে লাগল মনমরা হয়ে একা একা। এমন সময়, পড়বি তো পড়—সে গিয়ে পড়ল যেখানটায় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল লিসান্ডার। সে বলে উঠলো—আরে! এ তো লিসান্ডার ঘুমোচ্ছে মাটিতে শুয়ে: ও বেঁচে আছে তো, না, মৃত? হেলেনা খুব আস্তে আস্তে লিসান্ডারের গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—এই যে মশাই, আপনি কি বেঁচে? তাহলে উঠুন। ঝাঁকুনি লাগার সঙ্গে সঙ্গে লিসান্ডারের ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর প্রক্রিয়া শুরু হল সেই বশীকরণের পুষ্প নির্যাসের। সে তখন শুরু করল গদগদভাবে প্রেমিকের মত ভাষায় দেবী বন্দনা, জয়দেবের গীতগোবিন্দ সে ভাষার কাছে হার মানে—লিসান্ডার হেলেনাকে বললো, আহা কী সুন্দর তুমি—'যুগ যুগ ধরি হিঁয়ে হিঁয়ে রাখনু, তবু 'হিঁয়া জুড়ন না গেল'—তুমি যদি হও বনকপোত তবে ঐ হারমিয়া মেয়েটা সাক্ষাৎ দাঁড়কাক—তোমার জন্যে আমি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারি। লিসান্ডারের এইরকম মতিগতি দেখে হেলেনা তো রেগে আগুন—একে সে

হারমিয়ার বন্ধু, তায় আবার সে জানতো লিসান্ডারের সঙ্গে হারমিয়ার পবিত্র বাগদত্তা থাকার ইতিহাস। কাজেই সে অনুমান করল নিশ্চয়ই তাকে লিসাণ্ডার বিদ্রূপ করছে, তাই ঐ সব আজে বাজে কথা। তার ভারী দুঃখ হলো, সে বলল, হায় পোড়া কপাল আমার! কেনই বা ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন—সবার কাছে শুধু হাসি বিদ্রূপ আর অবজ্ঞাই জুটল আমার ভাগ্যে! লিসাণ্ডারকে সম্বোধন করে সে বলল—হে যুবক, আমার পোড়া কপালে আর কত সইতে হবে? এটাই কি যথেষ্ট নয়, যে ডিমিট্রিয়াসকে আমি এত ভালবাসি তার কাছ থেকে আমি কিছুই পেলাম না, না একটু প্রসন্ন দৃষ্টি, না দুটো মিষ্টি কথা? গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত আবার তুমি আমাকে ভালবাসার অভিনয়ে এমন হেনস্থা করছ— এ কেমন তরো লিসান্ডার? তোমাকে তো আমি ভালো বংশের সত্যিকারের ভদ্রলোক বলেই জানতাম! কথাগুলি বলার পর প্রচণ্ড রাগে সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে চলে গেল হেলেনা, আর লিসান্ডার ঘুমন্ত হারমিয়াকে বেমালুম ভুলে গিয়ে পিছু নিল হেলেনার।

এদিকে কিছুক্ষণ বাদে হারমিয়ার যখন ঘুম ভাঙ্গল সে সভয়ে দেখলো চারধারে কেউ-ই নেই—ঐ বিজন অরণ্যে সে একা। বনের ভিতর সে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে লাগল এদিক ওদিক—লিসান্ডার কোথায় যেতে পারে অথবা তার কী হতে পারে তার কোনো হদিসই সে করতে পারছিল না—সে ঠাওর করে উঠতে পারছিল না কোন দিকে গেলে তার দেখা পাওয়া যাবে। ইত্যবসরে আর এক ঘটনা ঘটল—ডিমিট্রিয়াস হারমিয়াকে এবং প্রণয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী লিসান্ডারকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে অবশেষে ক্লান্তি আর অবসাদে এক জায়গায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল—আর তাকে সেই গভীর ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেল ওবেরণ। ওবেরণ এর আগেই পাক-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কথাবার্তা বলে বুঝে গিয়েছিল যে পাক ভুলক্রমে অপর মানুষের চোখে তার বশীকরণ নির্যাস ব্যবহার করে গোল পাকিয়ে বসে আছে। তাই এখন সে ডিমিট্রিয়াসকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে মনে করল এবার যথার্থ ব্যক্তিকে পাওয়া গেছে—এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সে ডিমিট্রিয়াসের চোখের পাতায় ছুঁইয়ে দিল তার প্রেম-রস। আর জেগে উঠল ডিমিট্রিয়াস। এবারেও সেই ভ্রান্তিবিলাস—প্রথমেই ডিমিট্রিয়াসের চোখ পড়ল গিয়ে হেলেনার উপর। আর কে তাকে সামলাবে—ঐ লিসান্ডার যেমন দেবী আরাধনা শুরু করেছিল হেলেনাকে দেখে, সে-ও তেমনি হেলেনাকে পুজো করতে লাগল-'দেহি পদপল্লব মুদারম' কায়দায়। এদিকে আবার অকুস্থলে এসে উপস্থিত হল লিসান্ডার আর তার পশ্চাদ্ধাবনরত হারমিয়া—কেননা, পাক-এর দুর্ভাগ্যজনক ভুল ঔষধিক প্রক্রিয়ায় হারমিয়া বেচারা এখন ক্ষেপে গিয়েছে প্রেমিক ধরার জন্যে। লিসান্ডার আর ডিমিট্রিয়াস। এই দুজনের চোখেই তখন এঁটে বসে আছে সেই একই বশীকরণের কাজল, দুজনেরই কঠিন মতিভ্রম। তাই দুজনেই সমস্বরে প্রেম নিবেদন শুরু করল হেলেনাকে।

হেলেনা তো বিস্ময়ে আকাশ থেকে পড়ল—সে ভাবল বুঝিবা ডিমিট্রিয়াস, লিসান্ডার এবং তার একদা প্রিয়সখী হারমিয়া, এরা তিনজনে মিলে চক্রান্ত করে একসঙ্গে তাকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করছে।

হারমিয়া ও চক্ষু চড়ক গাছ—তারও মাথায় আসছে না কেন লিসান্ডার ও ডিমিট্রিয়াস যারা দুজনেই একদিন তার প্রেমে মুগ্ধ ছিল, আজ উভয়েই আসক্ত হয়েছে হেলেনার প্রতি। তবে হারমিয়ার পক্ষে এটাকে মোটেই ঠাট্টা বিদ্রূপ বলে উড়িয়ে দিতে পারার কথা নয়।

এর ফলে যা হওয়ার তাই হল— অর্থাৎ হেলেনা ও হারমিয়া, একদিন যারা গলায় গলায় বন্ধু ছিল, এবার তারা কোমর বেঁধে দাঁড়াল পরস্পরকে গালিগালাজ করতে।

হেলেনা বলল-হারমিয়া এত পাষণ্ড তুমি, তুমি কী না লিসান্ডারকে লেলিয়ে দিয়েছ মিথ্যা স্তোকবাক্যের বিদ্রূপে আমাকে এমনি করে উত্যক্ত করতে—এদিকে তোমার অপর প্রণয়ী ডিমিট্রিয়াস, যে কী না কথায় কথায় আমার প্রতি অবজ্ঞার লাথি ছুঁড়তে অভ্যস্ত ছিল তাকে নিয়োগ করেছ আমাকে সব খাসা খাসা বিশেষণে—দেবী, বনপরী, অনন্যা, হীরে, পান্না, স্বর্গীয়—এই সব সম্বোধন করতে। আমাকে তো ও ঘৃণাই করে। তবে তোমার প্ররোচনা ছাড়া ওসব কথা কিছুতেই ওর মুখ দিয়ে উচ্চারণ হত না। এর একমাত্র উদ্দেশ্য আমাকে বিদ্রূপ করা। হারমিয়া কত নির্দয় তুমি যে ঐ যুবকদের সঙ্গে দলবেঁধে তুমি তোমার অসহায় বন্ধুর সঙ্গে এই দুর্ব্যবহার করছ। আমাদের স্কুল জীবনের সেই বন্ধুত্বের কথা তোমার একবারও মনে পড়ল না? হারমিয়া, মনে পড়ে তোমার, কতদিন আমরা দুজন একই আসনের উপর বসে, দুজনে মিলে একই গানের কলি গাইতে গাইতে, হাতে ছুঁচ নিয়ে একই কাপড়ের উপরে সুতোয় একটাই ফুল তুলতাম—আমরা দিনে দিনে বেড়ে উঠছিলাম জোড়া চেরির মত—মনেই হতনা আমরা স্বতন্ত্র। হারমিয়া, এ কেমন বন্ধুর মত ব্যবহার তোমার, একজন অনূঢ়া মেয়ে হয়ে তুমি কী না দুটি পুরুষের সঙ্গে মিতালি করেছ তোমার এই অসহায় বন্ধুকে অপদস্থ করার জন্যে!

হারমিয়া বলল—কী সব আবোল তাবোল বকছ তুমি উত্তেজনার বশে? আমি তোমাকে কখন ঘৃণা করলাম, তুমি-ই তো বরং আমাকে যা তা বলছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কর, বলল হারমিয়া। চুপচাপ থাক, ভালো মানুষটির মত ভাণ দেখাও আর আমি পিছন ফিরলেই মুখ ভেঙ্গাও—আর নিজেদের মধ্যে চোখের ইশারায় কথা বলে মজা পাও। যদি তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র দয়ামায়া, ভদ্রতা বা ভব্যতা বোধ থাকতো তাহলে কিছুতেই তুমি আমার সঙ্গে এমন আচরণ করতে না।

হেলেনা এবং হারমিয়ার মধ্যে যখন এই কথা কাটাকাটি ও কলহ চলেছে তখন ডিমিট্রিয়াস ও লিসান্ডার ওদের ছেড়ে এগিয়ে গেল বনের ভিতর একটু

দূরে—হেলেনাকে ভালবাসার অধিকার নিয়ে তারা একটা হেস্তনেস্ত করবে পরস্পরের লড়াই-এর মাধ্যমে।

এদিকে হেলেনা ও হারমিয়া যখন দেখল ওরা স্থান ত্যাগ করেছে তখন তারাও হন্তদন্ত হয়ে ছুটলো বনের মধ্যে ওদের অন্বেষণে।

ওবেরণ এতক্ষণ আড়াল থেকে ওদের এই বাদ-বিসম্বাদ শুনছিল। ওরা চলে যাওয়ার পর সে পাককে বলল—শুনলে তো? তোমার গাফিলতিতেই এই অরাজকতা—না কী তুমি ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছ? পাক বলল—হে ছায়া রাজ্যের অধীশ্বর, বিশ্বাস করুন, সম্পূর্ণই ভুলবশত এমনটা ঘটে গেছে। আপনিই না বলেছিলেন এথেন্স-এর পোশাক দেখে ঠিক ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে হবে? যাহোক, এমনটা ঘটে গেছে বলে আমি একটুও দুঃখিত নই, এদের এই চিল্লানোর ব্যাপারটায় বরং বেশ মজাই লাগছে। ওবেরণ বললঃ নিজের কানেই তো শুনলে ডিমিট্রিয়াস ও লিসান্ডার খুঁজতে গেল লড়াই-এর জন্যে একটা উপযুক্ত ফাঁকা জায়গা। এখন আমার কথা মত একটা কাজ করো—আজকের মত রাতের আকাশটাকে খুব গাঢ় কুয়াশায় এমন করে ঢেকে দাও যে কিছু চোখে না পড়ে, আর ঐ বিবদমান প্রণয়ী দুটি যেন অন্ধকারে পথ হারিয়ে সারারাত এলোমেলো খুঁজে বেড়ায় একে অন্যকে। আর একটা মজা কর। তুমি একবার ওদের একজনের কণ্ঠস্বরের ভাণ করে অন্যজনকে তিক্ত বিদ্রূপে উত্তেজিত করো, পরমুহূর্তে অপরজনের গলার স্বর অনুকরণ করে আবার অন্যটাকে রাগিয়ে দাও—এমনিভাবে সর্বক্ষণ ওদের তোমার পিছনে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াও। দেখো, যতক্ষণ না ওরা ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে থেমে যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ তুমি কিন্তু ওদের থামতে দিওনা। যখন দেখবে ওরা বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে তখন এই অপর ফুলটার নির্যাস দু ফোঁটা ফেলে দিও লিসান্ডারের চোখে। ওর ঘুম ভাঙ্গলে ওর সম্বিত ফিরে আসবে এবং হেলেনাকে নিয়ে ওর চোখে যে নতুন রং ধরেছিল তখন সেটা আর থাকবেনা, ও আবার আগের মতই পাগল হয়ে উঠবে হারমিয়াকে পাওয়ার জন্যে—এর ফলে ঐ দুটি সুন্দরীই যে যার মনের মানুষ খুঁজে পাওয়ার পর তুষ্ট হবে, আর মনে মনে ভাববে আজ রাতের এই দুর্যোগগুলো বোধ হয় একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। যাও জলদি যাও পাক, একটুও দাঁড়িয়ে থেকনা। এদিকে আমি গিয়ে দেখি আমার প্রিয়তমা টিটানিয়া আবার কার প্রেমে পড়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছে।

টিটানিয়া তখন পর্যন্ত ঘুমিয়েই ছিল, ওবেরণ গিয়ে দেখল। তার মাথায় অতঃপর একটা দুষ্টু বুদ্ধি চাপল, সে দেখতে পেল একটা ভাঁড় বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বোধ করি ক্লান্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে টিটানিয়ার কাছাকাছি। ওবেরণ ভাবল, ভালই হয়েছে, এই ভাঁড়টাকেই কাজে লাগাই। এই ভেবে সে একটা গাধার মুণ্ডু দিল ভাল করে সেঁটে ঐ ভাঁড়টার মাথায়। ঐ মুণ্ডুটা এমন জব্বর ওর মাথায় বসে গেল

যে বোধ হল যেন ওটা ঘাড় থেকে গজিয়ে ওঠা ওর নিজেরই মস্তক। ওবেরণ যদিও খুবই সন্তর্পণে মুণ্ড বদলের কৌশলটি করছিল তবু ঐ সামান্য স্পর্শেই ভাঁড়টার ঘুম গেল চটে, সে ছটফট করে উঠে পড়ে এগিয়ে যেতে লাগল—ঘৃণাক্ষরেও কিন্তু টের পেলনা তার মাথাটি কার মাথা—সে এগোতে এগোতে গিয়ে পড়ল সেই কুঞ্জে যেখানে নিদ্রামগ্ন ছিল পরীর রাণী টিটানিয়া।

টিটানিয়ার ঘুম ভাঙ্গল—ঠিক এই সময়েই সে চোখ মেলে দেখল গর্দভমুণ্ড ভূষিত ভাঁড় মহারাজকে। টিটানিয়ার চোখে তখন সেই ক্ষুদে রাঙা কুসুমের স্বপ্নের ঘোর—প্রেম নির্যাসে জর্জরিত টিটানিয়া বলে উঠল—কী পেখলু, এ আমি কোন দেবদূতকে দেখছি—যেমন মনোহর তোমার রূপ, তুমি অবশ্যই তেমন-ই গুণধর ?

বোকা ভাঁড়টা বলল—আজ্ঞে দিদিমণি, আমার ভাঁড়ে যদি এটুকু বুদ্ধি জোগায় যে আমি কোনক্রমে এই বনের গোলকধাঁধাটুকু পার হতে পারি তাহলেই আমার যথেষ্ট হবে, তার বেশি কাণ্ডজ্ঞান আমার চাইনা।

প্রেমোন্মাদ রাণী বলল—সে কী কথা ? এ বনের বাইরে যাবে তুমি কিসের জন্যে ? আমি যে সে পরী নই, তুমি জানোনা আমার কী পরিচয়। আর এ-ও জানোনা তোমাকে আমি কত ভালবাসি। লক্ষ্মীটি চলো আমার সঙ্গে, আমি তোমার সেবাযত্নের জন্যে এখুনি আমার সহচরী পরীদের বলে দিচ্ছি।

এই বলে টিটানিয়া তার চারজন পরীকে ডেকে পাঠাল—তাদের নাম মটরকুঁড়ি, ঊর্ণা জাল, দেয়ালীয়া আর সরষে পুঁটকি।

রাণী তাদের উপর আদেশ দিল, এই সুন্দর ভদ্রলোকটির দেখাশোনার কোন ত্রুটি যেন না হয়—এঁকে এঁর চলাফেরার পথে একপেয়ে নৃত্য দেখাবে, এঁর আনন্দের জন্যে চোখের সমুখে তিড়িং তিড়িং নাচ দেখাবে, আর এঁকে খেতে দেবে আঙ্গুর আর সুমধুর খুবানি ফল। মৌমাছিদের মৌচাক থেকে মধুর থলিও চুরি করে নিয়ে আসবে এঁর জন্যে। ভাঁড়কে মিষ্টি করে সে বলল—এসো, লক্ষ্মীটি, বোস আমার কাছে, তোমার ঐ সুন্দর দাড়িওয়ালা থুতনিটা নিয়ে আমি একটু আদর করি—কী সুন্দর গর্দভ তুমি ! আমাকে একটু চুমু খেতে দাও তোমার ঐ দীর্ঘ কানে, হে মনোহর !

গর্দভমুণ্ড ভাঁড়টির প্রাণে রাণীর প্রণয় সম্ভাষণে তেমন একটা পুলকের সঞ্চার হলো বলে বোধ হলনা, তবে দাসদাসী ব্যাপারটা তাকে বেশ চাঙ্গা করে তুলল অহংকারে—কোথায় রে মটর কুঁড়ি, কোথায় গেলি, সে চেঁচিয়ে উঠল।

ছোট্ট মটর কুঁড়ি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—এই যে আজ্ঞে।

মাথাটা চুলকে দে তো—বলল ভাঁড় মহারাজ। আরে, ঊর্ণা জালটা গেল কোথায় ?

এই যে, আজ্ঞে, বলল ঊর্ণা জাল।

বোকা ভাঁড়টা বলল—বাছা ঊর্ণা, একটা কাজ কর দেখি—ঐ থিসল্ কাঁটা গাছটার মাথা থেকে ছোট্ট লাল মৌমাছিটা মেরে দাও আমাকে, আর সেই সঙ্গে

বাছা, মধুর থলিটাও আনতে ভুলনা। দেখো বাপু ঐ কাজ করতে গিয়ে যেন বেশি ছটফট কোরনা, সাবধানে করতে হবে, নাহলে মধুর থলিটা ছিঁড়ে যেতে পারে। ঐ থলিটা ঘাড়ে করে তোমাকে উড়তে হবে ভেবে আমার বড় মায়া হচ্ছে। তা সরষে পুঁটকিটা গেল কোথায়?

এই যে আজ্ঞে, বলল সরষে পুঁটকি—বলুন কি আপনার ইচ্ছা?

না, তেমন কিছু নয়, বলল বোকাটা—হ্যাঁ, তা একটু সাহায্য করনা মটর কুঁড়িকে চুলকোনোর কাজে—আর একটা কথা, আমাকে একবারটি নাপতের কাছে যেতে হবে, বুঝলে হে সরষে পুঁটকি, আমার কেমন যেন বোধ হচ্ছে মুখটায় বড্ড বেশি দাড়ি গোঁফ বেড়ে উঠেছে।

রাণী এমন সময় বলল—প্রিয়তম, তোমার খাবারের কথা তো কিছু বললে না—কি খাবে বল? আমি এখুনি এক ডানপিটে পরীকে দিয়ে কাঠবিড়ালীর সঞ্চয় থেকে তোমার জন্যে আনিয়ে দেব কিছু টাটকা বাদাম।

তার চেয়ে আর এক কাজ করো—বলল বোকাটা—বরং একমুঠো শুকনো মটর আনিয়ে দাও, আমার ওটা খেতেই বেশি ভাল লাগে। আসলে, তার মাথাটি গাধার মাথায় রূপান্তরিত হওয়ার ফলে তার রসনার প্রকৃতিও গিয়েছিল পালটে; মানুষের খাদ্য তার রুচবে কেন? সে বলল, খাওয়ার কথা থাক, আমাকে এখন একটু ঘুমতে দাও দেখি। আর দেখো, তোমার সাঙ্গপাঙ্গরা যেন আমাকে বিরক্ত না করে ঘুমের সময়।

হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও, রাণী বলল, আর আমি বসে বসে আমার দুটো ডানা দিয়ে তোমাকে হাওয়া করি। জানো তো, কত ভালবাসি তোমাকে, তোমাকে ছাড়া আমার চলবেই না।

পরীরাজ হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের চোখে দেখল তার স্ত্রীর বাহুবেষ্টনে আরামে ঘুমিয়ে আছে ভাঁড়টি। সে তার স্ত্রীর দৃষ্টিপথে এগিয়ে এল এবং স্ত্রীকে যারপরনাই কটু ভাষায় গালিগালাজ করল একটা গাধার সঙ্গে এই পরিমাণ প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার জন্যে।

টিটানিয়া হাতে নাতে ধরা পড়েছে, কী করে আর অস্বীকার করে? ভাঁড়টা তো তখনও তার বাহুর বন্ধনে ঘুমিয়ে, আর তার গর্দভ মস্তকে টিটানিয়ার দেওয়া ফুলের রাশি।

বেশ কিছুক্ষণের জন্যে ওবেরণ সমানে টিটানিয়াকে বাক্যবাণে বিধ্বস্ত করার পর বলল, 'আমাকে এবার দাও দেখি সেই চুরি করে আনা বাচ্ছাটাকে। টিটানিয়া আর কী করবে—সে তো এই নতুন প্রেমের ব্যাপারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে, সেই লজ্জায় সে আর ওবেরণের প্রস্তাবে অসম্মত হতে ভরসা পেলনা।

অতএব, ওবেরণ কৌশলে তার কার্যসিদ্ধি করে নিল এবং এরপর তার আর

কোনো ক্ষোভ রইলনা—যে বাচ্ছাটাকে নিয়ে টিটানিয়ার সঙ্গে তার যাবতীয় গোলমাল তাকে সে নিজের খাসচাকর রূপে পেয়ে গেল। স্বভাবতই নিজের রাণীকে নিয়ে এই মজার কৌশল করার ফলে রাণী বেচারার যে লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে সেজন্যে ওবেরণের বড় মায়া হল—কাজেই, অবিলম্বে সে বশীকরণ ব্যাধি দূর করার যে দ্বিতীয় ফুলটি ছিল তার নির্যাস লাগিয়ে দিল টিটানিয়ার চোখে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরীরাণী তার পূর্ব সম্বিত ফিরে পেল। আর তখন তার কী লজ্জা! সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল কী করে সে ঐ অদ্ভুত জীবটাকে এতক্ষণ প্রেম নিবেদন করেছে, গর্দভটির প্রতি তাকিয়ে এখন তার মন ঘৃণায় ভরে উঠল।

ওবেরণও সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড়ের মাথা থেকে গর্দভের মাথাটি খসিয়ে নিল এবং নিজের নিরেট মাথা নিয়েই তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দিল যতক্ষণ না তার ঘুম ভাঙ্গে।

ওবেরণ আর টিটানিয়ার মধ্যে আর কোনো ঝগড়া না থাকায় এখন তারা আগের মতই সুখী। ওবেরণ এবার তার স্ত্রীর কাছে ঐ রাতের যাবতীয় কাহিনী সবিস্তারে বলতে লাগল—কেমন করে দুইজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে কৃত্রিম কলহের সৃষ্টি হয়েছে তার ইতিহাস। টিটানিয়া বলল, চল যাই, দেখি গিয়ে কোথায় এবং কেমন করে ঐ রোমাঞ্চকর ঘটনার নিষ্পত্তি হয়।

রাজা ও রাণীকে খুব বেশি দূরে যেতে হলনা। কিছুদূর এগিয়েই তারা দেখতে পেল প্রণয়ী দুটি এবং তাদের দুই সুন্দরী প্রণয়িনী একে অপরের প্রায় কাছাকাছিই তৃণআচ্ছাদিত এক মনোরম ভূখণ্ডে সকলেই নিদ্রায় বিভোর। ঘটনাটি ঘটিয়েছে পাক-ই স্বয়ং এবং পরিকল্পিত ভাবেই, তার পূর্বতন ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্য করার অভিপ্রায়ে। অতি দুরূহ শ্রম ও কৌশলের দ্বারাই সে সবকটিকে একত্র করে আনতে সমর্থ হয়েছে, অথচ আনীত ব্যক্তিরা আদৌ অনুমান করতে পারেনি এই একত্রীকরণের কৌশল। এই ঘটনার পর সে খুব সাবধানে লিসান্ডারের চোখ থেকে বশীকরণের নির্যাসটুকু নষ্ট করে দিয়েছে রাজার দেওয়া সেই প্রতিকার-পুষ্পের নির্যাসে।

প্রথম ঘুম ভাঙ্গলো হারমিয়ার। এত কাছে তার হারিয়ে যাওয়া লিসান্ডারকে নিদ্রামগ্ন দেখে সে তো অবাক—বিস্ময়ভরে তাকিয়ে সে ভাবছিল কী করে সম্ভব হল লিসান্ডারের মত মানুষের এমন অদ্ভুতভাবে অন্য নারীর প্রতি আসক্তি। এমন সময়ে লিসান্ডারেরও ঘুম ভাঙ্গলো, চোখ মেলে সে দেখলো তার পাশেই বসে রয়েছে তার প্রাণপ্রিয় হারমিয়া—পরীর সেই বশীকরণের নেশা তার এরই মধ্যে টুটে গিয়েছে, সুস্থ মাথায় সে আবার অনুভব করল হারমিয়ার প্রতি আগের মতই তার মনের টান। তারা দুজন মিলে পর্যালোচনা করতে লাগলো রাতের ঘটা সেই আজগুবী কাহিনীর কথা—কিছুতেই তারা বুঝতে পারছিল না ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিল কী না, অথবা তারা দুজনেই দেখেছিল একই স্বপ্ন—যে স্বপ্নের মধ্যে গোটা ব্যাপারটাই গিয়েছিল তালগোল পাকিয়ে।

ইত্যবসরে ঘুম ভাঙ্গলো হেলেনা ও ডিমিট্রিয়াসের। বেশ ভালো ঘুম হওয়ার ফলে হেলেনার মাথাটা ঠাণ্ডা হয়েছিল। তার রাগও পড়ে গিয়েছিল। তার খুব ভালোই লাগছিল ডিমিট্রিয়াসের প্রেমালাপ, ভালোবাসার আশ্বাসের কথা এখনও তেমন ভাবেই বলে চলেছিল ডিমিট্রিয়াস. আর এক নতুন বিস্ময় আর আনন্দ নিয়ে হেলেনা অনুভব করল ঐ প্রতিশ্রুতিগুলি প্রকৃতই ডিমিট্রিয়াসের অন্তরপ্রসূত।

কাজেই এই নিশাচর মহিলারা আর একে অপরের প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না. তাদের সেই এককালের বন্ধুত্ব আবার তারা ফিরে পেল, আর ভুলে গেল পরস্পরের প্রতি বর্ষিত কটূক্তির কথা। তারা অতঃপর ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করতে বসল তাদের এই পরিস্থিতিকে তারা কী ভাবে মোকাবিলা করবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সকলেই সম্মত হল যে যেহেতু ডিমিট্রিয়াস আর এখন হারমিয়া সম্পর্কে আগ্রহী নয় কাজেই সে গিয়ে হারমিয়ার বাবাকে বুঝিয়ে বলবে যাতে তিনি মৃত্যুদণ্ডের আদেশটি মকুব করার ব্যবস্থা নেন। কথামত, ডিমিট্রিয়াস যখন এথেনস-এ ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করছে এমন সময় ওরা সকলে অবাক হয়ে দেখল হারমিয়ার বাবা ঈজিয়াস বনের পথ ধরে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। তিনি বেরিয়ে পড়েছেন তার পলাতকা কন্যার অনুসরণে।

ঈজিয়াস ওদের সব কথা শুনলেন। তিনি বুঝলেন ডিমিট্রিয়াস যখন আর তাঁর মেয়েকে বিয়ে করার জন্য উৎসাহী নয়, তখন মেয়ের সঙ্গে লিসাণ্ডারেব বিবাহে তাঁর আর আপত্তির কারণ থাকছেনা। তবে যে একটা শর্তে এই বিবাহে তিনি সম্মতি দিলেন তা হল এখন থেকে চারদিন বাদে ঐ বিবাহ নিষ্পন্ন হবে, অর্থাৎ ঠিক সেই তারিখে যে তারিখটি হারমিয়ার প্রাণদণ্ডের জন্যে নির্দিষ্ট আছে। আবার হেলেনাও আনন্দের সঙ্গেই বিয়ে করতে চাইল ডিমিট্রিয়াসকে ঐ একই দিনে, কেননা ডিমিট্রিয়াস তো এখন প্রকৃতই তার প্রতি অনুরক্ত।

পরীরাজ ওবেরণ ও তার রাণী এতক্ষন অদৃশ্য দর্শকের ভূমিকায় উপস্থিত থেকে লক্ষ্য করছিল কেমন সুন্দরভাবে এদের মনে শান্তি ফিরে এল এবং ওবেরণের চেষ্টার ফলে ঐ প্রেমিক প্রেমিকাদের বিপদ কেটে গিয়ে মিলনের পথ সুগম হল। রাজা ও রাণী নিজেরা এদের আনন্দে এতই খুশী হল যে তারাও স্থির করল গোটা পরীর দেশ জুড়ে ঐ বিবাহ উপলক্ষে নানা ধরনের আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

তবে একটা কথা। যদি কারো মনে হয় পরীদের এই আখ্যানটা আজগুবী অথবা অবিশ্বাস্য, যদি পরীদের দুষ্টু কৌতুক কারো মনে আঘাত দিয়ে থাকে, তবে তাদের উচিত হবে এই মনে করা যে তারা যা দেখল বা শুনল তা শুধু একটা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন মাত্র—এটা ঘটেছে তাদের ঘুমের ভিতর: আমি আশা করি আমার পাঠকেরা কেউই মনঃক্ষুন্ন হবেন না যদি যুক্তি দিয়ে তারা এই গল্পটিকে গ্রহণ করেন একটি মনোরম ও উদ্দেশ্যহীন 'মধ্য গ্রীষ্মের রাত্রের স্বপ্ন' হিসাবে।

দ্য উনটারস্ টেল

সে অনেকদিনের কথা। সিসিলির রাজা ছিলেন লিওনটিস আর তার রানী ছিলেন হারমিওয়ান—– রানী যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী। রাজা আর রানীর দিন কাটতো মহাসুখে — এক প্রাণ এক মন। রানীর ভালবাসায় আর সোহাগে এতই পরিতৃপ্ত ছিলেন রাজা লিওনটিস যে তার আর কোনো অভাব বোধই ছিলনা। তারই মধ্যে কেবল মাঝে মাঝে মনে হত যদি তিনি একটিবার রানীকে দেখাতে পারতেন তাঁর এককালের সহচর ও স্কুলের সহপাঠী বন্ধু পলিকসেনেসকে যে কীনা এখন বোহেমিয়ার রাজা। লিওনটিস ও পলিকসেনেসকে তাঁদের ছেলেবেলা থেকেই একসংগে বড় করে তোলা হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের পিতৃবিয়োগের ফলে যার যার রাজ্যে গিয়ে রাজ্য পরিচালনার ভার নিতেই হল—–একসঙ্গে আর থাকা হলনা, এবং অনেকদিনের মত দুজনের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ করাও হয়ে ওঠে না, যদিও প্রায়ই তাঁরা পরস্পরকে উপহার পাঠাতেন, চিঠিপত্র লিখতেন, তাছাড়া প্রীতিসূচক দূতবিনিময় করতেন।

অবশেষে, বারবার আমন্ত্রণের ফলে পলিকসেনেসকে আসতেই হল বোহেমিয়া থেকে সিসিলির রাজসভায়—–বন্ধুকে দেখা দেওয়ার জন্য।

পলিকসেনেসের এই আতিথ্যের প্রথম দিনগুলো ছিল শুধু আনন্দ আর আনন্দের। লিওনটিস বন্ধুকে পেয়ে যারপরনেই খুশিতে মশগুল। নিজের ছেলেবেলার বন্ধুটিকে যত্ন-আত্তির জন্য বিশেষ করে বলে দিলেন তাঁর রানীকে—–পুরোন দিনের সাথী ও চিরদিনের প্রিয়বন্ধুকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে যেন তার সুখের আর অবধি রইল না। পুরোনো দিনের গল্প, স্কুলের দিনগুলোর কথা, ঐ সময়ের নানা দুষ্টুমি—– এইসব প্রসঙ্গ নিয়েই তাঁদের সময় কাটতো, আর এই সবই তাঁরা রানীর কাছে গল্প করতেন। রানীও তাঁদের এই গল্পগুজবে অংশ নিয়ে খুবই মজা পেতেন।

অনেক দিন হয়ে গেল, এবার পলিকসেনেস ব্যস্ত হয়ে উঠলেন নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য। রাজকার্য, কতদিন আর ফেলে রাখা যায়। এদিকে লিওনটিস তো বন্ধুকে ছাড়তে চাননা, তিনি রানীকে বললেন তাঁর হয়ে বন্ধুকে আরও কিছুদিন থাকার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে।

মানুষ ভাবে এক হয় আর। বন্ধুপত্নীর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না পলিকসেনেস, আর এতেই ভুল বুঝতে শুরু করলেন রাজা লিওনটিস। তাঁর অনুরোধে বন্ধু পলিকসেনেস তাঁর যাওয়া পিছিয়ে দিতে রাজী হননি, অথচ রানীর অনুনয় বিনয়ে তিনি বিগলিত হয়েছেন এবং কয়েক সপ্তাহ থেকে যেতে স্বীকৃত হয়েছেন। লিওনটিস যদিও এতকাল তাঁর বন্ধুর নিষ্কলুস স্বভাব চরিত্রকে সম্মান করেই এসেছেন এবং

তাঁর স্ত্রীর মধুর স্বভাব ও স্বামীভক্তির জন্যে তাঁকে মনে মনে শ্রদ্ধাই করতেন, কিন্তু পলিকসেনেসের এই আতিথ্য গ্রহণের কাল স্ত্রীর অনুনয়ে বিলম্বিত হওয়ায় তাঁর মনে জন্ম নিল এক দুর্দমনীয় ঈর্ষার বীজ। রাজার ইচ্ছা অনুসারেই যদিও রানী হারমিওয়ান অতিথির সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতেন এবং তিনি যা কিছু করতেন তা যদিও শুধু মাত্র স্বামীর আনন্দের কথা ভেবেই, তবু তাঁর স্বামীর চোখে এ সবই বিকৃত হয়ে দেখা দিল এবং তাঁর সন্দেহের ভূত দিন দিনই তাঁকে বেশি করে বিভ্রান্ত করতে লাগল। এতকাল যে রাজা তাঁর বন্ধুকে এত বিশ্বাস করতেন ও ভালবাসতেন এবং নিজের রানীর প্রতি ছিলেন একান্ত অনুরাগী, স্বামী হিসাবে আদর্শ স্থানীয়, তিনিই হয়ে উঠলেন এক অসভ্য বর্বরের মত নিষ্ঠুর ও মায়াদয়াহীন। এর ফলে তিনি ডেকে পাঠালেন তাঁর এক সভাসদ ক্যামিল্লোকে এবং তাঁর কাছে নিজের এই সন্দেহের কথা খুলে বললেন এবং এ-ও বললেন যে, পলিকসেনেসকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে হবে এই তাঁর আদেশ।

ক্যামিল্লো মানুষটি ছিলেন অতি সৎপ্রকৃতির। এছাড়া তিনি ভাল করেই জানতেন যে রাজার এই সন্দেহের ব্যাপারটা সম্পূর্ণই অমূলক-কাজেই পলিকসেনেসকে বিষ দেওয়ার পরিবর্তে তিনি তাঁকে গোপনে রাজার এই আদেশের কথা বলে দিলেন। পলিকসেনেস একথা শোনার পর কালবিলম্ব না করে সিসিলি ত্যাগ করে গোপনে নিজের দেশে ফিরতে উদ্যত হলেন। ক্যামিল্লো নিজেও পলিকসেনেসের অনুরোধে তাঁর সঙ্গী হয়ে সিসিলি ত্যাগ করে চলে যেতে রাজী হলেন। অতঃপর ক্যামিল্লোর সহায়তায় তাঁরা উভয়ে নিরাপদে এসে পৌঁছে গেলেন বোহেমিয়ায়। এরপর থেকে বাকি জীবন ক্যামিল্লো সেখানেই থেকে গেলেন পলিকসেনেসের রাজসভায় রাজার সর্বাধিক প্রিয় বন্ধু এবং অনুগত সভাসদ রূপে।

পলিকসেনেসের এই গোপন স্থানত্যাগের ফলে রাজা লিওনটিস আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি গিয়ে উপস্থিত হলেন রানীর মহলে। নিরপরাধ রানী বসে ছিলেন তাঁর শিশুপুত্র ম্যামিল্লিয়াসকে কাছে নিয়ে—শিশুটি তার মাকে বাছাই করা একটা মজার গল্প শোনাবে বলে উসখুস করছিল– এমন সময়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন রাজা। জোর করে তিনি ছিনিয়ে নিলেন শিশুকে তার মায়ের কোল থেকে এবং রানী হারমিওয়ানকে বন্দী করলেন কারাগারে।

ম্যামিল্লিয়াস খুব ছোট– মাকে ছেড়ে সে থাকতে পারতো না। যখন সে দেখল তার চোখের সামনেই তার মাকে কেমন অপমান করে দূরে সরিয়ে নেওয়া হল এবং কারাগারে পাঠানো হল তখন মনে মনে সে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ল– দিনরাত সে গুমরে গুমরে বেড়ায়। কিছুই তার আর ভাল লাগেনা-ক্রমশ ক্রমশ তার খাওয়ার ইচ্ছা কমে যেতে লাগল, ঘুমও চলে গেল, মনে হল যেন তাকে আর বাঁচানো যাবেনা।

রানীকে কারাগারে পাঠানোর পর আর একটি কাজ করলেন লিওনটিস।

ক্লিওমেনিস ও ডিয়োন নামে দুজন সভাসদকে তিনি আদেশ দিলেন ডেলফস-এ ভগবান অ্যাপোলোর মন্দিরে গিয়ে অর‍্যাকল বা দৈববাণী জেনে আসতে— রানী হারমিওয়ান প্রকৃতই নিরপরাধ ও বিশ্বাসপরায়ণা কি না।

এদিকে কারাগারে প্রেরিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই রানী হারমিওয়ানের কোলে একটি কন্যা সন্তান এলো। বিপন্ন ও অসহায় নারী ঐ সন্তানের ফুটফুটে মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের দুঃখের মধ্যেও অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করলেন—শিশুটিকে বললেন—আমার ছোট্ট বন্দিনী, তোর মত আমিও নিষ্পাপ।

হারমিওয়ানের এই দুঃখের দিনে তাঁর একজন অতি সহৃদয় সখী ছিলেন, তিনি ছিল উদারচেতা প্রকৃতির, নাম তার পলিনা। পলিনা সিসিলির এক অভিজাত পুরুষ এ্যান্টিগোনাসের স্ত্রী। রানীর বন্দীদশায় এই কন্যাসন্তানের জন্মের কথা শুনে পলিনা বন্দীশালায় গিয়ে রানীর দাসী এমিলিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন তুমি রানীকে গিয়ে বলো যে তিনি যদি ভরসা করে ছোট্ট শিশুটিকে একটিবারের জন্য তাঁর কাছে দেন তবে তিনি তাকে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাবেন— আর ঐ নিষ্পাপ শিশুটির মুখের দিকে তাকালে হয়তো রাজার অন্তরের পরিবর্তন সম্ভব, তিনি স্নেহার্ত হতে পারেন। একথা শুনে এমিলিয়া খুবই খুশি হল এবং বলল— আপনি প্রকৃত আপনজনের কাজ করতেই এসেছেন। আমি এখনই রানীমাকে গিয়ে আপনার এই নিঃস্বার্থ প্রস্তাবের কথা বলব, তিনি অবশ্যই খুশি হবেন, কেননা আজই তিনি আমাকে বলছিলেন যদি এমন কেউ শুভাকাঙ্খী থাকতো যে কীনা সাহস করে বাচ্চাটাকে ওর পিতার কাছে হাজির করতে পারে। একথা শুনে পলিনা বললেন, তুমি যাও এমিলিয়া, রানীকে গিয়ে বলো আমি রাজার কাছে গিয়ে স্পষ্ট করে তাঁকে জানিয়ে দেব নির্দোষ রানীকে তিনি অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়েছেন। এমিলিয়া একথা শুনে পলিনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাবে কথা খুঁজে পেলনা— বলল ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, রানীমার এই দুর্দিনে আপনিই এক মাত্র তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। একথা বলে এমিলিয়া ভিতরে প্রবেশ করল ও রানীকে সব কথা বলল, রানীও এই বিপদে একটু আলোর মুখ দেখতে পেলেন, কেননা তিনি ভেবেছিলেন এমন কেউ নেই যে সাহস করে শিশুটিকে রাজার কাছে নিয়ে যাবে। রানী শিশুকে তুলে দিলেন পলিনার কোলে।

পলিনা সঙ্গে সঙ্গে নবজাত শিশুটিকে নিয়ে ছুটলেন রাজার কাছে, দ্বাররক্ষীদের কোনো বাধাই তাকে রোধ করতে পারল না, এমন কি তাঁর স্বামী রাজার রোষে পড়ার ভয়ে যখন তাঁকে নিষেধ করতে গেলেন, তিনি সে নিষেধও অগ্রাহ্য করে একেবারে রাজার কাছে পৌঁছে শিশুটিকে শুইয়ে দিলেন তাঁর পায়ের কাছে। পলিনা বড় সহজ মেয়ে নন, তিনি হারমিওয়ানের সপক্ষে রাজাকে সুন্দরভাবে তাঁর বক্তব্য বললেন। এবং রাজার এই অমানবিক নিষ্ঠুরতার জন্যে তাঁকে কটু কথা বলতেও দ্বিধা করলেন না। অবশেষে রাজার কাছে তাঁর নির্দোষ রানীর জন্য করুণা ভিক্ষা

করলেন। কিন্তু ফল কিছুই হল না, বরং পলিনার প্রতিবাদী আচরণে রাজা আরও রুষ্ট হলেন এবং তাঁর স্বামী অ্যান্টিগোনাসকে বললেন তাঁর স্ত্রীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে রাজসভার বাইরে।

পলিনার ভুল হয়েছিল বুঝতে, রাজার পিতৃহৃদয়ের কাছে যে প্রত্যাশা তাঁর ছিল তা ঘটল না। কেননা, যে মুহূর্তে তিনি চোখের বাইরে গেলেন নির্দয় রাজা তৎক্ষণাৎ পলিনার স্বামী অ্যান্টিগোনাসকে আদেশ দিলেন শিশুটিকে নিয়ে জাহাজে করে সমুদ্রে চলে যেতে এবং অনেক দূরে সমুদ্রতীরে বালুরাশির মধ্যে কোনো এক নির্জন স্থানে তাকে ফেলে আসতে যাতে কীনা অবহেলার ফলে তার মৃত্যু ঘটে।

অ্যান্টিগোনাস আর ক্যামিল্লোর মধ্যে প্রভেদ ছিল। ক্যামিল্লো রাজার অসৎ অভিপ্রায়ে সায় দেননি, দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অ্যান্টিগোনাস অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন রাজার আদেশ — তিনি অনতিবিলম্বে শিশুটিকে নিয়ে জাহাজে উঠলেন— আর জাহাজ ভেসে চললো দূর সমুদ্রে এক জনমানবহীন বালুকাবেলার উদ্দেশ্যে— যেখানে নিক্ষিপ্ত হবে ঐ নিষ্পাপ শিশুটি।

এদিকে, রানীর পাপাচার সম্পর্কে রাজা এতই স্থিরনিশ্চিত হয়েছিলেন যে ডেলফস-এ অ্যাপোলোর প্রত্যাদেশের জন্যে তিনি যে ক্লিয়োমেনিস ও ডিয়োনকে পাঠিয়েছিলেন, তাদের ফিরে আসার দেরীটুকু তাঁর সইলনা। রানীর প্রসূতিগৃহের নিয়ম মাফিক কালটুকু শেষ না হতেই এবং তাঁর ঐ প্রাণাধিক শিশুসন্তানটির শোকে মুহ্যমান অবস্থাতেই তিনি রানীকে হাজির করলেন রাজসভায় প্রকাশ্য বিচারের জন্যে, যাবতীয় অভিজাত নাগরিক ও সভাসদ্‌দের সামনে। দেশের অভিজাত যত নাগরিক, রাজসভার যত সভাসদ্ এবং বিচারপতিরা যখন সমবেত হয়েছেন একত্রে এবং হতভাগিনী রানী বন্দিনী অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর এই সব প্রজাপুঞ্জের সামনে তাদের বিচারের অপেক্ষায় ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত হল সেই সভায় ক্লিয়োমেনিস ও ডিয়োন— হাতে তাদের রাজার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সীলমোহর অঙ্কিত অ্যাপোলোর প্রত্যাদেশ। রাজা লিওনটিস সীলমোহর ভেঙে ফেলতে আদেশ দিলেন এবং বললেন প্রত্যাদেশ লিপিটি উচ্চৈস্বরে পাঠ করতে। লিপির যে কথাগুলি শোনা গেল তা—

'হারমিওয়ান নিষ্পাপ, পলিকসেনেস নির্দোষ, ক্যামিল্লো শুভাকাঙ্খী রাজবৎসল প্রজা, লিওনটিস ঈর্ষাপরায়ণ স্বৈরাচারী এবং রাজার অদৃষ্টে আছে উত্তরাধিকারী বর্জিত এক জীবন, যদি না তাঁর হৃত সন্তানকে আবার ফিরে পাওয়া যায়।'

প্রত্যাদেশের এই বাণীকে রাজা বিন্দুমাত্র মূল্য দিলেন না। তিনি বললেন এসব ডাহা মিথ্যা এবং রানীর প্রিয়জনেরা মিলে এ উদ্ভাবন করেছে। এই বলে তিনি পূর্বব্যবস্থামত রানীর বিচার চালিয়ে যেতে বললেন। লিওনটিস যখন এই কথা-কটি বলছিলেন ঠিক তখনই এক দূত এসে সংবাদ দিল যে নিজের জননীর এই মৃত্যুদণ্ডদানের বিচারের খবর পেয়ে দুঃখে ও লজ্জায় রাজপুত্র ম্যামিল্লিয়াসের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটেছে।

হারমিওয়ানও যখন শুনলেন তাঁর প্রিয় পুত্র তাঁরই দুর্ভাগ্যের বেদনায় এমন

করুণভাবে প্রাণত্যাগ করেছে তখন তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, তিনি সেই স্থানেই জ্ঞান হারিয়ে অচেতন হয়ে পড়লেন। এবার শুরু হল লিওনটিসের মর্মযন্ত্রণা, এবার তিনি অন্তরে উপলব্ধি করলেন তাঁর স্ত্রীর দুঃখ। তিনি পলিনা এবং রানীর পরিচারিকাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন রানীকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়ে যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। রানীকে অন্দরে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু পলিনা অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এলেন রাজাকে বললেন, রানীর সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

রানীর মৃত্যুসংবাদে এবার রাজা প্রকৃতই অনুতপ্ত হলেন নিজের নিষ্ঠুর আচরণের কথা ভেবে। অধিকন্তু যখন তিনি বুঝলেন যে তাঁর এই আচরণজনিত মর্মবেদনার ফলেই রানীর মৃত্যু ঘটেছে তখন রানীর নিষ্কলুষ চরিত্র বিষয়ে তাঁর আর কোনো সন্দেহ রইল না। সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁর মনে হল অর‍্যাক্ল-এর দৈববাণী অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ এবং 'যা তাঁর হারিয়ে গেছে' বলতে দূরসমুদ্রে ফেলে আসা তাঁর শিশুকন্যাকেই বুঝায়, এবার তাঁর সেই প্রত্যয় ফিরে এলো। এছাড়া ম্যামিল্লিয়াস মারা যাওয়ার ফলে এখন ঐ কন্যা ব্যতীত তাঁকে নিশ্চিতই উত্তরাধিকার বর্জিত জীবন যাপন করতে হবে। রাজা তাঁর সব ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্য করতে চাইলেন এবং সমগ্র রাজ্যের বিনিময়ে নিজের শিশুকন্যাকে ফিরে পাওয়ার জন্য আকুল হলেন। এখন থেকে শুরু হল রাজার প্রায়শ্চিত্যের জীবন– শুধু বিবেকের দংশনে দংশনে তার দিনগুলি অতিবাহিত হতে থাকল– বছরের পর বছর।

কথায় বলে, রাখে কেষ্ট মারে কে — ভাগ্যের এমনই খেলা যে ছোট শিশুটিকে নিয়ে অ্যান্টিগোনাস যে জাহাজে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন সেই জাহাজটি পড়ে তুমুল সামুদ্রিক ঝঞ্ঝার মুখে, আর তার ফলে জাহাজখানি ঝড়ের আঘাতে ভাগ্যক্রমে এসে পৌঁছায় বোহেমিয়ার কূলে— রাজা পলিকসেনেসের সেই বোহেমিয়া। অ্যান্টিগোনাস নিরুপায় হয়ে কন্যাটিকে এখানে ফেলেই চলে গেলেন।

ভাগ্যের আবার এমনই পরিহাস যে অ্যান্টিগোনাসকে সিসিলিতে ফিরে আর রাজা লিওনটিসকে এই কন্যা বিসর্জনের শুভ সংবাদ জানানোর অবকাশ ঘটেনি, কেননা মেয়েটিকে সমুদ্রতীর থেকে কিছুদূরে রেখে জাহাজে ফিরে আসার পথে জঙ্গল থেকে এক বুনো ভাল্লুক ঝাঁপিয়ে পড়ে অ্যান্টিগোনাসের উপর এবং তাঁর শরীর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দেয়—লিওনটিসের অধর্মের হুকুম তামিল করার যথাযথ প্রায়শ্চিত্যই বটে!

ফেলে-আসা রাজকন্যার গায়ে ছিল বহুমূল্য পোশাক এবং রত্নালঙ্কার, কেননা রানী হারমিওয়ান তাঁর মেয়েটিকে তার পিতা লিওনটিসের কাছে সেই সজ্জায় পাঠিয়েছিলেন– ঐ সুন্দর শিশুকন্যাটিকে দেখে যাতে রাজার মনের পরিবর্তন আসে। অ্যান্টিগোনাস ছোট একখানি কাগজে একটি নাম লিখে এই পোশাকের গায়ে সেঁটে দিলেন — কাগজটিতে লেখা ছিল একটি নাম —'পারডিটা' নামটির মধ্যে এই ইঙ্গিত নিহিত ছিল যে কন্যাটি উচ্চ-বংশোদ্ভূত এবং ভাগ্যনিপীড়িত।

পরিত্যক্তা অসহায় পারডিটা ভাগ্যক্রমে চোখে পড়ল এক মেষপালকের। ঐ গরীব মানুষটির অন্তরে শিশুটির জন্যে বড় মায়া হল, সে ছোট্ট পারডিটাকে কোলে করে তার বাড়িতে নিয়ে গেল স্ত্রীর কাছে — এবং উভয়ে মিলে তাকে যত্নে ও আদরে বড় করে তুলতে লাগল। কিন্তু মেষপালকটি তো খুবই গরীব, তাই রাজকন্যার বেশভূষায় যে মূল্যবান মণিরত্ন ছিল তা সে না লুকিয়ে পারল না এবং তাকে নিয়ে ভয়ে ভয়ে নিজের কুটির ছেড়ে বহুদূরে পালিয়ে গেল সে ও তার স্ত্রী, পাছে কেউ সন্দেহ করে এত মণিরত্ন সে পেল কোথায়। কাজেই ঐ দূরাঞ্চলে গিয়ে পারডিটার ঐ ধনরত্নে সে অনেক ভেড়া কিনে ফেলল, এবং ঐ মেষপালের ঐশ্বর্যে সে হয়ে উঠল এক ধনী মেষপালক। পারডিটাকে সে লালন পালন করতে লাগল নিজের কন্যার মত। পারডিটা জানল না সে কে— সে শুধু জানল সে ঐ সামান্য মেষপালকেরই কন্যা।

দিনে দিনে বড় হয়ে উঠলো পারডিটা— এখন সে এক সুন্দরী তন্বী। যদিও সামান্য এক মেষপালকের ঘরে তার তেমন শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ ঘটেনি তবু তার হাবভাব চালচলনে স্বভাবতই স্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল তার রাজারানী মায়ের যাবতীয় গুণপনা, যা মানুষকে শিখিয়ে দিতে হয় না। তার আচরণে কারো বোঝার উপায় ছিলনা যে সে রাজপরিবারেই মানুষ হয়ে ওঠেনি—বংশগৌরব প্রবাহিত হয়েছিল তার ধমনীতে, শিরা উপশিরায়।

বোহেমিয়াতেই দিন কাটে পারডিটার। এদিকে বোহেমিয়ার রাজা পলিকসেনেসের ছিল একটি মাত্র পুত্রসন্তান, নাম তার ফ্লোরিজেল। ঐ সময়ে একদিন ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। রাজপুত্র এসেছেন শিকারে এবং ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হয়েছেন ঐ মেষপালকের কুটিরের সন্নিকটে। এমন সময় হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল পারডিটাকে— তিনি তাকে দেখামাত্রই মুগ্ধ হলেন তাঁর রূপে, নম্রস্বভাব ও রাজকীয় আচরণে। এমন রমণীর প্রেমে পড়তে তাঁর আর দেরি হলনা। তিনি তাঁর রাজপরিচয় গোপন করে এক সাধারণ ভদ্র গ্রামবাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করলেন এবং নিজের পরিচয় দিলেন ডোরিক্লিস নামে। এই ভাবে রাজপুত্র উপস্থিত হলেন বৃদ্ধ মেষপালকের কুটিরে এবং নিয়মিতই শুরু হল তাঁর ঐ কুটিরে আসা যাওয়া। এদিকে রাজা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না কেন রাজপুত্র প্রায়ই রাজপুরীতে থাকেন না, তাঁর মনে আশঙ্কা দেখা দিল, বোধহয় কিছু অঘটন ঘটে থাকবে। অতএব তিনি তাঁর চরদের লাগিয়ে দিলেন রাজপুত্রের চলাফেরার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখার কাজে এবং অবিলম্বেই প্রকৃত তথ্যটি আবিষ্কৃত হল — মেষপালকের সুন্দরী কন্যার প্রতি রাজপুত্রের অনুরাগ।

রাজা আর সময় নষ্ট করতে চাইলেন না—খবর দিলেন তাঁর অতি বিশ্বস্ত অনুচর ক্যামিল্লোকে, যে ক্যামিল্লো একদিন লিওনটিসের রোষে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। ক্যামিল্লোকে তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন, বললেন, তাঁরা দুজন মিলে লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে চান পারডিটা নামে মেয়েটির পিতা বলে

পরিচিত সেই মেষপালকের গৃহে।

অতএব পলিকসেনেস ও ক্যামিল্লো ছদ্মবেশে এসে পৌঁছালেন বৃদ্ধ মেষপালকের বাসগৃহে। ঐ আবাসে তখন মহাসমারোহে উৎসব চলছিল মেষের লোম কর্তন উপলক্ষ্যে। অভ্যাগত না হলেও অপরিচিত এই অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনা করে মেষপালক উৎসব প্রাঙ্গণে নিয়ে গেল ঐ আনন্দে যোগদানের জন্য। এই উৎসবের রীতিই এই।

উৎসব প্রাঙ্গণে তখন বইছিল প্রাণখোলা আনন্দের প্রবাহ— হাসি আর হুল্লোড়ে। গ্রাম্য-সাধারণের ভোজের আয়োজন চলছিল সমান মাত্রায়। টেবিল পেতে দেওয়া ছিল ভোজ উপলক্ষ্যে। বাড়ির সামনে সবুজ ঘাস বিছানো জমিতে নাচগানে উত্তাল ছিল গ্রাম্য কিশোর কিশোরীরা, যারা যুবা শ্রেনীর তারা কিনছিল রঙিন ফিতে, হাতের দস্তানা অথবা নানা খেলনা – একটা ফেরীওয়ালা এসেছিল বাড়ির সামনে। তার কাছ থেকেই সকলে ঐ সওদা করছিল।

চারদিকে যখন এমন হৈ হুল্লোড় আর রঙ্গ তামাসার জোয়ার তখন একটি নিরুপদ্রব কোণে বসে বসে ফ্লোরিজেল ও পারডিটা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় মগ্ন ছিল, মনে হচ্ছিল যেন আমোদ আহ্লাদ আর শিশুসুলভ হৈ চৈ এর চেয়ে তাদের কাছে ঐ আলাপচারিতাই ছিল অধিক আকর্ষণীয়।

রাজা পলিকসেনেসের ছদ্মবেশ ছিল একেবারে নির্ভুল, তাঁকে চিনবার কোনো উপায়ই ছিল না, কাজেই অতি সহজেই তিনি এগিয়ে গেলেন তাঁর পুত্রের কাছাকাছি। উদ্দেশ্য, ঐ কথোপকথন কানে শোনা। অতি সহজ অথচ এমন সুন্দরভাবে পারডিটা রাজপুত্রের সঙ্গে কথা বলছিল যে রাজার তাক্ লেগে গেল— অবাক হয়ে ক্যামিল্লোকে তিনি বললেন, আরে ছোট ঘরে এমন মেয়ে থাকতে পারে এতো আমি কখনো ভাবিনি, ওর হাবভাব কথাবার্তা সবেতেই যেন একটা বংশমর্যাদার ছাপ লেগে আছে— মেষপাকলকে ঘরে এমনটা দেখা যায় না।

ক্যামিল্লো বলল, ঠিকই। ও যেন ঠিক সেই রাধারানী। সামান্য গয়লার ঘরে জন্ম হলেও রানী সে।

এবার ছদ্মবেশী রাজা বৃদ্ধ মেষপালকের বললেন— হ্যাঁ ভাই, ঐ যে সুন্দর গ্রাম্য ছেলেটি আপনার মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে ওটি কে বলুন তো? সবাই তো ওকে ডোরিক্লেস বলেই ডাকে— বৃদ্ধ বলল—হ্যাঁ, আমার মেয়েকে ও খুবই ভালবাসে, সত্যি বলতে কি, ওদের দুজনের মধ্যে দারুণ মনের মিল— আর যদি সত্যিই ডোরিক্লেস আমার মেয়েকে বিয়ে করে তবে কীভাবে যে তার ভাগ্য ফিরে যাবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনা। আসলে, রাজকন্যার হীরে জহরতের কিছুটা মেষপালক ভেড়ার পাল কিনতে ব্যয় করলেও বাকী অংশ সে ওর বিয়ের যৌতুক হিসাবে সুরক্ষিত রেখেছিল মৃত্তিকাগর্ভে।

রাজা এবার ফিরলেন তাঁর পুত্রের দিকে। তাকে সম্বোধন করে বললেন, এই

যে মরদ, মনে হচ্ছে তোমার মনটা যেন অন্য কিছুতে টইটুম্বুর, তাই আর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তুমি একেবারেই মনসংযোগ করতে পারছ না। আরে আমারও তো একদিন দিন ছিল। ভালবাসার লোকের জন্যে আমি তখন রাশি রাশি উপহার এনে দিতাম। আর তুমি কী না তোমার প্রেমিকার জন্য একটিও কিছু নিলেনা— ফেরিওয়াল টা এমনিই চলে গেল।

যুবরাজ বিন্দুমাত্রও অনুমান করতে পারেনি প্রশ্নকর্তা স্বয়ং তার পিতা, কাজেই সে সগর্বে উত্তর দিল, না মশাই, ওসব তুচ্ছ খেলনায় ওর মন ভরেনা, পারডিটা যা লাভ করলে তৃপ্ত হবে তা লুকোনো আছে আমার এই বুকের মধ্যে। এ কথা বলে সে ফিরল পারডিটার দিকে, এবং তাকে বলল— পারডিটা, আজ শুনে রাখ এই বুড়োটার সামনে আমি কী শপথ নিই। বুড়োটা একদিন নিজেও প্রেম করেছিল, কাজেই ওর সামনেই আমি কথা দিচ্ছি। অতঃপর ফ্লোরিজেল অপরিচিত ঐ বৃদ্ধকেই তার ও পারডিটার মধ্যে পবিত্র বিবাহবন্ধনের সাক্ষী রেখে বলল— মশাই, অনুগ্রহ করে এই চুক্তির কথা শুনুন।

আর যায় কোথায়—রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর ছদ্মবেশ ছেড়ে ফেললেন—এবং ধমকের সুরে বললেন— বিয়ের নয়, তোমার বিবাহবিচ্ছেদের চুক্তি হবে। পলিকসেনেস এই বলে তাঁর ছেলেকে আচ্ছাসে বকুনি লাগালেন ঐ ছোটঘরের মেয়েটার সঙ্গে এমনি মেলামেশার দুঃসাহসের জন্য। আর, পারডিটাকেও গালিগালাজ করতে লাগলেন— ভেড়াওয়ালার বাচ্চা, ভেড়াধরা— এইসব অকথ্য ভাষায়। প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি পারডিটাকে বললেন -- যদি আর কখনো আমার কানে যায় তুই আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিস তাহলে তোকেই শুধু নয় তোর বাবাকেও শূলে চড়াব।

রাগে গরগর করতে করতে রাজা চলে গেলেন, এবং ক্যামিল্লোকে বলে গেলেন ফ্লোরিজেলকে পাকড়ে নিয়ে আসতে তার পিছু পিছু।

রাজার প্রস্থানের পর কথা বলল পারডিটা। তার উচ্চবংশসুলভ মর্যাদায় আঘাত লেগেছিল রাজার অসম্মানজনক উক্তিতে। সে বলল যদিও তিনি রাজা এবং আমরা দরিদ্র এবং অসহায়, তবুও আমি বিন্দুমাত্র ভয় পাইনি। দু একবার ইচ্ছা হয়েছিল মুখের উপর তাঁর কথার সমুচিত জবাব দিই এবং বলি হে রাজামশাই, আপনার রাজপ্রাসাদে যে সূর্যের আলো পড়ে সেই একই সূর্য আলোকিত করে আমাদের এই সামান্য কুটির — সূর্যের কাছে সবাই সমান। সে প্রকৃতই মহান, তাই তার ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ নেই।

একটু পরেই সে নিজেকে আর সামলাতে পারল না — তার আত্মমর্যাদার অভিমানে বলে উঠল — হ্যাঁ ঠিকই তো। ছেঁড়া কাথায় শুয়ে লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন আমার ঘুচে গেছে। রানী হয়ে আমার কাজ নেই। আমাকে আপনারা মাপ করুন, আমাকে আমার এই ছোট ঘরের সুখ দুঃখ নিয়েই থাকতে দিন।

উদারহৃদয় ক্যামিল্লো মুগ্ধ হলেন পারডিটার এই মর্যাদাবোধে এবং তার সৌজন্যমূলক আচরণ দেখে। উপরন্তু তিনি অনুভব করলেন ঐ ছেলেমানুষ রাজপুত্র কিছুতেই পারবেনা একে ভুলে থাকতে — রাজার আদেশে তার ভালবাসা লোপ পেতে পারেনা। অতএব তিনি মনে মনে স্থির করতে লাগলেন কী করে এই দুটিকে মিলিয়ে দেওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় এসে গেল এ-কাজ উদ্ধার করার এক মনমত কৌশল।

এ ঘটনার বেশ কিছুকাল আগেই ক্যামিল্লোর কানে এ খবর পৌঁছেছিল যে সিসিলিতে রাজা লিওনটিস তাঁর কৃত কর্মের জন্য এখন যারপরনেই অনুতপ্ত। যদিও বর্তমানে ক্যামিল্লো দেশত্যাগী হয়ে বোহেমিয়ার রাজসভাতেই রাজার বন্ধু হিসাবে সুখেই ছিলেন তথাপি এককালের প্রভু লিওনটিসকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠত। তাছাড়া নিজের দেশে একবার ফিরে যেতে কার আর ইচ্ছা না-হয়? ক্যামিল্লো রাজকুমার ফ্লোরিজেল ও মেষপালককন্যা পারডিটাকে ডেকে বললেন— চলো তোমাদের আমি নিয়ে যাই সিসিলিতে, সেখানে আমি রাজা লিওনটিসকে তোমাদের কথা বলব। রাজা অবশ্যই আমার অনুরোধে তোমাদের আশ্রয় দেবেন এবং ফ্লোরিজেলের বাবার কাছে পুত্রের অপরাধ মার্জনা করার অনুরোধ জানাবেন— চাই কী তোমাদের বিয়েতে তাঁর সম্মতিও আদায় করে ছাড়বেন।

এ হেন প্রস্তাব তো আশা করাই যায়না -- ফ্লোরিজেল ও পারডিটা সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাব লুফে নিল। ক্যামিল্লো সিসিলিতে যাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন, অধিকন্তু সঙ্গে নিতে চাইলেন পারডিটার মেষপালক পিতাকেও।

বৃদ্ধ মেষপালক প্রস্তুত হলো যাওয়ার জন্যে। যাওয়ার সময় সে সঙ্গে নিয়ে নিল পারডিটার জন্যে গচ্ছিত সেই মণিমুক্তা, তার শিশু অবস্থার ছোট্ট পোশাকগুলি এবং সেই পোশাকে আটকে দেওয়া ছোট্ট কাগজের টুকরোটা।

এরপর সমুদ্রযাত্রা এবং সে যাত্রা বেশ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। ফ্লোরিজেল, পারডিটা ও মেষপালকটিকে নিয়ে ক্যামিল্লো পৌঁছে গেলেন সরাসরি রাজদরবারে। লিওনটিসের কাছে। লিওনটিস তাঁর মৃতা পত্নীর ও হারিয়ে যাওয়া কন্যার শোকে তখনও পর্যন্ত দুঃখ ও বিষাদেই দিন গুজরান করতেন। ক্যামিল্লোকে অপ্রত্যাশিত দেখতে পেয়ে তাঁর মন সাময়িক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, তিনি অত্যন্ত সাদরে পুরোনো সভাসদকে কাছে টেনে নিলেন এবং প্রকৃত মর্যাদায় রাজকুমার ফ্লোরিজেলকে অভ্যর্থনা জানালেন। ফ্লোরিজেল কিন্তু পারডিটার পরিচয় দিল তার বাগদত্তা রাজকুমারী বলে। এই মুহূর্তে লিওনটিসের দৃষ্টির সবটুকু আকর্ষণ করল ঐ পারডিটা। তার মুখের মধ্যে কোথায় যেন রাজা খুঁজে পেলেন তাঁর মৃতা স্ত্রীর মুখের আদল। আর তার ফলেই হারমিওয়ানের জন্যে রাজার পুরোনো শোক এবার নতুন করে উথলে উঠলো—তিনি বললেন, হায়রে, আমারও আজ এমন একটা সুন্দর মেয়ে থাকতে পারতো যদি না আমি সেদিন অমন নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করতে পাঠাতাম। ফ্লোরিজেলকে তিনি বললেন,

জানো বাবা, ঐ সময়েই আমি হারিয়েছি তোমার পিতার মত সৎ মানুষের বন্ধুত্ব ও মেলামেশা— আজ কেবলই ইচ্ছা হয় যদি একবার তাঁর দেখা পেতাম — আমার জীবনের চেয়েও আমার কাছে তা মূল্যবান।

রাজার জীবনের এই অতীত কাহিনী শুনে মেষপালকের টনক নড়ল। সে লক্ষ্য করল রাজা কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত পারডিটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন — রাজার কন্যা হারানোর ঘটনা এবং শিশু পারডিটাকে তার কুড়িয়ে পাওয়া – এই দুটি ঘটনার সময়ের মধ্যেও সে একটা সঙ্গতি দেখতে পেল। তার সন্দেহ আরও দৃঢ় হল পারডিটার ঐ ভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার কথা ভেবে এবং তার সেই রত্নালঙ্কার ও অন্যান্য সব চিহ্ন যার দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় তার বংশপরিচয় ও প্রকৃত অবস্থা। অতঃপর মেষপালকের পক্ষে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আর সময় লাগলো না — সে স্থির বুঝলো পারডিটাই সেই ফেলে আসা রাজকন্যা।

অতএব মেষপালক এবার তার অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিত বলতে শুরু করল। সেখানে তখন রাজা ছাড়াও উপস্থিত ফ্লোরিজেল, পারডিটা, ক্যামিল্লো এবং রানীর সেই বিশ্বস্ত সহচরী পলিনা। বৃদ্ধ বলল কী অবস্থায় সে শিশুটিকে কুড়িয়ে পায় এবং তাকে ফেলে দিয়ে যখন অ্যান্টিগোনাস ফিরে আসছিলেন তখন কীভাবে একটি ভাল্লুক তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে দেয়। এ সবই সে সচক্ষে দেখেছে। শিশুটির গায়ে যে রত্নালঙ্কার ছিল এবার সে সেগুলিও দেখাল এবং পলিনা সহজেই সনাক্ত করতে পারলেন যে ঐ বেশভূষা ও অলংকার পরিয়েই রানী হারমিওয়ান শিশুকন্যাকে রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন। এরপর বৃদ্ধ মেষপালক বের করল সেই ছোট্ট কাগজের টুকরোটা— পলিনার বুঝতে ভুল হলনা যে তার উপর যে হস্তাক্ষরে 'পারডিটা' লেখা আছে তা তাঁর স্বামী অ্যান্টিগোনাসেরই। সন্দেহের আর কোনই অবকাশ রইলনা যে ঐ পারডিটাই রাজা লিওনটিসের সেই পরিত্যক্তা কন্যা।

কিন্তু হায়রে। এই মুহূর্তে পলিনার অন্তরে পরস্পরবিরোধী দুই মহৎ আনন্দ বেদনার বোধ কী এক অস্থির আলোড়ন তুলেছে। একদিকে তাঁর স্বামীর দুর্ঘটনায় মৃত্যুসংবাদ ও তার বেদনা, অপরদিকে অ্যাপোলোর প্রত্যাদেশ নির্ভুল প্রমাণিত হওয়া ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হারানো রাজকন্যাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ।

লিওনটিস যখন শুনলেন ঐ পারডিটাই তাঁর হারিয়ে যাওয়া কন্যা তখন আরও বেশি করে তাঁর মন বেদনার্ত হল রানী হারমিওয়ানের অভাবে। তাঁর শুধু মনে হল রানী আজ তাঁর মেয়েকে দেখতে পেলেন না। বহুক্ষণ যাবৎ তাঁর মুখে কোন কথা সরছিল না, অবশেষে তিনি আবেগভরে শুধু বলে উঠলেন হায়রে, তোর মা নেই, তোর মা নেই!

এই আনন্দ ও বেদনায় একাকার হয়ে যাওয়া মুহূর্তে এগিয়ে এলেন পলিনা। রাজা লিওনটিসকে তিনি বললেন ইটালির শ্রেষ্ঠ ভাস্কর জুলিও রোমানোকে দিয়ে

তিনি অতি সম্প্রতি একটি মর্মর মূর্তি নির্মাণ করিয়েছেন। ঐ মূর্তিকে দেখলে মনে হয় বুঝিবা রানীই জীবন্ত দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা যদি তাঁর সঙ্গে গিয়ে তাঁর বাড়িতে নিজের চোখে মূর্তিটিকে দ্যাখেন তবে তাঁরও অবশ্যই মনে হবে বুঝিবা হারমিওয়ান স্বয়ং সেখানে দাঁড়িয়ে। আর কাল বিলম্ব না করে উপস্থিত সকলেই ছুটলেন পলিনার বাড়ির দিকে, রাজা তাঁর মৃতা রানীকে স্থাপত্যের মধ্যে অনুরূপ দেখার জন্যে আকুল, আর কন্যা পারডিটা তো আরও ব্যাকুল তার মাকে একটিবার চোখে দেখতে, যে মা-কে সে কখনও দ্যাখেনি।

নিজের বাড়িতে পৌঁছে পলিনা সকলের সম্মুখে পর্দাটা সরিয়ে সেই বিখ্যাত মর্মর মূর্তিটির উন্মোচন করলেন, এত জীবন্ত সেই মূর্তি যে রাজা তো দেখামাত্র নতুন করে শোকে ও দুঃখে বিহ্বল হয়ে গেলেন — বহুক্ষণের জন্য বেদনায় তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে থাকল। তিনি নীরব ও নিশ্চল হয়ে রইলেন।

পলিনা বলে উঠলেন — আপনার এই নীরবতা প্রকৃতই সুন্দর — আপনার দুঃখ ও বিস্ময় এমনভাবে ছাড়া আর কিছুতেই প্রকাশ সম্ভব নয়। ঠিক যেন আপনার রানী, ঠিক সে-ই একই মানুষ — তাই না ?

এবার রাজার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হল—হ্যাঁ ঠিক সে-ই ঠিক এমনি করেই সে দাঁড়িয়েছিল তার রাজকীয় মহিমায় যেদিন আমি রাজমহিষী রূপে তাকে বরণ করি। কিন্তু একটা কথা পলিনা, তোমার ভাস্করের নির্মিত রাজমহিষীকে যেন অনেকটা বেশি বয়সের বলে বোধ হচ্ছে। পলিনা উত্তরে বললেন — ঐ খানেই তো স্থপতির আসল শিল্পবোধ — তার কল্পনায় সে দেখতে পেয়েছে রাজমহিষী বেঁচে থাকলে এত বছর পরে তাঁর চেহারা ঠিক কেমন হতে পারতো। কিন্তু আর নয়, পর্দাটা টেনে দিচ্ছি, হয়তো একটু বাদেই আপনার মনে হবে বুঝি মূর্তিটা নড়ছে চড়ছে।

রাজা বললেন—না, না, পর্দা টেনোনা। হায়রে, কেনই বা আমি আজও বেঁচে আছি! দ্যাখো, দ্যাখো, ক্যামিল্লো, তোমারও কি বোধ হচ্ছেনা নিঃশ্বাস পড়ছে ঐ মূর্তির— মনে হচ্ছেনা-চোখদুটো নড়ে উঠলো ? পলিনা আরও একটু ব্যাকুল করতে চাইলেন রাজাকে। তিনি বললেন — এবার পর্দাটা তো টানতেই হবে, মহারাজ। আপনি যে পরিমাণে আত্মবিস্মৃত হয়েছেন তার ফলে হয়তো এখুনি ভাববেন বুঝিবা মূর্তিটা বেঁচেই আছে। রাজা আবেগে বলে উঠলেন — হে প্রিয়ভাষিনী পলিনা, তাই হোক — শুধু এখন নয়, যেন আরও বিশ বছর ধরে আমি ঐ কথাই ভাবতে পারি — সে বেঁচে আছে। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে ঐ মূর্তি নিঃশ্বাস ফেলছে। এ কোন অদ্ভুত স্থপতি, যে তার বাটালি দিয়ে কেটে নিঃশ্বাস বানাতে পারে ? তোমরা কেউ আমাকে বিদ্রূপ কোরনা। আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারছিনা, আমি চুমু না খেয়ে পারছিনা। পলিনা বললেন, না, না। একটু ধৈর্য্য ধরতেই হবে — ঐ মূর্তির ঠোঁটে যে লাল রং, তা এখনও কাঁচা রয়ে গেছে, আপনি যদি চুমু দেন তবে ঐ তেল রং আপনার ঠোঁটে চটচটে হয়ে

লেগে যাবে। এবার তাহলে পর্দাটা টেনে দিই — কেমন?

না — আগামী বিশ বছরের জন্যে 'না' -----। ওটা অমনিই থাকবে।

পারডিটা এতক্ষণ নতজানু হয়ে বসে তার মায়ের অপরূপ মূর্তির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ছিল। এবার সে-ও বসে উঠল — ঐ বিশ বছর আমিও এমনি করেই বসে থাকবো আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে।

আপনি এই আত্মবিস্মৃতি সম্বরণ করুন আমি পর্দা টেনে দিচ্ছি। নতুবা, আরও অধিকতর বিস্ময়ের জন্য মনকে প্রস্তুত করুন—রাজাকে বললেন পলিনা। আমি যথার্থই ঐ মূর্তিকে সচল করতে পারি এবং এ-ও দেখাতে পারি মূর্তিটি তার বেদীমূল থেকে নেমে এসে আপনার হাত ধরবে। কিন্তু এমন করলে আপনি তো ভাববেন আমার উপর কোনো অপদেবতার দুষ্ট শক্তি ভর করেছে।

কি বললে — রাজা বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন — আমি খুশিই হয়েছি তোমার কথায় — মূর্তি যদি চলতেই পারে তবে তো তুমি তাকে কথা বলাতেও পারো!

এ কথা শোনার পর পলিনার আদেশমত অতি মৃদুস্বরে এক পবিত্র সংগীত শোনা গেল। পলিনা আগে ভাগেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। এবার সকলের অবাক হওয়ার পালা। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সকলে দেখল মূর্তিটি তার বেদীমূল থেকে নিচে নেমে এল এবং দুহাত বাড়িয়ে রাজাকে আলিঙ্গন করল। মূর্তিটি এবার কথা বলতেও আরম্ভ করল — সে রাজার মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করল, আরও প্রার্থনা জানাল তার নবাবিষ্কৃতা কন্যার উদ্দেশ্যে।

মূর্তিটি যে তার দুহাত দিয়ে রাজা লিওনাটিসের কণ্ঠলগ্ন হয়েছিল তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, আর এতেও অবাক হওয়ার কারণ নেই যে সে তার স্বামী ও কন্যার মঙ্গল কামনা করেছিল। অবাক হওয়ার প্রকৃতই কোনো কারণ নেই কেননা প্রকৃতপক্ষে ঐ মূর্তি জীবন্ত হারমিওয়ান স্বয়ং — বাস্তব ও জীবিত রানীরই দৈহিক উপস্থিতি।

আসলে পলিনা মিথ্যা রটনা করে দিয়েছিলেন রানীর মৃত্যুর কথা, রাজার কাছে তিনি এ মিথ্যা সংবাদ পাঠিয়েছিলেন রাজার রোষ থেকে রানীর প্রাণ রক্ষার জন্যে এবং তার পর থেকে এ পর্যন্ত রানী পলিনার গৃহেই আত্মগোপন করে ছিলেন যাতে কোনক্রমে রাজা না জানতে পারেন যে রানী জীবিত। আজ পারডিটা ফিরে আসার ফলেই রাজার কাছে এই সত্য প্রকাশ করা সম্ভব হল, কেননা হারমিওয়ান যদিও তাঁর নিজের প্রতি রাজার নিষ্ঠুর ব্যবহার অনেক আগেই ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর শিশুকন্যার প্রতি পিতার নিষ্ঠুরতাকে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন নি।

মৃতা স্ত্রীর পুনরুজ্জীবন ও হারিয়ে যাওয়া কন্যাকে আবার ফিরে পাওয়ার ফলে লিওনটিসের দীর্ঘ দিনের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে যে আনন্দের বন্যা এল তা সম্বরণ করার সাধ্য তাঁর ছিলনা।

সমবেত সকলের মুখেই শোনা গেল অভিনন্দনের কথা এবং স্নেহ ও ভালবাসার উক্তি। আনন্দে উৎফুল্ল রাজা ও রানী বোহেমিয়ার রাজপুত্র ফ্লোরিজেলকে আন্তরিকভাবে স্বতস্ফূর্ত প্রশংসা করলেন তাঁদের কন্যাকে সামান্য মেষপালকের মেয়ে জানা সত্বেও ভালবাসার উদারতার জন্যে, আর বৃদ্ধ মেষপালককে কৃতজ্ঞতা জানালেন তাঁদের কন্যার প্রাণরক্ষার জন্যে। ক্যামিল্লো এবং পলিনার আনন্দও কম নয় — তাঁদের সৎ ও বিশ্বাসপরায়ণ প্রভুভক্তির ফলেই আজ সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এই শুভ পরিণতি সম্ভব হল।

অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর এই আনন্দের ষোল কলা পূর্ণ হবে বলেই বোধ হয় এই শুভ মুহূর্তে সিসিলির রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন রাজা পলিকসেনেস।

পলিকসেনেসের এই অকস্মাৎ এসে পড়ার কারণও আছে। ক্যামিল্লো এবং তাঁর নিজের পুত্রটিকে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতে না দেখে তাঁর মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। কেননা, পারডিটার সঙ্গে মেলামেশার জন্যে সেই যে ছদ্মবেশে মেষপালকের বাড়িতে গিয়ে তিনি ফ্লোরিজেলকে ভৎসনা করেছিলেন তার ফলেই হয়তো সে দেশত্যাগ করেছে, এই তাঁর অনুমান। দ্বিতীয়ত, ক্যামিল্লোও দীর্ঘদিন যাবৎ একবার দেশে ফেরাব জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অতএব এই পলাতকদের সন্ধানেই রাজা পলিকসেনেসের সিসিলিতে আগমন। বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করেই তিনি তাঁর পুত্রের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন বলেই ভাগ্যবশত আজ তাঁর এককালের পরম বন্ধু লিওনটিসের জীবনের এই চরম আনন্দের মুহূর্তে উপস্থিত হতে পেরেছেন এমনি অপ্রত্যাশিতভাবে।

সকলের এই আনন্দে হৃষ্টচিত্তে অংশগ্রহণ করলেন পলিকসেনেস, তিনি ক্ষমা করলেন তাঁর বন্ধুর অন্যায় ঈর্ষাজনিত রোষের অপরাধ — দুই বন্ধু আবার ফিরে পেলেন তাঁদের শৈশবের নির্মল ও প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সেই পুরানো স্বাদ। এই আনন্দের খোলা পরিবেশে পলিকসেনেস পারডিটা ও তাঁর পুত্রের মিলনে প্রতিবন্ধকতা করবেন একথা ভাবাই যায়না। আজ আর পারডিটা 'ভেড়াধরা' নয়, সে হতে চলেছে সিসিলির ভাবী রাজার রাজমহিষী।

অতএব আমরা দেখলাম, দীর্ঘদিনের সকল দুঃখ কষ্টের মধ্যেও যে অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছিলেন রানী হারমিওয়ান তার উপযুক্ত পুরস্কার তিনি লাভ করলেন। এই মহীয়সী নারী এরপর স্বামী ও কন্যার সাহচর্যে স্ত্রী ও মাতারূপে দীর্ঘকাল সুখে জীবন যাপন করেছিলেন।

মাচ্ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং

মেসিনার রাজপ্রাসাদ। ঐ প্রাসাদের দুই কুমারী, একজনের নাম হিরো, আর একজন বিয়াট্রিস। মেসিনার শাসনকর্তা লিওনেটোর ঐ প্রাসাদ—হিরো তাঁর কন্যা এবং বিয়াট্রিস কন্যাসদৃশ ভ্রাতুষ্পুত্রী।

বিয়াট্রিস বড় চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে, তার সব সময়েই ভাল লাগে বোন হিরোকে একটু ভুলিয়ে হালকা করে দিতে, কেননা হিরো ছিল বড় গম্ভীর প্রকৃতির। বিয়াট্রিস চেঁচামেচি করে মজার কথা বলে তাকে অন্যমনস্ক করে দিতে চাইত। যা কিছুই চোখে পড়ুক না কেন সেটাকে হাসি ঠাট্টা করে এক ধরনের মজা করাতেই ছিল চঞ্চল বিয়াট্রিসের আনন্দ।

এই দুটি কুমারীর জীবনে, আসল গল্প শুরু হল যেদিন সেনাদলের কয়েকজন উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন যুবাপুরুষ এসে উপস্থিত হল মেসিনায় তাদের প্রাসাদে। লড়াই সদ্য শেষ হওয়ার পর ঐ যুবকেরা ফিরছিল যে যার রাজ্যে — তাদের ইচ্ছা হল পথে মেসিনার প্রাসাদে কয়েকদিন লিওনেটোর আতিথ্য গ্রহন করে। সাহসিকতার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে এরা সকলেই বিশেষ সম্মানও লাভ করেছে, কাজেই এখন একটু হালকা বিশ্রামের জন্যে মন তাদের ছটফট করছিল। এই যুবকদের মধ্যেই ছিল অ্যারাগনের রাজপুত্র ডন পেড্রো, তার বন্ধু ফ্লোরেন্স-অধিপতি ক্লডিও এবং তার হুল্লোড়বাজ ও বাকপটু বন্ধু বেনেডিক, যার আসল পরিচয় পদুয়ার অধিপতি।

এই তিনজন আগন্তুকের কাছে কিন্তু মেসিনা নতুন কোনো স্থান নয়, কেননা পূর্বেও তারা এখানে এসেছে এবং পরিচিত ছিল লিওনেটোর সঙ্গে। কাজেই অতিথিবৎসল লিওনেটো সহজেই তাঁর এই পূর্ব পরিচিত সুহৃদবর্গকে পরিচয় করিয়ে দিলেন নিজের কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে।

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করা মাত্রই বেনেডিক কথা বলতে শুরু করল লিওনেটো এবং রাজকুমারের সঙ্গে, জমাট আলাপে তার জুড়ি নেই। কিন্তু বিয়াট্রিসই বা কম যায় কিসে? সব আলাপ আলোচনাতেই যোগ দেওয়া তার চাই-ই চাই। বেনেডিকের কথার মাঝখানে তাকে খোঁচা দিয়ে সে বলে উঠল -- আপনি তো মশাই অবাক করলেন, আপনি কথা বলেই চলেছেন অথচ শ্রোতা নেই। বিয়াট্রিস যেমনটি বেনেডিকও তেমনি, বাজে কথার তুবড়ি ফোটাতে ওস্তাদ, কিন্তু বিয়াট্রিসের এই ধরনের মুখরা স্বভাব তার ভালো লাগল না, ভাল ঘরের মেয়ের পক্ষে এই ধরনের চটুলতা বেনেডিকের কাছে কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হল। তার এবার মনে পড়ল এর আগে তারা যখন মেসিনায় আসে বিয়াট্রিস তখনও তাকে নিয়েই সর্বদা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত, সবার মধ্যে তাকেই সে বেছে নিয়েছিল আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে। বেনেডিকও ছাড়ার পাত্র নয়, কেননা স্বাভাবতই যখন এই একই চরিত্রের দুটি

মানুষ মুখোমুখি হয় তখন এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ, কেউই কাউকে ঠুকে কথা বলতে ছাড়েনা। অতএব বেনেডিক ও বিয়াট্রিসের ঠোকাঠুকি লেগে যেত দেখা হওয়া মাত্রই এবং পরিশেষে একের প্রতি অন্যের বিরক্তি নিয়ে তারা যে যার মত স্থান ত্যাগ করত। কাজেই আজ যখন বিয়াট্রিস তার কথার মাঝখানে ফোঁড় কেটে তাকে অপদস্থ করতে উদ্যত হলো এবং বললো মশাই আপনি তো নিজেই বলেন নিজেই শোনেন, তখন বেনেডিক এমন ভাণ করলো যেন সে আগে বিয়াট্রিসকে লক্ষ্যই করেনি এবং বলে উঠলো, আরে এই যে শ্রীমতি অবজ্ঞাসুন্দরী, আপনি এখনও তাহলে জীবিতই আছেন? অতঃপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর বাকযুদ্ধ চলতে থাকলো অনর্গল। একটানা চলল কে কাকে অপদস্থ করতে পারে এবং বিয়াট্রিস এরই মধ্যে খোঁচা দিল বেনেডিকের যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্যের কথা তুলে, যদিও সে ভাল করেই জানতো বেনেডিকের শৌর্যবীর্যের কথা। বিয়াট্রিস বলে বসল, তোমার যা বীরত্ব সেখানে তো তুমি ছুঁচো মেরে বেড়িয়েছ, আর যখন সে লক্ষ্য করল যে রাজকুমার বেনেডিকের বাকচাতুর্যে খুব মজা পাচ্ছেন, তখন বিয়াট্রিস মোক্ষম আঘাত করল বেনেডিককে—বলল, আরে তুমি আর কত বড়ই বা হবে? তোমার কাজ তো রাজকুমারের ভাঁড়ামি করা। এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবান প্রকৃতই আহত করল বেনেডিককে—অন্য সব কথা সে খানিকটা ঠাট্টাচ্ছলে নিলেও এটা তার কাছে অপমানজনক মনে হল। সে প্রকৃতই ভাল যোদ্ধা ছিল কাজেই ছুঁচো মারার কথাটায় তার তেমন গায়ে লাগেনি, কিন্তু প্রকৃত রসিক ও বাকপটু লোককে কেউ যদি ভাঁড় বলে তবে তা সহ্য করা শক্ত হয়ে ওঠে—রসিকতা কোন পর্যায়ে গেলে ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত হয় তা বিচার করা যেহেতু দুষ্কর। বেনেডিক অতঃপর সর্বান্তকরণে ঘৃণা করতে শুরু করল বিয়াট্রিসকে।

অতিথিদের এই সমাবেশে শান্তপ্রকৃতির মেয়ে হিরো চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিল, আর এদিকে ক্লডিও খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করছিল এই ক'বছরের ব্যবধানে হিরোর রূপলাবণ্যে কেমন ঢল নেমেছে, মনে মনে তারিফ করছিল তার অঙ্গসৌষ্ঠব, কেননা হিরো প্রকৃতই ছিল রূপলাবণ্যময়ী তন্বীশ্যামা। রাজকুমার কিন্তু এসব দেখছিল না। তার চোখের চেয়ে কান ছিল সজাগ, সে শুনছিল বেনেডিক ও বিয়াট্রিসের কবির লড়াই, আর এই শুনতে শুনতে কানে কানে সে লিওনেটোকে বলল—মেয়েটি তো ভারী প্রাণোচ্ছল, তা বেনেডিকের সঙ্গে ওর বিয়ে লাগিয়ে দিলে সোনায় সোহাগা। লিওনেটো তো আকাশ থেকে পড়লেন—বললেন, আরে বলো কি রাজকুমার, যদি দুটিতে গাঁটছড়া বাঁধে তবে তো সপ্তাহ না পেরোতেই ওরা ঝগড়া করে তুলকালাম বাধাবে।

লিওনেটোর এ বিষয়ে তেমন উৎসাহ দেখা না গেলেও রাজকুমার কিন্তু এই দুটি বুদ্ধিসর্বস্ব বাক্যবাগীশকে সাত পাকে বাঁধার ব্যাপারটা মন থেকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে

দিতে পারলো না।

প্রাসাদ থেকে পথে নেমে ক্লডিওর সঙ্গে কথাবার্তায় রাজকুমার আঁচ করে নিল বেনেডিক ও বিয়াট্রিসের যে উদ্বাহের ব্যাপারটা নিয়ে সে এতক্ষণ ভাবছিল তা ছাড়াও আর একটি বৈবাহিক সম্ভাবনাও উঁকি দিচ্ছে ক্লডিওর হাবভাবে ও কথাবার্তায়। ব্যাপারটা তার মন্দ লাগল না। খোলাখুলি তাই সে ক্লডিওকে প্রশ্ন করে জানতে চাইল হিরোকে সত্যিই তার মনে ধরেছে কী না। এ প্রশ্নের উত্তরে ক্লডিও কিছু আর গোপণ করল না, সে বলল যখন সে আগের বারে মেসিনাতে আসে তখন তার মন পড়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে এবং হিরোকে তখন তার তেমন করে দেখার অবকাশ হয়নি, কিন্তু এখন ফেরার পথে তার মনে তো আর যুদ্ধের দামামা বাজছে না, তার পরিবর্তে এই শান্তির আকাশে তার মনে গোকুলের বাঁশি বেজে উঠেছে—এখন শুধুই মেঘের মত হালকা সুখের স্বপ্ন ভেসে বেড়াচ্ছে তার চিত্তাকাশে, কেবলই মনে হচ্ছে কত সুন্দরী হিরো, ভাবছি সেই প্রথম দেখা থেকেই ও আমার মন কেড়ে নিয়েছে যুদ্ধে যাওয়ার সময়েই।

ক্লডিওর এই মনখোলা স্বীকারোক্তি রাজকুমারের মনে দাগ কাটল। সে আর সময় নষ্ট না করে সরাসরি হাজির হলো হিরোর পিতা লিওনেটোর কাছে এবং তাঁকে অনুরোধ করল তাঁর মেয়েটিকে ক্লডিওর হাতে সমর্পণ করতে, জামাতা হিসাবে তো ক্লডিও মোটেই যে–সে পাত্র নয়, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, ধনসম্পদে সে তো হিরোর উপযুক্ত পাত্রই বটে। কাজেই লিওনেটোর সম্মতি পেতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হলনা, আর রাজকুমার যখন এই প্রস্তাব নিয়ে স্বয়ং হিরোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল তখন হিরোর মত পেতেও দেরী হল না। অতঃপর রাজকুমারের সহায়তায় ক্লডিও লিওনেটোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর কন্যা সম্প্রদানের জন্যে দিনটিও স্থির করে নিল----হিরো ও ক্লডিওর শুভ পরিণয়।

দিন তো স্থির হলো। কিন্তু তবুও তো মাঝে আরো কটা দিন। এই 'কটা দিন' নিয়েই তো মহা সমস্যা—ক্লডিওর সময় আর কাটতে চায়না। বোধহয় এরকমটাই হয়ে থাকে। কাম্যবস্তু চাওয়া আর নিশ্চিত পাওয়ার মাঝখানের সামান্য ফারাকটুকুও মনে হয় অতি দীর্ঘ, বড় ক্লান্তিকর। রাজকুমার ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে এই অন্তর্বর্তী সময়টুকু কাটাতে উদ্ভাবন করতে চাইল এক মজার খেলা—স্থির হল অতি কৌশলে বেনেডিক ও বিয়াট্রিসকে ফেলতে হবে প্রেমের ফাঁদে।

ক্লডিও এ-ব্যাপারে এক পায়ে খাড়া, রাজকুমারের এই খেয়াল তার দারুণ লাগল। লিওনেটোও দেখলেন খেলাটা ভালই জমবে। তিনিও বললেন, তথাস্তু, আর স্বভাব নম্র প্রকৃতির হিরোও রাজী হল। তার সাধ্য অনুসারে সে তার বোনের পাত্র নির্বাচনে সহায়তা করতে প্রস্তুত।

কৌশলটা হল—বন্ধুরা চক্রান্ত করে বেনেডিকের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করবে যে

বিয়াট্রিস তাকে প্রকৃতই ভালবাসে। আবার অপরপক্ষে হিরোর দায়িত্ব ঠিক অনুরূপভাবে বিয়াট্রিসের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা যে বেনেডিক তার প্রেমে পাগল।

এই অভিযানে প্রথম অপারেশন শুরু করল তিনজন — রাজকুমার, লিওনেটো এবং ক্লডিও। তারা আবিষ্কার করল বেনেডিক একা একা বসে আছে প্রাসাদের কুঞ্জবনে, হাতে একখানা বই নিয়ে সে পড়ায় নিমগ্ন। সুযোগ বুঝে রাজকুমার এবং সাঙ্গপাঙ্গরা কুঞ্জবনের পিছনে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। জায়গাটা তারা এমন বেছে নিল যে সেখান থেকে তাদের কথোপকথন সহজেই যাতে বেনেডিকের কানে যায়, অথচ চোখে না পড়ে কোথায় দাঁড়িয়ে এসব কথা হচ্ছে। খানিক এলোমেলো কথার পর রাজকুমার বলল—এই যে স্যার লিওনেটো, আপনি সেদিন কী যেন বলছিলেন, আপনার ভাইঝি নাকি প্রেমে পড়েছে আমাদের বেনেডিকের? তা আমি তো ভাবতেই পারিনা ঐ মেয়ে আবার কারো প্রেমেট্রেমে পড়তে পারে। লিওনেটো বললেন আরে তাই তো মশাই আমিও কি ভাবতে পারতাম? তবে কী না ঘটে? এখন তো দেখছি মেয়ে আমার বেনেডিক বলতে পাগল, অথচ তার বাইরের হাবভাবে এর বিন্দুবিসর্গ বোঝা যাবে না। মনে হবে সে বুঝি বেনেডিকের প্রতি সর্বদাই খড়গহস্ত। ক্লডিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমিও তো হিরোর কাছে শুনে অবাক যে বিয়াট্রিস নাকি বেনেডিকের কথা ভেবে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, তাকে না পেলে সে প্রাণই রাখবে না। লিওনেটো আর ক্লডিও এক সঙ্গেই বলে উঠল—এ কী করে সম্ভব? বেনেডিক তো ঘোর নারীবিদ্বেষী, কথায় কথায় সে মেয়েদের পিণ্ডি চটকায়, আর বিয়াট্রিসের সঙ্গে তার তো সাপে-নেউলে।

রাজকুমার এবার এমন ভাব দেখাল যেন বিয়াট্রিসের এই অপাত্রে প্রেমের কাহিনী শুনে সে তার জন্যে বড়ই দুঃখ বোধ করছে। সহানুভূতির সুরে সে বলল বেচারী বিয়াট্রিসের এমন অবস্থার কথা তাহলে বেনেডিককে বলা দরকার। ক্লডিও তেমনি ভাণ দেখিয়ে বলল, কোনো ফল হবেনা, বরং উলটো ফল হবে। বেনেডিক এতে মজা পেয়ে আরও বেশি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে বিয়াট্রিসকে। উত্তরে রাজকুমার তেমনি ভান করে বলল, তাই যদি হয় তবে বেনেডিককে গোল্লায় পাঠানো উচিত, কেননা, বিয়াট্রিস এমন সুন্দর মেয়ে, তার সব কিছুই এত ভাল। শুধু ঐ একটিই ভুল সে করে বসে আছে—বেনেডিককে ভালবাসা। অতঃপর রাজকুমার তার সঙ্গীদের ইঙ্গিতদ্বারা সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিল এবং বুঝতে চাইল তাদের এই কথাবার্তার ফলে বেনেডিকের মনে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

যেমনটা হওয়া উচিত ঠিক তাই ঘটল। বেনেডিক অতি মনোযোগসহকারে আদ্যোপান্ত শুনেছে। বিয়াট্রিস তাকে ভালবাসে, তা-ও কী সম্ভব? তার মনের এখন বেসামাল অবস্থা। সে ভাবল, কী জানি বিধাতার এ কোন খেয়াল। তার বন্ধুরা চলে যাওয়ার পর তার কেবলই মনে হতে থাকল—না, না, এর মধ্যে

কোনো ছল চাতুরী থাকতে পারেনা, ওরা যা আলোচনা করছিল তা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই করছিল, আর তাছাড়া ওরা বলছিলো ওরা হিরোর কাছ থেকেও বিয়াট্রিসের এ অবস্থার কথা শুনেছে, হিরোও নাকী খুবই দুঃখ বোধ করছে তার বোনের এই অবস্থায়। না, না—এ ভালবাসাকে কিছুতেই অবহেলা করা যায় না। আমাকে শেষে বিয়ে করতে হবে এমন তো কখনও ভাবিনি। কিন্তু যখন বলেছিলাম মরতে হয় অকৃতদার থেকেই মরব তখন তো আর ভাবিনি যে বাঁচলে বিয়ে করেই বাঁচব। ওরা বলল মেয়েটিকে দেখতে যেমন সুন্দর তার স্বভাব-চরিত্রও তেমনই মধুর। তা এ তো খুবই হক কথা। ওরা আরও বলছিল তার নাকি একটাই শুধু অপরাধ যে সে আমাকে মন দিয়েছে। তা এটা অপরাধ হতে যাবে কেন ? ঐ তো, এদিকেই যেন আসছে বিয়াট্রিস ? সত্যিই তো— ভারী সুন্দরী তো মেয়েটা। হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর চোখে-মুখে ভালবাসা ফুটে উঠছে।

ইতিমধ্যে বিয়াট্রিস কাছাকাছি এসে পড়ল—সে তার স্বভাবসুলভ খোঁচা দিয়ে বলল—এই যে মশাই, ভাববেন না যে আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি, ওরা আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে খাবার জন্যে ডাকতে। এতকাল বেনেডিক কদাপি ভুল করেও নরম সুরে বিয়াট্রিসের উদ্দেশ্যে কোনো আলাপনের কথা ভাবেনি, কিন্তু আজ খুব বিনীতভাবেই উত্তর দিল—আহা ভালো মেয়েটি, বিয়াট্রিস, তুমি আবার কষ্ট করে এতটা দূর এলে ! বিয়াট্রিস কিন্তু সেই একই রূঢ়ভাবে আরো দু একটি বাক্যবাণ ছুঁড়ে সেখান থেকে চলে গেল—যদিও ঐ বিবাদ বাক্যগুলির অন্তস্থলে যথেষ্ট পরিমানে সুধা নিহিত আছে বলেই বেনেডিক বিশেষ আশ্বস্ত বোধ করল, এবং স্বভাবতই প্রাণের আবেগ সম্বরণ করতে না পেরে সে গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল—যদি এই কন্যাকে আমার মন সঁপতে না পারি তবে আমি পিশাচ—যদি একে না ভালবাসতে পারি তবে আমি অধম এক ইহুদি—ওর ছবি আমার চাই-ই চাই।

অর্থাৎ, শিকার জালে পড়ল—প্রেমের খেলায় অনভিজ্ঞ গোবেচারা বেনেডিক ধরা পড়ল বন্ধুদের পেতে রাখা ফাঁদে। এবার দেখা যাক হিরো কোন জাল বিছিয়েছে বিয়াট্রিসকে ধরার জন্যে। তার দাবায় ঘুঁটির কাজ হল উরসুলা ও মার্গারেট নামে তার দুই সহচরীর। হিরো মার্গারেটকে বললো, ভাই মার্গারেট চটপট একটা কাজ করতো—ছুটে একবার বাইরের বসার ঘরে যাওতো, সেখানে দেখবে আমার বোন বিয়াট্রিস গল্প করছে রাজকুমার ও ক্লডিওর সঙ্গে। তার কানে কানে গিয়ে বলো যে আমি উরসুলার সঙ্গে আমাদের কুঞ্জবনে বেড়াতে বেরিয়েছি আর আমরা যে আলাপ আলোচনা করছি তা বিয়াট্রিসকে নিয়েই। ওকে গিয়ে বলো কেমন ভারী সুন্দর ঐ বনে আমরা রয়েছি যেখানে মাধবীলতাগুলি ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে সূর্য্যের উষ্ণ কিরণে, আর অকৃতজ্ঞ লোকজনের মত, সেই সূর্য্যকেই সে তার কুসুম কুঞ্জে প্রবেশ করতে দিতে নারাজ। আমরা জানি যে কুঞ্জে বিয়াট্রিসকে ছলে ভুলিয়ে

আনার জন্যে মার্গারেটকে হিরো পাঠালো এ সেই একই মনোরম কুঞ্জ যেখানে কিছুক্ষণ আগে অতি নিষ্ঠাবান শ্রোতার মত বেনেডিক মুগ্ধ হয়েছিল বিয়াট্রিসের প্রেমকথা শ্রবণে।

মার্গারেট বলল, আমি কথা দিচ্ছি আমি এখুনিই নিয়ে আসব তাকে।

এই ব্যবস্থার পর উরসুলাকে নিয়ে হিরো পৌঁছল ঐ কুঞ্জে। সেখানে গিয়ে সে উরসুলাকে বলল, বিয়াট্রিস যখন আসবে আমরা তখন এই সরু পথটা দিয়ে এধার ওধার পায়চারি করতে থাকবো, আর আমাদের আলোচনার বিষয় হবে কেবলমাত্র বেনেডিক যখনই আমি বেনেডিকের নাম করব তুই সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকবি আহা! অমন মানুষ আর হয়না, যেন হীরের টুকরো, যেমন রূপে তেমনি গুণে। আর আমি তার সঙ্গে জুড়ে দেব আহা বেনেডিক বিয়াট্রিসের জন্যে কি না করতে পারে, এমন তার ভালবাসা। নে, এবার শুরু কর – ঐ দ্যাখ, কেমন টিটিভ পাখির মত লাফাতে লাফাতে এদিকে দৌড়ে আসছে বিয়াট্রিস আমাদের কথা শুনবে বলে।

এবার তারা শুরু করল অভিনয়। যেন উরসুলার কোনো কথার উত্তরে সে তার বক্তব্য বলছে এমন সুরে হিরো বলতে থাকলো– না না উরসুলা ও কথা বলিস না আমার বোন ওকে কিছুতেই সইতে পারে না, ওকে বরং সে তাচ্ছিল্যই করে – তাছাড়া আমার বোন প্রেমে পড়ার পাত্রীই নয় বুনো পাহাড়ী পাখির মত সে নিজেকে গুটিয়েই রাখতে চায়। উত্তরে উরসুলা বলল—তা তুমি সঠিক বুঝেছ যে বেনেডিক বিয়াট্রিসকেই ভালবাসে। তা নাহলে বলছি কেন, বলল হিরো, আর তাছাড়া রাজকুমার আর ক্লডিও দু'জনে মিলে আমাকে অনুরোধ করলেন কথাটা বিয়াট্রিসের কাছে বলার জন্যে—তা আমি তাদের বললাম, দোহাই আপনাদের ঐ কথা মুখে আনবেন না, যদি আপনাদের বন্ধু বেনেডিকের প্রতি আপনাদের সত্যিই মনের টান থাকে তাহলে তাকে এমন করে অপদস্থ হতে দেবেন না। উরসুলা বলল, তা বটে বিয়াট্রিসের কানে একথা না তোলাই ভাল—শুনলেই সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে আর হাসাহাসি করবে বেনেডিককে নিয়ে। হিরো বলল, এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার যে বেনেডিকের মত বিদ্যা বুদ্ধি রূপ ও গুণে এমন একটি ছেলেকে অবহেলা করে বিয়াট্রিস। উরসুলা বলল, বটেই তো বিয়াট্রিসের এই খুঁতখুঁতুনি স্বভাবটা মোটেই ভাল নয়। হিরো বলল, তা তো জানি, কিন্তু সে কথা তাকে বোঝাবে কে। আমি বলতে গেলে সে এক কথায় উড়িয়েই দেবে। উরসুলা বলল, না না আপনি ভুল বুঝছেন আপনার বোনটিকে, বুদ্ধি বিবেচনার এতটা অভাব তাঁর কিছুতেই হতে পারেনা যে বেনেডিকের মত এমন সব দিক থেকে সেরা একটি ছেলেকে তিনি অবহেলা করবেন। হিরো বলল, তা বটে, তার সুনামও খুব, ইটালির এক নম্বর ছেলে বলে তার সুখ্যাতি, অবশ্য ক্লডিওর কথা আলাদা। অতঃপর হিরো মার্গারেটকে ইঙ্গিত করলো প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে, আর উরসুলা

সঙ্গে সঙ্গে বলল, ওসব কথা থাক, তা আপনার বিয়ের দিন স্থির হল কবে, দিদি? হিরো বলল, আরে কালই তো আমার বিয়ে — তা তুই এখন চলতো আমার সঙ্গে কিছু নতুন পোষাক-আশাক এনেছি, দেখে একটু বলিস তো কোনটা পরলে বিয়ের কনেকে ভাল মানাবে।

এতক্ষণ বিয়াট্রিস আড়াল থেকে রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল মার্গারেট ও হিরোর ঐ সংলাপ। যে মুহূর্তে তারা স্থান ত্যাগ করল অমনি সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল—এ কী শুনলাম আমার কানে—এ কী সত্যি? চুলোয় যাক আজ থেকে আমার অবজ্ঞা ও ঘৃণা, চুলোয় যাক কুমারীসুলভ অহংকার! বেনেডিক তোমার ভালবাসা সার্থক হোক, আমি আজ থেকে আমার বাগ-না-মানা মনকে তোমার হাতে দেব বলে সংকল্প করলাম।

এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটছে তার সবটুকুই মজার—এরপর আরও মজার হতে পারতো যদি আমরা দেখতে পেতাম বেনেডিক ও বিয়াট্রিস—এই দুই পরস্পর বৈরীর এ হেন নাটকীয় পরিবর্তনের পর তাদের দেখা হলে ছবিটা কেমন দাঁড়ায়, কেননা তারা তো বেমালুম ঠকে বসে আছে আমোদপ্রিয় রাজকুমারের মজাদার কৌশলে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর—কেননা, ইত্যবসরে হিরোর ভাগ্যে দেখা দিল দারুণ এক সংকট। আগামী কালই তার বিয়ের দিন স্থির আছে, আর আজই সেই দুর্যোগ হিরো ও তার পিতা লিওনেটোর সব আনন্দ নষ্ট করে দিল।

রাজকুমারের ছিল এক সৎভাই, যুদ্ধ ফেরৎ সে-ও তার সঙ্গে আসে মেসিনাতে। ভাইটির নাম ছিল ডন জন। ভাই হলে কী হবে, মানুষ হিসাবে সে ছিল অসৎ—সর্বদাই তার অসন্তোষ আর অশান্তিবোধ, আর মনের মধ্যে মতলব কী করে অন্যের সর্বনাশ করা যায়। ডন জন তার রাজকুমার দাদাকে দু চোখে দেখতে পারত না। স্বভাবতই দাদার বন্ধু ক্লডিওকে সে সমানভাবেই ঘৃণা করত। অতএব জন যখন দেখল হিরোর সঙ্গে ক্লডিওর বিয়ে হতে যাচ্ছে তখন সে স্থির করল যে উপায়েই হোক এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে—তার স্বার্থ ছিল শুধুমাত্র তার দাদা ও দাদার বন্ধুর প্রতি ঈর্ষাজনিত ক্ষতিসাধনের মজা। কেননা সে জানত দাদা তার বন্ধুর এই বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে চেষ্টা করেছে এবং এ বিয়ে হলে সে-ও ক্লডিওর মতই আনন্দ পাবে।

এই ক্ষতিসাধনের কাজটি উদ্ধার করার জন্যে জন সঙ্গী করে নিল তারই মত অসৎ আর একটি লোককে, নাম যার বোরাশিও। বোরাশিওকে সে বলল, কাজটি করে দিতে পারলে ভাল পুরস্কার মিলবে।

বোরাশিওর আবার একটু প্রণয়জনিত যাতায়াত ছিল হিরোর সেই দাসী মার্গারেটের কাছে। এটাকেই কাজে লাগাতে চাইল ডন জন। সে বোরাশিওকে বলল, তুমি তোমার প্রণয়িনী মার্গারেটকে রাজী করাবে আজ রাত্রে সে যেন তার দিদিমণি হিরো ঘুমিয়ে পড়ার পর তার ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে তোমার সঙ্গে কথা বলার ভাণ

করে ; আর সেই সময়ে সে যেন হিরোর পোশাকেই নিজেকে সাজিয়ে নেয়—অর্থাৎ এমন দেখলে ক্লডিও সহজেই বিশ্বাস করবে তার ভাবী স্ত্রী হিরো-ই বুঝি এমন গোপনে কথা বলছে অভিসারী কোনো প্রণয়ীর সঙ্গে। এই এক চালেই কিস্তিমাত হয়ে যাবে এই ছিল তার পরিকল্পনা।

ব্যবস্থাটি পাকা করে ডন জন একেবারে চলে এল তার দাদা, অর্থাৎ রাজকুমার এবং দাদার বন্ধু ক্লডিওর কাছে। সে এসে ইনিয়ে বিনিয়ে বলল হিরো মেয়ে ভাল নয়, তার ঘরের জানলার কাছে মাঝরাতে মানুষ যাতায়াত করে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে তাকে।

এই সংবাদটি সে লাগাতে এল ঠিক সময়ে, অর্থাৎ যেদিন বিয়ের দিন নির্ধারিত হয়েছে তার ঠিক আগের দিনে। সে বলল, যদি বিশ্বাস না-হয় আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাদের চাক্ষুষ দেখিয়ে দিতে পারি এটা সত্যি কি না। তোমরা সচক্ষে দেখবে হিরো তার গোপন প্রণয়ীব সঙ্গে প্রেমালাপ করছে তার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে। ক্লডিওরা তৎক্ষণাৎ জনের কথায় তার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হল এবং ক্লডিও বলল—ঠিক আছে, যদি এ ঘটনা যথার্থ হয় তবে বিয়ে কাকে বলে আমি দেখিয়ে দেব। এখন কিছু বলব না, আগামীকাল বিয়ের লগ্নে সমাগত অতিথিদের সামনে আমি ঐ মেয়েকে এমন শিক্ষা দেব যে সে আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। রাজকুমারও তাকে সমর্থন করে বলল, বটেই তো, এই বিয়ের ব্যাপারে আমিই তো অগ্রনী হয়ে তোমাকে উৎসাহ দিয়েছি, কাজেই ঐ মেয়েকে আমিও হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব প্রতারণার শাস্তি কেমন।

ডন জন ওদের এনে উপস্থিত করল হিরোর শয়নকক্ষের কাছাকাছি এক স্থানে। রাতের অন্ধকারে ওরা দেখল কে একজন দাঁড়িয়ে আছে জানলার গোড়ায় এবং জানলায় মুখ বাড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছে হিরো—অর্থাৎ দুটিই প্রক্সি চরিত্র, পুরুষটির অভিনয় করছে বোরাশিও এবং হিরোর অভিনয় করছে হিরোর পোশাকে সজ্জিত মার্গারেট। ব্যাস, রাজকুমার এবং ক্লডিও সহজেই বিশ্বাস করে নিল হিরো ভ্রষ্টা রমণী।

ক্লডিও তখন রাগে ফুঁসছে, সে সচক্ষে দেখেছে এই ব্যভিচার। মুহূর্তের মধ্যে হিরোর প্রতি তার বিশ্বাস ও ভালবাসা পরিবর্তিত হলো চূড়ান্ত ঘৃণায়। সে প্রতিজ্ঞা করল আগামী কাল গির্জায় যখন বিবাহের জন্যে তাদের উপস্থিত করা হবে তখন সে সকলের সামনে হিরোর মুখোশ খুলে তাকে বে-ইজ্জত করবে। রাজকুমারও বলল সেটাই ঠিক পথ, কেননা এমন মেয়েকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এর চেয়ে উপযুক্ত শাস্তি তাদের জানা নেই। ক্লডিওর মতো এমন সৎ ও উদার পাত্রের সঙ্গে যার বিয়ে হতে চলেছে আজ বাদে কাল, সে কি না বিয়ের পূর্বরাত্রেই এমন কুৎসিত ব্যাভিচারে মত্ত।

পরের দিন। বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা নিখুঁত—অতিথিরা উপস্থিত—ক্লডিও ও হিরো দাঁড়িয়ে আছে পুরোহিতের সামনে। পুরোহিত, যাকে বলা হত 'ফ্রায়ার' বা ভিক্ষু, তিনি এগিয়ে আসছেন পাত্র ও পাত্রীর সম্মুখে অনুষ্ঠানের মন্ত্র উচ্চারণের জন্য – ঠিক এই মুহূর্তে যার-পর-নেই ক্রুদ্ধ ভাষায় ক্লডিও প্রকাশ করল নির্দোষ হিরোর চরিত্র সম্পর্কে তার পূর্বরাত্রের অভিজ্ঞতার কথা। আকাশ থেকে পড়ল হিরো—কিছুই আসছে না তার মাথায়—সে শুধু বলল—ওর শরীর ভালো আছে তো, এ সব কী বকছে ও প্রলাপের মতো?

এই পরিস্থিতিতে লিওনেটো উদ্‌ভ্রান্তের মতো রাজকুমারের শরণাপন্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন—তুমি চুপ করে রইলে যে বড় রাজকুমার? বলো, তুমিই বলো?

রাজকুমার বলল, আমি আর কি বলব? আমাকেই বে-ইজ্জত হতে হল এমন একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুর বিয়ের কথা হওয়াতে। আপনি জানেন কি আমার ভাই, স্বয়ং আমি এবং আমার এই বিপন্ন বন্ধু ক্লডিও—আমরা কালরাতে নিজেদের চোখে দেখেছি, নিজেদের কানে শুনেছি আপনার ঐ মেয়ে তার জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে একজনের সঙ্গে রঙ্গালাপ করছে। এ আমি শপথ করে বলছি।

বেনেডিক একটু হকচকিয়ে গেল, সে ভাবতে লাগল—ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন ঠেকছে, ঠিক খাঁটি বলে মনে হচ্ছে না।

এই আঘাতে ভেঙ্গে পড়লো হিরো—বিদীর্ণ হৃদয়ে সে শুধু বললো, হায় ভগবান, এ তুমি কি করলে! আর এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হতভাগিনীর সংজ্ঞা লোপ পেল—মনে হল যেন তার দেহে প্রাণ নেই। রাজকুমার এবং ক্লডিও বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে গির্জার বাইরে বেরিয়ে পড়ল। তাদের অত্যাচারের ফলেই এই ঘটনা—তবু হিরো বেঁচে রইল না মরে গেল তা দেখার কোন প্রয়োজনই তারা বোধ করল না। তাদের ক্রোধ এমনই নিষ্ঠুর করেছে তাদের।

বেনেডিক কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলো হিরোর কাছে—সে তার সাধ্যমত সাহায্য করতে এগিয়ে এলো বিয়াট্রিসকে হিরোর শুশ্রূষায়। সে জানতে চাইল বিয়াট্রিসের কাছে—কেমন দেখছো? বিয়াট্রিস বললো মনে হচ্ছে প্রাণ নেই। বিয়াট্রিস কিছুতেই এই দুঃখ সম্বরণ করতে পারছিল না, সে ভাবতেই পারেনা তার বোনের মত এমন মেয়েকে কেউ এই অপবাদ দিতে পারে, কিছুতেই সে বিশ্বাস করবে না এই বানানো গল্পের কথা। পিতা লিওনেটোর কিন্তু নিজের মেয়ের উপর এই আস্থাটুকু ছিল না। এই অপবাদে তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন এবং নিজের মুখে উচ্চারণ করলেন যেন মেয়ে আর বেঁচে না ওঠে—পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক এই মৃতবৎ কন্যার প্রতি পিতার এই রূঢ় আচরণ বড় বেদনার।

প্রাচীন পুরোহিত কিন্তু প্রকৃতই জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তিনি বহুদর্শী এবং বিচক্ষণ। তাঁর সামনে যে ঘটনা ঘটল তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি মন দিয়ে লক্ষ্য

করেছেন—লক্ষ্য করেছেন হিরোর মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রতিক্রিয়া এবং স্পষ্টই দেখেছেন এই অপবাদে কী নিদারুণ লজ্জায় তার মুখ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছিল এবং একটু পরেই কী এক পবিত্র শুভ্রতায় মুছে গেল সেই লজ্জার লাল রং। তিনি এ ছাড়াও লক্ষ্য করেছিলেন হিরোর চোখে কেমন এক আগুন যা কি না স্পষ্টই প্রতিবাদে জ্বলজ্বল করছিল যখন রাজকুমার তার নারীত্বের পবিত্রতায় প্রশ্ন তুলে তাকে অপমান করছিল। পুরোহিত লিওনেটোকে উদ্দেশ্য করে বললেন—এই নিরপরাধ কন্যার উপর যে অপবাদ এসে পড়লো অবশ্যই কোথাও কোনো মারাত্মক ভুলের জন্যেই তা ঘটে থাকবে, যদি তা না-হয়, তবে আজ থেকে আপনি আমাকে নির্বোধ বলেই অভিহিত করবেন, আর আমার বিদ্যা-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, বয়স অথবা আমার প্রাপ্য সম্মান ও যাজকীয় বৃত্তি সব কিছুই আমি পণ রাখতে পারি এই সত্যের জন্যে।

কিছুক্ষণ বাদে হিরোর চেতনা ফিরে এলো। পুরোহিত সস্নেহে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বলতে পারো মা, কাকে নিয়ে ওরা এই অপবাদ তোমার সম্পর্কে রটনা করল? হিরো বললো—আমি তো এর কিছুই জানিনা, যারা এই প্রশ্ন তুলেছে তারাই জানে। সে তার বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—বাবা, যদি তুমি প্রমাণ করতে পারো কাল রাতে এবং ঐ অস্বাভাবিক সময়ে আমার সঙ্গে কোনো ব্যক্তি কথা বলেছে, অথবা গত রাতে কোনরূপ প্রাণীর সঙ্গেই আমি কোনো বাক্য বিনিময় করেছি তবে তার শাস্তি দেওয়ার জন্যে আমি বলব তুমি আমাকে ত্যাগ কোরো, ঘৃণা কোরো এবং যে কোনো অত্যাচার করে মেরে ফেলো।

পুরোহিত আবার বললেন, নিশ্চয়ই কোনো অস্বাভাবিক ধরনের কিছু একটা ভ্রান্তি ঘটেছে রাজকুমার ও ক্লডিওর মনে। তিনি লিওনেটোকে বললেন, আপনি এক কাজ করুন, আপনি প্রচার করে দিন যে আপনার মেয়ে হিরো মারা গেছে। একথা সকলে সহজেই বিশ্বাস করবে। কেননা তাকে যে অচেতন অবস্থায় তারা দেখে গেছে তাতে এ বিশ্বাস করা খুবই স্বাভাবিক। আর আপনি নিজে পোশাকে পরিচ্ছদে শোক পালন করতে থাকুন, আর মৃতের সৎকারের জন্যে যথাবিধি আচার অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করুন—তৎসহ মৃতা মেয়ের জন্যে একটা স্মৃতিসৌধ নির্মাণেরও দরকার। রাজা এ কথার অর্থ কিছুই অনুধাবন করতে পারলেন না। তিনি প্রশ্ন করলেন—কি ফল হবে এ সব করলে? পুরোহিত উত্তরে বললেন, অন্তত এটুকু হবে যে এই কলঙ্কের কালি কিছুটা মুছে যাবে মৃতার প্রতি মানুষের সহানুভূতির উদ্রেক হওয়ার ফলে যতো সামান্যই হোক তবু এর প্রয়োজন, যদিও এটুকুই মাত্র আমাদের লক্ষ্য নয়। আসলে ক্লডিও যে মুহূর্তে এই মৃত্যুর সংবাদ শুনবে এবং শুনবে তারই গঞ্জনার ফলে এ মৃত্যু ঘটলো, তখন স্বভাবতই তার মনে হতে থাকবে জীবিত হিরোর গুণগুলির কথা, আর তার ফলে সে ধীরে ধীরে শোকাভিভূত

হবে—সে তো একদিন তাকে ভালবেসেছিল। তাই তার মনে হবে কেনই বা এমন কটুকথা বলতে গেলাম। যতো সত্যিই মনে হোক এই অপবাদের কারণ, ক্লডিও ব্যথিত না-হয়ে পারবে না।

বেনেডিকও বললো হিরোর পিতা লিওনেটোকে—আমি বলি, আপনি পুরুতমশাই-এর কথা মত কাজ করুন। আর কথা দিচ্ছি, যদিও রাজকুমার এবং ক্লডিও এরা উভয়েই আমার বিশেষ বন্ধু তবুও আমি সব কথাই তাদের কাছে গোপণ রাখবো।

পুরোহিত এবং বেনেডিক, এই দুজনের কথায় লিওনেটো অনেকটা ধাতস্থ হলেন. তিনি ওদের কথা মত কাজ করতে রাজী হয়ে বললেন, আমি আজ বড় অসহায়. সামান্য তৃণখণ্ডের অবলম্বনটুকুও আজ আমার কাছে মহামূল্যবান। পুরোহিত মশাই এরপর লিওনেটো ও হিরোকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন, তাদের এই বিপদে যেটুকু সান্ত্বনা ও ভরসা দেওয়া যায় তার জন্যে।

বেনেডিক ও বিয়াট্রিস—এখন তারা মুখোমুখি—এবং শুধু তারা দুজন। যে বন্ধুরা তাদের নিয়ে মজা করার জন্যে কৌশলের জাল বিস্তার করেছিল আজ তারা নিজেরাই জড়িয়ে পড়েছে এক প্রকৃত ষড়যন্ত্রের জালে—যারা এই দুজন পরস্পর বিরোধীকে নিয়ে বড় রকমের একটা তামাসার সূত্র উদ্ভাবন করেছিল আজ তারা নিজেদের ব্যর্থতার ভারে নিজেরাই বিপর্যস্ত, তামাসার আনন্দ তারা হারাতে বসেছে চিরকালের জন্যে।

প্রথম কথা বলল বেনেডিকই—সে বলল, তুমি কি কাঁদছিলে বিয়াট্রিস—সারাক্ষণ ধরে তোমার চোখে জল? হ্যাঁ, বলল বিয়াট্রিস, এ কান্না তো থামার নয়, আমাকে তো আরো অনেক কাঁদতে হবে। বেনেডিক বলল—আমি বুঝেছি, সত্যিই বুঝেছি, তোমার বোনের উপর মস্ত বড় একটা অবিচার হয়ে গেছে। বিয়াট্রিস উত্তরে বলল—জানো, এই অবিচারের প্রতিকার যদি কেউ করতে পারে তবে আমি চিরদিনের জন্যে তার কেনা হয়ে থাকব, সে হবে আমার প্রকৃত বান্ধব। বেনেডিক বলল—বলো, কীভাবে এ বন্ধুত্ব দেখালে তুমি খুশি হবে? আমি তো আজ আর তোমাকে ছাড়া কিছুই জানিনা—কী অদ্ভুত, তাই না? সঙ্গে সঙ্গে বিয়াট্রিসও বলল—যদি আমিও ঠিক ঐ কথাটাই বলতে পারতাম যে আজ তোমার চেয়ে আর অন্য কিছুই আমার কাছে প্রিয় নয়—আমাকে বিশ্বাস কোরনা, কিন্তু এর একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। আমি যে ভালবাসার কথা বলে ফেললাম জানিনা তা সত্যি অথবা সত্যি নয়—আমি হ্যাঁ-ও বলছি না, না-ও বলছি না। তবে আমার বোনের জন্যে আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে। বেনেডিক সহসা আবেগের সুরে বলে উঠল—এই তরোয়াল ছুঁয়ে আমি শপথ করে বলছি—নিশ্চয়ই আমাকে তুমি ভালবাসো। আর আমিও ভালবাসি তোমাকে—বলো, কি পেলে তোমার আশা মিটবে—আমি সবই করতে

প্রস্তুত তোমার জন্যে। বিয়াট্রিস বলল—বেশ, তাহলে খুন করো ক্লডিওকে। বেনেডিক বললো—না, না, পৃথিবীতে কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি ঐ কাজটি পারব না। আসলে বেনেডিক অত্যন্ত ভালবাসতো ক্লডিওকে এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিলো হিরোর প্রতি তার এই দুর্ব্যবহারের পিছনে অন্য কিছু আছে যার জন্যে সে দায়ী নয়। বিয়াট্রিস তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, কেন তোমার ঐ ক্লডিও কি একটা শয়তান নয়? সে-ই না আমার বোনকে এইভাবে অপবাদ দিল, এবং অবজ্ঞা দেখাল—তাকে এমন করে অপদস্থ করল? হ্যাঁ, আমি যদি মেয়ে না হয়ে তোমার মত পুরুষ হতাম তবে দেখতে। বেনেডিক দেখল বড় উত্তেজিত হয়েছে বিয়াট্রিস। সে তাকে শান্ত করার জন্যে বলল, শোনো, একটু বোঝার চেষ্টা কর, বিয়াট্রিস। কিন্তু কোনো কথাই শুনতে প্রস্তুত নয় বিয়াট্রিস। ক্লডিওকে সে ক্ষমা করতে পারে না এবং বারবার তাই বেনেডিককে বলতে লাগলো—আমি আমার বোনের অপমানের প্রতিশোধ চাই-ই চাই। ইয়ার্কি পেয়েছে। বলে কি না, প্রেমালাপ করেছে—জানলায় দাঁড়িয়ে বেটা ছেলের সঙ্গে রাতের বেলায় কথা বলেছে—আমার এমন সোনার মত বোনটি—তাকে কি না এমন করে অপবাদ দিলো, তার মুখে চুনকালি মাখালো, তার সর্বনাশ করলো। হায়রে আমি যদি পুরুষ হতাম তবে ক্লডিওকে---- যদি কোনো সত্যিকারের বন্ধু থাকতো আমার, যে আমার জন্যে পুরুষের মত জেগে উঠতে পারে --- কিন্তু কি হবে এই হাহুতাশ করে—পুরুষের শৌর্য তো আজ শুধুই কেতাদুরস্ত ভব্যতা। হাততালি পেলেই তা সার্থক। যাকগে, কি আর লাভ এই আফশোষ করে, আমি তো চাইলেই পুরুষ হতে পারি না, আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি, মেয়েদের শুধু চোখের জল ছাড়া আর কিই বা আছে, আমি সেই কান্না নিয়েই জীবনপাত করব। বেনেডিক বললো—না, না অমন কথা বোল না, দাঁড়াও! এই যে আমার হাত দেখছ, এই হাতে তোমাকে স্পর্শ করে বলছি, আমার ভালবাসায় ফাঁকি নেই। বিয়াট্রিস বললো---তোমার ঐ হাত নিয়ে পারো তো অন্য কিছু করো নিছক শুধু ভালবাসার শপথ নিয়েই আমাকে আশ্বস্ত করতে চেওনা। উত্তরে বেনেডিক বলল—তুমি কি প্রকৃতই তোমার অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করো যে হিরোর উপর অবিচার হয়েছে?

নিশ্চয়ই—যদি আমার অন্তর বলে কিছু থাকে, আমার বোধ বুদ্ধি বলে কিছু থাকে—তবে আমি বলছি, এ অবিচার। ঘোর অন্যায়।

ঠিক আছে—বললো বেনেডিক — আর কিছু জানতে চাইনা—আমি দেখে নেব, ক্লডিওকে দেখে নেব। এই তোমার হাতে চুমু দিলাম, চলি তাহলে। এই হাতেই শেষ হবে ক্লডিও—যা বললাম, দেখো। যাও, তোমার বোনকে বলো শান্ত হতে।

ঠিক এই মুহূর্তেই — যখন বিয়াট্রিস জাগিয়ে তুলতে চাইছিল বেনেডিককে,

তার জ্বালাময়ী ভাষায় উত্তেজিত করছিল বেনেডিকের সুপ্ত বীরত্ব—হিরোর প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে যত প্রিয়ই হোক ক্লডিও তবু তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে তখনই ওদিকে লিওনেটোও তাঁর তরোয়াল নিয়ে আহ্বান করেছিলেন রাজকুমারকে এবং ক্লডিওকে সমুচিত জবাব দিতে– কেন তারা তাঁর মেয়ের উপর এই কলঙ্ক চাপিয়ে দিল—আজ কি না সেই দুঃখে তাঁর মেয়ে প্রাণ হারালো। তবে ক্লডিও বা রাজকুমার কেউই লিওনেটোর সঙ্গে লড়াই করতে এগিয়ে এলনা। তারা তাঁকে তাদের গুরুজন স্থানীয় বলেই মনে করত, তাছাড়া তাঁর পিতৃত্বের দুঃখকেও তারা অনুভব করেছিল। কাজেই তারা বলল—না, মাপ করুন আপনার সঙ্গে আমরা মারামারি করতে পারিনা। এরই মধ্যে এসে পড়ল বেনেডিক, আর এসেই অস্ত্রযুদ্ধে আহ্বান করল তার দুই বন্ধু, রাজকুমার এবং ক্লডিওকে। সে বলল, জবাব দাও–হিরোকে এমনভাবে অপমান করেছ কেন। ক্লডিও ও রাজকুমার তো অবাক—তারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, বুঝেছি, এ সবই সেই বিয়াট্রিসের কাজ, সে-ই বেনেডিককে উত্তেজিত করেছে আমাদের বিরুদ্ধে। যাই হোক, ক্লডিও এগিয়ে এলো বেনেডিকের আহ্বানের উত্তরে এবং দুই বন্ধুর মধ্যে তরবারি যুদ্ধে সেদিন কী বিপদের উৎপত্তি হত কেউ বলতে পারে না যদি না ঠিক এই মুহূর্তে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এমন একটি ঘটনা ঘটতো যার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে হিরো সম্পর্কে যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তা ভিত্তিহীন।

কথায় বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। রাজকুমার আর ক্লডিও যখন বেনেডিকের এই পরিবর্তন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাওয়া নিয়ে কথা বলছে ঠিক তখনই একজন ম্যাজিস্ট্রেট বোরাশিওকে তাদের সামনে হাজির করলেন কোমরে দড়ি বেঁধে। বোরাশিও তার এক বন্ধুর কাছে নিজের সেই অপকীর্তির গল্প করছিল, অর্থাৎ ডন জন তাকে টাকা পয়সা দিয়ে কীভাবে হিরোর জানলার ধারে পাঠিয়েছিল মেয়েটির চরিত্রে কালি মাখাতে।

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাই বলল বোরাশিও। ক্লডিওর সাক্ষাতেই রাজকুমারের কাছে সে তার অপরাধের স্বীকারোক্তি দিল এবং বলল ডন জন তাকে লোভ দেখিয়ে বলেছিল মার্গারেটকে হিরোর জামাকাপড় পড়ে এই অভিনয় করাতে পারলে ভালমতন অর্থপ্রাপ্তি হবে। সেই অনুসারে সেদিন রাত্রে জানলার ধারে হিরোর পোশাকে দাঁড়িয়ে কথা যে বলছিল সে হিরো নয়, মার্গারেট। হিরো এ বিষয়ে কিছুই জানেনা, সে সম্পূর্ণই নির্দোষ। এ কথা শোনার পর ক্লডিও এবং তার বন্ধু রাজকুমারের মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ রইলনা, তারা বুঝলো হিরো কেমন করে এই চক্রান্তের শিকার হয়েছে। সংশয় আরো দূরীভূত হল এই কারণে যে ডন জন অবস্থা বেগতিক দেখে মেসিনা ছেড়ে ডুব দিয়েছে—সে বুঝেছে তার শয়তানি ধরা পড়ে গেছে এবং তার ভাই-এর হাতে আর সে রক্ষা পাবে না।

এবার শুরু হ'ল অনুশোচনা। ক্লডিও উপলব্ধি করল কী অন্যায়ভাবে তারা হিরোকে এমন অপবাদ দিয়েছে, আর সেই রূঢ় কথা ও অন্যায় অত্যাচারের ফলে তার জীবন নাশ হয়েছে। তার চোখের সামনে এবার প্রিয়তমা হিরোর মূর্তি ভেসে উঠলো, যে পবিত্র মূর্তি দেখে একদিন সে উতলা হয়েছিল। রাজকুমার জানতে চাইল তার মনের কথা, জানতে চাইল বোরাশিওর কথাগুলি তার হৃদয়কে এক তীক্ষ্ণ লৌহশলাকার মত বিদ্ধ করেছে কি না। উত্তরে ক্লডিও বলল, ঐ কথাগুলি শোনার সময় তার বোধ হচ্ছিল যেন এক তিক্ত বিষ ধীরে ধীরে তার কণ্ঠনালীর পথে নেমে সমস্ত শরীরকে যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন করে দিল।

অনুতপ্ত ক্লডিও ক্ষমা ভিক্ষা করল লিওনেটোর কাছে তার কন্যার প্রতি এই অমানুষিক অন্যায়ের অপরাধের জন্যে। সে শপথ করে বলল লিওনেটো যে শাস্তিই দিতে চান সে মাথা পেতে নেবে সেই শাস্তি—যাকে সে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং যে ছিল তার এত প্রিয় তার প্রতি অবিচারের জন্যে সব শাস্তিই সে নিতে প্রস্তুত।

লিওনেটো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেন। বললেন আগামী কালই সকালে ক্লডিওকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে—পাত্রী অনুরূপ হিরোরই মতন দেখতে তার এক কাকার মেয়ে। ঐ মেয়েটিই হিরোর মৃত্যুর ফলে বর্তমানে লিওনেটোর যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী। ক্লডিও বললো, যেহেতু আমি অঙ্গীকারবদ্ধ তাই আপনি যে মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব করছেন সে সম্পূর্ণ অপরিচিতা হওয়া সত্ত্বেও আমি তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত—শুধু তাই নয়, যদি সেই মেয়ে ইথিওপিয়া থেকে সদ্য আমদানি কালো আদমিও হয় তা-ও আমি মেনে নেব। মনে মনে সে কিন্তু হিরোর প্রতি অবিচার ও তার মৃত্যুবেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল—সেদিন সারারাত তার কাটলো লিওনেটো যে সমাধিটি হিরোর জন্যে প্রস্তুত করেছিলেন তার বেদীতে নিদারুণ দুঃখে আর অবিরাম অশ্রুবর্ষণে।

সকাল হোল। রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে ক্লডিও পৌঁছে গেল গির্জায়। সেখানে ইত্যবসরেই উপস্থিত ছিলেন সেই ধর্মপ্রাণ যাজক-পুরোহিত, ছিলেন লিওনেটো এবং তাঁর পাশে ভ্রাতুষ্পুত্রী, অর্থাৎ বিবাহের পাত্রী। ক্লডিওর দ্বিতীয়বার বিবাহের সব আয়োজন প্রস্তুত। লিওনেটো কন্যাসম্প্রদান করলেন ক্লডিওর অঙ্গীকার অনুসারে, তবে পাত্রীর মুখটি ঢাকা ছিল বোরখায়। ফলে ক্লডিওর পক্ষে সম্ভব হলনা তাকে চেনা। বোরখা পরিহিতাকে ক্লডিও বলল—আমি তোমার পাণিগ্রহণের জন্যে এই আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম পুরোহিতের সামনে ঈশ্বর সাক্ষী করে—যদি তুমি সম্মতি দাও তবে আমিই তোমার স্বামী। বোরখার অন্তরালবর্তিনী সেই অপরিচিতা মুহূর্তে বোরখা সরিয়ে বলল, হ্যাঁ যখন জীবিত ছিলাম, এই আমিই ছিলাম তোমার অপর স্ত্রী। দেখা গেল অপরিচিতা হয়ে বোরখার আড়ালে যে ছিল সে ভ্রাতুষ্পুত্রী মোটেই

নয়, লিওনেটোর নিজের কন্যা হিরোই স্বয়ং। অপ্রত্যাশিত এই ব্যাপারটি অবশ্যই ক্লডিওর পক্ষে এক চমকপ্রদ আনন্দানুভূতি, মৃতা হিরো যে আবার এমনি করে তার জীবনে ফিরে আসবে এ-কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি, কাজেই নিজেরই চোখদুটোকে বিশ্বাস করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠলো—আর রাজকুমারও তেমনি অবাক, সে বললো, আরে যেন সেই হিরোই– মারা গিয়েছে যে হিরো সে-ই তো?

লিওনেটো বললেন—হ্যাঁ ঠিকই, সে মৃতাই ছিলো—যতক্ষণ জীবিত ছিল তার কলঙ্ক।

বিবাহের অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হতে চলল। পুরোহিত বললেন কাজ মিটে গেলে সব কথা খুলে বলব, কেমন করে এই অসম্ভব সম্ভব হল। অতঃপর এগিয়ে গেলেন তিনি দুটি হাত মিলিয়ে দেওয়ার মন্ত্র উচ্চারণ করতে কিন্তু বেনেডিক তাঁর পথে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করল হিরোর সঙ্গে ক্লডিওর বিবাহের ঐ একই লগ্নে সে চায় বিয়াট্রিসের সঙ্গে তার বিয়ে হোক। বিয়াট্রিস বলল—সে কি, এমন কথা তো আমার জানা ছিলনা। উত্তরে বেনেডিক বলল—মহাশয়া, আপনার জানা ছিল কি না সে সংবাদে আমার কাজ নেই, তবে আমার ভালমতোই জানা ছিল যে আপনি আপনার হৃদয় নিয়ে বড় বিব্রত। আমার জন্যেই মন আনচান করে আপনার একথা আমার নয়, আপনার ভগ্নি হিরোর—জিজ্ঞাসা করুন তাকে? ব্যাখ্যাটি বড় জব্বর—সবাই তো থ—এবং সকলেই বুঝলো খেলা করতে করতে সুতো জড়িয়ে গিয়েছে এবং শক্তভাবেই পড়েছে প্রেমের গিঁট। এ থেকে ছাড়া পাওয়ার কোন রাস্তাই নেই। প্রকৃত সত্য ব্যাপারটা এ অবস্থায় একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে—কে শোনে কার কথা। বেনেডিক বিয়ে করবে তো করবেই, দুনিয়ায় কে কী বলল সে তার ধার ধারেনা, হালকা হাসির সুরেই সে বলতে লাগলো—তোমার ওপর বড় দয়া হয়েছিল যখন শুনলাম আমাকে না পেলে তুমি আত্মঘাতী হবে, তাই না বিয়ে করব বলেছি। বিয়াট্রিসও কম যায়না। সে বলল—রাখো রাখো, নেহাৎ আমার বোন হিরো আমাকে তোমার হয়ে এত অনুনয় বিনয় করেছিল এবং বলেছিল ভালবেসে বেসে তোমার দেহে ক্ষয়রোগ ধরে গেছে, তাইনা আমি তোমার উপর দয়া দেখিয়েছি। বিধির নির্বন্ধ—এই দুই ক্ষ্যাপাটে বুদ্ধিসর্বস্ব জুটি অগত্যা ভালই জোড় হয়ে গেল সাতপাকের বাঁধনে। ক্লডিও ও হিরোর বিয়ের পরই তাদের হাতে হাত মিলিয়ে দেওয়া হল। তবে এ কাহিনীর যবনিকায় আরো একটি উপাখ্যান যুক্ত হল—সেটি হল এত বাধাবিঘ্ন ও জটিলতার উৎপত্তি যার শয়তানি চক্রান্তে সেই পলাতক ডন জন ধরা পড়ে এবং তাকে মেসিনাতে নিয়ে আসা হয়—এবং পেঁচামুখো নিত্য অসুখী সেই মানুষটার সামনেই তার যাবতীয় চক্রান্তের মূলে নুড়ি জ্বেলে জ্বলে উঠলো আনন্দের মশাল—মেসিনার প্রাসাদ আলোয় আলো, উৎসবে মুখর।

অ্যাজ য়্যু লাইক ইট

অনেক কাল আগের কথা। ফ্রান্স ছিল তখনকার দিনে অনেকগুলি প্রদেশের সমষ্টি। ঐ প্রদেশগুলিকে বলা হত ডিউকডাম, অর্থাৎ ডিউকের রাজ্য। আমাদের এই গল্পের কাহিনী তারই এক প্রদেশের কথা। সেই প্রদেশে তখন গায়ের জোরে রাজত্ব কায়েম করেছিলেন একজন ডিউক, যে তার বড় ভাইয়ের আইনসঙ্গত অধিকার হরণ করে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন বনবাসে।

নিজের রাজত্ব থেকে নির্বাসিত হয়ে ডিউক আশ্রয় নিলেন এক গভীর জঙ্গলে। ঐ অরণ্যের নাম ছিল আর্ডেন। ডিউকের সঙ্গী ছিলেন রাজসভার কতিপয় বিশ্বস্ত সভাসদ্। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর সহচর হলেন এবং বনবাসের দুঃখ বরণ করলেন তাঁর প্রতি ভালবাসায়। এদিকে ঐ সভাসদ্‌বৃন্দের যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি তাও কুক্ষিগত করে নিলেন পরস্বোপহরণকারী নতুন ডিউক। নির্বাসনের জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট ক্লেশ, কিন্তু দিনের পর দিন বনবাসের ঐ সহজ সরল অনায়াস জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে এই বনবাসীদের কাছে সেই জীবনই মনে হল সুন্দর, রাজসভার ক্লেশকর ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের চেয়ে যেন এ অনেক সুন্দর, অনেক মনোরম। এ জীবন যেন পুরাকালের সেই গাথাকবিতার সবুজ বনের রবিনহুডের কাহিনীর মত অনাড়ম্বর আর তেমনি রোমাঞ্চকর।

মাঝে মাঝেই নগরীর রাজসভা ছেড়ে মহৎ হৃদয় কোনো কোনো যুবা এসে যোগ দিতেন এই বনবাসে। আর দুলকি চালে গানে গল্পে সবার দিন কাটতো যেন কল্পলোকের সেই স্বর্ণযুগ। নিদারুণ গ্রীষ্মে মাঠঘাট যখন রোদে ফেটে চৌচির তখন তাঁরা ঐ সবুজ বনের বিশাল গাছের ছায়ায় আরামে শরীর বিছিয়ে দেখতেন হরিণের লুকোচুরি খেলা। আর ঐ ডোরাকাটা সহজ-সরল হাবা বেচারীরা হয়ে উঠেছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গীর মত প্রিয়, কেননা ঐ বনেরই জীব তারা। তাই বড় ব্যথা লাগতো যখন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে বাধ্য হয়ে শিকার করতে হতো ছোট হরিণগুলোকে। শীত এসে তার হাওয়ায় যখন সারা শরীরে কনকনে বরফের খোঁচা দিত আর ডিউকের মনে পড়তো তার বিড়ম্বিত ভাগ্যের কথা, তিনি ধীরচিত্তে সহজ করে নিতেন ঐ হিমেল স্পর্শ আর বলতেন: দেহে এই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে আমি পাই সত্যিকারের বন্ধুসুলভ পরামর্শ — এরা মিথ্যা তোষামোদ করেনা, এরা আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমার প্রকৃত অবস্থা, আর যদিও এদের ছোঁয়ায় হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি লাগে তবু মানুষের কৃতঘ্নতা ও নির্দয় আচরণের তুলনায় তা অনেক সহনীয়। ভাগ্যের পরিহাসে জীবনে যে দুঃখ-দুর্দশার দুর্দিন আসে তাকে নিয়ে মানুষ যত নিন্দাই করুক আমি কিন্তু তার মধ্যে এক মূল্যবান সত্যের সন্ধান পেয়েছি, ঠিক যেন বুকে ঘসটে চলা বিষাক্ত ও বিশ্রী ব্যাঙ-এর মাথার

মণির মতো মহামূল্য যার দ্রব্যগুণ। পরমসহিষ্ণু ডিউক তাঁর পারিপার্শ্বিক সবকিছুর মধ্যেই এইভাবে খুঁজে পেতেন নীতিশিক্ষার ইঙ্গিত এবং দৃষ্টিভঙ্গির এই নৈতিক রূপান্তরের ফলেই সমাজ ও সংসার থেকে বহুদূরে এই অরণ্যবাসের জীবনে তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল নিরুচ্চার গাছের ভাষা বহমান ক্ষুদ্র নদীর বুকে মূল্যবান কত পুঁথির আলেখ্য, শিলার গায়ে অলিখিত কত ধর্মোপদেশ এবং প্রতিটি বস্তুর গভীরে মঙ্গলের সংকেত।

নির্বাসিত ডিউকের একটিই মাত্র কণ্যা, নাম তার রোজালিণ্ড। ভাই ফ্রেডারিক যখন তাঁর রাজ্য আত্মসাৎ করে ডিউককে বনবাসে পাঠায় তখন তাঁর কণ্যাটিকে সে রাজসভাতেই রেখে দেয়, তার কণ্যা সিলিয়ার সখীরূপে। দুটি মেয়ের মধ্যে সখ্যতা ছিল অটুট, পিতাদের ব্যবধান সে সখ্যতায় বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেনি। সিলিয়া সর্বদাই প্রাণপন চেষ্টা করত তার নিজের পিতার অপরাধের ফলে রোজালিলেজর অন্তরের ব্যথা ভুলিয়ে দিতে, যে ব্যথার মূলে ছিল ঐ সরল মেয়েটির নির্বাসিত পিতার প্রতি ভালবাসা। যখনই রোজালিণ্ড বিষন্ন হয়ে পড়ত তার বাবার নির্বাসনের কথা ভেবে অথবা তার দুর্বৃত্ত কাকার উপর নিজের অসহায় নির্ভরতার জন্যে, তখনই সিলিয়া কেবল ভাবতো স্নেহে ও যত্নে কী ভাবে সে রোজালিণ্ডকে তার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে।

এমনি একটি দিনে রোজালিণ্ড যখন মনমরা হয়ে নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছিল এবং সিলিয়া তাকে নানাকথায় সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে, ঠিক তেমনি সময়ে ডিউক ফ্রেডারিকের পাঠানো এক দূত এসে তাদের বলল রাজপ্রাসাদের সামনের মাঠে এক মল্লযুদ্ধের অনুষ্ঠান হতে চলেছে, যদি তাঁরা ঐ খেলা দেখতে আগ্রহী হয় তবে যেন এখনই সেখানে উপস্থিত হয়। সিলিয়া মনে মনে ভাবল হয়তো এই মল্লযুদ্ধের খেলা দেখলে রোজালিণ্ড কিছু সময়ের জন্যে অন্যমনস্ক হবে এবং তার মনটা হালকা হবে, তাই সে রোজালিণ্ডকে টেনে নিয়ে চলল মল্লভূমির দিকে।

এ যুগের মত ঐ কুস্তির খেলা তখনকার দিনে শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলে সাধারণ কুস্তিগীরদেরই চর্চার বিষয় ছিলনা, রাজা-রাজড়াদের কাছেও তা ছিল অতি প্রিয় এক ক্রীড়া হিসাবে প্রচলিত, এবং এই মল্লযুদ্ধের দর্শকের ভূমিকায় আসন গ্রহণ করতেন সম্ভ্রান্ত মহিলারা ও রাজকুমারীরা। সিলিয়া ও রোজালিণ্ডও সেই কারণেই দেখতে গেল মল্লযুদ্ধ। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই অসম প্রতিযোগী যোদ্ধাকে দেখে রাজকুমারীদের ভারী মন খারাপ হয়ে গেল। তারা দেখল এদের মধ্যে একজন বিশালকায় ও শক্তিশালী, দীর্ঘকাল ধরে সে কুস্তিবিদ্যার চর্চা করে এখন একেবারে পেশাদার কুস্তিগীর, তার হাতে অনেক যোদ্ধাকেই এর আগে প্রাণও দিতে হয়েছে, এবং অপরজন একেবারেই অল্পবয়সী যুবা, আর ঐ বয়সের অল্পতার ফলে এই বিদ্যার ক্ষেত্রে সে একেবারেই অনভিজ্ঞ—কাজেই দর্শকদের সকলেরই মনে হল ঐ যুবকটির অপঘাত অবশ্যম্ভাবী, পেশাদার ঐ পালোয়ান নিমেষের মধ্যে তার টুঁটি চেপে ধরবে।

ডিউক উপস্থিত হয়েছিলেন অনেক আগেই। রোজালিণ্ড ও সিলিয়ার দিকে চোখ পড়তেই তিনি বলে উঠলেন— আরে, তোমরাও এসে গিয়েছ এই কুস্তি দেখতে? তা না এলেই ভাল করতে বাছারা। ব্যাপারটা একেবারেই মজার হবে বোধ হচ্ছেনা, দেখছো তো লড়িয়ে দুটি আদৌ এক মাপের নয়, ঐ যে ছোকরা লড়তে চাইছে বড় মায়া হচ্ছে ওর জন্য। দ্যাখো তোমরা বুঝিয়ে-সুজিয়ে ওকে নিরস্ত করতে পারো কি না, ওর তো হাড়গুলো সবই গুঁড়িয়ে যাবে।

ডিউকের কথাগুলো খুবই ভাল লাগল মেয়েদের। তারা স্বভাবতই নরম প্রকৃতির, তাদের মায়া দয়া বেশি। তাই সিলিয়া প্রথমে এগিয়ে গেল অপরিচিত যুবকটির কাছে তাকে খুব করে বোঝাতে চেষ্টা করল যেন সে ঐ পালোয়ানটার সঙ্গে লড়তে না যায়। যুবকটি সিলিয়ার কথায় রাজী হলনা দেখে এগিয়ে গেল রোজালিণ্ড। সে গিয়ে তার কাছে অনেক মিনতি করে বলল যেন সে লড়াই না করে, অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করল কত বড় বিপদের ঝুঁকি আছে এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায়— কিন্তু রোজালিণ্ডের এই মিষ্টি অনুনয়ের ফলে যুবকটির মনে ভয়ের পরিবর্তে যেন বেশি করে জেগে উঠল নিজেকে বীর বলে সবার সামনে তুলে ধরার রোমান্স, বিশেষ করে ঐ সুন্দরী রমণীর কাছে নিজের শৌর্যের প্রমাণ ও বীরত্বের দ্বারা তাকে মুগ্ধ করা। সিলিয়া ও রোজালিন্ডের অনুনয় যদিও যুবকটি প্রত্যাখ্যান করল কিন্তু তার প্রত্যাখ্যানের ভাষার মধ্যে যে বিনয় ও সৌজন্যবোধ প্রকাশ পেয়েছিল তার ফলে মেয়ে দুটি আরও বেশি উদ্বিগ্ন হল। যুবকটি তার এই সবিনয় প্রত্যাখ্যানের শেষে বলল : আমি বড়ই দুঃখিত যে আপনাদের মত এমন সুরূপা ও সুন্দর ব্যবহারের মহিলাদের কথা রাখতে পারছি না। তবু বলি, আমার এই ভাগ্য পরীক্ষায় আপনাদের দৃষ্টির প্রসন্নতা ও শুভকামনাই হোক আমার অনুপ্রেরণা— যদি এ পরীক্ষায় পরাজয় ঘটে তবে জানবো আমি অযোগ্য,তাই সে লজ্জা আমার প্রাপ্য, যদি আমার মৃত্যু ঘটে তবে জানবো আমি তো মরতেই চেয়েছি। আমার মত হতভাগ্যের মৃত্যুতে কারো কিছু এসে যায় না, এমন কেউই নেই যে আমার জন্যে চোখের জল ফেলবে। আমার থাকা-না-থাকায় এ বিশাল পৃথিবীর কিছুমাত্র ক্ষতি নেই, কেননা আমি নিঃস্ব। আমার মত এক অভাজনের মৃত্যুই শ্রেয়, কেননা মৃতের সেই শূন্যস্থানটুকু তাহলে পূর্ণ হবে যোগ্যতর কোন ব্যক্তির দ্বারা।

অতএব সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল মল্লযুদ্ধ। সিলিয়া খালি মনে মনে কামনা করছে– হে ভগবান এই নবাগত যুবক যেন আঘাত না পায়, কিন্তু রোজালিণ্ডের মনে যুবকটির জন্যে আরও অনেক বেশি উৎকণ্ঠা। যে মুহূর্তে সে ঐ যুবকটির কাছে শুনেছে তার আত্মীয় বান্ধবহীন অসহায়ত্বের কথা, শুনেছে তার কাছে মৃত্যুই শ্রেয় সেই মুহূর্ত থেকে রোজালিণ্ড ঐ যুবকের ভাগ্যের সঙ্গে খুঁজে পেয়েছে নিজের অদৃষ্টের মিল, আর সেই জন্যেই আরো বেশি করে তার মায়া পড়েছে ওর প্রতি। ফলে, এই যুদ্ধে যখনই যুবকটির কোনো বিপদের সম্ভাবনা

দেখা দিচ্ছে তখনই ভয়ে কেঁপে উঠছে রোজালিণ্ডের বুক— সে জানে না তার অলক্ষ্যেই কেমন করে সে ভালবেসে ফেলেছে ঐ তরুণ যোদ্ধাকে।

রোজালিণ্ড ও সিলিয়ার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা যুবকটির অনুপ্রেরণা হয়ে তার মধ্যে সঞ্চার করল অদম্য এক সাহস ও শক্তি। সে এক বিস্ময়! ঐ বিশাল পালোয়ানকে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে সম্পূর্ণ পরাস্তই শুধু করেনি, তাকে এমনভাবে ভূলুণ্ঠিত করেছে যে তার বাকশক্তি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে, তার দেহ সম্পূর্ণ অবশ।

যুবকটির এই বীরত্ব দেখে ডিউক ফ্রেডারিক তো মুগ্ধ— কী অদ্ভুত তার সাহস ও কৌশল। ডিউকের ইচ্ছা হল ছেলেটিকে কাছে ডেকে তার পিতৃ পরিচয় জানার, যাতে কি না তিনি নিজের আশ্রয়ে তাকে স্থান দিতে পারেন।

যুবকটি নিজের পরিচয়ে বলল তার নাম অরল্যাণ্ডো, এবং সে স্যার রাউল্যাণ্ড ডি বয়েজের কনিষ্ঠপুত্র।

অরল্যাণ্ডোর পিতা স্যার রাউল্যাণ্ড মারা গিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। জীবিতকালে তিনি ছিলেন বর্তমানে নির্বাসনপ্রাপ্ত ডিউকের একজন অনুগত প্রজা এবং অতি প্রিয় বন্ধু। কাজেই ডিউক যখন অরল্যাণ্ডোর এই পরিচয়ের কথা অবহিত হলেন সঙ্গে সঙ্গে তার মনের পরিবর্তন ঘটে গেল। অরল্যাণ্ডোকে আর তার বিন্দুমাত্র ভাল লাগলো না। অত্যন্ত বিরক্তি নিয়ে তিনি অচিরে সেখান থেকে উঠে গেলেন। তার দাদারই একজন বন্ধু স্যার রাউল্যাণ্ড — বিরক্তিতে তার মন ভরে উঠল। আবার ছেলেটি এমন বীরের মত সাহসী— আহা, যদি সে রাউল্যাণ্ডের পুত্র না-হয়ে আর কোন ঘরে জন্মাত!

এদিকে রোজালিণ্ড যখন শুনল যে তার যাকে এত ভালো লেগেছে অপরিচিত সেই যুবকটি তারই বহুদিনের পিতৃবন্ধু স্যার রাউল্যাণ্ডের পুত্র তখন আনন্দে তার মন ভরে গেল। সে ভাবতে লাগল আমার বাবা স্যার রাউল্যাণ্ডকে কতই না ভালবাসতেন। যদি আগে জানতে পেতাম যে ঐ যুবকটি তারই পুত্র তবে মল্লযুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে তাকে যখন অনুনয় বিনয় করি সেই কাকুতিমিনতি করতাম চোখের জল মিশিয়ে।

রোজালিণ্ড ও সিলিয়া গিয়ে দাঁড়াল অরল্যাণ্ডোর কাছে। তারা লক্ষ্য করল বেচারা ভারী সঙ্কুচিত বোধ করছে এমন খামকা ডিউক তার উপর অখুশি হওয়াতে; তারা নানা কথাবার্তায় তাকে অন্যমনস্ক করে ব্যাপারটা ভুলিয়ে দিতে চাইল, আর যখন কথাবার্তার শেষে ফিরে যাওয়ার জন্যে তারা মুখ ঘুরিয়েছে ঠিক তখনই রোজালিণ্ড আবার এগিয়ে এল তার বাবার পুরানো বন্ধুর পুত্র অদম্য সাহসী এই যুবকটির কাছে আরো দু একটি মনের কথা বলার জন্যে। সে কিছু বলার আগেই তার গলা থেকে হারটি খুলে বলল— নাও, এটি তোমাকে দিলাম। আমার দেওয়া এই সামান্য উপহার, এ আমার ভালবাসার দান। আজ তো ভাগ্য আমার সবই কেড়ে নিয়েছে, না হলে তোমাকে দিতাম আরও কত মণিমুক্তো।

এ ঘটনার এখানেই ইতি। কিন্তু আসল ঘটনার এখানেই শুরু। রোজালিণ্ড ও সিলিয়া এই দুই বোনের যখন একান্তে দেখা হল এ ঘটনার কিছু পরে, সিলিয়া লক্ষ্য করল রোজালিণ্ড এ কথা ওকথায় কেবল অরল্যাণ্ডোর প্রসঙ্গই নিয়ে আসছে। তার বুঝতে বাকি রইলনা যে তার বোনটি ঐ সুপুরুষ নবীন যোদ্ধাকে এরই মধ্যে মন দিয়ে বসে আছে। সে রোজালিণ্ডকে বলেই ফেলল: কি রে এটা কি করলি, এমন তড়িঘড়ি প্রেমে পড়ে গেলি? রোজালিণ্ড একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলল— আমার বাবা যে ওর বাবাকে এত ভালবাসতো। উত্তরে সিলিয়া বলল— কী অপূর্ব যুক্তি, আমার বাবা ওর বাবাকে ভালবাসতো, অতএব আমিও ওকে তাঁর ছেলে বলে প্রাণ দিয়ে দেবো, বটে? তা আমার বাবা যেহেতু ওর বাবাকে দুচোখে দেখতে পারতো না, অতএব আমারও একান্ত কর্তব্য ওকে দূরছাই করা, কি বলিস? কিন্তু আমি তো বাপু অরল্যাণ্ডকে দূরছাই করছি না।

এদিকে ফ্রেডারিক তো স্যার রাউল্যাণ্ড ডি বয়েজের ছেলেকে দেখে রেগে আগুন। তার মনে পড়ে গেল স্যার রাউল্যাণ্ডের মত অভিজাত বংশীয় কত মানুষ নির্বাসিত ডিউকের সঙ্গী হয়ে তাঁর সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে। উপরন্তু, কিছুকাল যাবৎ রোজালিণ্ডের প্রতিও তার রীতিমত আক্রোশ দেখা গিয়েছিল। এর কারণ আর কিছুই নয়— সাধারণ মানুষ রোজালিণ্ডকে ভালবাসত তার গুণপনার জন্য। অধিকন্তু তার বাবার সদ্‌গুণের কথা ভেবে সকলেই তার এই দুর্ভাগ্যের প্রতি ছিল অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। ফলে ডিউকের যত রাগ গিয়ে পড়ল ঐ হতভাগ্য রোজালিণ্ডের ঘাড়ে। রোজালিণ্ড ও সিলিয়া যে ঘরের ভিতরে বসে একান্তে তাদের মনের কথা বলছিল সেই ঘরে কথা নেই বার্তা নেই ঢুকে পড়লেন ডিউক এবং রোষকষায়িত নেত্রে রোজালিণ্ডকে লক্ষ্য করে বললেন— হতভাগী, এখুনি তুই এই প্রাসাদ ছেড়ে চলে যা, তোর বাবা যে চুলোয় গেছে সেই জঙ্গলে চলে যা তার কাছে। সিলিয়া নিজের বাবার কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করল, কিন্তু ডিউকের সেই এক কথা। তিনি সিলিয়াকে বললেন — এতকাল শুধু তোর কথা ভেবেই রোজালিণ্ডকে রাজপ্রাসাদে থাকার অনুমতি দিয়েছি, কিন্তু আর তা হবে না। উত্তরে সিলিয়া বলল— ঠিক কথা কিন্তু তুমি যখন এই ব্যবস্থা করেছিলে তখন তো আমি খুবই ছোট, আমি সেদিন রোজালিণ্ডের থাকা অথবা না থাকার কোনো মাহাত্ম্যই বুঝতাম না। আর, আমি তোমাকে এই ব্যবস্থা করার জন্য সেদিন কোনো অনুরোধও করিনি, তুমি নিজের ইচ্ছাতেই এটা করেছিলে। কিন্তু তারপর যত দিন গেছে আমরা দুজন একসঙ্গে বড় হয়েছি, এক সাথে খেলা করেছি, একই সঙ্গে পাশাপাশি বসে খেয়েছি, এক শয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছি, আবার একই সঙ্গে জেগে উঠেছি — আজ আমি জানি কতখানিটা জুড়ে আছে সে আমার জীবনে, আমি তো কোন মতেই তাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। ফ্রেডারিক মেয়েকে বোঝাতে চাইলেন, তিনি বললেন, তুমি জানো না কত শয়তান আর ধূর্ত ঐ মেয়ে, ওর সবটাই লোক-দেখানো ভাণ।

ও ভালমানুষটি হয়ে চুপ করে থাকে যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। আর সেই চালাকিটাকেই মানুষ ওর সহিষ্ণুতা ভেবে ওর ওপর সহানুভূতি দেখায়। নেহাৎই নির্বোধের মত তুমি ওর জন্যে ওকালতি করছ — এটুকু নিজের ভাল কেন বোঝনা যে ও এখান থেকে বিদায় হলে লোকের চোখে তুমি আরও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আরও গুণবতী বলে তোমার আদর বাড়বে। আর একটি কথা বোল না ওর জন্য। ওর প্রতি আমার যে আদেশ সেটাই শেষ কথা, সে আদেশ প্রত্যাহারের ক্ষমতা কারো নেই।

বেচারা সিলিয়ার অনুনয়ে কোন ফল হলনা। অগত্যা সে দেখল তার সামনে একমাত্র পথ নিজের পিতার আশ্রয় ও অবলম্বন পিছনে ফেলে রোজালিণ্ডের সঙ্গে পথে নামা। সেই রাত্রেই সে প্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে এল রোজালিণ্ডের সঙ্গে তার প্রতি উদার ভালবাসার আকর্ষণে— তারা চলতে লাগল আর্ডেনের সেই অরণ্যের খোঁজে যেখানে তারা দেখা পাবে রোজালিণ্ডের পিতা নির্বাসিত ডিউকের।

কিন্তু পথে তো বিপদ আছে। একে অজানা অচেনা পথ ঘাট, তায় অল্পবয়সী দুটি মেয়ে তারা। সিলিয়া বুদ্ধি খাটিয়ে বলল — দ্যাখ, এইসব দামী দামী পোশাকে আমাদের মত দুটি মেয়ের অজানা পথে যাওয়া ঠিক হবে না, বরং এই পোশাকের পরিবর্তে সাধারণ গ্রামের মেয়েদের পোশাক পরে আত্মগোপন করাই আমাদের পক্ষে নিরাপদ। রোজালিণ্ড বলল — কথাটা মন্দ বলিস নি, তবে আরও নিরাপদ হবে আমাদের মধ্যে একজন যদি পুরুষের বেশ ধারণ করি। যেমন কথা তেমনই কাজ — দুজনে রফা করে নিল, যেহেতু দুজনের মধ্যে রোজালিণ্ডই একটু লম্বায় বড়, অতএব সেই হবে পুরুষ আর সিলিয়া তার বোন হিসাবে পরবে গ্রাম্য মেয়ের পোশাক — তারা যেন দুটি ভাইবোন। রোজালিণ্ড স্থির করল ছদ্মবেশে তার নাম হবে গ্যানিমিড। আর সিলিয়া বলল, আমার নাম তাহলে এলিয়ানা।

ছদ্মবেশী রোজালিণ্ড ও সিলিয়া আরও একটু বুদ্ধি খাটাল। তারা যথেষ্ট পরিমাণ ধনরত্নও গোপনে তাদের সঙ্গে নিয়ে নিল—রাস্তায় খরচ আছে। আর রাস্তাটাও তো কম নয়—কোথায় সেই বহুদূরে আর্ডেনের জঙ্গল — ডিউকের রাজ্যসীমানার বাইরে — অনেকদূরে।

এখন থেকে রোজালিণ্ড আর সেই লাজুক মেয়েটি নয় — সে হৃষ্টপুষ্ট রীতিমত সাহসী এক গ্রাম্য যুবক গ্যানিমিড। তার চলাফেরায় কথাবার্তায় ক্রমশই সে রপ্ত করে ফেলেছে পুরুষালী ধরণ-ধারণ। একান্ত অনুগত বন্ধুত্বের দায়ে সিলিয়া তার সঙ্গ নিয়েছিল এই দীর্ঘ ক্লান্তিকর ও বিপজ্জনক পথে, তাই প্রতিমুহূর্তেই গ্যানিমিড হৈ চৈ করে তার বোন এলিয়ানার পথের কষ্ট লাঘব করতে সবর্দাই সচেষ্ট— সে তো শক্তসমর্থ বেটাছেলে আর এলিয়ানা তার কোমলস্বভাবা বোন। এক সহজ সরল গ্রাম্য বালিকা।

পথ চলা একরকম ভালই কাটল হৈ চৈ করতে করতে। এবার তারা এসে

পড়ল আর্ডেনের বনের ভিতর। কিন্তু কই, এখানে না-আছে থাকার মত কোনো আশ্রয়, না আছে পথচলতি সরাইখানা। এদিকে খাবারও কিছু জোটেনি। গ্যানিমিডের পুরুষালী এবার মাথায় ওঠার উপক্রম — এতক্ষণ সে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে হাসি ঠাট্টায় ছোট বোন এলিয়ানাকে তাজা রাখছিল, কিন্তু এবার সে নিজেই কুপোকাৎ। গ্যানিমিড এলিয়ানাকে বলল, ওরে এবার তো পৌরুষ রাখা দায় হলো, আমার যে মেয়েদের মত কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। এলিয়ানাও বলল — দিদি আর তো পথ চলতে পারিনা। সঙ্গে সঙ্গে গ্যানিমিডের মনে হল তাকে তো ভেঙে পড়লে চলবেনা। সে পুরুষ, আর পুরুষ হিসাবে তার কর্তব্য দুর্বল ললনাকে বল ভরসা দান করা। সে এলিয়ানাকে সাহসের সুরে বলল— আরে ভয় কিসের? এলিয়ানা আমার ছোট বোনটি, আর ভেবনা, আমরা তো এসেই পড়েছি। আর হাঁটতে হবেনা, ঐ তো আর্ডেন বন। কিন্তু মেকী পৌরুষ আর কৃত্রিম বল-ভরসার কথায় কতক্ষণ আর চলে? আর্ডেনে তারা এসেছে বটে, কিন্তু কোথায় গেলে ডিউকের দেখা পাওয়া যাবে তার হদিশ দেবে কে? তাদের এই সঙ্গীন অবস্থা হয়তো মৃত্যুতেই শেষ হতো, কেননা না আছে খাবার, না আছে জল। আর শক্তিও ফুরিয়ে গেছে এক পা সামনে যাওয়ার, কিন্তু ভাগ্য তাদের এ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিল এক অপ্রত্যাশিত উপায়ে। যখন তারা ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে যাবতীয় আশা-ভরসা ত্যাগ করে ঘাসের উপর মৃতপ্রায় বসে ধুঁকছে এমন সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক রাখাল ঐ গাঁয়েরই একজন। অতি কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে গ্যানিমিড তাকে ডেকে বলল, শুনছ ভাই রাখাল, যদি অর্থের বিনিময়ে অথবা সামান্য একটু ভালবাসায় এই জনবিরল স্থানে তুমি আমাদের একটু আশ্রয় দাও। কেননা, আমার এই ছোট বোনটি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়ে পড়েছে।

আগন্তুক উত্তরে বলল — দেখুন আমি সামান্য ভৃত্য, কাজ করি এক মেষপালকের কুটিরে। তা আমার মেষপালক প্রভুর সেই সামান্য কুটিরটিও বিক্রী হতে চলেছে, যদি ঐ সামান্য আশ্রয়ে আপনারা মাথা গুঁজে থাকতে পারেন তবে চলুন আমার সঙ্গে। সেখানে গেলে আপনারা অবশ্যই গরীবের আদর-যত্নটুকু পাবেন, আপনারা আমাদের অতিথি। এ কথার সঙ্গে সঙ্গে রোজালিণ্ড ও সিলিয়া যেন হাতে স্বর্গ পেল, তারা যেন সম্পূর্ণ চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং আর কথা না বলে চলতে লাগল ঐ ভৃত্যটির সঙ্গে সঙ্গে। অনতিবিলম্বে তারা পৌঁছে গেল মেষপালকের কুটিরে এবং আর বাক্য ব্যয় না করে কিনে নিল সেই কুটিরখানি। মেষপালকের ভৃত্যটিকেও তারা নিয়োগ করল নিজেদের দেখাশোনার কাজে। ভাগ্য যখন এমন একটা মনোরম কুটির পাইয়ে দিল এবং আহারের সামগ্রী ও আর অভাব রইলনা, তখন ওরা স্থির করল আর ব্যস্ত না হয়ে দিন কয়েক সেখানেই অপেক্ষা করবে। তারপর ধীরে সুস্থে খুঁজে নেওয়া যাবে বনের কোন দিকে ডিউকের তাঁবু পড়েছে।

পথের ক্লান্তি দূর হতে সময় লাগল না। এবার ধীরে ধীরে রোজালিণ্ড ও সিলিয়া

বেশ মানিয়ে নিল মেষপালকের জীবনধারায়, তারা নিজেদের যেন রাখাল রাখালিনীর মতই বোধ করতে শুরু করল। কিন্তু পুরোনো ব্যথাটা তবুও মাঝে মাঝে জেগে ওঠে গ্যানিমিডের মনে, সে ভাবতে থাকে একদিন সে ছিল রোজালিণ্ড আর সে ভালবেসেছিল নির্ভীক যুবা অরল্যাণ্ডোকে যে অরল্যাণ্ডো কি না তার বাবার বন্ধুরই পুত্র। গ্যানিমিড বসে বসে বিষণ্ণ মনে ভাবতো সেই কতদূরে সে ফেলে এসেছে অরল্যাণ্ডোকে। এই দীর্ঘ ক্লান্তির পথের একেবারে শেষ সীমান্তে, যে পথ তারা পার হয়ে এসে পৌঁছেছে এই অরণ্যে। ভাগ্য কিন্তু তার জন্য জমা করে রেখেছিল এক আকস্মিক চমক, কেননা ঠিক ঐ সময়েই অরল্যাণ্ডোও এসে উপস্থিত হয়েছিল ঐ বনভূমিতে, আর্ডেনে। আর সেই আকস্মিকতাতেই মোড় নিল রোজালিণ্ডের দুর্ভাগ্যের বারমাস্যা।

অরল্যাণ্ডো ছিল তার পিতা স্যার রাউল্যাণ্ড ডি বয়েজের কনিষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুকালে সে ছিল নিতান্তই নাবালক। পিতা তাকে সমর্পন করে যান তার বড় ভাই অলিভারের হাতে। অলিভারের উপর নির্দেশ ছিল সে যেন ছোট ভাইকে প্রকৃত শিক্ষিত করে তোলার যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে কি না সম্ভ্রান্ত বংশের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে। অলিভার কিন্তু পিতার মৃত্যুকালীন সেই উপদেশ পালন করার ধার ধারেনি। সে নিজের ভাইকে বিদ্যালয়ে পাঠানো তো দূরের কথা, তাকে সম্পূর্ণ মূর্খ রাখার মতলবে যতদূর সম্ভব তার প্রতি অবহেলাই করেছে। অরল্যাণ্ডো কিন্তু প্রকৃতিগত ভাবে লাভ করেছিল তার বাবার যাবতীয় সদ্‌গুণ এবং তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব। বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ না-করলেও তার মধ্যে বিকশিত হয়েছিল যত্নে লালিত এক সদ্বংশজাত যুবকের যাবতীয় গুণ, আর অলিভার তাই মনে মনে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল অশিক্ষিত বানিয়ে রাখা অরল্যাণ্ডোর পুরুষোচিত রূপে এবং মর্যাদাসম্পন্ন ব্যবহারগুণে। ঈর্ষা শুধু ঈর্ষাতেই সীমাবদ্ধ রইল না। অলিভার মনে মনে মতলব ভাঁজতে লাগল কী উপায়ে অরল্যাণ্ডোকে একেবারেই খতম করে দেওয়া যায়। কাজ হাঁসিল করার জন্যে সে তার অনুচরদের লাগিয়ে দিল যেমন করে হোক অরল্যাণ্ডোকে রাজী করাতে হবে নামজাদা এক কুস্তিগীরের সঙ্গে লড়ার জন্যে—ঐ কুস্তিগীরের সুনামের কথা আমরা তো আগেই শুনেছি—তার হাতে বহু মানুষেরই প্রাণ গেছে। নিজের বড় ভাইয়ের কাছে অবহেলা আর উপেক্ষা পেয়ে পেয়ে অরল্যাণ্ডো জীবন সম্পর্কে একেবারেই নিরাসক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হত তার মত অসহায় মানুষের মৃত্যুই শ্রেয়।

অলিভারের ফিকির কাজে এলোনা। মল্লযুদ্ধে নামী পালোয়ান এঁটে উঠতে পারল না অরল্যাণ্ডোর সঙ্গে, অরল্যাণ্ডো বিজয়ী হল। ফলে অলিভারের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বেড়ে গেল বহুগুণ এবং সে সংকল্প করল জতুগৃহ দাহের মত অরল্যাণ্ডো যে ঘরে ঘুমোয় সেই ঘরই জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে—অলিভার যখন এই সংকল্পের শপথ উচ্চারণ করছিল তখন তার সেই কথাগুলি কানে গেল

এমন একজনের যে কি না ছিল অরল্যাণ্ডোর পিতার অতি অনুগত ভৃত্য এবং যে অত্যন্ত ভালবাসত অরল্যাণ্ডোকে। কারণ, তার সঙ্গে তার পিতার অনেক মিল ছিল। কাজেই সে অবিলম্বে ছুটে গেল অরল্যাণ্ডোকে সাবধান করতে। অরল্যাণ্ডো তখন সবেমাত্র ফিরেছে কুস্তিগীর পালোয়ানকে হারিয়ে দিয়ে ডিউকের প্রাসাদ থেকে। বৃদ্ধ ভৃত্যটি তাকে দেখামাত্রই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল তার আশু বিপদের কথা ভেবে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলে চলল—হায় আমার এমন ভাল প্রভু, এমন সুন্দর প্রভু, স্যার রাউল্যাণ্ডের কথা মনে পড়ে যায় তোমাকে দেখে—কেন তুমি এত ভাল হতে গেলে? কেন তুমি এত ভদ্র, এত বলশালী, এত সাহসী হতে গেলে? আর কেনই বা তোমার শখ হোল সেই নামী কুস্তিগীরটাকে কুস্তিতে হারানোর? জান কি তুমি বাড়িতে এসে পৌঁছনোর আগে আগেই তোমার নামডাক পৌঁছে গেছে এই বাড়িতে। অরল্যাণ্ডোতো অবাক, সে কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না এসব কথার প্রকৃত মানেটা কি হতে পারে। এবার বৃদ্ধটি সব কথাই খুলে বলল। সে বলল, তোমার দাদা তো তোমাকে দু চোখে দেখতে পারে না, কেননা তোমাকে সকলে এত ভালবাসে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত তার আবার ডিউকের বাড়িতে কুস্তিতে তোমার জয়ের ফলে চারিদিকে লোকে তোমাকে বাহবা দিচ্ছে, আর তার ফলে হিংসায় জ্বলছে তোমার দাদা। সে মতলব করেছে তোমার শোওয়ার ঘরে আগুন লাগাবে যখন তুমি ঘুমিয়ে থাকবে আজ রাত্রে। কাজেই তোমার আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা ঠিক হবেনা, তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও। ভালো মানুষ এই বৃদ্ধটির নাম ছিল অ্যাডাম। অ্যাডাম জানতো অরল্যাণ্ডো কপর্দকহীন। তার কষ্টার্জিত যে সামান্য সঞ্চয়টুকু ছিল সেই পাঁচ শত ক্রাউন সে অরল্যাণ্ডোকে দিয়ে বলল, এ পুঁজিটুকু আমি জমিয়েছিলাম তোমার বাবার বেঁচে থাকার কালে। আর এই সামান্য ধন আমি রেখেছিলাম সেই দিনের জন্যে যখন আমার শরীর অশক্ত হওয়ার ফলে বার্ধক্যে আমি আর খেটে খেতে পারব না। কিন্তু সর্বজীবকে যিনি আহার দেন আমাকে তিনিই দেখবেন। এই সামান্য সঞ্চয়টুকু তোমাকে দিলাম, তুমি নাও, আর আমাকে নিয়ে চল তোমার সঙ্গে। যদিও আমার চেহারা দেখে আমাকে বুড়ো মানুষ মনে হয়, তবু তোমার প্রয়োজনে সব কাজই আমি করে দিতে পারব। অরল্যাণ্ডো অবাক হয়ে গেল অ্যাডামের মহত্বে—সে শুধু বলল, হে নমস্য বৃদ্ধ, তোমার মধ্যে আজও অব্যাহত আছে পুরোনো দিনের প্রভু-ভৃত্যের সেই অমূল্য মূল্যবোধের বন্ধন। এ যুগের ঠুনকো কেতাদুরস্তি তোমার জন্যে নয়। হ্যাঁ, আমরা দুজনে পথে নামব এক সাথে, আর তোমার কম বয়সের সঞ্চয়টুকু নিঃশেষিত হওয়ার আগে নিশ্চয়ই আমি খুঁজে নেব উপার্জনের কোন উপায় যাতে আমরা দুটিতেই খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারি।

অরল্যাণ্ডো আর অ্যাডাম বেরিয়ে পড়ল পথে—একজন অতি প্রিয় প্রভুপুত্র, আর একজন তার বিশ্বস্ত ও অনুগত ভৃত্য। তারা চলছে তো চলছেই, জানেনা

কোনদিকে তারা চলেছে, কোথায় ওদের ঠিকানা। এমনি করে চলতে চলতে তারা এসে পড়ল আর্ডেনের সেই একই অরণ্যে এবং ঠিক তেমনিভাবেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে উঠল যেমনটি ঘটেছিল গ্যানিমিড ও এলিয়ানার ভাগ্যে। তারা এদিকে ওদিকে খুঁজতে লাগল যদি কোথাও কোন মনুষ্যবসতির চিহ্ন চোখে পড়ে। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে তারা আরও হয়রান হয়ে পড়ল ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়, ক্লান্তি আর অবসাদে তাদের মনে হল বুঝিবা মৃত্যুই তাদের সম্মুখে। অ্যাডাম কাতর স্বরে বলে উঠল, হায় প্রভু, আর তো পারিনা, খিদেতে আমার প্রাণ গেল, আমি আর চলতে পারছিনা। এই কথা বলে সে মাটির উপর শুয়ে পড়ল, যেন সেই স্থানই তার গোরস্থান, এবং শেষবারের মত তার প্রভুর কাছে ছুটি চেয়ে নিল। অরল্যাণ্ডো তার এই মৃতপ্রায় অবস্থা উপলব্ধি করে তাকে নিজের কাঁধে তুলে নিল এবং কাছাকাছি এক সুশীতল গাছের ছায়ার নীচে তাকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল। সে বলল, বৃদ্ধ অ্যাডাম ভাই, ভেঙ্গে পড়না, একটু বিশ্রাম করো, তোমার দেহের ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে, মৃত্যুর কথা মুছে ফেল মন থেকে।

কিন্তু কিছু খাবার না হলে তো নয়—অরল্যাণ্ডো বেরিয়ে পড়ল কোথায় খাবার মত কিছু পাওয়া যায় তার খোঁজে—খুঁজতে খুঁজতে সে এসে উপস্থিত হ'ল বনের ঠিক সেইখানটায় যেখানে থাকতেন ডিউক তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে। আর এমনই যোগাযোগ যে ঠিক সেই মুহূর্তেই ডিউক তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে একসাথে খেতে বসেছিলেন, তিনি আসন নিয়েছিলেন ঘসের উপর (রাজকীয় এই ডিউকের যোগ্য আসনই বটে), আর তাঁদের মাথার উপর চাঁদোয়া হয়ে ছায়াদান করছিল মস্ত মস্ত গাছের ডালপালার পাতার আচ্ছাদন।

খিদের জ্বালায় অরল্যাণ্ডোর দিগ্বিদিক জ্ঞান লোপ পেয়ে গিয়েছিল—সে তার গায়ের জোরে খাবার কেড়ে খাওয়ার জন্যে কোষ থেকে তরোয়াল টেনে বার করল এবং বলে উঠল—সাবধান, আর একদম মুখে কিছু তুলবেনা, তোমাদের ঐ খাদ্য আমার চাই। ডিউক শান্ত কণ্ঠে তাকে বললেন, তুমি এমন করছ কেন? অভাবের তাড়নায় তুমি কি এমন বেপরোয়া হয়ে গিয়েছ, নাকি তোমার স্বভাবটাই বর্বরের মতো? অরল্যাণ্ডো বলল, না মশাই, আমি মরণাপন্ন হয়েছি একটু খাদ্যের অভাবে, তাই এই অভদ্রতা। ডিউক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আরে এসো এসো, তুমি আমাদের অতিথি, আমাদের সঙ্গে একসাথে বসেই খাবে।

অরল্যাণ্ডোর কানে ডিউকের কথাগুলি এমন এক জঙ্গলের মানুষের মুখে অদ্ভুত ঠেকল, তাঁর সহৃদয় আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে সে ভাবল এই মানুষটি তো বর্বর হতে পারেনা। তাই সে নিজের উদ্ধত আচরণে সংকুচিত হয়ে লজ্জায় তরোয়ালখানা সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে ফেলল এবং বলল—আমাকে মাপ করুন, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি ধরে নিয়েছিলাম এমন জঙ্গলের মধ্যে শুধুই বুঝি অসভ্য বর্বরের বাস, সেই জন্যেই রূঢ় আদেশের ভঙ্গীতে আপনার সঙ্গে কথা বলেছি। জানিনা

আপনারা কেমন মানুষ কিংবা কোথাকার মানুষ—জানিনা কেন আপনারা এই জনহীন অরণ্যে এমনি ঘন গাছপালার আড়ালে নিরাপদ অন্ধকারে সময় অতিবাহিত করে চলেছেন এমন অকর্মণ্য অবহেলায়! যদি অতীতের কোনো সুদিনের স্মৃতি আজও আপনাদের স্মরণে আসে, যদি কখনো আপনাদের জীবনে এমন কোনো আবাসের কথা মনে পড়ে যেখানে গির্জার ঘন্টায় মানুষ মাথানত করে ঈশ্বরের আরাধনা করত, যদি আপনারা সমাজজীবনে স্বজনপরিবেষ্টিত হয়ে কখনো ভোজের উৎসবে যোগ দিয়ে থাকেন, যদি দুঃখপীড়িত মানুষের বেদনায় কোনদিন আপনারা চোখের জল মুছে থাকেন, আর যদি আপনারা কখনো অনুভব করে থাকেন অন্যের জন্যে করুণা, অথবা অপরের করুণালাভের অনুভূতিই বা কেমন, তবে আমার এই কথাগুলি যেন আপনাদের মধ্যে জাগায় সামাজিক মানুষের প্রত্যাশিত ভদ্র আচরণ! অরল্যাণ্ডোর এই আবেগোচ্ছল আবেদনের প্রত্যুত্তরে ডিউক শান্ত আবেগে বললেন—হ্যাঁ, সুদিন বলতে তুমি যা বলছ একদিন আমাদের তেমন দিন ছিল। আজ যদিও বা আমাদের আশ্রয় এই জনহীন অরণ্য, একদিন আমরাও ছিলাম নগর ও উপনগরীর নাগরিক, গির্জায় ঘন্টাধ্বনির সংকেতে আমরাও সেদিন প্রার্থনা করেছি, আত্মীয়-পরিজন মিলে একসাথে আহারের আনন্দ, তা-ও লাভ করেছি, আর পবিত্র করুণার উদ্রেকে নীরবে নয়নাশ্রু মুছেছি—অতএব এসো, আমাদেব এই আহার-সামগ্রীর তুমিও অংশগ্রহণ করো, যতটুকু তোমার তৃপ্তি সাধন করতে পারে ততটুকুই তুমি আহার কর। অরল্যাণ্ডো বলল, কিন্তু আমার তো একজন সাথী আছে সঙ্গে, সেই অসহায় বৃদ্ধ শুধুমাত্র আমার প্রতি প্রাণের টানেই ক্লান্তিতে পা টেনে টেনে সারাটা পথ এসেছে আমার সঙ্গে। এখন আর সে চলতে পারছে না, সম্পূর্ণ অশক্ত হয়ে পড়েছে, একদিকে যেমন বার্ধক্যের ভারে, অপরদিকে তেমনি অনাহারে। যতক্ষণ না তার মুখে অন্ন দিতে পারি ততক্ষণ আমি কোনো আহারই স্পর্শ করতে পারব না। ডিউক বললেন—ঠিকই তো। যাও এখুনি তার সন্ধান করে এখানে তাকে নিয়ে এসো, তোমরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত আমরা আহার শুরু করব না। হরিণী যেমন তার শাবকের সন্ধানে ত্রস্তপদে ছুটে বেড়ায় তাকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে। অরল্যাণ্ডোও তেমনি ছুটে গেল বৃদ্ধ অ্যাডামের কাছে এবং অনতিবিলম্বে তাকে কাঁধে নিয়ে উপস্থিত হল ডিউকের কাছে। ডিউক বললেন, নাও, এবার কাঁধ থেকে নামাও তোমার এই সম্মানিত বোঝা। তোমরা উভয়েই আমাদের স্বাগত অতিথি। এবার বৃদ্ধ অ্যাডামকে তাঁরা খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করে তুললেন, তার মনে শক্তি ও আনন্দের সঞ্চার হ'ল। সে ফিরে পেল তার পূর্বের দেহবল ও সামর্থ।

ডিউকের সঙ্গে অরল্যাণ্ডোর আলাপ আলোচনার অবকাশে ডিউক জানতে চাইলেন অরল্যাণ্ডোর প্রকৃত পরিচয় এবং যখন তিনি শুনলেন সে তাঁরই পুরনো বন্ধু স্যার রাউল্যাণ্ড ডি বয়েজের সন্তান তখন তিনি সম্পূর্ণভাবেই তার যাবতীয় দায়িত্বভার নিজের উপর নিলেন। অরল্যাণ্ডো এবং তার ভৃত্য অ্যাডাম বনের মধ্যে থেকে

গেল ডিউকের আশ্রয়ে। আপনজনের মত।

অরল্যাণ্ডোর এই বনে এসে পড়ার ঘটনাটা কিন্তু ঘটেছিল গ্যানিমিড ও এলিয়ানার সেখানে হাজির হওয়ার অতি অল্পকালের মধ্যেই। আমরা তো আগেই জেনেছি সেই মেষপালকের কুটিরখানা কিনে নিয়ে সেখানেই আস্তানা করেছিল গ্যানিমিড ও এলিয়ানা। ওরা দুই বোন ভারী অবাক হল একদিন যখন ওদের চোখে পড়ল কে একজন গাছের গায়ে কেটে কেটে খোদাই করেছে রোজালিণ্ডের নাম, আর ঐ গাছের ডালে ঝুলছে রোজালিণ্ডকেই উৎসর্গ করা সনেট বা গীতিকবিতা। ভাবতে গিয়ে তারা যখন কোন কুলকিনারাই করে উঠতে পারছেনা তখন তাদের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হল অরল্যাণ্ডোর সঙ্গে। ওদের তাকে চিনতে দেরী হলনা, কেননা, রোজালিণ্ডের উপহার দেওয়া সেই হারটি তখনও তার গলায় দুলছিল।

অরল্যাণ্ডো বেচারার কিন্তু মাথাতেও আসেনি যে গ্যানিমিডই তার সেই রাজকুমারী রোজালিণ্ড—যে রোজালিণ্ড তার অভিজাতসুলভ বিনয় ভালবাসায় তার হৃদয় জয় করেছিল, ডিউকের আয়োজিত সেদিনের মল্লযুদ্ধের শেষে। তাঁর মনকে রোজালিণ্ড এমন গভীরভাবে দোলা দিয়েছিল যে সে সারাদিন ঐ বনের গাছে গাছে রোজালিণ্ডের নাম লিখে বেড়াতো তরোয়ালে খোদাই করে, আর সনেট লিখে ঝুলিয়ে রাখতো গাছের শাখায়। রোজালিণ্ড বলে গ্যানিমিডকে চিনতে না-পারলেও তার বড় ভাল লাগল সুন্দর চেহারার ঐ রাখাল বালকের মিষ্টি ব্যবহার, আর কেমন যেন মনে হল ওর ভাবভঙ্গীতে কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে তার প্রিয় রোজালিণ্ডের সঙ্গে। অরল্যাণ্ডো আলাপ জমিয়ে তুললো গ্যানিমিডের সঙ্গে, কিন্তু রাখাল ছেলেটির আচার ব্যবহারে মনে হচ্ছিল যেন সেই মর্যাদাসম্পন্ন আচরণের অভাব যা সে লক্ষ্য করেছিল রোজালিণ্ডের ভিতর। তার পরিবর্তে কেমন একটা ঔদ্ধত্য ফুটে উঠেছিল ওর কথাবার্তায় যা কিনা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে বালকের মধ্যে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। এক ধরনের দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুরে সে অরল্যাণ্ডোকে বলছিলো একটা প্রেমিক যুবকের কথা, যে কিনা এই বনে দিনরাত ঘুরে ঘুরে রোজালিণ্ডের নাম খোদাই করে গাছপালাগুলোর দফারফা করে দিচ্ছে। প্রশস্তিমূলক ওড্ কবিতা লিখে ঝুলিয়ে রাখছে হথর্নের কাঁটা বেড়ার ডালে, শোকের কবিতা এলিজি রচনা করে আটকে দিচ্ছে কাঁটা গাছে—আর ঐ সবের মধ্যেই শুধু রোজালিণ্ড রোজালিণ্ড ঘ্যানঘ্যানানি। যদি একবার ঐ প্রেমিক ক্ষ্যাপাটির সাক্ষাৎ পেতাম তবে একটা বিধান দিতাম যাতে কিনা অচিরে তার প্রেমের ব্যাধিটি নিরাময় হয়।

অরল্যাণ্ডো অকপটে স্বীকার করে বসল যে সে-ই সেই অবুঝ প্রেমিক যার কথা গ্যানিমিড বলছে এবং জানতে চাইল কী সেই সৎ পরামর্শ যাতে প্রেমের রোগে আরাম হবে। রোগ নিরাময়ের যে প্রস্তাব গ্যানিমিড করেছিল এবং যে পরামর্শ সে এবার অরল্যাণ্ডোকে দিল তা হল অরল্যাণ্ডোকে প্রতিদিন একবার করে হাজিরা দিতে হবে, সে আর তার বোন যে কুটিরে থাকে সেখানে। সেখানে হাজির হয়ে

তার করনীয় কি হবে সে বিষয়ে গ্যানিমিড বলল—দ্যাখো, সেখানে আমি যেন রোজালিণ্ড এমনি ভাব দেখাব, আর তুমি আমাকে সম্পূর্ণ রোজালিণ্ড জ্ঞানে প্রেম নিবেদন করবে, ঠিক যেমনটি আসল রোজালিণ্ডকে তুমি করতে চাও। প্রতিদানে, আমি আবদেরে মেয়েদের অনুকরণে তোমার উপর খামখেয়ালী জোর খাটাব, এর ফলে আমার আবদারের পাল্লায় পড়ে আপনিই তোমার ঘাড় থেকে প্রেমের ভূত নেমে যাবে। এই হচ্ছে গিয়ে আমার চিকিৎসা বিধান। অরল্যাণ্ডো যদিও ভূতটিকে যেটুকু চিনেছিল তাতে এই চিকিৎসায় খুব একটা ভরসা আছে বলে সে বোধ করল না, তবু মন্দের ভাল মনে করে সে প্রতিদিন গ্যানিমিড ও এলিয়েনার কাছে ধর্ণা দিতে এবং সেখানে গিয়ে কৃত্রিম প্রেমের খেলায় অভিনয় করতে রাজী হল। ব্যবস্থা অনুসারে অরল্যাণ্ডোর নিয়মিত হাজিরা শুরু হল এবং সে সেখানে যাওয়া মাত্র মেষপালক বালক গ্যানিমিডকে হে আমার রোজালিণ্ড, হে আমার রোজালিণ্ড বলে সম্ভাষণ করতে লাগলো এবং উঠতি বয়সের ছেলে ছোকরারা সচরাচর ঠিক যে সব স্তবস্তুতির অনুপানে তাদের প্রণয়িনীদের তোষামোদ করে থাকে তাই করতে লেগে গেল। তবে এমম্বিধ চিকিৎসার ফলে গ্যানিমিডের ও অরল্যাণ্ডোর আরোগ্য বিধানে কিছুমাত্র অগ্রসর হচ্ছে এরূপ বোধ হলনা। অরল্যাণ্ডোর প্রেম ব্যাধির কোনই উন্নতি লক্ষ্য করা গেল না।

যদিও অরল্যাণ্ডো জ্ঞানত মনে ভাবত তার এই প্রেম নিবেদন ব্যাপারটি নিতান্তই একটা আমুদে খেলা এবং স্বপ্নেও ভাবেনি যে এ খেলার গ্যানিমিড আসলে গ্যানিমিডই নয়, সে রোজালিণ্ড, তবু এর মধ্যে দিয়ে নিজের মনের চাপা আবেগটুকু প্রকাশের ফলে সে একধরনের তৃপ্তির স্বাদ পেত ঠিক যেমনটি পেত রোজালিণ্ড নিজেও। উপরন্তু রোজালিণ্ডোর ছিল একধরনের মজা—সে আত্মগোপন করে যে প্রেমের সম্ভাষণগুলি প্রতিদিন শুনছিল তা তো তারই উদ্দেশ্যে।

মজার খেলায় কেটে গেল বেশ অনেকগুলি দিন গ্যানিমিড আর অরল্যাণ্ডোর। এদিকে ভালোমানুষ এলিয়েনা লক্ষ্য করছে যে গ্যানিমিড সাজধারী রোজালিণ্ড দিব্বি আছে, কাজেই সে-ও ভাবল প্রেমের খেলা চলছে চলুক না। সে আর চাইল না রোজালিণ্ডকে স্মরণ করিয়ে দিতে যে এখনো পর্যন্ত তার নিজের বাবার সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠেনি যার ঠিকানা ওরা অরল্যাণ্ডোর মারফৎ ইত্যবসরে জেনে গেছে। এর পর অবশ্য একদিন গ্যানিমিড গিয়ে সাক্ষাৎ করল ডিউক মশাই-এর সঙ্গে এবং ডিউক যখন তার কাছে তার বংশ পরিচয় জানতে চাইলেন, সে বলল, মশাই, আপনি যেমন বড় ঘরে জন্মেছেন আমিও তেমনি বড় ঘরের ছেলে। গ্যানিমিডের কথায় ডিউক একটু মৃদু হাসলেন, কেননা তাঁর ঘৃণাক্ষরেও মনে হয়নি যে গ্যানিমিডের কোনো রাজবংশীয় উত্তরাধিকার থাকতে পারে। গ্যানিমিড যখন দেখল তার পিতা অর্থাৎ ডিউক বেশ আনন্দেই দিন যাপন করছেন, তখন সে আর তড়িঘড়ি গোটা ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে চাইল না। তারও ইচ্ছা হল—খেলাটা চলছে, চলুক

না।

এরপর একদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সকালবেলা। অরল্যাণ্ডো তার রোজকার হাজিরা দিতে চলেছে গ্যানিমিডের কুটিরে। তার চোখে পড়ল একটি পথচারী ঘাসের উপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এবং তার গলায় জড়িয়ে রয়েছে এক বিশাল সবুজ রংএর সাপ। অরল্যাণ্ডোকে সেইদিকে আসতে দেখে সাপটা ঐ ঘুমন্ত মানুষটির গলা থেকে নেমে সুড় সুড় করে ঢুকে গেল পাশের ঝোপঝাড়ের ভিতরে। অরল্যাণ্ডোও সেই ঝোপের জঙ্গলের দিকে সাপটাকে খুঁজতে এগিয়ে গেল। ঝোপের কাছাকাছি যাওয়া মাত্র তার দৃষ্টিতে এল একটা সিংহী গুটিসুটি মেরে বসে আছে এবং তার মাথাটা একেবারে মাটিতে ঠেকানো। সিংহ বন্যপশুর মধ্যে অভিজাত। শোনা যায় তারা নাকী ঘুমন্ত অথবা মৃত মানুষের উপর কখনও ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এটা সিংহের রাজসিক উদারতা। কাজেই ঐ সিংহীটা ওঁত পেতে অপেক্ষায় ছিল নিদ্রিত ব্যাক্তিটির ঘুম কখন ভাঙ্গে—ভঙ্গিটা অনেকটা বিড়ালের শিকার ধরার মত। বোধহয় ঈশ্বরের অভিপ্রায়েই ঠিক এমন মুহূর্তে অরল্যাণ্ডোর এখানে উপস্থিতি। বোধহয়, ঐ মানুষটির প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই সে এসে পড়েছিল—সিংহী ও সাপ, এই দুটি ভয়ঙ্কর প্রাণীর হাত থেকে। বিপদ কেটে যাওয়ার পর অরল্যাণ্ডো আস্তে আস্তে ঘুমন্ত মানুষটির কাছে গেল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে তো অবাক—এ যে তারই দাদা অলিভার। তার মনে হল এই দ্বিবিধ বিপদ থেকে যাকে সে বাঁচাল সে-ই একদিন কী নিদারুণ অত্যাচার করেছে তার প্রতি, এমনকি তার ঘরে আগুন দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারবে বলে ফন্দি এঁটেছিল। স্বভাবতই একবার তার মণে উদয় হল, থাক্—ওর সিংহের পেটেই যাওয়া উচিত। কিন্তু না, আবার তার মনে হল—হাজার হোক আমার নিজের ভাই ও, মায়ের পেটের সহোদর। এমনই তার সহজাত মনুষ্যত্ববোধ। অরল্যাণ্ডো সঙ্গে সঙ্গে নিজের তরোয়াল কোষমুক্ত করল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর সিংহীটার উপর। অরল্যাণ্ডোর ক্ষিপ্র আক্রমনে সিংহী সহজেই নিহত হল এবং অলিভারের আর কোনো বিপদ রইলনা—না বিষাক্ত সাপের, না হিংস্র সিংহের। তবে সিংহীটাও শেষ হওয়ার আগে একটা মরণ কামড় দিতে চেয়েছিল, তার ফলে তার ধারালো থাবার ঘায়ে অরল্যাণ্ডোর একখানি হাত রীতিমত জখম হয়ে গেল।

সিংহীর সঙ্গে অরল্যাণ্ডোর যখন জীবনমরণ লড়াই চলেছে ঠিক তখনই ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল অলিভার এবং সে বিস্মিত হয়ে দেখল তার ভাই অরল্যাণ্ডোকে আরও দেখল যার প্রাণহানির চেষ্টা করতেও সে কসুর করেনি সে-ই নিজের প্রাণ বিপন্ন করে হিংস্র বন্য জন্তুর হাত থেকে তার প্রাণ বাঁচাতে কিভাবে লড়াই করছে। এই দৃশ্যে ও দৃষ্টান্তে অলিভারের লজ্জার আর সীমা রইল না, স্বকৃত পাপের অনুশোচনায় তার মন ভরে গেল, সে অনুতপ্ত হল তার পুরোনো আচরণের কথা ভেবে এবং অশ্রুসিক্ত চোখে নিজের ছোট ভাইয়ের কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। অলিভারের

এই অনুশোচনায় অরল্যাণ্ডোর হৃদয়ও দ্রবীভূত হল, সে আনন্দে অভিভূত হয়ে অলিভারের সব অপরাধ ভুলে গেল এবং দুই ভাই পরস্পরকে অলিঙ্গনপাশে জড়িয়ে ধরল। এর পর থেকেই অলিভার প্রকৃত বড় ভাইয়ের মত স্নেহপরায়ণ হয়ে উঠল অরল্যাণ্ডোর প্রতি, সে অনুতাপ করতে লাগল যে অরল্যাণ্ডোর সর্বনাশের সংকল্প মাথায় নিয়েই সে তার অনুসরণে এসেছিল আর্ডেনের জঙ্গলে।

কিন্তু পথের এই বিপত্তিই এখনকার মত অরল্যাণ্ডোর প্রেমের অভিসারে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল। বেচারার হাত থেকে অনর্গল রক্ত ঝরছে সিংহীর নখের আঘাতে। সে এখন কী করে যাবে গ্যানিমিডের কাছে! বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে নিজেকে। অগত্যা অলিভারের শরণাপন্ন হতে হল। অলিভারকে সে বলল—দাদা তুমি গিয়ে মেষপালকের কুটিরে যে ছেলেটিকে দেখতে পাবে তার নাম গ্যানিমিড। আমি গ্যানিমিডকে রহস্যোচ্ছলে 'রোজালিণ্ড' বলে ডাকি—তাকে তুমি আমার এই বিপদের কথাটা বুঝিয়ে বোলো।

অলিভার তৎক্ষণাৎ চলল গ্যানিমিডের কুটিরে। সেখানে গিয়ে গ্যানিমিড ও এলিয়েনার কাছে সে সব কথা বলল, অরল্যাণ্ডোর এই নির্ভীকতা ও ঈশ্বরের কৃপায় তার নিজের জীবন ফিরে পাওয়ার সমস্ত কাহিনীটির সব কথা সবিস্তারে বলার পর অলিভার ওদের কাছে জানাল যে সে-ই অলিভার যে কিনা একদিন অরল্যাণ্ডোর প্রতি শত্রুতায় দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়েছিল, কিন্তু আজ সে অনুতপ্ত এবং তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে সব বিরোধ মিটে গিয়ে এখন তারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক মন এক প্রাণ।

অলিভার যখন এমন সকরুণ ও আন্তরিকভাবে তার কৃত অপরাধের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করছিল তখন অসচেতনভাবে এলিয়েনার মনে তার প্রতি একধরনের অনুরাগ জেগে উঠছিল, যে অনুরাগ ভালবাসায় পরিণত হতে দেরি হল না। এলিয়েনা অলিভারের প্রেমে পড়ল। নিজের এই দুঃখের কথা বর্ণনা করার ফলে একটি মেয়ের মনে ভালবাসার ছায়া পড়ল ভেবে অলিভার অপ্রস্তুত বোধ করছিল, কিন্তু তা হলেও সে নিজেও ধরা পড়ল এলিয়েনার প্রেমের টানে একেবারেই সহসা। অদৃশ্য তড়িৎ-বাহিত প্রণয় যদিও এই মুহূর্তে এলিয়েনা ও অলিভারকে আচ্ছন্ন করেছিল কিন্তু অপরদিকে অরল্যাণ্ডোর বিপদের কথা শোনামাত্র মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল গ্যানিমিড। অলিভার এলিয়েনার প্রতি আসক্ত হলেও মূর্ছিত গ্যানিমিডের সেবায় বিন্দুমাত্র অবহেলা করেনি। গ্যানিমিডের যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো সে তখন ভাবলো হয়তো অলিভারের কাছে রোজালিণ্ড বলে ধরা পড়ে গিয়েছি, কাজেই নিজের নারীসুলভ সেই দুর্বলতা ঢাকার জন্যে সে বলল—দেখলেন তো কেমন মূর্ছা যাওয়ার অভিনয়টা করেছি। আপনার ভাই অরল্যাণ্ডোকে গিয়ে কিন্তু বলবেন আমি কেমন নিখুঁত মূর্ছার অভিনয় করে ফেললাম। অলিভারের কিন্তু চোখ এড়ালো না গ্যানিমিডের সত্যিকারের মূর্ছার লক্ষণ, তার চোখ মুখের চেহারায় যা স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। সে রীতিমত অবাকই

হয়ে গেল এবং বলল---তা বাপু যদি মূর্ছার ভাণ করতেই পেরে থাক, এবার একটু ভরসা সঞ্চয় করে ফ্যালো---ভাণ করো যেন তুমি সত্যিই পুরুষ। গ্যানিমিড বললো---বটেই তো, তবে আমার তো নিজের দাবীতেই নারী হওয়ার কথা।

মেষপালক কুটিরে অলিভারের সাক্ষাতকারটি যেন একটু বিলম্বিত লয়েই শেষ হল এবং এই দীর্ঘ সময়ের শেষে সে যখন তার ভ্রাতৃসকাশে উপস্থিত হল তখন তার থলিতে ভর্তি একরাশ কথা। অরল্যাণ্ডোর সেই সিংহীর আক্রমণে আহত হওয়ার কথা শুনে গ্যানিমিডের মূর্ছা যাওয়ার কথা ছাড়াও সে বলতে লাগল সে নিজে কিভাবে প্রেমে আক্রান্ত হয়েছে মেষপালিকা এলিয়েনার দর্শনে এবং সেই প্রথম দর্শনেই এলিয়েনাও কীভাবে তার প্রেমের আরজি মঞ্জুর করেছে। এতদুপরি সে অরল্যাণ্ডোকে বলে ফেলল যে সে পাকাপাকি তার মনস্থির করে ফেলেছে এলিয়েনাকে বিয়ে করবেই, আর সেই অনুরাগে সে দেশত্যাগী হয়ে এই বনেই ঘর বাঁধবে মেষপালক হয়ে এবং তার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় বিষয় আশয় সে দান করবে অরল্যাণ্ডোকে।

অরল্যাণ্ডো বলল---অতি উত্তম প্রস্তাব, শুভস্য শীঘ্রম, আগামী কালই লাগাও বিয়ে। আর আমি যাই, ডিউক ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্নটা সেরেই আসি। তুমি বরং গিয়ে তোমার ভাবী বধূকে বলে রাজী করাও গে। মেষপালিকা এখন কুটিরে একাই আছে---ঐ তো তার দাদাটি আমাদের এদিকেই আসছে। অলিভারের আর তর সইলনা, সে ছুটল এলিয়েনার কাছে, এবং গ্যানিমিডকে অরল্যাণ্ডোর যেমন মনে হচ্ছিল এদিকেই আসছে, সত্যিই সে এসেও পড়ল এবং জানতে চাইলো তার ক্ষতের সেই ব্যথাটা এখন কেমন আছে।

অরল্যাণ্ডো ও গ্যানিমিডের মধ্যে আলোচনাটা এবার শুরু হল অলিভারের হঠাৎ এলিয়েনার প্রেমে পড়ার কথা নিয়ে। অরল্যাণ্ডো বলল, আমি দাদাকে বলেছি তার টুকটুকে ভাবী বউটিকে গিয়ে বলে কয়ে রাজী করাতে যাতে সে আগামী কালই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে সম্মত হয়। সে আরও বলল---আমার যেমন কপাল, যদি ঐ একই দিনে আমিও আমার রোজালিণ্ডকে বউ করে নিতে পারতাম!

গ্যানিমিড সব কথা শুনে বলল---তা বেশ করেছ, ওদের দুজনের বিয়েটা কালই হয়ে যাক, আর তুমি তোমার রোজালিণ্ডকে যদি সত্যিই ভালবেসে থাক যেমন তোমার কথাবার্তায় নিত্য বলছো, তবে আর দুশ্চিন্তা করনা, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। দেখি আমি কী করতে পারি, আশা করি আগামী কালই তোমার সেই মনের মানুষকে সশরীরে হাজির করতে পারবো, আর এ-ও হলফ করে বলতে পারি সেই ছুঁড়ি তোমাকে বিয়ে করতে সহজেই মত দেবে।

অরল্যাণ্ডোর কাছে ব্যাপারটা যতই তালগোল পাকানো ধাঁধাঁর মত মনে হোক না কেন গ্যানিমিডের তো সবটাই নিজের হাতের মধ্যে। কেননা সে-ই তো রোজালিণ্ড। এই অসম্ভব ব্যাপারটাকে অরল্যাণ্ডোর কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে

সে বলল—দেখ, তোমার ঐ সত্যিকারের রোজালিণ্ডকে হাজির করার জন্যে আমি একটা ম্যাজিকের সাহায্য নেব, ম্যাজিকটা আমি শিখেছিলাম আমার এক খুড়োমশাই-এর কাছে, জাদুকর ছিলেন তিনি।

প্রেমে ভীমরতিগ্রস্ত বেচারা অরল্যাণ্ডো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেনা—ভাবছে হয়তো এ সত্যি, আবার ভাবছে এত ভাগ্য কি আমার হবে। সে গ্যানিমিডকে কাকুতি-মিনতি করে বলল—দ্যাখ, যা বলছ তা সত্যি তো? গ্যানিমিড বলল—তিন সত্যি করে বলছি, ঠিক ঠিক ঠিক—ওহে ভীতু যুবক, যাও নতুন জামাকাপড় পরে বরের সাজে তৈরী হও এবং ডিউক ও তাঁর সজ্জনদের তোমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করে এসো—রোজালিণ্ডকে যদি আগামী কালই বিয়ে করবে বলে সংকল্প করে থাক—তবে সে অবশ্যই এখানে এসে পড়বে।

পরের দিন। অলিভার রাজী করিয়ে ফেলেছে এলিয়েনাকে। কাজেই বিয়ের পোশাকে তারা দুজনে এসে হাজির ডিউকের জঙ্গলী বৈঠকখানায়। তাদের সঙ্গে এসেছে অরল্যাণ্ডোও। সে অবশ্য এখনও তার কনে হাজির করতে পারেনি।

দুটি বিয়ে হতে চলেছে এক সঙ্গে, একই লগ্নে। সকলেই সভায় উপস্থিত। কিন্তু একটি মাত্র পাত্রী, আর একটি কোথায়? সবারই মনে নানা জল্পনা-কল্পনা, তবে মোটের উপর তাদের ধারণা হল নিশ্চয়ই অরল্যাণ্ডোকে নিয়ে গ্যানিমিড রসিকতা করার জন্যে এই ব্যবস্থা করেছে। রোজালিণ্ড ব্যাপারটাই ধাপ্পা।

ডিউক যখন শুনলেন যে তাঁরই মেয়ে, অর্থাৎ রোজালিণ্ডকেই উপস্থিত করা হবে ম্যাজিকের সাহায্যে তখন তিনি অরল্যাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করলেন সে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে কিনা ঐ মেষপালকের উদ্ভট গল্পে। ডিউকের প্রশ্নের জবাবে যখন অরল্যাণ্ডো বলছিল যে তার মাথায় কিছুই আসছে না, সে নিজেই বিভ্রান্ত বোধ করছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই সভাস্থলে উপস্থিত হল গ্যানিমিড। গ্যানিমিড ঢুকেই সরাসরি ডিউককে প্রশ্ন করল—ধরুন আমি যদি সত্যিই আপনার মেয়েকে এখানে এনে হাজির করতে পারি, আপনি তাকে কন্যার পিতা হিসাবে অরল্যাণ্ডোকে সম্প্রদান করতে রাজী তো?

ডিউক আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলেন—শুধু রাজকন্যা কেন, আমার যদি হাতে থাকতো তবে আমি সম্পূর্ণ রাজ্যও তাকে দান করতাম রাজকন্যার সাথে।

গ্যানিমিড এবার অরল্যাণ্ডোকে প্রশ্ন করল—তোমার প্রকৃত মনোবাঞ্ছাটা কী? বলো, তাকে বিয়ে করবে তো—যদি তাকে আনতে পারি?

অরল্যাণ্ডোও আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলে উঠল—আলবাৎ করব—আমি যদি রাজার রাজাও হতাম তাহলেও করতাম।

অতঃপর গ্যানিমিড ও এলিয়েনা উভয়ে স্থানত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেল কিছুক্ষণের জন্য। সেখানে গিয়ে গ্যানিমিড নিজের পুরুষালি পোশাক ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই পরে নিল রমণীর সাজসজ্জা, আর সে রোজালিণ্ড

হয়ে গেল ম্যাজিকের মত, ম্যাজিকের সাহায্য ছাড়াই। এলিয়েনাও তার গাঁইয়া বেশবাস পালটে নিয়ে পরিধান করল ধনীর দুলালীর অঙ্গবাস। অতি অনায়াসেই তার রূপান্তর ঘটল সম্ভ্রান্ত রমণী সিলিয়াতে।

এই অন্তর্বর্তী সময়ে যখন গ্যানিমিড ও এলিয়েনা স্থানত্যাগ করে গিয়েছিল, ডিউক অরল্যাণ্ডোকে বললেন, দ্যাখো, ঐ গ্যানিমিডকে দেখতে যেন অনেকটা আমার রোজার মতই। অরল্যাণ্ডোও তাঁর কথায় একমত হয়ে বলল—হ্যাঁ আমিও অনেকটা মিল লক্ষ্য করেছি ওর মধ্যে।

কী হতে পারে বা না পারে সেই জল্পনা-কল্পনা করার আর অবকাশ হলনা, কেননা তখনই অকুস্থলে এসে পড়ল রোজালিণ্ড ও সিলিয়া পরনে তাদের নিজেদের বেশভূষা। রোজালিণ্ড আর ম্যাজিকের ভাণ না দেখিয়ে একেবারেই গিয়ে বসল তার বাবার পায়ের কাছে। নতজানু হয়ে বলল, বাবা তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর যেন সুখী হতে পারি। উপস্থিত সবাই তো অবাক, কারো মাথায়ই আসছে না কী ভাবে স্বয়ং রোজালিণ্ড অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হল। ব্যাপারটাকে সহজেই ভোজবাজি মনে হতে পারে, এই ভ্রান্তি নিরসনের জন্য রোজালিণ্ড তার বাবার কাছে চালাকির মুখোশটা পুরোপুরি খুলে এবার বলতে লাগলো, রাজসভা থেকে তার বিতাড়িত হওয়ার কথা। কেমন করে সে ঐ বনে এসে মেষপালকের বেশ ধরেছিল এবং এলিয়েনাকে চালিয়েছিল তার বোন হিসেবে।

আর দেরী নয়। ডিউক তাঁর পূর্বোক্ত সম্মতি আনন্দসহকারে অনুমোদন করলেন—রোজালিণ্ড ও অরল্যাণ্ডোর বিয়ে হয়ে গেল। একই সঙ্গে সিলিয়া ও অলিভারেরও বিয়ে হল সেই লগ্নে। এই জনবিরল অরণ্যে ঐশ্বর্য অথবা সমারোহের আয়োজন রহিত এই বিবাহে অপর যে আনন্দের স্বাদ পেয়েছিল সেদিনের বরকন্যা অথবা সমবেত অপর সকলে তার তুলনা মেলে না। তারা মনোরম গাছপালার ছায়াশীতল ভূমির আসনে যখন পরম তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিল মৃগমাংস, সে আনন্দ ও তৃপ্তির মধ্যে ডিউকের অথবা নববিবাহিতদের বিন্দুমাত্রও অভাব বোধ ছিল না। আবার ঠিক তখনই সেখানে এসে উপস্থিত হল অপ্রত্যাশিত এক দূত — সেই দূতের মুখে ছিল তদোধিক অপ্রত্যাশিত এক আনন্দ-সংবাদ নির্বাসিত ডিউক আবার ফিরে পেয়েছেন তার হৃত রাজ্য।

ডিউকের কনিষ্ঠ ভাই-এর পাপের অবসানের ফলেই এই পরিবর্তনের সূচনা। সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল রোজালিণ্ডের সঙ্গী হয়ে তার কন্যা সিলিয়ার গৃহত্যাগের সংবাদে — এছাড়া প্রতিদিনই তার কানে আসছিল রাজসভার যত জ্ঞানীগুণী ও যোগ্য ব্যক্তি তাঁরা একে একে সকলে তার সংসর্গ ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছেন আর্ডেনে, নির্বাসিত আসল ডিউকের কাছে। এমন দুর্দিনেও তার ভাইকে মানুষ এত ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে জেনে সে ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে ছুটল এক বিশাল সৈনবাহিনী সঙ্গে নিয়ে আর্ডেনের দিকে— উদ্দেশ্য, তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃদ্ধ ডিউক এবং তাঁর

অনুচরবৃন্দকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করা এবং মৃত্যুতে নির্মূল করা। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন, যার ফলে এই দুষ্টপ্রকৃতি কনিষ্ঠের অসৎ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে তার মনে দেখা দিল স্বকৃত অপরাধের জন্যে অনুশোচনা। এই পরিবর্তনের পিছনে ছিল একটি সামান্য ঘটনা। হিংসাপরায়ণ এই ভাই যখন আর্ডেনের জঙ্গলে প্রবেশের মুখে ঠিক তখনই তার দেখা হয়ে গেল এক সাধুপ্রকৃতির মানুষের সঙ্গে, মানুষটি একজন সন্ন্যাসী। তাঁর সঙ্গে ডিউকের আলাপ হল এবং আলাপের ফলে ধীরে ধীরে তার মনের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল—তার মনে আর বিন্দুমাত্র হিংসা-দ্বেষ রইল না এবং এখন থেকে সে যার-পর-নেই অনুতপ্ত হল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল অন্যায় উপায়ে লব্ধ ডিউকের সম্পত্তি সে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেবে কোনো আশ্রমে বা মঠে মন্দিরে। তার অনুতপ্ত হৃদয়ের প্রথম কাজ হিসাবে সে তখনই দূত পাঠাল তার বড় ভাই, অর্থাৎ প্রকৃত ডিউকের কাছে, আমরা পূর্বেই শুনেছি কেমন করে ডিউক ডিউকডম ফিরে পাওয়ার সেই সংবাদ পেয়েছিলেন রোজালিণ্ড ও সিলিয়ার বিবাহের ভোজসভায়। আর শুধু ডিউকের রাজ্যেই নয়, ডিউকের দুর্দিনে বন্ধুবান্ধব যাঁরা তাঁর বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন তাঁরা সকলেই ফিরে পেলেন তাঁদের হৃত সম্পত্তি।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ভাগ্যের এই পটপরিবর্তন। এক মুহূর্তে নিঃস্ব বনবাসীর রাজ-ঐশ্বর্য ফিরে পাওয়া—এ সংবাদে রোজালিণ্ড ও সিলিয়ার বিবাহোৎসবের আনন্দ একেবারে কূল ছাপিয়ে গেল। সমবেত সকলেই আত্মহারা হল নৃত্যগীত রঙ্গ তামাসায়। সিলিয়া অভিনন্দন জানালো তার দিদি রোজালিণ্ডকে তার পিতার এই ভাগ্য পরিবর্তনে। যদিও সম্পত্তির হস্তান্তরের ফলে আজ থেকে সে নিজে আর ঐ ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিনী রইল না, তবুও তার অভিনন্দন জানানোতে লেশমাত্র আন্তরিকতার অভাব ছিল না। আজ থেকে রোজালিণ্ডই তো যাবতীয় ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিনী, তবুও তাদের দুটি বোনের মন ছিল একই সূত্রে গাঁথা, অই ঈর্ষা অথবা দ্বেষের কোনো চিহ্নই ছিলনা তাদের সম্পর্কে।

বৃদ্ধ ডিউকের দুঃখের দিনে যাঁরা প্রতিদিন তাঁর পাশে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বনবাসের সব দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নিয়েছিলেন, আজ সবার আগে তাঁদের কথা মনে পড়ল ডিউকের। আজ তিনি সুযোগ পেলেন তাঁদের উপযুক্ত পুরস্কারে সম্মানিত করার। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে শুধুমাত্র ডিউকের প্রতি প্রীতির বন্ধনে এতদিন তাঁরা মুখ বুঁজে তাঁর দুঃখকে নিজেদের দুঃখ বলে মেনে নিয়েছিলেন, তাই আজ তাঁরা পরমপ্রীতি লাভ করলেন নিজেদের ধনসম্পত্তি ফিরে পাওয়ায়।

দ্যা টু জেন্টলমেন অব ভেরোনা

ভ্যালেনটাইন আর প্রোটিউস। ভেরোনা শহরেই তাদের বাড়ি। আর এই দুটি তরুণ যুবকের মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুত্ব— যেমন প্রগাঢ় তেমনি অটুট। একটি দিনের জন্যেও এই দুই বন্ধুর মনের অমিল কেউ দ্যাখেনি। তাদের পড়াশোনা এক সঙ্গে, বেড়ানো এক সঙ্গে, এক সঙ্গেই তাদের সারাদিন কাটে। তবে প্রোটিউস অবশ্য নিজের জন্য একটুখানি সময় বন্ধুর কাছে বলেকয়েই ব্যবস্থা করে নিয়েছে— সময়টুকু খুবই দরকারি, কেননা ঐসময়ে তার একটিবারের জন্যও অন্তত যাওয়া চাই তার প্রণয়িনীর কাছে, অর্থাৎ সুন্দরী জুলিয়ার বাড়িতে। ভ্যালেনটাইন যদিও বন্ধুর এই প্রণয়ের ব্যাপারে সম্মতি দিতে আপত্তি করেনি, তবু প্রণয় ব্যাপারটা তার আদৌ পছন্দ হ'ত না। সে নিজে কখনও প্রেম নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তাই জুলিয়া এবং তার প্রশস্তি নিয়ে প্রোটিউসের প্যানপ্যানানিতে সে বরং ক্লান্তিই বোধ করত। এর ফলে মাঝে মাঝে সে প্রোটিউসের প্রেম নিয়ে তার সঙ্গে ঠাট্টাতামাসা, এমন কি কখনও-সখনও অল্পবিস্তর ঠোক্কর দিয়েও মজা পেত। আর সে বড়াই করে বলত : ঐ সব আজগুবি খেলা অকম্মাদেরই মানায়, প্রেম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায়— তাহলে তো আমাকে তোর মত ভালবাসায় এই বুঝি গেল, এই বুঝি সব গেল বলে ভয়ে পাগল হয়ে যেতে হবে, তর চেয়ে বেশ আছি বাবা— মাথা নেই, তার মাথা ব্যথা।

দুটি বন্ধুতে এই সব কৃত্রিম কোন্দল নিয়ে আর অনাবিল বন্ধুত্ব নিয়ে বেশ ছিল। এরই মধ্যে একদিন সকাল না হতেই প্রোটিউসের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল ভ্যালেনটাইন। সে এসে বলল— ভাই, কিছুদিনের মত আমাকে তো বাইরে যেতে হচ্ছে, মিলানে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়েছে, অগত্যা কি করি বল ? প্রোটিউসের একেবারেই ইচ্ছা নয় যে ভ্যালেনটাইন শহর ছেড়ে বাইরে কোথাও যাক। সে তাই অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করল ভ্যালেনটাইনকে, কিন্তু ভ্যালেনটাইন এককাট্টা— সে বলল : না, তা হয় না। এ অনুরোধ তুমি কোর না। এখনই কাজের সময়। এই সময় বাড়িতে বসে বসে কুঁড়েমি করে নিজের পরকালটি ঝরঝরে করতে আমি রাজী নই। তাছাড়া, যারা ঘরকুনো হয় অদের বুদ্ধির দৌড় ও হয় ঐ কুয়োর ব্যাং-এর মতো। হ্যাঁ, তোমার যদি ঐ জুলিয়ার মিষ্টি হাসিতে টিকিটি বাঁধা না থাকতো তাহলে তোমাকেও আমি বলতাম চলো আমার সঙ্গে। বাইরের দুনিয়ায় কতোই তো দেখার আছে, জানার আছে— তা তুমি তো বাপু নিপাট প্রেমিক। চালিয়ে যাও, জিতা রহো।

কাজেই দুই বন্ধুর ছাড়াছাড়ি আর রোধ করা গেল না। পরস্পরের প্রতি আমরণ

বন্ধুত্বের শপথ নিয়ে যাওয়ার সময় প্রোটিউস বলল— আমি তো যেতে পারলাম না ভাই, তবে বিদেশে যা কিছু তোমার চোখে পড়বে এবং যখনই তার কোনটিকে তোমার ভাল লাগবে, একটিবার অন্তত আমার কথা যেন তোমার মনে আসে সেই আনন্দের মুহূর্তে।

ভ্যালেনটাইন সেদিনই রওনা হল তার বিদেশযাত্রায়, মিলানের পথে। বন্ধুর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রোটিউস বসে পড়ল কাগজ কলম নিয়ে জুলিয়াকে প্রেমপত্র লিখতে। লেখা সারা হতে চিঠিখানা যে পাঠিয়ে দিল যথাস্থানে তার কাজের মেয়ে লুসেটার হাত দিয়ে।

জুলিয়া মেয়েটি ছিলো খুবই সৎ প্রকৃতির। প্রোটিউস তাকে যেমন আন্তরিকভাবে ভালবাসতো সে-ও ঠিক প্রতিদানে তাকে তেমনই মনে-প্রাণে ভালবাসতো। তবে তার চরিত্রের মধ্যে ছিল এক ধরনের প্রকৃত আত্মমর্যাদাবোধ এবং সেই কারণেই সে মনে করত কোনো কুমারী মেয়ের পক্ষে চট করে কোনো পুরুষকে প্রশ্রয় দেওয়াটা শোভন নয়। কাজেই মনে মনে সে প্রোটিউসকে যতই কামনা করুক না কেন, বাইরে সে তা প্রকাশ করত না, ফলে প্রোটিউস বেচারার অনেক কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছিল জুলিয়া দেবীর সামান্য প্রসন্ন দৃষ্টির আশায়।

পত্রবাহিকা লুসেটা বেচারীর উপর পড়ল জুলিয়ার কৃত্রিম দেমাকের জের। সে যথারীতি প্রোটিউসের পত্রখানি নিয়ে হাজির হয়েছে জুলিয়া সমীপে, আর জুলিয়া তো রেগে আগুন। সে বলল— তোর কী স্পর্ধা! তুই তোর প্রভুমশাই-এর চিঠি দিতে চাস আমাকে — যা, এখুনি দূর হ আমার সামনে থেকে। মুখে একথা বললে হবে কী, জুলিয়ার বুক তো ফাটছে চিঠিখানি দেখার আশায় - সে ভাবছে কত না জানি মান অভিমানের কথা আছে ঐ চিঠিতে। অতএব লুসেটা বেরিয়ে যেতে না যেতেই সে আবার ডেকে ফিরালো তাকে। সে কাছে আসতেই জুলিয়া বলল — এই লুসেটা, কটা বেজেছে রে ঘড়িতে? লুসেটা অত বোকা নয় — সে জুলিয়ার অভিসন্ধিটা ঠিকই বুঝেছে, ঘড়ির কাঁটার চেয়ে চিঠির কথাগুলো যে বেশি জরুরী তা সে বুঝে নিয়েছে। তাই, ঘড়ির খবর না দিয়েই সে আরও একবার চিঠিখানি এগিয়ে দিল তার দিকে। জুলিয়াও বুঝল যে লুসেটা তার মনের কথাটা ধরে ফেলেছে। সে উত্তেজনাবশে চিঠিখানা লুসেটার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে মেঝের উপর ছড়িয়ে ফেলল এবং চিৎকার করে লুসেটাকে বলল— বেরিয়ে যা বলছি, এক্ষুণি যা। লুসেটা বেরোনোর মুখে চিঠির টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছে দেখে জুলিয়া আবার চেঁচিয়ে উঠল — আবার দাঁড়িয়ে আছিস, কে তোকে ওগুলো কুড়োতে বলেছে, ফেলে দে ওগুলো, ওগুলো ছুঁয়েছিস কি তোকে মজা দেখাব— দূর হ এখান থেকে।

লুসেটার প্রস্থানের পর জুলিয়ার কাজ হল যত্নসহকারে ছিন্নপত্রের ছেঁড়া অংশগুলি

জুড়ে জুড়ে তার অর্থ উদ্ধার করা। প্রথমেই যে শব্দগুলি উঁকি দিল তা দাঁড়াল এইরূপ : 'প্রেমে ক্ষত-বিক্ষত প্রোটিউস'— আহাহা কত না তার ব্যথা! সে আবারও ছেঁড়া কাগজ জুড়তে জুড়তে চোখ মুছতে লাগল— 'ভালবাসারই ঘায়ে' সে ক্ষত বিক্ষত, আহত, আহা হা! সে বলল : এই আহত পত্রাংশগুলি আমি এই রাখছি বুকের ভিতর — ওরা ওখানেই শুয়ে থাক, বুকের বিছানায়, যতদিন না সুস্থ হয়ে ওঠে। সে ঐ ছেঁড়া টুকরা গুলির প্রত্যেকটিকে চুমু দিতে লাগল — আহা, কত ব্যথাই ওদের লেগেছে।

এমনি মেয়েলি সুরে সে ছেলেমানুষী করতে করতে কত কথাই না বলতে লাগল ঐ ছেঁড়া কাগজ বুকে চেপে, কিন্তু কোনো অনুনয়েই আর সেগুলিকে জোড়াও গেল না, তার মধ্যে লেখা শব্দগুলির জোড়া অর্থও আর উদ্ধার করা হয়ে উঠলো না। সে এবার নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে ভাবতে লাগল — কী দারুণ বিশ্বাসঘাতিনী আমি, এমন সব মধুর নিষ্পাপ শব্দগুলিকে হত্যা করলাম — হায় হায়। কাজেই প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ সে সারা প্রাণ মন দিয়ে একখানি প্রেমপত্রের খসড়া প্রস্তুত করল প্রোটিউসের উদ্দেশ্যে — এমন বিনীত প্রেম সে আগে কখনো নিবেদন করেনি।

প্রোটিউউসকে আর পায় কে — তার চিঠির জবাবে এমন চিঠির কথা সে স্বপ্নেও ভাবিনি। সে শুধু পড়ছে আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠছে— মরি মরি, প্রিয়তমা, কী মধুর তোমার কথাগুলি, ধন্য আমার জীবন! এহেন আনন্দে যখন তার টালমাটাল অবস্থা, তখনই সেই খুশিতে বাদ সাধলো হঠাৎ তার পিতার আগমন। পিতা উপস্থিত হয়ে বললেন— কি রে, ওটা কী পড়ছিস, কীসের চিঠি?

প্রোটিউসের জবাব দিতে দেরি হল না। সে বলল— হ্যাঁ বাবা, ঐ মিলান থেকে এসেছে চিঠিখানা, আমার বন্ধু ভ্যালেনটাইনের চিঠি। উত্তরে তার বাবা বললেন—দে তো দেখি চিঠিখানা, দেখি কী লিখেছে সেখানকার হালচালের কথা।

প্রোটিউস ঘাবড়ে গিয়ে বলল — না না তেমন কিছু খবর টবর নেই। ভ্যালেনটাইন খালি জানিয়েছে ওখানে গিয়ে সে মিলানের ডিউকের কাছে খুবই খাতির যত্ন পাচ্ছে, প্রতিদিনই তিনি ভ্যালেনটাইনকে কিছু না কিছু উপহার দিচ্ছেন। আর তা ছাড়া লিখেছে যে আমার কথা তার সব সময়েই মনে পড়ে, আমি যদি তার এই সৌভাগ্যের সঙ্গী হতে পারতাম, এই তার ইচ্ছা।

পিতা বললেন— তা তোমার কেমন বোধ হচ্ছে — বন্ধুর ঐ ইচ্ছাটা পূর্ণ হলে কেমন হয়?

প্রোটিউস ভাবল বাবাকে একটু খোসামোদ করতে ক্ষতি কি — সে বলল, তুমি যা ইচ্ছে করবে তাই-ই হবে, আমি তো তোমার ইচ্ছাটাকেই মূল্যবান মনে করি।

প্রোটিউসের এই ভালমানুষীপনা তার অজান্তে একটা গোল পাকিয়ে তুলল।

প্রোটিউস বেচারা ধারণা করতেই পারেনি যে তার অচলা পিতৃভক্তিসূচক উক্তি সে কী কুক্ষণেই না করে ফেলেছে। ব্যাপারটা হল গিয়ে পিতাপুত্রের এই সাক্ষাতের কিছুক্ষণ আগেই প্রোটিউসের বাবা তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তিনি তাঁকে বলছিলেন যে এখনকার দিনে সকলেই চায় তাদের ছেলেদের বাইরে পাঠিয়ে মানুষ করতে। তাই প্রোটিউসের মত একটা উপযুক্ত ছেলেকে ঘরে বসিয়ে রেখে তিনি খুবই ভুল কাজ করছেন। তিনি আরও বলছিলেন, কেউবা ছেলেকে পাঠাচ্ছে যুদ্ধে যোগ দিয়ে ভাগ্য অনুসন্ধানে, কেউবা পাঠাচ্ছে দূর সমুদ্রে নতুন উপনিবেশের খোঁজে। আবার কেউবা দেশের বাইরে কোনো নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছে উচ্চতর পড়াশোনার জন্যে — আর তাছাড়া ওর বন্ধু ভ্যালেনটাইনই তো কিছুদিন আগে গিয়েছে মিলানের ডিউকের রাজসভায় রাজসম্মান লাভের আশায়। তা তোমার ছেলেটি তো খুবই যোগ্য এত সব পথের মধ্যে সে যেটিই বেছে নিক, সবেতেই তার উন্নতি অবধারিত। এখনই যদি ঠিকমত না এগিয়ে যেতে পারে তবে আরো যখন বয়স বাড়বে তখন তো সমূহ মুস্কিলেই পড়বে। বাইরের আলো হাওয়া ছাড়া বৃদ্ধিই বা হবে কেমন করে?

কাজেই প্রোটিউসের বাবার ঠিক মনের মত বস্তুটিই মিলে গেল যখন প্রোটিউস বলল ভ্যালেনটাইনের চিঠিতে আছে তার বন্ধুকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা মিলানে তার কাছে। প্রোটিউস তার অজ্ঞাতেই জড়িয়ে পড়ল নিজের জালে। তার বাবা স্থির করে ফেললেন ছেলেকে মিলানেই পাঠাতে হবে — প্রোটিউসকে কিছুই বললেন না কেন তাঁর হঠাৎ ছেলেকে বাইরে পাঠানোর তাড়া পড়ল। ভদ্রলোকের ধাতই অন্য ধরনের — ছেলের কাছে কোনো কথা বুঝিয়ে বলা অথবা কারণ দেখানোর তিনি পরোয়াই করতেন না — তাঁর ভাবখানা, আমার ইচ্ছার উপর আবার কথা? অতএব তিনি প্রোটিউসকে বললেন — ভ্যালেনটাইন তার পত্রে যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে আমিও তাই চাই। ছেলেকে অবাক হতে দেখে তিনি তো আরও অবাক— বললেন, হাঁ করে দেখছ কী, ভাবছ কী জন্যে তোমাকে মিলানের ডিউকের রাজসভায় পাঠাতে মনস্থ করলাম। করলাম আমার খুশি তা-ই, আর কিছু শুনতে চাও? কাল-ই যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে নাও, কোনো ফ্যাচাং দেখিয়ো না। আমার এক কথা। নড়চড় নেই।

প্রোটিউস তার বাবাকে চিনতো, কোনো ওজর আপত্তি বা যুক্তি শোনার পাত্র যে তিনি নন এটা তার ভালো করেই জানা ছিল। কাজেই নিজের আহাম্মকির উপর দোষারোপ করা ছাড়া কী আর করবে সে — কেনই বা জুলিয়ার চিঠির ব্যাপারটা নিয়ে ভ্যালেনটাইন প্রসঙ্গ তুলতে গেল, তাই না সে ফেঁসে গেল। এখন তো কপালে জুলিয়া বিহনে বিরহজ্বালা লেখাই হয়ে গেল। খণ্ডায় কার সাধ্য!

জুলিয়া দেখল তারও কপালে সেই একই দুঃখ। কাজেই প্রোটিউসের প্রতি তার

কৃত্রিম দূরত্বের মুখোশটা এবার খসে পড়ল — দুই প্রণয়ী সাক্ষাৎ করে চোখের জল মুছতে মুছতে অনেক সব ব্যথাবেদনার কথা বলে শপথ নিল তারা কোনদিনই একে অন্যকে ভুলে যাবে না, তাদের প্রেম অমর, সেই প্রেমের অমরত্বের নির্দশন-স্বরূপ তারা পরস্পর অঙ্গুরী বিনিময় করে বলল ঐ আংটি তারা কেউ কোনদিন হাতছাড়া করবে না। অতঃপর চোখের জল মুছতে মুছতে বিদায় নিল প্রোটিউস, সে পাড়ি দিল মিলানের উদ্দেশ্যে, তার বন্ধু ভ্যালেনটাইনের আশ্রয়কে লক্ষ্য করে।

ভ্যালেনটাইনের যে গল্প প্রোটিউস তার বাবার কাছে বানিয়ে বলেছিল, অর্থাৎ মিলানের ডিউকের রাজসভায় তার সম্মানলাভের কথা, সেটা কিন্তু ভ্যালেনটাইনের ক্ষেত্রে গল্প হলেও সত্যি। ভ্যালেনটাইন মহাসমাদর লাভ করেছিল ডিউকের দরবারে। আর এর সঙ্গে বাড়তি আর যা ঘটেছিল তা প্রোটিউস স্বপ্নেও ভাবেনি — যে মুক্ত বিহঙ্গ থাকার বড়াই করত ভ্যালেনটাইন, সেই অহংকার তার গোল্লায় গেছে বর্তমানে প্রোটিউসের মত সে-ও প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এই তাজ্জব অঘটনটি ভ্যালেনটাইনের হৃদয়ে যার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল সেই কুমারীর নাম সিলভিয়া, এবং সে খোদ ডিউকের নন্দিনী। সিলভিয়াও অবশ্য ভালবেসে ফেলেছিল ভ্যালেনটাইনকে, কিন্তু তাদের প্রেমটা গোপণেই চলছিল ডিউকের চোখে ধুলো দিয়ে। ডিউক ভ্যালেনটাইনকে খুবই খাতির যত্ন করতেন বটে এবং তাকে প্রতিদিনই রাজদরবারে নিমন্ত্রণও করতেন, তবে তাঁর কন্যার জন্যে যে পাত্রটিকে তিনি বাছাই করেছিলেন সে ভ্যালেনটাইন নয়,তার নাম থুরিয়ো। সিলভিয়া কিন্তু থুরিয়োকে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারত না— তার না আছে রুচি, না আছে গুণ, যেমনটি সে দেখেছে ভ্যালেনটাইনের মধ্যে।

প্রেমের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী—ভ্যালেনটাইন এবং থুরিয়ো। একদিন সিলভিয়ার কাছে দুজনেই উপস্থিত। মুখোমুখি হওয়ার পর থুরিয়ো যা কিছু বলছে তার সব কথাকেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিচ্ছে ভ্যালেনটাইন তার উচ্চতর বিদ্যাবুদ্ধির জোরে। এমন সময় ডিউক এসে উপস্থিত হলেন ঘটনাস্থলে এবং ভ্যালেনটাইনকে তার বন্ধু প্রোটিউসের মিলানে এসে পৌঁছানোর সুসংবাদটি জানালেন। ভ্যালেনটাইনও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল— ওর আসাটাই আমি সর্বান্তঃকরণে চাইছিলাম— জানেন স্যার, অমন ছেলে আর দুটি হয় না। আমি তো ওর তুলনায় কিছুই নই। আমার জীবনের অনেকটা সময়ই আমি নষ্ট করেছি আড্ডায়, আলসেমিতে কিন্তু প্রোটিউস একটু সময়ও বাজে নষ্ট করেনি, যেমন তার রূপ, তেমনি তার গুণ। যে যে গুণ মানুষের ভূষণ হতে পারে তার সব কটিই সযত্নে সে আহরণ করেছে।

তবে তো তাকে তার যোগ্য সম্মান দিয়ে দরবারে আহ্বান জানাতে হয়, বললেন ডিউক। তিনি আরও বললেন— ওরে সিলভিয়া, হ্যাঁ তোমাকেও বলছি ওহে থুরিয়ো, যাও তোমরা তাকে ডেকে নিয়ে এসো। ভ্যালেনটাইনের তো সে বন্ধুই, কাজেই

তাকে আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। এই সময়েই সেখানে এসে পড়ল প্রোটিউস, এবং তাকে দেখিয়ে ভ্যালেনটাইন সিলভিয়াকে বলল — এই যে ইনিই আমার বন্ধু প্রোটিউস। দেবী সিলভিয়া একে তুমি আমারই মত তোমার সেবক জ্ঞানে আদর আপ্যায়ন কোরো।

দেখা সাক্ষাতের পালা শেষ করে দুই বন্ধু যখন নিজেদের মধ্যে খবরাখবর নিতে শুরু করল তখন ভ্যালেনটাইন জিজ্ঞাসা করল প্রোটিউসকে— কি গো, তা ভেরোনার হালচাল কেমন? আর তোমার প্রেমিকার কুশল তো? প্রেমের ব্যাপার কতদূর গড়ালো? প্রোটিউস রহস্য করে বলল— তুই যে বড় প্রেমের তত্ত্বতল্লাস করছিস, আগে তো প্রেমের নামে কানে আঙ্গুল দিতিস, এখন তোর হ'লটা কি?

ভ্যালেনটাইন বলল— সে কথা আর কী বলব ভাই, আমার তো গোটা জীবনটাই গেছে বেদখল হয়ে । প্রেম-নিন্দার প্রায়শ্চিত্য করতে এখন প্রাণ যাওয়ার উপক্রম। যে প্রেমকে একদিন উপেক্ষা করতাম সেই প্রেমই এখন আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে প্রতিহিংসা বশে, আর আমার রাতের ঘুমটুকুও কেড়ে নিয়েছে আমাকে বন্দী করে। ভাই প্রোটিউস, আগে কে জানতো বল যে এমনি প্রবল প্রতাপ প্রেমের দেবতার একেবারে এক ঘায়ে আমাকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে তার তেজে, কে জানতো এত পুড়তে হয় তার আগুনে, তবেই না খাঁটি সোনা। কেইবা জানতো তার পূজায় এমন আনন্দ যার তুলনা মেলে না সারা বিশ্বে। প্রেমের কথা ছাড়া আর কোন কথায় আর আমার রুচি নেই— খেতে, শুতে, উঠতে বসতে প্রেম আর প্রেম, এমন কি ঘুমতে ঘুমতেও আমি প্রেমের স্বপ্ন দেখি।

বন্ধুর নিজের মুখে এই প্রেমোন্মাদের স্বীকারোক্তি শুনে প্রোটিউস ভাবল সে তাহলে তার বন্ধুকে এতদিনে কাবু করতে পেরেছে, এটা তারই জয়জয়কার। কিন্তু 'বন্ধু' শব্দটা বুঝি আর প্রোটিউসের মুখে মানায় না, ভ্যালেনটাইনের প্রতি তার বন্ধুত্বে একমুহূর্তেই চিড় ধরে গেছে, কেননা প্রেম নামক সর্বশক্তি সমন্বিতা যে দেবীর কথা তারা আলোচনা করছিল সেই ভয়ঙ্করী এখন গ্রাস করেছে প্রোটিউসের দেহ মন। সিলভিয়ার সংগে প্রথম সাক্ষাতেই প্রোটিউস বিসর্জন দিয়েছে জুলিয়ার প্রতি তার প্রেমের একনিষ্ঠতা, বিসর্জন দিয়েছে ভ্যালেনটাইনের প্রতি অর বন্ধুত্বের বিশ্বস্ততা। সে এখন সব ভুলে সিলভিয়ার প্রতি প্রেমে জরজর— ভ্যালেনটাইনের সঙ্গে তার অবশ্য বন্ধুত্ব এই বিশ্বাসঘাতকতায় একটুও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, সে সিলভিয়ার প্রেমে ভ্যালেনটাইনের পরিবর্তে নিজেকেই অভিষিক্ত করতে উৎসুক। এমন ধারা পরিবর্তনের মুখে হয়তো যারা সচরাচর সৎ প্রকৃতির মানুষ তাদের একটু বিবেকের দংশনে অস্থির অস্থির বোধ হয় — প্রোটিউসেরও যে ভ্যালেনটাইন ও জুলিয়ার কথা ভেবে তা হয়নি তা নয়, তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে এলো প্রেম। প্রোটিউস বিমল আনন্দে জেগে উঠল তার নবীন প্রেমে। নব আনন্দে।

সুযোগেরও অভাব হলনা। বেচারী ভ্যালেনটাইন তার গোপন প্রেমের সব চাবি কাঠির কথাই অকপটে গল্পের ছলে জানিয়ে দিয়েছিল নিজের বন্ধুর কাছে। সে জানিয়েছিল কত সাবধানে তাকে লুকিয়ে প্রেম করতে হচ্ছে সিলভিয়ার সঙ্গে, পাছে ডিউক অর্থাৎ সিলভিয়ার বাবা টের পান। কেননা, ডিউক কিছুতেই এ বিয়েতে সম্মতি দেবেন না। কাজেই বাধ্য হয়ে ভ্যালেনটাইনকে লুকোচুরির পথ বেছে নিতে হয়েছে এবং সেই অনুসারে সে সিলভিয়াকে রাজী করিয়েছে যে সেদিন রাতেই সে তার বাবার প্রাসাদ ছেড়ে চুপি চুপি পালিয়ে আসবে এবং তারা দুজনে পাড়ি দেবে মনটুয়াতে। আর সিলভিয়ার নিশীথ অভিসারে যেহেতু 'মন্দির বাহিরে কঠিন কবাট', তাই তাকে রাত্রির অন্ধকারে, প্রাসাদের একটি জানলা দিয়ে নেমে আসতে হবে দড়ির মই-এর সাহায্যে। ভ্যালেনটাইন সরল বিশ্বাসে সেই অতি প্রয়োজনীয় দড়ির মইটি তার বন্ধুকে দেখিয়েও দিল।

বিশ্বাস করা কঠিন, তবু সত্যি। ভ্যালেনটাইনের এই গোপন কথাগুলি সে অনেক বিশ্বাস নিয়েই জানিয়েছিল তার বন্ধু প্রোটিউসকে। আর মর্মান্তিকভাবে সেই বিশ্বাসভঙ্গ করে প্রোটিউস কথাগুলি শোনামাত্রই চলল ডিউকের কাছে জানাতে।

দুষ্টের ছলনার অভাব হয় না। প্রোটিউস গিয়ে একথা সেকথার পর ডিউককে বলল — দেখুন কথাগুলো বলতে আমার বড় অপরাধ বোধ হচ্ছে—হয়তো প্রকৃত বন্ধুর মত কাজ এ নয়। তবু না-বলাও আরো বড় রকমের অপরাধ, কেননা এর সঙ্গে আপনার ভালোমন্দ মানসম্মান জড়িত। আপনি এত মহৎ, আমার প্রতি আপনি অযাচিতভাবে এত সদয় ব্যবহার করেছেন, তাই আপনাকে এ সংবাদ জানানো আমার কর্তব্য বলেই বিবেচনা করি, যদিও এতে আমার বন্ধু বিচ্ছেদ হবে, কিন্তু পার্থিব সব কিছুর উপরেই আমি কর্তব্যকে স্থান দিই। এবম্বিধ গৌরচন্দ্রিকা করার পর প্রোটিউস আনুপূর্বিক সব কথাই বলল যা সে ভ্যালেনটাইনের মুখে শুনেছে, এমন কি সেই দড়ির মই-এর কথাও বাদ পড়ল না এবং ভ্যালেনটাইনের পোশাকের নীচে কেমন করে সে সেই মইটি লুকিয়ে রেখেছে তা-ও বলে দিল।

প্রোটিউসের কথা শুনে ডিউক মনে করলেন সে বুঝি এই পৃথিবীতে সততার এক পরম বিস্ময়, তার মত সৎ ব্যক্তি অতি বিরল, কেননা বন্ধুর প্রেম ব্যাপারটাই তার কাছে বড় নয়, বন্ধুর অন্যায়কে সে প্রশ্রয় দিতে পরাঙ্মুখ— আহা কী মহৎ মানুষ! ডিউক প্রোটিউসকে কথা দিলেন তিনি ঘুণাক্ষরেও ভ্যালেনটাইনকে জানতে দেবেন না যে। প্রোটিউসের কাছেই তিনি এই গোপন সংবাদটি জেনেছেন। তার পরিবর্তে তিনি এমন এক কৌশলের ফাঁদ পাতবেন যে ভ্যালেনটাইন নিজেই সেই ফাঁদে ধরা দেবে এবং তার চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবে। তিনি অপেক্ষায় রইলেন কখন সন্ধ্যা হবে।

সন্ধ্যা হতে দেরি হল না। ডিউক লক্ষ্য করলেন ভ্যালেনটাইন ছুটতে ছুটতে

চলেছে প্রাসাদের দিকে এবং এ-ও অনুমান করলেন যে তার পোশাকের নিচে কিছু একটা লুকোনো আছে। তাঁর বুঝতে বাকী রইলনা যে সেই বস্তুটিই দড়ির মই।

ডিউক এগিয়ে এসে বললেন — আরে ভ্যালেনটাইন, এত তাড়াহুড়ো করে কোথায় চলেছ? ভ্যালেনটাইন অতি বিনয়ের সংগে বলল — আজ্ঞে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে এক পত্রবাহক, কয়েকটা চিঠি দেশে বন্ধুবান্ধবকে পাঠাতে হবে। তাই লিখে নিয়ে ওকে দিতে যাচ্ছি। প্রোটিউস একদিন যেমন এক মিথ্যা কথার জালে নিজের বাবার কাছে ফ্যাসাদে পড়েছিল, ঠিক তেমনি ফ্যাসাদে পড়ল ভ্যালেনটাইন তার মিথ্যা ওজরে।

ডিউক বললেন— খুব জরুরী বুঝি?

ভ্যালেনটাইন বলল— না, তেমন কিছু নয়, বাবাকে চিঠিতে জানাচ্ছি যে আপনার আতিথেয়তায় কত ভালভাবে এখানে আমার দিন কাটছে।

ডিউক একথা শুনে বললেন— সে আর এমন কি জরুরী, পরে ও-কথা জানালেও চলবে। বরং এদিকে এসো দেখি, তোমার সঙ্গে দু-একটা বিষয় একটু পরামর্শ করে নিতে চাই, আমার নিজের কিছু জরুরী কাজকর্মের ব্যাপারে। অতঃপর তিনি সুকৌশলে একটা গল্প ফাঁদলেন, এটি তার আসল দ্দেশ্যের ভূমিকা মাত্র— আসল উদ্দেশ্যটি ভ্যালেনটাইনের পোশাকের আড়ালের মইটিকে টেনে বের করা। ডিউক বললেন, দ্যাখ বাবা, জানো তো আমি আমার মেয়ে সিলভিয়াকে বিয়ে দিতে চাই থুরিয়োর সঙ্গে, তা মেয়ে তো বেঁকে বসে আছে, আমার কথা সে গ্রাহ্যই করছে না। এমন বেপরোয়া হতচ্ছাড়া মেয়ে—আমি যে তার বাবা এবং সে আমার মেয়ে এই কথাটার সে কোনো মূল্যই দেয় না। ভয়ও পায় না। ওর এই ঔদ্ধত্যের জন্যে ওর উপর আর আমার বিন্দুমাত্র মায়া নেই, দয়াও নেই। তাই আমি বাপু স্থির করে ফেলেছি মেয়ের যখন কর্তব্যবোধই নেই, তখন আর একটা বিয়েই করব আমি, আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে দূর করে দেব বাড়ি থেকে যার সঙ্গে খুশি যে চুলোর দুয়োরে খুশি সে যাক। যদি তার রূপ দেখে তাকে কেউ বিবি করতে চায় করুক। আমাকে অথবা আমার যে বিষয়সম্পত্তি তাকে তো সে থোড়াই কেয়ার করে।

ভ্যালেনটাইন খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ব্যাপারটা ঠিক অনুধাবণ করে উঠতে পারছিল না! তার মাথায়ই আসছিল না এর পরিণতিটা কী হতে পারে। অতএব সে বলল—তা আমাকে আপনি কী করতে আদেশ করেন?

ডিউক বললেন— আরে এ তো অতি সহজ কথা। দ্যাখো যে মেয়েটিকে আমি বউ করে আনব বলে বিবেচনা করেছি সে একটু লাজুক প্রকৃতির, কিন্তু বড় ভাল মেয়ে। কিন্তু একটা বিষয়ে সে একটু বেগড়বাই করছে, তার পছন্দ হচ্ছেনা আমার

এই বুড়ো মানুষের বকবকানি। তা দ্যাখো, আমার তো বাপু বয়স হলো, সেই কবে ছেলেবেলায় প্রেমট্রেম করেছি, হালে তো প্রেমালাপের বহুলাংশে পরিবর্তনও ঘটে গেছে, সেই সব প্রেমালাপেরে হালফ্যাশানী আদব কায়দা দুরস্ত হতে গেলে তোমার সাহায্য আমার চাই, তুমি আমাকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে সেই তরুণীটির গ্রহণযোগ্য করে দাও।

ভ্যালেনটাইন কিছুই অনুমান করতে পারলনা। বোকার মত উৎসাহ নিয়ে তদানীন্তন কালে প্রেমাভিসারের সাধারণ জ্ঞানের ঝুলি ডিউকের কাছে খুলে ধরল— যেমন করে প্রেমিকার চিত্ত জয়ের জন্যে মাঝে মাঝে উপহার নিয়ে যেতে হয়, ঘনঘন তার বাড়িতে কড়া নাড়তে হয়— ইত্যাকার সব বশীকরণ পদ্ধতি।

ডিউক এবার আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বললেন— না বাপু, ঐ উপহার টুপহার সে ছোঁবে না, একবার এক উপহার পাঠিয়ে আমার সে কী হয়রানি, এই মারে তো সেই মারে। আর তাছাড়া তার বাপটাও ভারী বেয়াড়া, দিনের বেলায় আলো থাকতে তার বাড়ির পথ মাড়ানোর উপায় নেই।

ভ্যালেনটাইন ফস করে বলে বসল— কেন দিনে যাওয়ার দরকারটা কি ? রাতেই তো অভিসারের প্রশস্ত সময়।

ধূর্ত ডিউক এতক্ষণে কথায় কথায় বোকা খরগোশটাকে শেয়ালের মত গর্তের মুখে এনে ফেলেছে। ডিউক বললেন— সে তো খুব ভাল কথা, কিন্তু রাতে যে ওদের বাড়ির সদর এমন তালা আঁটা থাকে যে সেখান থেকে মাছিটিও গলতে পারে না।

ভ্যালেনটাইন বেচারার মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ল — তা তালা বন্ধ থাকলো তো কী হয়েছে, আপনি একটা দড়ির মই লাগিয়েই তো সেই মেয়েটির শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়তে পারেন। আর মই আমিই আপনাকে জোগাড় করে দেব, একেবারে যেমনটি দরকার। আর সেই দড়ির মইটি লুকিয়ে রাখতেও কিছু অসুবিধা নেই, এই আমি এখন যেমন আলখাল্লা পরে রয়েছি তেমনি একটা পোশাক পরে নিলেই হল।

ব্যাস আর কথা নয়। ডিউক বললেন — আরে তাই না কী, এতো খুবই ভাল ফন্দি বার করেছ, তা দাও তো দেখি তোমার গায়ের ঐ আলখাল্লাটা। এই বলার সংগে সংগেই তিনি ভ্যালেনটাইনের পোশাকটা টেনে ধরলেন, এবং সেটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে শুধু যে দড়ির মইটিই আবিষ্কার হল অই নয়, তার সংগে বেরিয়ে পড়ল সিলভিয়াকে লেখা একখানি প্রেমপত্র। ডিউক তৎক্ষণাৎই পত্রখানির পাঠোদ্ধার করে নিলেন— যে পত্রের মধ্যে নিহিত ছিল ভ্যালেনটাইনের সংগে তাঁর মেয়ের গৃহত্যাগের যাবতীয় রূপরেখা। এরপর যা ঘটার তাই ঘটল। ভ্যালেনটাইনের কপালে জুটল ডিউকের তিরস্কার, তাকে ডিউক যার-পর-নেই কটূক্তি করে বললেন—

তোমাকে যে অতিথির মর্যাদা দিয়ে এতদিন আদর যত্ন করেছি এই তার উপযুক্ত ব্যবহার বটে— আমারই মেয়েকে তুমি ফুঁসলে নিয়ে পালানোর মতলব করেছিলে— যাও, এই মুহূর্তে এই দরবার থেকে বেরিয়ে যাও, শুধু দরবারই নয় এই মিলান শহরে যেন আর কখনও তোমার মুখ না দেখি। এর পর ভ্যালেনটাইনের আর কিছুই করার রইল না, সে সেই রাত্রেই বাধ্য হল মিলান ত্যাগ করতে, শেষবারের মত সিলভিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎটুকুও করার সুযোগ পেল না।

এদিকে মিলানে প্রোটিউস যখন ভ্যালেনটাইনের সর্বনাশ করে সিলভিয়াকে পাওয়ার খোয়াব দেখছে তখন অন্যদিকে ভেরোনাতে জুলিয়া কিন্তু প্রোটিউসের দেখা না পেয়ে পাগল। প্রোটিউসের বিরহ তাকে এমনই উতলা করে তুলেছে যে তার উচিত ও অনুচিতের বোধ সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার উপক্রম। ফলে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল প্রোটিউসের দেখা পাওয়ার জন্যে ভেরোনা ছেড়ে মিলানে পাড়ি দেবে। কিন্তু পথে তো ভয় আছে, কাজেই নিরাপত্তার জন্য সে এক অভিনব পন্থার আশ্রয় নিল। সে সঙ্গে নিল তার দাসী লুসেটাকে এবং তারা দুজনেই পুরুষের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে বেরিয়ে পড়ল। অনতিকাল পরে নিরাপদেই তারা এসে পৌঁছল মিলানে এবং ঠিক সেই সময়ে তারা এল যখন প্রোটিউসের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মিলান থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তার বন্ধু ভ্যালেনটাইনকে।

জুলিয়া যখন মিলানে এসে পৌঁছাল তখন বেলা প্রায় দুপুর। দেখে শুনে একটা সরাইখানায় সে থাকার ব্যবস্থা করে নিল। থাকার জায়গাটা বড় কথা নয়, তার মাথায় কেবল প্রোটিউসের চিন্তা—কী করে তার সন্ধান পাওয়া যায়। সে ভাবল, সরাইওয়ালার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে যদি কিছু খোঁজখবর পাওয়া যায়। সরাইওয়ালাকে ডাকা হত 'হোস্ট' বলে, জুলিয়া তার হোস্টের সংগে আলাপ জমিয়ে তুলল।

হোস্ট তো মহা খুশি। তার মত একজন সাধারণ সরাইওয়ালার সঙ্গে ভাল বংশের এমন সুন্দর একজন যুবক এমন মন খুলে গল্পগুজব করবে তা সে আশাই করতে পারে নি। জুলিয়ার ছদ্মবেশের জন্যে স্বভাবতই তাকে সরাইওয়ালা যুবক বলেই ধরে নিয়েছিল। সে যাই হোক, সরাইওয়ালা মানুষটি ছিল সাদাসিধে, কাজেই আলাপরত যুবকটিকে মনমরা মনমরা মতন দেখে তার বড় মায়া হল— সে তার অতিথির মনোরঞ্জনের জন্য তাকে সঙ্গে করে এক গানের আসরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিল। সেই আসরের উদ্দেশ্য এক প্রেমিক যুবক কর্তৃক সেই সন্ধ্যায় তার প্রণয়িনীর জানলায় নীচে খোলা জায়গায় গান গেয়ে তার চিত্তবিনোদন।

জুলিয়ার বিষণ্নতার কারণ কিন্তু একটু অন্য ধরনের। তার মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তার ঐ পুরুষালি পোশাক দেখে প্রোটিউস হয়তো বিরক্ত হবে, কেননা তার ধারণা ছিল প্রোটিউস তাকে ভালবাসতো তার কুমারীসুলভ অহংকার ও চারিত্রিক মর্যাদাবোধের জন্য। তার ভয় হল প্রোটিউসের চোখে সে ছোট হয়ে যাবে। এই

দুর্ভাবনার ভারেই তার যত অশান্তি ও মানসিক বিষাদ।

হোস্টের প্রস্তাবে সে আনন্দের সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল, সে যেতে চাইল গানের আসরে। মনে মনে তার আশা ছিল যদি এই উপায়ে সে একবার প্রোটিউসের দেখা পেয়ে যায়, লুকিয়ে তাকে দেখার সুযোগ।

অতএব সন্ধ্যা হতেই জুলিয়া হোস্টের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল এবং গিয়ে উপস্থিত হল ডিউকের প্রাসাদের কাছে, সিলভিয়ার অলিন্দের নীচে। সেখানেই গানের ব্যবস্থা। অনেক আশা নিয়ে জুলিয়া গিয়েছে, কিন্তু হায়, তার কপালই মন্দ। সেখানে গিয়ে সে যা দেখল তা সে ভাবতেও পারেনি। সে দেখল তারই প্রণয়ী প্রোটিউস আজ বিশ্বাসঘাতকের মত তাকে ছেড়ে গান গেয়ে সিলভিয়ার প্রতি প্রেম নিবেদন করছে। জুলিয়া আড়ালে থেকে শুনতে পেল জানলার পথে সিলভিয়ার কথা। সিলভিয়া সেখান থেকে গালিগালাজ করছিল প্রোটিউসকে তার বন্ধু ভ্যালেনটাইনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে এবং জুলিয়াকে ত্যাগ করার অপরাধে। জুলিয়া আরও দেখল সিলভিয়া তারপর জানলা ছেড়ে ভিতরে চলে গেল, কেননা তার মন পড়ে ছিল ভ্যালেনটাইনের প্রতি এবং প্রোটিউসের মত অসৎ ও বিশ্বাসনষ্টকারী বন্ধুকে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। এ দৃশ্য দেখার পর স্বভাবতই প্রোটিউসের সম্পর্কে জুলিয়ার একেবারেই হতাশ হয়ে যাওয়ার কথা। সে হতাশ হয়ে পড়েছিল তা-ও সত্যি, তবু বিপথগামী প্রোটিউসকে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না, তার ভালবাসা দিয়ে সে তাকে জয় করবে—এই ভেবেই সে আশায় বুক বাঁধল। এমন সময় সে শুনল অল্প কিছুকাল আগে প্রোটিউস বুঝি তার বাচ্ছা চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। এই শুনে সে তার হোস্টের শরণাপন্ন হল, যদি সে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে প্রোটিউসের সঙ্গে দেখা করে চাকরের খালি পদটি তাকে জোগাড় করে দিতে পারে। হোস্টের সাহায্যে কাজটা জুটেও গেল, প্রোটিউস অনুমানও করতে পারল না যে তার ভৃত্যটি স্বয়ং জুলিয়া। ভৃত্য রূপে জুলিয়ার কাজ হল প্রোটিউসের চিঠিপত্র অথবা উপহার সামগ্রী নিয়ে সিলভিয়ার সংগে সাক্ষাৎ করা। এমনি ভাবে উপহার বইতে বইতে একদিন আরও মর্মান্তিক এক আঘাত তাকে পেতে হল যখন সে দেখল তারই হাত দিয়ে প্রোটিউস সিলভিয়াকে পাঠাচ্ছে একটি অঙ্গুরীয়, যে অঙ্গুরীয়টি সে-ই দিয়েছিল প্রোটিউসকে ভেরোনা ছেড়ে যখন সে আসে — এবং সে কোনদিনই হাত থেকে খুলবে না বলে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল।

আংটিটি নিয়ে জুলিয়া উপস্থিত হল সিলভিয়ার কাছে। আংটি গ্রহণ করা তো দূরের কথা, প্রোটিউসের পাণিপ্রার্থনার আরজিটি সরাসরি খারিজ করে দিল সিলভিয়া। ভ্যালেনটাইনের স্থানে সে অপর কাউকেই বরণ করতে প্রস্তুত নয়, প্রোটিউসের মত খলনায়কের তো প্রশ্নই ওঠে না। সিলভিয়ার এই প্রোটিউসবিদ্বেষে জুলিয়া মনে মনে খুবই খুশি হল। এবার সে ভরসা পেয়ে বেশ মন খুলে আলাপ করতে

শুরু করল সিলভিয়ার সঙ্গে — অবশ্য তার প্রকৃত পরিচয় গোপণ রেখে সে প্রোটিউসের ভৃত্য সেবাসটিয়ান বলেই নিজেকে চালিয়ে যাচ্ছিল। আলাপের ছলে সেবাসটিয়ান বলল প্রোটিউসের কুকীর্তির কথা, কেমন করে সে তার প্রথম প্রণয়িনী জুলিয়াকে ত্যাগ করেছে। সে বলল, জুলিয়াকে সে ভাল করেই চেনে এবং জানে কত ভাল প্রকৃতির মেয়ে সে। এ-ও সে জানে কত সরল মনে জুলিয়া ভালবাসে প্রোটিউসকে এবং তার সেই ভালবাসার ফলে সে কত বড় আঘাত পেয়েছে প্রোটিউসের এই ব্যভিচারে। এরপর সে অতি সাবধানে দ্ব্যর্থক ভাষায় বলতে শুরু করল— জানেন দিদি, জুলিয়া লম্বায় প্রায় আমারই মত, আমারই মত তার গায়ের রং, তার চুলের রং এমন কি চোখের মণিও আমার ঠিক যেমনটি। বস্তুত পুরুষের পোশাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল জুলিয়াকে, খাসা একটি নবীন যুবক। সমস্ত কথা শোনার পর পরিত্যক্তা জুলিয়ার জন্য সিলভিয়ার মনে করুণার উদ্রেক হল এবং আবার যখন জুলিয়াপ্রেটিউস প্রেরিত আংটিটি তার দিকে এগিয়ে দিতে উদ্যত হল সে বলল— নিয়ে যাও ঐ আংটি। তার লজ্জা করে না ঐ আংটি আমাকে পাঠাতে? আমি নিজেও প্রোটিউসের মুখে আগে শুনেছি যে ওটা তাকে জুলিয়াই দিয়েছিল। হ্যাঁ ভাই, তোমাকেও আমার খুব ভাল লাগছে, কেননা তুমি সেই অবস্থায় জুলিয়ার দুঃখে নিজেও ব্যথিত হয়েছ। এই নাও আমার টাকার থলিটি, এতে কিছু অর্থ আছে, জুলিয়ার হয়ে এটা আমি তোমাকে দিচ্ছি। সম্প্রতি প্রোটিউসের প্রেমে তার ভাগীদার সিলভিয়ার কাছ থেকে এই সহৃদয় ব্যবহার পেয়ে ছদ্মবেশী জুলিয়ার মন অনেকটাই শান্ত হল।

এবার আমরা আবার ভ্যালেনটাইনের কথায় আসি। ডিউকের দরবার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সে চলেছে যে দিকে দুচোখ যায়। জানে না কোথায় সে যাবে, কোথায় তার আশ্রয়। দেশে ফিরে বাবার সামনে দাঁড়ানোর মুখ আর নেই — অপমানে আর লজ্জায় সে আজ মিলান থেকে বিতাড়িত। নিজের কপালের কথা ভাবতে ভাবতে সে ঢুকে পড়ল একটা জঙ্গলের পথে। একেবারে জনশূন্য সে জঙ্গল, কিন্তু মিলান থেকে দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়, যে মিলানে সে তার চোখের মণি সিলভিয়াকে ফেলে এসেছে। অন্যমনস্কভাবে সে চলছে তো চলছেই, এমন সময় একদল ডাকাত এসে তার পথ আটকে ধরল। ডাকাতরা বলল — দে, যা আছে তোর কাছে।

ভ্যালেনটাইন খুব নরম সুরে বলল— দ্যাখ ভাই, আমি বড় হতভাগা। ভাগ্যচক্রে আজ আমাকে ঘর ছেড়ে বনবাসে যেতে হচ্ছে। আমি আজ পথের ফকির-কপর্দক শূন্য— শুধু এই পরণের জামাকাপড় ছাড়া আর কিছুই আমার সম্বল নেই।

ডাকাতরা ভ্যালেনটাইনের দুঃখের কথা শুনে তার উপর সদয় হল, তাছাড়া তার কথাবার্তা শুনে তারা বুঝল সে ভাল বংশের ছেলে এবং তার মধ্যে বেশ একটা পৌরুষের ভাবও আছে। কাজেই তাকে তারা একটা প্রস্তাব দিল। তারা

বলল— দ্যাখো, তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। তবে তোমাকে আমরা আমাদের সর্দারের সম্মান দিয়ে রাখবো— তুমি হবে আমাদের সেনাপতি, আমরা সবাই তোমার অধীনে তোমার আদেশ অনুযায়ী চলব। তবে একটা শর্ত — যদি তুমি আমাদের এই প্রস্তাবে রাজী না হও তবে তোমাকে আমরা এখুনি খুন করে ফেলব।

অন্ধের কী বা দিন কী বা রাত— ভ্যালেনটাইন ভাবল আমার আর ভালোই বা কী মন্দই বা কী— কাজেই ওদের প্রস্তাবে স্বীকৃতি দেওয়াই ভাল। সে বলল, ঠিক আছে, আমি রাজী, তবে একটা শর্ত আমার আছে, তোমরা কখনও স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করবে না এবং গরীব যাত্রীর উপরেও কোনো জুলুম করতে পারবে না।

অতএব ভাগ্যের বিড়ম্বনায় অভিজাতবংশীয় ভ্যালেনটাইন হয়ে দাঁড়াল গাথা-কবিতায় বর্ণিত সেই রবিনহুডের মত, সমাজবহিষ্কৃত দস্যুদলের অধিনায়ক রবিনহুড। ঠিক এমনি সময়ে আবার ভাগ্যক্রমে তার দেখা হয়ে গেল সিলভিয়ার সঙ্গে। সে আবার আর এক উপাখ্যান।

আমরা জানি, সিলভিয়ার সঙ্গে থুরিয়োর বিয়ে দেওয়ার জন্যে তার বাবা মিলানের ডিউক ছিলেন এককাট্টা। বাবার পীড়াপীড়ির ফলে অতিষ্ঠ হয়ে সিলভিয়া শেষ পর্যন্ত স্থির করল সে ভ্যালেনটাইনের সন্ধানে যাবে মনটুয়াতে, কেননা সে শুনেছিল ভ্যালেনটাইন মনটুয়াতেই যাবে। কিন্তু ভ্যালেনটাইনের ব্যাপারটা তো ইতিমধ্যে তালগোল পাকিয়ে অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে — সে এখন জঙ্গলের বাসিন্দা, দস্যুদলের অধিনায়ক হিসাবেই পরিচিত, যদিও দস্যুদের লুটকরা টাকাকড়ি সে স্পর্শও করত না, তার একমাত্র কাজ ছিল দস্যুদের খবরদারি করা, তাদের আদেশ দেওয়া এবং লক্ষ্য রাখা যাতে কীনা তারা অসহায় পথচারীর উপর জোর-জুলুম না করে।

পিতার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়া সোজা, কিন্তু রাস্তায় তো বিপদ আছে। তার উপর সিলভিয়া সুন্দরী এবং অল্পবয়স্কা নারী। সে একটি উপায় অবলম্বন করল পথের নিরাপত্তার জন্য। তার পিতার রাজদরবারেই একজন সৎ ও বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সে পথের সাথী করে নিল। ভদ্রলোকের নাম ইগলাম্যুর। পথ পার হতে ঐ জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই তাদের চলতে হচ্ছে, যেখানে থাকত ভ্যালেনটাইন ও তার ডাকাতের দল। এমন সময় একজন ডাকাতের চোখ পড়ল তাদের উপর আর সঙ্গে সঙ্গে সে পাকড়াও করল সিলভিয়াকে — ইগলাম্যুর ধরা পড়তে পড়তে কোনরকমে তাদের হাতছাড়া হয়ে পালিয়ে গেল।

ডাকাতটা দেখল ধরা পড়া মেয়েটা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। সে বলল, আরে ভয়ের কিছু নেই, তোমাকে আমি কিছু বলব না, শুধু তোমাকে ধরে নিয়ে যাব আমাদের গুহার ভিতরে। সেখানে আছেন আমাদের ক্যাপটেন। তাঁকেও ভয় পাওয়ার

কারণ নেই, তিনি অতি সজ্জন মানুষ এবং কখনই মেয়েদের উপর কোন অত্যাচার বরদাস্ত করেন না, অতি দয়ালু প্রকৃতির ব্যবহার তাঁর। ডাকাত দলের সর্দারের কাছে তাকে বন্দী করে নিয়ে হাজির করা হবে এবং সেই সর্দার অতি সজ্জন ব্যক্তি— এসব স্তোকবাক্যে সিলভিয়া আদৌ ভরসা পেল না। সে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো— হায় ভ্যালেনটাইন, আজ আমাকে তোমার জন্যই এত সব সহ্য করতে হল।

ঠিক এই সময়ে, যখন ডাকাতটা সিলভিয়াকে নিয়ে এগোচ্ছে তাদের গুহার দিকে, সেখানে এসে পড়ল প্রোটিউস, আর তার পিছন পিছন ভৃত্য বেশে জুলিয়া। প্রোটিউস যে মুহূর্তে রাজদরবারে সংবাদ পেয়েছিল সিলভিয়ার অন্তর্ধানের, সে আর কাল বিলম্ব না করে তার অনুসরণে ঢুকে পড়েছিল এই বনের মধ্যে। প্রোটিউস তৎপরতার সঙ্গে ডাকাতটার হাত থেকে উদ্ধার করল সিলভিয়াকে— আর সিলভিয়া এই উপকারের জন্য তাকে ধন্যবাদ দেবে কি, তার আগেই প্রোটিউস শুরু করল তার স্বভাবসিদ্ধ প্রেম নিবেদন। সিলভিয়া যতই বিরক্ত হয়ে উঠছে সে ততই জোর গলায় প্রেমের দাবী ফলাতে লাগল। বেচারী জুলিয়া ভৃত্যের বেশে দাঁড়িয়ে একটি কথাও বলতে পারছে না, সে শুধু ভয় পাচ্ছে যদি ডাকাতের হাত থেকে বাঁচানোর কৃতজ্ঞতাবশে সিলভিয়া প্রোটিউসকে বিয়ে করার সম্মতি দিয়ে দেয়। কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে— ঠিক এই বিপদের সময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয় ভ্যালেনটাইন। সে শুনেছে তার দলের মানুষ একটি মেয়েকে ধরে রেখেছে, তাই শুনে সে তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ছুটে এসেছে।

প্রোটিউস তো এতক্ষণ সিলভিয়াকে প্রবল পরাক্রমে প্রেম নিবেদনে মত্ত ছিল, এবার ভ্যালেনটাইনকে দেখে তার ভূত দেখার অবস্থা হল। সে আশাই করেনি এমন একটা পরিস্থিতি হতে পারে। এই অবস্থায় আপনা থেকেই তার মনে অনুশোচনার সূত্রপাত হল, সে প্রকৃতই নিজের আচরণে দুঃখিত হয়ে দুঃখ জানাল বন্ধু ভ্যালেনটাইনকে এবং নিজের কৃত কর্মের জন্যে তার কাছে মাপ চাইল। ভ্যালেনটাইন স্বভাবতই ছিল মহৎ প্রকৃতির এবং উদার, এমন কি তার মধ্যে কিছুমাত্রায় ভাবের আতিশয্যও ছিল যাকে বলে রোমান্টিক। সে প্রোটিউসের ক্ষমা প্রার্থনার উত্তরে তাকে শুধু ক্ষমা করা নয়, পুরনো বন্ধু হিসেবে আবার গ্রহণ করল। উপরন্তু, সে আরও একটি গোলমাল পাকিয়ে তুলল ভাবের অতিশয্যে—সে প্রোটিউসকে বলল— হ্যাঁ ভাই, আজ থেকে সিলভিয়ার প্রতি আমার ভালবাসা আমি ভুলে যাব, আজ থেকে আমি তোমাকেই দিলাম তাকে প্রেমের অধিকার। একথা শুনে ভৃত্যবেশী জুলিয়ার তো মাথায় বাজ পড়লো। সে ভাবলো এ কেমন অদ্ভুত ব্যাপার। সে আরও ভাবলো প্রোটিউসের যেটুকু বা বিবেকের দংশনে চিত্তশুদ্ধি ঘটেছিল তা বুঝি আর সে রাখতে পারবে না, সে সিলভিয়াকেই ফিরে গ্রহণ করবে প্রেমিকা রূপে। ভয়ে ও দুর্ভাবনায় জুলিয়া জ্ঞান হারালো, সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো। তার

মূর্চ্ছা দেখে সকলেই তার দিকে ঝুঁকে পড়ল সেবা-শুশ্রুষার জন্যে, নতুবা এতক্ষণে সিলভিয়া রেগে আগুন হয় যেতো তাকে নিয়ে দুই বন্ধুর এমন হাত বদলের জন্যে। সে অবশ্য মনে মনে জানত যে ভ্যালেনটাইনের এই ভাবাবেগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না এবং বন্ধুর প্রতি এতটা দাক্ষিণ্য সে বরাবর কিছুতেই দেখাতে পারবে না।

কিছুক্ষণ বাদে জুলিয়ার যখন জ্ঞান ফিরে এল সে তখন একটি আংটি হাতে নিয়ে বলল— আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমার প্রভু এই আংটিটি দিতে বলেছিলেন সিলভিয়াকে। আংটিটার দিকে চোখ পড়তেই প্রোটিউস বুঝতে পারল এটি সেই আংটিই যা সে একদিন দিয়েছিল জুলিয়াকে, জুলিয়ার কাছে পাওয়া আংটির বিনিময়ে। এখন সে সেই আংটিটিই আবার পাঠিয়েছিল সিলভিয়াকে ভৃত্যের হাত দিয়ে, অর্থাৎ ভৃত্যের ছদ্মবেশে জুলিয়ার হাত দিয়ে। সে বলে উঠল— এ কেমন করে হল? এতো জুলিয়ার আংটি, তুই এটা কী করে পেলি, হ্যাঁরে ছোকরা? জুলিয়া বলল— জুলিয়াই আমাকে এটা দিয়েছে, আর এটা এখানে নিয়ে এসেছে জুলিয়া নিজেই।

এতক্ষণে প্রোটিউসের চোখ খুলল। সে ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারল তার ভৃত্য সেবাসটিয়ান অন্য কেউ নয়, সে-ই জুলিয়া। এবার সে নিজের ভুল বুঝতে পারল এবং উপলব্ধি করল কী নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে জুলিয়া তার জন্যে এতদূর এসেছে, তারই ভালবাসায়। এই উপলব্ধির ফলে তার মনে জুলিয়ার জন্যে ভালবাসা আবার আগের মতই জেগে উঠল এবং সে তাকে পাওয়ার জন্যে পরমানন্দে সিলভিয়াকে তুলে দিল ভ্যালেনটাইনের হাতে, যার দাবী সিলভিয়ার উপর সবার বেশি।

প্রোটিউস এবং ভ্যালেনটাইন আবার তাদের পুরোনো বন্ধুত্ব ফিরে পাওয়াতে এবং যার যার যোগ্য প্রেমিকাকে লাভ করাতে যখন আনন্দের আতিশয্যে হৈ হুল্লোড় করছে ঠিক সেই সময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, মিলানের ডিউক স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গে থুরিয়ো। সিলভিয়ার সন্ধানেই তাঁরা এখানে এসে পৌঁছেছেন।

থুরিয়োর আর দেরী সয়না, সে এগিয়ে গেল সিলভিয়াকে হাতধরে টেনে আনতে এবং চেঁচিয়ে উঠল— সিলভিয়া আমারই। সঙ্গে সঙ্গে ভ্যালেনটাইন জোর গলায় প্রতিবাদের সুরে বলল— সাবধান থুরিয়ো, আর এক পা যদি এগিয়েছো কিংবা মুখে যদি ওকথা আবার উচ্চারণ করেছ তাহলে তোমাকে বেঁচে ফিরতে হবে না। এই তো, দাঁড়িয়ে আছে সিলভিয়া, একবার কাছে এসো তো ওর, দেখি তোমার ঘাড়ে কটা মাথা। মাথার কথা শুনে ঘাবড়ে গেল থুরিয়ো, সে আসলে ছিল ভীতু এবং কাপুরুষ। তাই পিছিয়ে গিয়ে হামবড়াই দেখিয়ে বলতে লাগল— আমার বয়েই গেছে সিলভিয়ার জন্যে আমি কি এতই বোকা যে, যে-মেয়ে আমাকে চায় না তার জন্য লড়তে যাবো?

ডিউক নিজে ছিলেন সাহসী, তাই কাপুরুষকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। থুরিয়োর রকম-সকম দেখে তিনি রাগে ও উত্তেজনায় বললেন—তুমি নিতান্ত হীন ও লম্পট বলেই আমার মেয়েকে হাত ধরে টেনে নিয়ে আসতে চেয়েছিলে আর সামান্য ভয়েই তাকে ত্যাগ করতে তোমার দেরী হল না।

এবার ভ্যালেনটাইনের দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে তিনি বললেন— সাবাস তোমাকে ভ্যালেনটাইন। তোমার মত সাহসী যুবক যে কোনো সাম্রাজ্ঞীর ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য। সিলভিয়াকে আমি তোমাকেই দান করলাম, তুমিই তোমার যোগ্যতায় তাকে অর্জন করেছ। ভ্যালেনটাইনও অতি নম্র বিনয়ের সঙ্গে ডিউকের হাতে চুমু দিল এবং তাঁর দেওয়া অমূল্য সম্পদ তাঁর কন্যাকে যথোচিত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করল। আর এই আনন্দের মুহূর্তে সে সদাশয় ডিউকের কাছে প্রার্থনা জানাল এই বনবাসকালে তার সহচর চোরডাকাতদের ক্ষমা করার জন্য। সে তাদের পক্ষ নিয়ে বলল যে সমাজজীবনে ফিরে গেলে তাদের মধ্যে থেকেই পাওয়া যাবে অনেক যোগ্য মানুষ যারা উচ্চতর কাজে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাতে পারবে। এর কারণ এদের মধ্যে কেউই কোনো হীন অপরাধে লিপ্ত হয়ে সমাজ থেকে বিতাড়িত হয় নি, এদের যা কিছু অপরাধ তা মানুষের উপকারে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ভ্যালেনটাইনের প্রস্তাব ডিউক এক কথায় মেনে নিলেন। এরপর আর কিছুই বাকী রইল না। শুধুমাত্র বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্যস্বরূপ প্রোটিউসকে ডিউকের কাছে তার যাবতীয় ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ দিতে হল। এই বিবরণের মধ্যে তার আত্মগ্লানির এবং জাগ্রত বিবেকের যে পরিচয় ধরা পড়ল তা তার শাস্তির পক্ষে যথেষ্টই বলা যায়। কারো মনে আর কোনো ক্ষোভ রইল না। প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সকলেই ফিরে এল মিলানে— ডিউকের সাক্ষাতে মহাসমারোহে বেজে উঠল বিয়ের সানাই।

দ্যা মার্চেন্ট অব ভেনিস

ভেনিস নগরের বাসিন্দা, পেশায় সে কুসীদজীবী, অর্থাৎ তেজারতি তার ব্যবসা, আর নাম তার শাইলক, যদিও শাইলক দি জু নামেই সে সর্বাধিক পরিচিত। জাতিতে ইহুদি বলেই লোকে শাইলককে 'জু' বলত তাই নয়, 'জু' কথাটা তারা সুদখোর অর্থেই ব্যবহার করত। শাইলক দ্যা জু আর চামার সুদখোর শাইলক, ভেনিসের ব্যবসায়ী বণিকমহলে হয়ে গিয়েছিল সমার্থক। খ্রীষ্টান ব্যবসায়ীদের চড়া সুদে টাকা ধার দিত শাইলক আর ঐ সুদের টাকা দিনে দিনে পাহাড়প্রমাণ জমে গিয়ে তাকে করে তুলেছিল প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক। দয়ামায়ার বালাই ছিলনা শাইলকের হৃদয়ে, ধার দেওয়া টাকা আদায়ের ব্যাপারে সে নির্মম, আর সেই কারণেই ভদ্রসমাজে সে হয়ে গিয়েছিল অতি মাত্রায় অপ্রিয়। তার এই প্রকৃতির জন্যে তার প্রতি সবচেয়ে বিরূপ যে ছিল সে ঐ ভেনিস নগরীরই অপর এক নবীন ব্যবসায়ী, নাম অ্যান্টোনিও। শাইলকও ঘৃণা করত অ্যান্টোনিওকে, যার-পর-নেই ঘৃণা, আর তার কারণ মানুষের আপদে-বিপদে টাকা ধার দিত অ্যান্টোনিও এবং সে টাকায় সে সুদ নিত না কখনই। স্বাভাবতই অর্থলোভী শাইলকের সঙ্গে উদারহৃদয় অ্যান্টোনিওর শত্রুতা লেগেই ছিল। বণিকদের বিনিময়কেন্দ্র অর্থাৎ রিয়ালটোতে এই দুই প্রতিপক্ষের যখনই সাক্ষাৎ হত তখন অ্যান্টোনিও শাইলককে তার অতিরিক্ত মাত্রায় সুদ নেওয়ার জন্যে এবং নির্মম প্রকৃতির কারণে গালমন্দ করত। শাইলক বিনা প্রতিবাদে মুখ বুঁজে সহ্য করে যেত সেই ব্যবহার, কিন্তু মনে মনে সে অপেক্ষায় ছিল প্রতিহিংসার দিন যেদিন আসবে----।

মানুষের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্যে অ্যান্টোনিওর তুলনা মেলা ভার, যেমন তার ভদ্র আচরণ তেমনি মানুষের প্রতি সৌজন্য প্রকাশে সে নিয়ত ক্লান্তিহীন—সত্যিই তার সমকালীন ইটালিতে প্রাচীন রোমান বলতে যে গুণাবলী বোঝায় তার সম্যক বিকাশ হয়েছিল তারই চরিত্রে। সকলের কাছেই সে সমান প্রিয় কিন্তু তার অতি প্রিয় বন্ধু বলতে যে ছিল সে একমাত্র ব্যাসানিও। ব্যাসানিও ছিল ভেনিসের এক অতি অভিজাত নাগরিক, কিন্তু তাহলে কী হবে, যে সামান্য পিতৃধন সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল তার সবটুকুই ব্যয় হয়ে গিয়েছিল তার ধনীসুলভ ব্যয়বহুল জীবনযাত্রায়, যে ধরনের ঘটনা এই শ্রেণীর যুবকদের ক্ষেত্রে প্রায়শই ঘটতে দেখা যায়। আর যখনই টাকায় টান পড়ত অ্যান্টোনিও তার দিকে হাত বাড়িয়েই ছিল—যেন এই দুটি বন্ধুর সম্পর্ক শুধু এক প্রাণই নয়, এক ধনও বটে।

কাহিনীর সূত্রপাত ঐ ব্যাসানিওকে নিয়েই। একদিন সে এসে উপস্থিত অ্যান্টোনিওর কাছে—বলল, ভাই নিজের ভাঙা কপালটাকে জোড়া লাগানোর একটা সুবর্ণ সুযোগ

পেয়ে গেছি। একটি মহিলাকে আমি দারুণ ভালবাসি, অনেকদিনের ভালবাসা, আর সেই মেয়েটির ধনসম্পত্তি প্রচুর। সম্প্রতি তার পিতৃবিয়োগের ফলে পিতার যাবতীয় ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার বর্তেছে তারই উপর। ওর বাবা জীবিত থাকা কালেই ওদের বাড়িতে আমার যাওয়া আসারও বাধা ছিলনা, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ সময়ে মেয়েটির চোখে-মুখে আমি লক্ষ্য করেছি নির্বাক প্রতিশ্রুতি, কাজেই পাত্র হিসাবে আমি বোধ করি তার অপছন্দের কারণ হব না। কিন্তু ভাই তুমি তো জানো, আমার তো ভাঁড়ে মা ভবানী, কিন্তু এমন এক বিত্তশালী পাত্রীর যোগ্য পাত্র হিসাবে সেখানে যেতে হলে একটু ঢাকঢোল পেয়াদা গোমস্তা না-হলে কি ভালো দেখায়? তাই বলি, তোমার কাছে আমার ঋণের তো কুলকিনারা নেই। এবারটা দেখি পাশার এই দানটায় যদি ভাগ্য ফেরাতে পারি, তা তুমি আমাকে হাজার তিনেক ডুকাট এবারকার মত ধার দাও। কি বল?

অ্যান্টোনিও একটু মুস্কিলেই পড়ল—তার হাত তখনকার মত একেবারেই খালি। তবে সে তো আর কপর্দকশূন্য নয়, কেননা তার বাণিজ্যতরীগুলি অচিরেই নানা বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে ভেনিসের কূলে এসে ভিড়বে এবং এ-কথা সে জানতো। কাজেই সে বলল, ঠিক আছে, এতে আর এত ভাবনা কিসের, ঐ ধনী সুদখোর শাইলকটার কাছে গেলেই সব সমস্যা মিটে যাবে, আমার তিনখানা জাহাজের বিনিময়ে ওর কাছে টাকাটা ধার নিলেই চলবে।

দুই বন্ধু চলল শাইলকের কাছে। সেখানে গিয়ে অ্যান্টোনিও বলল, মশাই আমাকে তিন হাজারের মত ডুকাট ধার দিতে হবে, আর তার সুদ হিসাবে আপনার যত খুশি ধরতে পারেন, আমার যে জাহাজগুলি বাণিজ্য করে ফিরে আসছে তার অপেক্ষায় যে-কটা দিন, আপনার যাবতীয় দেনা সুদসমেত পেয়ে যাবেন। কথাটা শুনেই শাইলক মনে মনে পরিকল্পনাটা স্থির করে নিল—'হ্যাঁ যদি ওকে একবার বাগে পাই, পুরোনো যতো ঝাল সবই একবারে ঝেড়ে নেব; ও কীনা আমাদের ইহুদি জাতিকে অবজ্ঞা দেখায়, ও টাকা ধার দেয় বিনা সুদে; অন্যান্য বনিকদের মাঝখানেই গালিগালাজ করতে থাকে আমাকে আর আমার সদোপায়ে উপার্জিত অর্থকে। ও বলে আমার সেই উপার্জন নাকী সুদখোরের ইতরামি। আমি ওকে আজ বাগে পেয়েছি, যদি না মজা দেখাই তবে জাহান্নমে যাক আমার ইহুদি জাতি!' অ্যান্টোনিও যখন দেখল শাইলক কেবল নিজের মনে কীসব ভাবছে, তার কথার কোনো জবাবই নেই, তখন সে টাকাটা হাতে আসার অপেক্ষায় অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল ওহে শাইলক, কানে কথা ঢুকছে, টাকাটা ধার দেবে কী না?' উত্তরে শাইলক বলল: 'সীনিঅ্যর অ্যান্টোনিও রিয়ালটোতে দাঁড়িয়ে বহুবার তুমি যা না তাই বলেছ আমাকে, আমার টাকাকড়ি নিয়ে, আমার তেজারতি ব্যবসা নিয়ে, আমি তোমার কোনো কথা গায়ে মাখিনি, মুখ বুঁজে সয়েই গিয়েছি। কেননা নীরবে দুঃখ বহনেরটীকা

নিয়ে তবেই আমরা ইহুদি ; তাছাড়াও আমাকে তুমি গাল দিয়েছ নাস্তিক বলে, বলেছ কসাই, আমার গায়ের পবিত্র জাতীয় পোশাকে থুথু দিয়েছ, তোমার ঐ পায়ে লাথি মেরেছ আমাকে যেন পথের খেঁকি কুকুর আমি। তা বেশ, এখন তো দেখছি আমারই সাহায্য তোমার দরকার হয়ে পড়েছে ; তুমিই এসেছ আমার কাছে, তুমিই বলছ, 'শাইলক কিছু টাকা ধার দাও না'। তা বাপু, কুত্তার আবার টাকা থাকে না কি ? এ-ও কি সম্ভব যে একটা কুকুর ধার দেবে তিন হাজার ডুকাট ? তা তোমার কি মনে হয়, আমি গড় হয়ে বলি, আসুন আসুন, মহাশয় ব্যক্তি আপনি, এই তো গত বুধবারে আপনি থুথু দিয়েছিলেন আমার গায়ে, আর এই সেদিন আমাকে সম্ভাষণ করেছিলেন সারমেয় বলে, আর এই সব ভদ্র আচরণের বিনিময়ে আপনাকে টাকা ধার তো দিতেই হয়—তাই না ?' অ্যান্টোনিও বলল : বেশ করেছি, আবারও তোমাকে যা খুশি বলব, গায়ে থুথু দেব, লাথিও আবার মারব। আমাকে টাকা ধার দিয়ে তুমি বন্ধুবাৎসল্য দেখাবে সে জন্যে আমি আসিনি, তোমার মিত্র নয় শত্রু হিসাবেই টাকা ধার দাও। আর যদি সময় মত ফেরৎ দিতে না পারি তবে নির্বিবাদে তোমার পাওনা সুদে পুষিয়ে নিও। শাইলক বলল—আরে বাপরে, তুমি দেখি রেগেই আগুন, ওসব পুরোনো কথা থাক। না-হয় বন্ধু বলেই এখন থেকে আমাকে ভাবো, আমি তোমার ভালবাসাটুকু পেলেই খুশি। এ যাবৎ তোমার কাছে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছি ঠিকই, তবে সে-সব কথা ছেড়ে দাও। তা তোমার যা টাকার দরকার তা বন্ধুর মতই দিচ্ছি, আর ওর বাবদ সুদের কথা মুখেও এনো না।' শাইলকের এই আপাতমধুর ব্যবহারে অ্যান্টোনিও তো রীতিমত অবাক। শাইলক তার ভদ্র আচরণে আরও একধাপ এগিয়ে বলল যে তার এই বিনা সুদে টাকা ধার দেওয়াটা আসলে অ্যান্টোনিওর ভালোবাসা লাভের উদ্দেশ্যেই, তিন হাজার ডুকাট ঐ ভালবাসার জন্যে সামান্যই, আর সেজন্যে সুদ নেওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। তবে এই উপলক্ষে অ্যান্টোনিওকে নিয়ে সে তার উকিলের কাছে একটিবারের জন্যে যাবে এবং একটু কৌতুকের জন্যে অ্যান্টোনিওকে একটা চুক্তিপত্রে সই দিতে হবে। মজাটা আর কিছুই নয়, শুধু একটা শর্ত থাকবে যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যদি অ্যান্টোনিও টাকাটা ফিরিয়ে দিতে না পারে তাহলে খেসারত স্বরূপ শাইলক তার খুশিমত অ্যান্টোনিওর শরীরের যেখান থেকে ইচ্ছা এক পাউণ্ড মাংস দাবী করতে পারবে।

'বহুৎ আচ্ছা', বলল অ্যান্টোনিও—'ওই বণ্ডে আমি সই দিতে প্রস্তুত। আর অবশ্যই বলব শাইলক জ্যু হলে হবে কী, তার মধ্যে একটু মানুষ্যত্বও আছে।'

ব্যাপারটা ব্যাসানিওর আদৌ মনঃপূত হল না। সে বন্ধুকে নিষেধ করল এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে। কিন্তু অ্যান্টোনিও নাছোড়বান্দা, সে বলল, আরে কুছ পরোয়া নেই, ধারের টাকা শোধ দেওয়ার যে দিন ধার্য হবে তার অনেক আগেই

আমার জাহাজগুলো পৌঁছে যাবে। তাতে যা আমদানী হবে তার কাছে ঐ তিন হাজার কোন ছার।

অ্যান্টোনিও এবং ব্যাসানিওর এই উত্তর প্রত্যুত্তর শুনে শাইলক বলল— 'হায় ঈশ্বর আব্রাহাম, এই খ্রীষ্টানগুলি মানুষকে কেবল সন্দেহের চোখেই দ্যাখে। এরা নিজেরা মানুষকে হেনস্থা করে বলে এদের সবার উপরেই সন্দেহ। আচ্ছা ভাই ব্যাসানিও, বল দেখি যদি চুক্তিমত সময়ের মধ্যে ও টাকাটা না-ই দিতে পারে তবে ওর ঐ মাংসের খেসারতি নিয়ে আমার হবেটা কি'? মানুষের শরীরের এক পাউণ্ড গোস্ত, কীই বা তার দাম, আর আমার ফয়দাটাই বা কী হবে'? বরং গরু কিংবা ভেড়া হলে তবু কিছু উসুল হতে পারতো। আমি তো বলছিই, আমার এই ব্যাপারটা স্রেফ দোস্তির জন্যে। যদি তোমাদের মনে ধরে তবে এস, না হয় ফোটো।'

শেষটায় অ্যান্টোনিও রাজীই হয়ে গেল। শাইলকের বন্ধুত্বের আশ্বাসে তার বন্ধুকে এই ঝুঁকি নিতে ব্যাসানিও বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও অ্যান্টোনিও চুক্তিপত্রে সই করে দিল, সে ভাবল শাইলক যা বলেছে তা-ই ঠিক—ব্যাপারটা একটা নিছক কৌতুক।

ব্যাসানিও যাকে বিয়ে করবে বলে ব্যাকুল হয়েছিল সেই ধনীদুহিতা এবং পিতৃ ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিনীর বসতি ছিল ভেনিসের সন্নিকটেই বেলমন্ট নামক স্থানে। আর তার নাম ছিল পোরশিয়া। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যে পোরশিয়ার কথা আমরা বইতে পাই, অর্থাৎ রোমান সেনেটর কেটোর কন্যা ও ব্রুটাসের পত্নী যে রমণী, তার চেয়ে কোনো অংশেই রূপ অথবা গুণে আমাদের এই পোরশিয়া হীন নয়।

কাজেই, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে টাকা বন্ধু অ্যান্টোনিও জোগাল ব্যাসানিওকে সেই টাকায় দলবল সহ জাঁকজমক করে সে চলল বেলমন্টের পথে। সঙ্গে নিল তার এক বিশেষ বন্ধুকে, নাম তার: গ্রাশিয়ানো।

বৈবাহিক ব্যাপারের শর্তে কৃতকার্য হতে ব্যাসানিওর খুব একটা বেগ পেতে হল না এবং পোরশিয়াও অনন্দের সঙ্গেই তাকে স্বামী হিসাবে বরণ করে নিল।

ব্যাসানিও শাদা মনেই নিজের প্রকৃত অবস্থার কথা পোরশিয়াকে খুলে বলল। সে বলল যে নিজের বংশগৌরব ও পিতৃপুরুষের পরিচয়ই তার একমাত্র সম্বল। আর পোরশিয়াও ব্যাসানিওকে পেয়ে খুশি হয়েছিল তার কারণ তার ব্যক্তিগত গুণপনা। তার নিজের তো ধনসম্পদ যথেষ্টই ছিল তাই স্বামীর অর্থের মোহ তার কাছে বড় নয়। ব্যাসানিওকে সে তার স্বভাবসুন্দর বিনয়ের সঙ্গে জানালো যে আরও বহুগুণে রূপসী হলেও অথবা আরও হাজারগুণ ধনী হলেও সে নিজেকে ব্যাসানিওর যোগ্য স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা বলেই সেটুকু মনে করত। আরও বেশি সুন্দরভাবে আরও বেশি বিনয় করে সে বলল—কীই বা আমার দাম, না শিখেছি আচার ব্যবহার, না জানি লেখাপড়া, কোনো বিষয়েই দক্ষতাও নেই আমার, তবে এখনও

তো সময় আছে, সবই শিখে নিতে পারবো, তোমার আদেশে নির্দেশে আমি নিজেকে গড়ে নিতে পারবো—আমি এবং আমার বলতে যা কিছু, আজ থেকে তা তোমারই। এই গতকাল পর্যন্ত, হে ব্যাসানিও, আমিই ছিলাম এই বিশাল অট্টালিকার অধিকারী। আমিই ছিলাম আমার অধীশ্বরী, আমার এই ভৃত্যকুলের প্রভু—আর আজ থেকে এই অট্টালিকা, এই ভৃত্যকুল, এই আমি—এর সবই তোমার, তুমিই এর অধীশ্বর। আমি এর সবই তোমাকে দিয়ে দিলাম আমার এই আংটিটির সঙ্গে। এই কথার সঙ্গেই পোরশিয়া তার অঙ্গুরীয় দান করল ব্যাসানিওকে।

যুগপৎ বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় বিমূঢ় ব্যাসানিও ভাবতে লাগল তার মতো অতি সাধারণ অবস্থার একজন মানুষকে এই বিপুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী অভিজাত কণ্যা কত নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করল। আনন্দ ও ভক্তিভাবের আতিশয্যে তার যেন সব কথাই হারিয়ে গেল, কোনো কথাই আর সে গুছিয়ে বলে উঠতে পারলনা, শুধু ভাঙা ভাঙা ভাষায় ভালবাসার অঙ্গীকার ও ধন্যবাদ জানিয়ে সে পোরশিয়ার দেওয়া আংটিটি নিজের হাতে নিল।

ঠিক এই সময়ে কাছাকাছি ছিল পোরশিয়ার সহচরী নেরিসা এবং ব্যাসানিওর সঙ্গী গ্রাশিয়ানো। গ্রাশিয়ানো যখন দেখল ব্যাসানিওর প্রেমের অভিযান এমন মধুরেন সিদ্ধিলাভ করল তখন ঐ আনন্দের পূর্ণ সমাপ্তির আশায় তারও ইচ্ছা হল নেরিসাকে তার জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করে তার কামনা যেন একই দিনে দুটি বিবাহই অনুষ্ঠিত হয়।

তার বিবাহের ইচ্ছায় ব্যাসানিও আনন্দের সঙ্গে বলে উঠল—আমি সর্বান্তঃকরণে সম্মতি দিলাম, তুমি বিয়ে কর।

এবার গ্রাশিয়ানো জানালো তার পাত্রীটি আর কেউই নয়, সে পোরশিয়ার সহচারী নেরিসা। সে বলল — নেরিসা তাকে কথা দিয়েছে যদি তার কর্ত্রী পোরশিয়া ব্যাসানিওকে বিয়ে করে তবে সে-ও গ্রাশিয়ানোকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। এ কথা শোনার পর পোরশিয়া নেরিসার কাছে জানতে চাইল ব্যাপারটা সত্যি কি না। নেরিসা বলল—যদি আপনার অনুমতি হয় তবেই আমার সম্মতি, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। পোরশিয়ার অনুমতি সহজেই মিলল এবং ব্যাসানিও আনন্দসহকারে বলল—ভাই গ্রাশিয়ানো তোমার আর নেরিসার বিবাহের দ্বারাই সম্পূর্ণ হবে আমাদের বিয়ের উৎসব-আনন্দ।

মানুষ ভাবে এক হয় আর। প্রেমিক প্রেমিকাদের এই উল্লাসের মুহূর্তে তাদের আনন্দে বাদ সাধল এক পত্রবাহক দূত। পত্রবাহকের কাছে ছিল অ্যান্টোনিওর পাঠানো এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ; ব্যাসানিও যখন ঐ চিঠি পড়ছিল তখন তার চোখে মুখে যে দুর্ভাবনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তা লক্ষ্য করে পোরশিয়ার মনে হল নিশ্চয়ই কোনো প্রিয়জন বিয়োগের দুঃসংবাদে ব্যাসানিওকে এমন ম্লান দেখাচ্ছে, সে জানতে

চাইল কী আছে ঐ চিঠিতে। উত্তরে ব্যাসানিও বলল—হায় পোরশিয়া, যে অপ্রীতিকর শব্দগুলি এর মধ্যে আছে তার চেয়ে নিদারুণ কোনো আঁচড় আজ অবধি কাগজের গায়ে কেউ দ্যাখেনি। হে দেবী, আমার ভালবাসা জানাতে গিয়ে আমি তোমাকে মুক্তকণ্ঠে বলেছিলাম আমার বংশ গৌরবের কথা, আমার ধমনীতে প্রবাহিত যে রক্ত তার কথা, কিন্তু আবার এ-ও বলা উচিত ছিল যে নিঃস্ব বলতে যা বোঝা যায় আমি তার চেয়ে অধম, কেননা আমি ঋণের দায়ে দায়বদ্ধ। অতঃপর ব্যাসানিও সবিস্তারে চিঠির মূল কথাগুলি বলল—সে কেমন করে অ্যান্টোনিওর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল, অ্যান্টোনিওই বা কী উপায়ে টাকাটা সুদখোর শাইলকের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল, কী ছিল সেই ঋণ বিষয়ে শাইলকের সঙ্গে চুক্তিপত্রের শর্ত, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না ফিরিয়ে দিতে পারলে অ্যান্টোনিওকে তার বিনিময়ে দিতে হবে এক পাউণ্ড মাংস তার শরীর থেকে। কথাগুলি বলার পর ব্যাসানিও পোরশিয়াকে পড়ে শোনাল অ্যান্টোনিওর চিঠি, তাতে লেখা ছিল: 'প্রিয় ব্যাসানিও, আমার সবগুলি জাহাজই ভরাডুবি হয়ে গিয়েছে, শাইলককে তার চুক্তিপত্র অনুসারে খেসারত দিতে চলেছি, কিন্তু সে খেসারত তো আমার জীবন দিয়ে শোধ হবে, তাই মৃত্যুর মুহূর্তে যেন তোমার দেখা পাই, জানি তোমার আনন্দে ব্যাঘাত ঘটবে, তাই আমার প্রতি ভালবাসার টানে যদি তোমাকে না আনতে পারি, আমি চাইনা যে শুধু এই পত্রের আবেদনের ফলে তুমি এস।' এই চিঠির কথাগুলি শেষ হতে না হতেই পোরশিয়া বলল—প্রিয় ব্যাসানিও আমার, এই মুহূর্তে সব কাজ ফেলে তুমি চলে যাও তোমার বন্ধুকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে। তোমার এমন বন্ধুর কেশাগ্র যাতে কেউ না স্পর্শ করতে পারে তার জন্যে নিয়ে যাও আমার স্বর্ণভাণ্ডার, যদি দেয় অর্থের বিশগুণ স্বর্ণমুদ্রাও প্রয়োজন হয় তবু তোমার ভুলের জন্যে এমন একজন বন্ধুর সামান্যতম ক্ষতিও যেন না-হয়, আর তোমাকে লাভ করতে আমার এই মূল্য দিতে হল বলেই তুমি আমার কাছে আরও বেশি প্রিয়। পোরশিয়া আরও বলল যে ব্যাসানিও বেলমন্ট ত্যাগ করার আগে তাদের বিয়েটা সেরে নেওয়াই সঙ্গত হবে, কেননা পোরশিয়ার অর্থে আইনসম্মত অধিকার বর্তাবার জন্যে এটা একান্ত করণীয়। কাজেই ঐ দিনেই তাদের বিবাহ সম্পন্ন হল এবং সেই সঙ্গে বিবাহিত হল গ্রাশিয়ানো এবং নেরিসা, আর বিবাহ অনুষ্ঠানের শেষ হতে না হতেই ব্যাসানিও ও গ্রাশিয়ানো ছুটল ভেনিসে। সেখানে গিয়ে ব্যাসানিও দেখল তার বন্ধু অ্যান্টোনিও বন্দী হয়ে আছে কয়েদখানায়।

শাইলকের দেওয়া সেই তিনহাজার ডুকাটের ঋণ পরিশোধের দিন পার হয়ে গিয়েছিল, জাহাজডুবির দুর্ভাগ্যের ফলে অ্যান্টোনিও আজ বিপন্ন। ব্যাসানিও প্রভূত অর্থ নিয়ে পীড়াপীড়ি করল শাইলককে, কিন্তু শাইলক তার প্রাপ্য দাবী সম্পর্কে নির্মম—এক পাউণ্ড মাংস ছাড়া আর কিছুতেই সে ভুলবেনা। কাজেই ভেনিসের

ডিউকের আদালতে একটি দিন ধার্য হয়েছে এই মর্মস্পর্শী মামলার শুনানীর জন্যে। নিরুপায় ব্যাসানিওকে তাই ভয়াবহ দুশ্চিন্তার ভার মাথায় নিয়ে অপেক্ষায় থাকতে হল সেই অনিশ্চিত মামলার ফলের জন্যে।

এদিকে বেলমন্ট থেকে যেদিন ব্যাসানিও ভেনিসে আসে সেদিন পোরশিয়া তাকে বিদায় দিয়েছিল খুবই আনন্দের সঙ্গে। সে ভেবেছিল তার অর্থের বিনিময়ে অ্যান্টোনিওকে সহজেই বিপদমুক্ত করা সম্ভব হবে। তাই ব্যাসানিওকে সে বলে দিয়েছিল ফেরার সময় যেন সে বন্ধু অ্যান্টোনিওকেও নিয়ে আসে তার সঙ্গে। কিন্তু ব্যাসানিও চলে যাওয়ার পর পোরশিয়ারও যেন কেমন দুশ্চিন্তা হতে লাগল, তার মনে হল ব্যাপারটা হয়তো এত সহজ হবেনা, অ্যান্টোনিওকে নিয়ে সত্যিই বিপদ হতে পারে। নিজের ঘরে যখন একা একা বসে ভাবতে লাগল তখন পোরশিয়ার কেবলই মনে হতে থাকল কেমন করে এই বিপদ থেকে অ্যান্টোনিওকে মুক্ত করা যায়, সে ভাবতে লাগল তার নিজের দ্বারা সেই বন্ধুকে বাঁচানোর কোনো উপায় উদ্ভাবন করা যায় কী না। একথা ঠিক যে ব্যাসানিওকে বিয়ে করার আগে সে কথা দিয়েছিল যে ভবিষ্যতে তার সব কাজেই সে তার প্রিয় স্বামীর পরামর্শ অনুসারেই চলবে, কিন্তু তার সেই স্বামীরই এমন একজন বন্ধুর জীবন যখন এইভাবে বিপন্ন হয়েছে তখন স্বামীর পরামর্শের অপেক্ষা করার চেয়ে নিজের বিবেক ও বুদ্ধি অনুসারে পথ নির্দেশ করাই তার কাছে অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হল। অতএব পোরশিয়া তার স্বাধীন অথচ যথার্থ ন্যায় বিচার বিবেচনার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে স্থির করল সে নিজেই ভেনিসে যাবে এবং অ্যান্টোনিওর মামলায় তার পক্ষ সমর্থন করে সওয়াল করবে ডিউকের আদালতে।

বেশ ভেবেচিন্তেই অগ্রসর হল পোরশিয়া। পদুয়াতে তার এক আইনজীবী আত্মীয় ছিলেন। ভদ্রলোকের নাম বেলারিও। পোরশিয়া পত্রের মারফৎ তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটা জানালো এবং এই মামলায় তাঁর পরামর্শের জন্যে লিখল। সে আরও জানালো যে তিনি যেন তাঁর মতামত পাঠানোর সঙ্গে তাঁর আইনজীবীর পোশাকটিও পাঠিয়ে দেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পোরশিয়ার পত্রবাহক বেলারিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে এল। বেলারিও তার মাধ্যমে অ্যান্টোনিওর মামলা বিষয়ে তার পরামর্শ জানিয়ে দিলেন এবং তৎসহ আর যা কিছু পোরশিয়ার প্রয়োজন হতে পারে তাও পাঠিয়ে দিলেন।

এবার শুরু হল পোরশিয়ার অভিযান। সে এবং তার সহচরী নেরিসা উভয়েই পুরুষের পোশাকে নিজেদের সজ্জিত করে নিল। উপরন্তু পোরশিয়া গায়ে চাড়িয়ে নিল উকিলের গাউন। নেরিসা যেন তার নথিপত্রবাহী সহকারী মুহুরী এমনি ভাবে তারা অবিলম্বে চলল ভেনিসে। ভেনিসে তারা যেদিন গিয়ে উপস্থিত হল ঠিক সেই দিনেই ছিল অ্যান্টোনিওর বিচারের শুনানী।

ভেনিসের সেনেট হাউস—ডিউকের দরবার এবং সর্বোচ্চ আদালত। সেখানে ভেনিসের গণ্যমান্য সেনেটর পরিবৃত বসে আছেন ডিউক স্বয়ং, এমন সময় সেখানে বিচার শুরুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে উপস্থিত হল পোরশিয়া। সে প্রথমেই ডিউকের কাছে দাখিল করল বেলারিওর চিঠি। প্রখ্যাত আইনজীবী হিসাবে বেলারিওর পরিচয় ডিউকের অগোচর ছিল না। তিনি তাঁর পত্রে ডিউককে জানিয়েছেন যে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি তাঁর মক্কেল অ্যান্টোনিওর মামলায় যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে অপারগ সেই হেতু তাঁর পরিবর্তে তিনি পাঠাচ্ছেন এক অতি সুপণ্ডিত নবীন আইনজীবীকে এই মামলায় আসামী পক্ষের উকিল হিসাবে। ঐ আইনজীবীর নাম ব্যালথাজার (অর্থাৎ পোরশিয়ার ছদ্ম নাম)। ডিউক এই পত্র অনুসারে ব্যালথাজারকে যথারীতি সওয়ালের অনুমতি দিলেন আর মনে মনে চমৎকৃত হলেন এই নবীন আইনজীবীর চোখমুখের তারুণ্যে যা ফুটে উঠছিল পোরশিয়ার পরিধানে উকিলের গাউন ও দীর্ঘ পরচুলের ফাঁক দিয়ে।

এবার শুরু হল সেই অশ্রুতপূর্ব বিচার। পোরশিয়া নিজের চারিদিকটা বেশ ভাল করে দেখে নিল চোখ বুলিয়ে। তার চোখে পড়ল সাক্ষাৎ হৃদয়হীন জ্যু-শাইলক, সে লক্ষ্য করল অ্যান্টোনিওর ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাসানিও, ব্যাসানিওর চোখে মুখে দুঃখ ভয় ও দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ছায়া। সে কিন্তু পোরশিয়ার ছদ্মবেশের জন্যে তাকে একেবারেই চিনতে পারেনি।

যে কঠিন কাজের ভার নিয়ে পোরশিয়া সেদিন আদালতে উপস্থিত হয়েছিল সে কাজ তার মত অল্পবয়স্কা এক নারীর পক্ষে কত কঠিন সে বিষয়ে পোরশিয়া সম্যক অবহিত ছিল, আর সেইজন্যেই সে নিজের মনের সবটুকু শক্তি নিয়ে শুরু করল তার সওয়াল। অতি কৌশলের সঙ্গে পোরশিয়া প্রথমেই শাইলককে সম্বোধন করে বলল যে ভেনিসের প্রচলিত আইনের বলে শাইলক তার ক্ষতিপূরণের দাবী চুক্তিপত্র অনুসারে ন্যায়তই পেতে পারে। এ-বিষয়ে আইন তার পক্ষে। সেই সঙ্গে পোরশিয়া অতি মধুর ভাষায় বলল করুণার মহৎ আদর্শের কথা। তার সেই সুমধুর ভাষণে মানুষ মাত্রেরই হৃদয় দ্রবীভূত হয়, একমাত্র কঠিনহৃদয় শাইলকের কাছে তার আবেদন নিরর্থক। পোরশিয়া বলল করুণা এক স্বর্গীয় গুণ। তার বর্ষণ মাটির বুকে আকাশ থেকে ঝরে পড়া মৃদু বর্ষা ধারার মত। করুণার আশীর্বাদ দ্বিবিধ—যে করুণা করে সেও যেমন ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে, তেমনি যে করুণা লাভ করে সেও সেই আশীর্বাদ পায়। রাজার রাজমুকুটও ম্লান হয়ে যায় তার করুণার গুণে, কেননা এ গুণ তো স্বয়ং ঈশ্বরের। আর মানুষের বিচার যেটুকু পরিমাণে করুণার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয় তখন সেই পরিমাণে পার্থিব শক্তি হয়ে ওঠে ঈশ্বরিক। একথার পর পোরশিয়া শাইলকের কাছে এই বলে আবেদন করল যে আমরা মানুষ মাত্রেই যখন ঈশ্বরের কাছে করুণাপ্রার্থী, তখন সেই প্রার্থনার দ্বারাই আবার আমরাও

অপরকে করুণা করার শিক্ষা লাভ করি। কিন্তু ধর্মের কাহিনী শোনার মত মানসিকতা শাইলকের আদৌ ছিল না, সে বলল—আমি ওসব শুনতে চাইনা, আমার প্রাপ্য এক পাউণ্ড মাংস ছাড়া অপর কিছুতেই আমি রাজী নই। পোরশিয়া অজ্ঞতার ভাণ করে বলল কেন, আসামী কি টাকাটা দিতে পারছেনা ? একথা শোনামাত্রই ব্যাসানিও বলল—শুধু তিনহাজার ডুকাট কেন, শাইলক যতটাকা চায় তার সবটাই আমরা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু শাইলক তার সংকল্পে অটুট—তার ঐ এক পাউণ্ড অ্যান্টোনিওর মাংস চাই-ই চাই। ব্যাসানিও নিরুপায় হয়ে অগত্যা নবীন অথচ জ্ঞানী আইনজীবীকে অনুরোধ করে বলল যদি কোনো রকমে আইনের একটু হেরফের করে অ্যান্টোনিওর প্রাণটুকু রক্ষা করা যায়। পোরশিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলল, সে কিছুতেই সম্ভব হতে পারেনা—আইন কেউ নিজের ইচ্ছামত এদিক ওদিক করতে পারেনা। একথা শুনে শাইলককে আর পায় কে—সে মনে ভাবল আইন যখন তার অনুকূলে তখন মামলায় তার জিৎ অবধার্য—আনন্দে সে বলে উঠল—'এই আদালতে আজ সাক্ষাৎ ড্যানিয়েল উপস্থিত! হে জ্ঞানী নবীন বিচারক, জানিনা কী ভাবে তোমাকে আমি সম্মান দেখাব। তোমার ঐ নবীন বয়সের চোখে মুখে কিছুতেই ধরা পড়েনা কত প্রাজ্ঞ তুমি!'

(আইনের প্রতি তার নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্যে) এবার পোরশিয়া শাইলককে বলল—দিন তো দেখি আপনার খতখানা, দেখা যাক কী ছিল আপনাদের চুক্তি। শাইলকের হাত থেকে চুক্তিপত্রখানা নিয়ে সে পড়ার ভাণ করে বলল—হ্যাঁ, ঠিকই বটে, শাইলক এই চুক্তি অনুযায়ী আইনসম্মত ভাবেই খেসারত দাবী করতে পারেন—তাঁর প্রাপ্য এক পাউণ্ড মাংস তিনি নিজহাতে কেটে নিতে পারেন অ্যান্টোনিওর হৃদপিণ্ডের একেবারে ধার থেকে। শাইলককে ডেকে সে বলল—তা আপনি যদি ব্যাসানিওকে একটু দয়া করেন তো খুবই ভাল হয়, যদি অনুমতি করেন তবে এই চুক্তিপত্রখানা আমি ছিঁড়ে ফেলি, আপনার যা ইচ্ছা। কিন্তু শাইলকের অন্তরে দয়ামায়ার স্থান নেই। সে বলল—আমি আমার আত্মার নামে শপথ করে বলছি, কোনো অনুনয় বিনয়ের ভাষাতেই আমি আমার সংকল্প থেকে নড়ছিনা। পোরশিয়া বলল—আর কীই বা করার আছে, তা অ্যান্টোনিও, আপনি তাহলে এবার সাহসে আপনার বুক বাঁধুন, প্রস্তুত হোন ছুরির জন্যে। শাইলক এদিকে তার মস্ত ছুরিখানা মহা আনন্দে এদিক ওদিক করে শান দিতে ব্যস্ত—এক পাউণ্ড মাংসের জন্যে—এই অবসরে অ্যান্টোনিওকে পোরশিয়া জিজ্ঞাসা করল—বলুন আপনার কি কিছু বলার আছে? শান্ত ও সমাহিত মনে অ্যান্টোনিও বলল—কী আর বলার থাকতে পারে? আমি তো মনকে প্রস্তুত করেই নিয়েছি মৃত্যুর জন্যে। এর পর সে ব্যাসানিওকে ডেকে বলল—এস ভাই ব্যাসানিও, তোমার হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দাও। বিদায় দাও ভাই। আমার এই দুর্ভাগ্য তোমারই জন্যে,

এই কথা ভেবে মন খারাপ কোরনা যেন। তোমার গুণবতী স্ত্রীর কাছে বোলো আমার কথা, আর বোলো তোমাকে আমি কেমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। একথা শোনার পর মনোবেদনায় কাতর হয়ে ব্যাসানিও বলল, ভাই অ্যান্টোনিও, একথা সত্যি যে আমি যাকে বিয়ে করেছি সে আমার কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়—কিন্তু আমার কাছে আজ আমার জীবন, আমার স্ত্রী, এমন কি সারা পৃথিবীর সব কিছুর চেয়েও প্রিয় তোমার প্রাণ, আর সেই প্রাণ রক্ষা করার জন্যে যদি আমাকে ঐ সব কিছুই খোয়াতে হয় আমি তার জন্যে প্রস্তুত।

ব্যাসানিওর এই কথাগুলির জন্যে পোরশিয়া খুশিই হল। অ্যান্টোনিওর প্রতি ব্যাসানিওর বন্ধুপ্রীতি তার খুবই ভাল লাগল, তবুও সে এই সুযোগে ব্যাসানিওকে একটু খোঁচা দিতে ছাড়লনা। সে বলল—আপনার কথাগুলি খুবই সুন্দর, কিন্তু আপনার স্ত্রী যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন তবে বোধ করি তাঁর কানে আপনার এই বদান্যতা খুব মধুর মনে হত না। এদিকে গ্রাশিয়ানো ভাবল সেই বা কম যাবে কেন, সর্ববিষয়ে সে ব্যাসানিওকে অনুকরণ করতেই অভ্যস্ত। তাই মুহুরী বেশধারী নেরিসা যখন পোরশিয়ার পাশে বসে লেখায় ব্যস্ত তখন গ্রাশিয়ানো তার সাক্ষাতেই বলে বসল—হ্যাঁ আমারও স্ত্রীকে আমি হৃদয় দিয়ে ভালবাসি, কিন্তু আমিও তৃপ্তি পেতাম যদি সে মরে যেত এবং তার আত্মা স্বর্গে গিয়ে কোনো ঈশ্বরিক শক্তিকে দিয়ে ঐ ইতর সুদখোরটার অন্তরের কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারত। একথা শুনে মৃদু হেসে নেরিসা বলল—আপনার খুব কপাল যে আপনার স্ত্রী এখানে নেই, থাকলে অবশ্যই আপনার বদান্যতার ফলে সংসারে কিছু ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি হত।

এদিকে শাইলকের আর তর সইছেনা। সে বলে উঠল-কী সব আজে বাজে কথায় আপনারা সময় নষ্ট করছেন, ধর্মাধিকরণের কাছে আমার প্রার্থনা — এখুনি মামলার রায় দিন। একথার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আদালত কক্ষে এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির উদ্ভব হল—সকলেই বিষণ্ন চিত্তে প্রতীক্ষা করতে লাগলো অ্যান্টোনিওর দণ্ডাদেশের জন্যে।

পোরশিয়া জানতে চাইল অ্যান্টোনিওর মাংসটা মাপার জন্যে দাঁড়িপাল্লা মোতায়েন আছে কী না। সে শাইলকের দিকে তাকিয়ে বলল—তা শাইলক, আপনি একটা ডাক্তারের ব্যবস্থা রেখেছেন তো, নাহলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে আসামী তো প্রাণে মারা যাবে? আগাগোড়াই শাইলকের মতলব ঐ রক্তপাত হতে হতে অ্যান্টোনিও মরবে, কাজেই সে বলল—কই, এমন কথা তো চুক্তিতে উল্লেখ করা নেই। পোরশিয়া বলল, সে কথা ঠিকই, চুক্তিতে কোথাও ওরকম উল্লেখ নেই, তবে তাতে কী আসে যায়, আপনি না হয় একটু দয়াপরবশ হয়ে বেচারার জন্যে এটুকু করলেনই। শাইলক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—আমার দ্বারা ওসব ডাক্তার-টাক্তার খোঁজা সম্ভব নয়, আমাদের চুক্তিতে তা বলে না। পোরশিয়া অতঃপর বলল—তবে কী আর

করা যাবে—অ্যান্টোনিওর এক পাউণ্ড মাংস আপনার অবশ্য প্রাপ্য, আইন অনুসারেই প্রাপ্য এবং আদালতও সেই বিধান দিচ্ছে। আর আসামীর বুক থেকেই ঐ মাংস আপনি কাটতে পারেন, এটাও আইনে আটকাচ্ছে না আর আদালতও আপনাকে সে অধিকার দিচ্ছে। একথায় শাইলককে আর পায় কে—সে আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল—বিচারক! আপনি সত্যিই মস্ত জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান বিচারক। আজ ড্যানিয়েলই উপস্থিত এই বিচারশালায়। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের লম্বা ছুরিটাকে আরও একবার শানিয়ে নিল এবং অ্যান্টোনিওর দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল—কই, এস, তৈরী হও।

পোরশিয়া বলল—আহা হা এত ব্যস্ত হবেন না, জ্যু মশাই, আরও একটু কথা আছে, অন্যরকম কথা। এই চুক্তিপত্র অনুসারে কিন্তু আপনি একটি বিন্দুও রক্ত পেতে পারেন না—পরিস্কার ভাষাতেই উল্লেখ আছে 'এক পাউণ্ড মাংস'। তা ঐ মাংসখণ্ডটা কাটতে গিয়ে যদি একটি বিন্দুও খ্রীষ্টানের রক্তপাতের কারণ ঘটে তবে আপনার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং তার অধিকার বর্তাবে ভেনিস সরকারের উপর। পোরশিয়ার বিচক্ষণ উপায় উদ্ভাবনের ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই গেল শাইলকের বিরুদ্ধে—মাংস কাটা যাবে কিন্তু রক্তপাত না করে কাটতে হবে—এ কী করে সম্ভব—আবার, সত্যিই তো চুক্তিতে রক্তের উল্লেখ করা নেই। অতএব গোটা আদালত ঘরে পোরশিয়ার এই বিচক্ষণতার বাহবা ধ্বনি উঠতে লাগল, আর গ্রাশিয়ানো মজার জন্যে শাইলকের উক্তিরই পুনরুচ্চারণ করে বলল—বিচারক! আপনি সত্যিই মস্ত জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান বিচারক! ওহে জ্যু-তাকিয়ে দ্যাখ—আজ সত্যিকারের ড্যানিয়েলই উপস্থিত এই বিচারশালায়!

শাইলক এতক্ষণে বুঝল তার মতলব আর সিদ্ধ হওয়ার নয়, সে মুখ কাঁচুমাচু করে কোনরকমে ঢোক গিলে বলল—থাকগে, আমার টাকাটাই দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

ব্যাসানিও তখন আনন্দে উদভ্রান্ত, অপ্রত্যাশিতভাবে তার বন্ধুর প্রাণ রক্ষা হয়েছে, তাই সে উল্লাসে বলে উঠল—ধরুন, নিন কত লাগবে। পোরশিয়া তাকে ক্ষান্ত করে বলল—থামুন, এত ব্যস্ত হবেন না, জ্যু কে তার প্রাপ্য খেসারত ছাড়া আর কিছুই দেওয়া চলবে না। আসুন। শাইলক আপনার ছুরি নিয়ে মাংসটুকু কেটে নিন, কিন্তু সাবধান যেন রক্ত না পড়ে, আর একটা কথা—ঠিক এক পাউণ্ড, একটুও কম কিংবা বেশি হওয়া চলবেনা, ওজনের যদি সামান্যতম হেরফেরও হয় এমনকি দাঁড়িপাল্লাটা যদি এক চুলও কোনোদিকে হেলে যায় তবে কিন্তু ভেনিসের আইন অনুসারে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে এবং আপনার যাবতীয় ধন সম্পদ চলে যাবে ভেনিসের সেনেটের অধিকারে।

শাইলক বলল—ওসবে দরকার নেই, আমার টাকাটা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন,

আমি আর এখানে থাকতে চাইনা। ব্যাসানিও ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলল—টাকা আমার কাছেই আছে, এইতো।

শাইলক সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ালো টাকাটার দিকে আর তৎক্ষণাৎ পোরশিয়া বলল—আরে সবুর করুন, আপনার বিষয়ে আরও একটু বাকি আছে। ভেনিসের আইন মোতাবেক আপনি অপরাধী, কেননা আপনি এই রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের প্রাণনাশের চক্রান্তে লিপ্ত, কাজেই আপনার প্রাণ এখন নির্ভর করছে ভেনিসের ডিউকের দয়ার উপর, তিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে প্রাণভিক্ষা দিতে পারেন, অতএব আপনি নতজানু হয়ে তাঁর কাছে আপনার প্রাণভিক্ষা করুন।

পোরশিয়ার কথা শেষ হতে না হতেই ডিউক শাইলককে বললেন---আমরা খ্রীষ্টান, এবার দ্যাখো তোমাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোথায়---আমি তোমাকে না চাইতেই তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম। তবে তোমার ধনসম্পত্তির অর্ধেক দিতে হবে অ্যান্টোনিওকে আর অপর অর্ধেকের মালিকানা ভেনিস সরকারের।

উদারহৃদয় অ্যান্টোনিও বলল, না না, আমাকে কিছু দিতে হবে না, আমি আমার অংশ ত্যাগ করতে প্রস্তুত যদি শাইলক একটি দলিলে দস্তখত করতে রাজী থাকে। সে দলিলে উল্লেখ থাকবে শাইলকের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির মালিক হবে তার মেয়ে ও জামাই। অ্যান্টোনিওর এই কথা বলার একটি বিশেষ কারণ ছিল। সে জানতো কিছুদিন আগে শাইলকের একমাত্র কন্যা পিতার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করেছে এক খ্রীষ্টান যুবককে, সেই যুবকটির নাম লোরেঞ্জো এবং সে আবার অ্যান্টোনিওরই বন্ধু, আর সেই বিয়ের দরুন চটে গিয়ে শাইলক তার সম্পত্তি থেকে মেয়েকে বঞ্চিত করেছে।

নিরুপায় শাইলক সেই শর্তেই রাজী হয়ে গেল। সে দেখল তার প্রতিহিংসা চরিতার্থের ইচ্ছা তো ব্যর্থ হলই, উপরন্তু তার বিষয় আশয় নিয়েও টানাটানি—তাই হতাশায় সে বলল—আমি অসুস্থ বোধ করছি, আমাকে বাড়ি ফিরতে দিন, যা কিছু সই সাবুদ করতে হয় সেখানেই পাঠাবেন, আমি আমার অর্ধেক বিষয় মেয়েকেই লিখে দেব।

ডিউক বললেন—তাই হোক, বাড়িতেই যাও তুমি, সেখানেই দলিলে দস্তখত করে দিও। হ্যাঁ, তবে যদি তোমার নিষ্ঠুরতার জন্যে তুমি অনুতপ্ত হয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাক তবে ভেনিসের রাজসরকার তোমাকে মাপ করে তোমার অর্ধেক সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে।

অতঃপর ডিউক মুক্তি দিলেন অ্যান্টোনিওকে এবং আদালতের সমাপ্তিও ঘোষণা করলেন সঙ্গে সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে তিনি নবীন আইনজীবীর জ্ঞান ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের বিশেষ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে চাইলেন নৈশভোজে। পোরশিয়ার তো মাথায় অন্য চিন্তা, তাকে অবিলম্বেই বেলমন্টে ফিরতে হবে, কেননা তার

স্বামী অর্থাৎ ব্যাসানিও সেখানে পৌঁছনোর আগেই তার পৌঁছে যাওয়া চাই, কাজেই ডিউককে সে ধন্যবাদ দিয়ে বলল—মাপ করবেন আমি তো থাকতে পারছিনা। ডিউকও তাঁকে আদর আপ্যায়ন না করতে পারার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তবে অ্যান্টোনিওর দিকে ঘুরে তিনি তাকে বললেন—ওহে অ্যান্টোনিও, এই ভদ্রলোককে তাঁর পুরস্কার দিতে দেরি কোরনা, আমার বিবেচনায় তোমার ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ওঁর কাছে, ওঁরই জন্যে তোমার প্রাণ রক্ষা হল।

ডিউক এবং তাঁর সেনেটরবৃন্দ এবার একে একে আদালত কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন। ব্যাসানিও এবার পোরশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে বলল—আজ্ঞে আপনার তুল্য যোগ্য ব্যক্তির কাছে কী আর বলব—আজ আপনার বিচক্ষণতার ফলেই আমি এবং আমার বন্ধু অ্যান্টোনিও এত বড় শোচনীয় শাস্তির থেকে বেঁচে গেলাম, কীই বা আপনাকে দিতে পারি, ঐ জ্যু-এর প্রাপ্য তিন হাজার ডুকাট নিয়ে আপনি আমাদের ধন্য করুন। অ্যান্টোনিও বলল—আর এ ছাড়াও চিরদিন আমরা আপনার ঋণ মনে রাখবো এবং একান্ত বশংবদ থাকবো আপনার কাছে।

টাকা নিতে কিছুতেই রাজী করানো গেলনা পোরশিয়াকে, কিন্তু ব্যাসানিওর বারবার অনুরোধের ফলে পোরশিয়া একটা কিছু উপহার নিতে স্বীকৃত হল। এই রাজী হওয়ার মধ্যে অবশ্য ছিল তার মাথায় আসা এক নতুন দুষ্টু বুদ্ধি। সে ব্যাসানিওকে বলল—এত করে যখন বলছেন, তখন কী আর করি বলুন, তা দিন আপনার হাতের ঐ দস্তানা জোড়া, আমিই আপনার পরিবর্তে ওটা ব্যবহার করব। ব্যাসানিও দস্তানা জোড়া খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পোরশিয়ার চোখ পড়ল ব্যাসানিওর হাতে বিয়ের দিনে দেওয়া তার আংটিটি। আসলে ওটার উদ্দেশ্যেই দস্তানা উপহার চাওয়া, কেননা আংটিটি হস্তগত করতে পারলে পরে ব্যাসানিওকে ফ্যাসাদে ফেলে মজা করা যাবে, এই ছিল পোরশিয়ার মতলব। কাজেই আংটিটি দেখা মাত্রই সে বলে ফেলল, তা ঐ আংটিটিও আমাকে না-হয় দিন, আপনার প্রীতি উপহার ওটাই হোক। ব্যাসানিও পড়ল মহা মুস্কিলে, কেননা যে বস্তুটির দিকে উকিলবাবুর নজর পড়েছে একমাত্র সেই বস্তুটিই সে প্রাণ থাকতে দিতে পারেনা। তাই নিতান্ত বিপন্ন হয়ে সে বলল—আজ্ঞে, দয়া করে আমাকে মাপ করুন, ঐ আংটি আমার স্ত্রীর উপহার, আমি তার কাছে অঙ্গীকার করেছি ওটি কখনো কাউকে দেবনা। ওর পরিবর্তে আপনাকে আমি ভেনিসের সবচেয়ে মূল্যবান আংটিটি সংগ্রহ করে দেব এবং সেটি সংগ্রহের জন্যে আমরা বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করব, আপনি যেন অখুশি হবেন না। পোরশিয়া একথা শোনার পর ভাণ করল যেন সে খুবই অপমানিত বোধ করেছে ব্যাসানিওর প্রস্তাবে, তাই সে রাগ করে আদালত ছেড়ে চলে যাওয়ার ভাণ করল এবং বলতে বলতে গেল—ভাল শিক্ষাই দিলেন আপনি। শিখলাম কেমন ভিখিরিকে জবাব দিতে হয়।

পোরশিয়া চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টোনিও নিজেকে বড় অপ্রস্তুত বোধ করল। ব্যাসানিওকে সে বলল—ভাই ব্যাসানিও, আংটিটি ওঁকে দিয়ে দাও। আমাকে তুমি ভালবাস, সেই ভালবাসার কথা ভেবে এবং আমার প্রাণরক্ষায় যে ব্যক্তিটি এমন করে সাহায্য করেছে তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতায় তুমি না-হয় তোমার স্ত্রীর কাছে একটু অপ্রিয় হলেই। এ কথা শুনে ব্যাসানিও নিজেকে ভারী অকৃতজ্ঞ ভেবে লজ্জিত হল এবং আংটিটি দিয়ে দিতেই মনস্থির করল। সে গ্রাশিয়ানোকে আংটিটি দিয়ে পাঠিয়ে দিল পোরশিয়াকে খুঁজে বের করে সেটি দেওয়ার জন্যে। পোরশিয়ার হাতে আংটিটি পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গে নেরিসা, অর্থাৎ বর্তমানে উকিলের মুহুরীও জেদ ধরল তারও চাই গ্রাশিয়ানোর হাতের আংটিটি (যে আংটি সে-ই দিয়েছিল বিয়ের দিনে)। গ্রাশিয়ানো ভাবল সে-ই বা উদারতায় ব্যাসানিওর চেয়ে কম হবে কেন, কাজেই সে-ও দিয়ে দিল নেরিসাকে তার অঙ্গুরীয়টি। আংটি আদায় করার পর দুটি রমণী—পোরশিয়া ও নেরিসা একান্তে হাসিতে ফেটে পড়ল, তারা বলতে লাগল—একবার ফিরে আসুক না স্বামী মহাপ্রভুরা। তখন দেখাব মজাটা কেমন—আংটি দেখাতে না পারলে বলব—কে জানে কোথায় মেয়েছেলের কাছে খুইয়ে এসেছ, এখন ভারী সাধু সাজছ।

এর পরের ঘটনা বেলমন্ট-এ। পোরশিয়া ফিরে আসছে তার নিজের বাড়িতে। তার মন আনন্দে ভরপুর, এ আনন্দ আমরা লাভ করি কোনো ভাল কাজ সম্পন্ন করার তৃপ্তিতে। খুশি মন নিয়ে সে যা কিছু দেখছে তা-ই তার ভাল লাগছে—চাঁদের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যেন এত উজ্জ্বল সে আগে কখনো ছিলনা—ধীরে ধীরে চাঁদ যখন একখণ্ড মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল তখন তার চোখ পড়ল দূরে বেলমন্টে তার গৃহের গবাক্ষ পথে একটি প্রদীপের দিকে, আর সে-ই আলোটি দেখা মাত্র আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল তার কল্পনা, সে নেরিসাকে বলল—দেখছিস্, ঐ যে আমার জানলার পথে চোখে পড়ছে যে প্রদীপ শিখাটি—ওর আলো ছড়িয়ে পড়ছে কতদূর পর্যন্ত অন্ধকারে, ঠিক এমনি করেই মানুষের শুভকাজ কলুষমুক্ত করে আবিল পৃথিবীর। এমন সময় তার কানে এল সংগীত, যে সংগীত হাওয়ায় ভেসে আসছিল তারই গৃহের কোনো কক্ষ থেকে—সে বলে উঠল—রাতের নিস্তব্ধ আকাশে সংগীতের ধ্বনি যেন অনেক মধুর মনে হয়, দিনের কোলাহলের মধ্যে যেন এমনটি পাওয়া যায় না।

পোরশিয়া ও নেরিসা এবার প্রবেশ করল বাড়িতে। তাদের প্রথম কাজই হল পুরুষের পোষাক ত্যাগ করে পুনরায় নিজেদের পোশাক পরে নেওয়া, কেননা অনতিপরেই এসে পড়বে তাদের স্বামীরা। আর ঠিকই তাই হল। ওদের প্রায় পিছন পিছনই এসে পৌঁছল তারা। সঙ্গে অ্যান্টোনিও। ব্যাসানিও পোরশিয়ার সঙ্গে তার বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিল, এবং পোরশিয়াও যথারীতি অভিনন্দন ও স্বাগত জানাতে

ব্যস্ত হয়ে পড়ল—কিন্তু এই পর্ব শেষ-হতে-না হতেই শোনা গেল হলঘরের এক কোণে নেরিসা খড়্গহস্ত হয়েছে তার স্বামী গ্রাশিয়ানোর উপর। পোরশিয়া অবাক হওয়ার ভাণ করে বলল—কী ব্যাপার, এরই মধ্যে ঝগড়া—তা কী নিয়ে অশান্তি? উত্তরে গ্রাশিয়ানো বলল—আর বলেন কেন দিদি, একটা গিলটি করা ছেঁদো আংটি আমাকে দিয়েছিল নেরিসা, আর তার গায়ে দাগা ছিল এক নাপতে ছড়া—'ভালবেসে স্থান দিও, আমায় ফেলে দিওনা।'

নেরিসা বলল—কী সব বকছ কাব্যি নিয়ে, ঐ আংটির মূল্য কী তা জানো না? তোমাকে যখন ওটা উপহার দিই তখন কী বলেছিলে তুমি? তুমি বলোনি যে জীবন থাকতে ঐ আংটি তুমি কখনো হাতছাড়া করবে না, ঐ আংটি আঙ্গুলে নিয়েই তুমি মরবে? আর এখন তুমি বলছ কি না যে ঐ আংটি তুমি দিয়েছ উকিলের মুহুরীকে। ওসব কথা রাখো, আমি জানি, তুমি ওটা দিয়েছ কোনো মেয়েমানুষকে। গ্রাশিয়ানো বলল—তোমাকে ছুঁয়ে দিব্যি করে বলছি, আমি ওটা একজন যুবককেই দিয়েছি, একটু ছোকরা মত দেখতে, বেঁটে খাটো, তোমার চেয়ে লম্বায় বড় হবেনা—লোকটা উকিলের মুহুরী যে উকিলবাবুর বয়স কম কিন্তু কেমন বিচক্ষণের মত লড়াই করে অ্যান্টানিওর প্রাণ রক্ষা করলেন। তা যখন ঐ বকবকানি ছোকরাটা ঐ আংটিটা চেয়ে বসল তার পারিশ্রমিক বাবদ, আমি আর অস্বীকার করতে পারিনি। পোরশিয়া বিস্ময়ের ভাণ করে বলল—তা গ্রাশিয়ানো তুমি কাজটা ভাল করনি। তোমার স্ত্রীর প্রথম উপহারটি ঐভাবে দেওয়া ঠিক হয়নি। আমিও তো আমার স্বামীকে একটা আংটিই উপহার দিয়েছিলাম—কই, তিনি তো সেটা জীবন থাকতে কাউকে দেবেন এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনা। গ্রাশিয়ানো তৎক্ষণাৎ নিজের চামড়া বাঁচানোর জন্যে বলে উঠল—হ্যাঁ, ব্যাসানিওকেও তো তার আংটিটা দিতে হল উকিলের পারিশ্রমিক বাবদ, আর তার মুহুরীটাও লেখালিখির কাজ করছে বলে আমার কাছে ঐ দক্ষিণাটাই দাবী করেছে।

পোরশিয়া পেয়ে বসল ব্যাসানিওকে। সে কৃত্রিম রাগের ভাণ করে বলল—নেরিসা তাহলে ঠিকই বলেছে, বুঝেছি আমার আংটিটিও গোল্লায় গেছে কোনো মেয়েছেলের দৌলতে। ব্যাসানিও একথায় মনে মনে ভারী দুঃখিত হল, সে যতদূর সম্ভব অনুনয় বিনয় করে বলতে শুরু করল—আমি ধর্মত বলছি, কোনো স্ত্রীলোককে আমি আংটিটি দিইনি, সেই বিখ্যাত আইনজীবীকেই আমি ওটা দিয়েছি। তাঁকে আমি তিনহাজার ডুকাট দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি তা নিলেন না, বললেন, ঐ আংটিটিই তাঁর চাই, আর আমি তাতে রাজী না-হওয়াতে তিনি রাগ করে চলে গেলেন—তা আমার আর কীইবা করার ছিল বলো, পোরশিয়া? আমি অকৃতজ্ঞতার সংকোচে এমন খেই হারিয়ে ফেললাম যে পরে বাধ্য হয়েই আংটিটি তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম। তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা কর। আমি জোর করেই বলতে পারি

যে তুমি নিজে সেখানে উপস্থিত থাকলে তুমিও আংটিটি আমার কাছ থেকে নিয়ে তাকে দিয়ে খুশি করতে।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল অ্যান্টোনিও। এবার সে বলল—হায়রে আমিই সেই হতভাগা যার জন্যে এই অশান্তির উদ্ভব।

পোরশিয়া অ্যান্টোনিওকে শান্ত করার জন্যে বলল—না না। আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনি আমাদের মাননীয় অতিথি। কিন্তু অ্যান্টোনিও নিজের বন্ধুর পক্ষ অবলম্বন করে বলল—একদিন এই ব্যাসানিওর জন্যেই আমি আমার এই দেহটা বাঁধা রেখেছিলাম। আর আপনার দেওয়া আংটিটি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে যার জন্যে আজ আমি প্রাণ ফিরে পেয়েছি। এবার আরও একবার আমি আমার এই প্রাণটিই বাঁধা রাখছি এবং কথা দিচ্ছি আপনার স্বামী আর কখনই আপনার সঙ্গে কথার খেলাপ করবে না। এ কথায় পোরশিয়া বলল—তাহলে আপনিই ওর জামিন থাকতে রাজী? ঠিক আছে, দিন ঐ আংটিটি ওকে, আর বলে দিন যেন আর কখনও এটা আগের মত হাতছাড়া না হয়।

ব্যাসানিও তো আংটিটি দেখে একেবারে আকাশ থেকে পড়ল—এ যে সেই একই আংটি, অবিকল সে-ই।

পোরশিয়া তখন তার উকিল সাজার গল্পটা সবিস্তারে বর্ণনা করল এবং নেরিসার মুহুরি সাজার কথাও। ব্যাসানিও তো সব শুনে আনন্দ বিস্ময়ে হতবাক, তারই স্ত্রী নিজের বিবেক বুদ্ধির প্রেরণায় কেমন সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে রক্ষা করেছে তার বন্ধু অ্যান্টোনিওর প্রাণ।

আরো একবার পোরশিয়া তার বাড়িতে স্বাগত জানালো অ্যান্টোনিওকে এবং সেই সঙ্গে তার কিছু চিঠি পত্রও দিল। ঐ চিঠিপত্র অপ্রত্যাশিতভাবেই এসে পড়েছিল তার হাতে এবং ওর মধ্যে ছিল সেই আশাতীত আনন্দের সংবাদ—অ্যান্টোনিওর যে জাহাজগুলি ডুবি হয়েছে বলে আগে খবর এসেছিল, আসলে সেগুলির কোনো ক্ষতিই হয়নি, এবং বর্তমানে সেগুলি বাণিজ্য শেষে ফিরে এসেছে বন্দরে। কাজেই যে শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে চূড়ান্ত বিপদের আশঙ্কায় এক বিত্তশালী বণিকের গল্প শুরু হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি হল অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের সংবাদে, আর সবাই পুরোনো বিপদের কথা ভুলে গিয়ে অবসর সময়ে ঐ হালকা হাসির আংটি বিভ্রাট নিয়ে হাসাহাসি করতে শুরু করল. স্বামীরাই কেমন বোকা বনে গিয়ে চিনতে পারেনি নিজেদের স্ত্রীকে। এতৎসহ গ্রাশিয়ানো এক মজাদার শপথ নিল একটি ছড়া বানিয়ে গানের মধ্যে দিয়ে :

...জীবৎ কালে সে এমনি ভয়ে
আর কিছুতে হয়না জড়সড়
রক্ষা করা নেরিসার ঐ আংটি যেমন তরো।

সিমবেলিন

এই কাহিনীর সময় যখন অগস্টাস সিজার ছিলেন রোম-সম্রাট। ইংল্যাণ্ড তখনও ইংল্যাণ্ড নামে পরিচয় লাভ করেনি, তাকে বৃটেন বলেই সকলে জানতো। ঐ বৃটেনেরই এক রাজার নাম ছিল সিমবেলিন।

দুটি পুত্র ও একটি কন্যা রেখে সিমবেলিনের প্রথমা স্ত্রী দেহত্যাগ করেন। তিনটি সন্তানই নিতান্ত শিশু। এদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় বলতে কন্যাটি, নাম তার ইমোজেন। একমাত্র ইমোজেনই তার পিতার কাছে রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে উঠছিল, কিন্তু কেউই জানেনা কী এক অজ্ঞাত কারণে তার দুটি ভাই ঐ শিশু অবস্থাতেই খেলাঘর থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল—ওদের মধ্যে বড়টির বয়স তখন মাত্র তিন বছর আর ছোটটিতো নিতান্তই বাচ্চা। সিমবেলিন কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারেন নি তারা কোথায় আছে অথবা কী উপায়ে তাদের রাজপ্রাসাদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সিমবেলিন দ্বিতীয়বার যে বিয়ে করেন সেই দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী আদৌ সুমতিসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁর মাথায় শুধুই চক্রান্তের চিন্তা, আর তাছাড়া তাঁর সতীনকন্যা ইমোজেনের প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহারের অন্ত ছিলনা।

ইমোজেনকে দুচোখে দেখতে না পারলেও তাকে দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির মতলবটি রাণীর মাথায় ঠিকই এসেছিল। তাঁর নিজেরও একটি ছেলে ছিল, ঐ সন্তান তাঁর প্রথম পক্ষের, অর্থাৎ রাণী নিজেও দুইবার বিবাহিতা ছিলেন। তিনি মনে মনে ফন্দী আঁটেন ঐ পুত্রের সঙ্গে ইমোজেনের কী করে বিয়ে দেওয়া যায়, কেননা তাহলে কালে কালে বৃটেনের রাজসিংহাসন লাভ করবে তাঁর ঐ পুত্র ক্লোটেন যার নাম। রাণী জানতেন যেহেতু দুটি রাজপুত্র, অর্থাৎ ইমোজেনের দুটি ভাই নিখোঁজ, কাজেই পিতার অবর্তমানে রাজসিংহাসনের অধিকারী হবে ইমোজেনই। কিন্তু রাণীর এই আশার মুখে ছাই দিয়ে ইমোজেন নিজেই তার বাবা এবং সৎ মায়ের অজ্ঞাতসারেই নিজের পাত্র নির্বাচন করে বিয়ে করে নিল।

পাত্রটির নাম পসথুমাস। শিক্ষা দীক্ষায় ও রূপেগুণে পসথুমাস ছিল তার সমকালিন বৃটেনে সেরা ছেলে। তার পিতার মৃত্যু হয় সিমবেলিনের জন্যেই এক যুদ্ধযাত্রায়. আর তার জন্মের অব্যবহিত পরেই তার মায়ের মৃত্যু হয় মৃত স্বামীর শোকে।

পসথুমাসের ঐ নামটি নির্বাচন করেছিলেন রাজা নিজেই, কেননা তার পিতার মৃত্যু হয় সে যখন মাতৃগর্ভে। পিতা ও মাতা এই দুজনকে হারানোর ফলে তার যে অসহায়ত্ব তার প্রতি মমতাবশত রাজা পসথুমাসের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও তাকে আশ্রয় দেন নিজের কাছে রাজপ্রাসাদে।

ইমোজেন আর পসথুমাস-দুজনেই একে অপরের খেলার সাথী, তাদের

পড়াশোনাও একই শিক্ষকের কাছে। দুটি শিশুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ মনের টান, আর যখন তারা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল তাদের ছেলেবেলার সেই মনের টান পরিণত হল নিবিড় ভালবাসায়। এই ভালোবাসার বন্ধনেই তারা সবার অগোচরে গোপণে বিয়ে করে ফেলল।

রাণীর কানে এই গোপন পরিণয়ের সংবাদ পৌঁছুতে দেরী হলনা, কেননা রাজপুরীর সর্বত্রই তার চর লাগানো ছিল ইমোজেনের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্যে। এই বিয়ের ফলে তাঁর সমূহ স্বার্থনাশ হয়ে যাওয়ায় রাণী তো রাগে আগুন। কাজেই সংবাদ পাওয়ামাত্রই তিনি গিয়ে উপস্থিত হলেন রাজার কাছে এবং ইমোজেন ও পসথুমাসের বিয়ের খবরটি লাগিয়ে দিলেন।

রাজা সিমবেলিন রাগে ফেটে পড়লেন ইমোজেনের এই অসম পাত্র নির্বাচনে। রাজার মেয়ে সে কীনা বিয়ে করল তারই এক প্রজার পুত্রকে। নিজের বংশমর্যাদার এ আঘাতের ফলে সিমবেলিন পসথুমাসকে আদেশ দিলেন অবিলম্বে বৃটেন ত্যাগ করে যেতে এবং তার উপর এই দণ্ডাদেশ জারী করলেন যে তাকে চিরদিনের জন্যে নিজের দেশ থেকে নির্বাসনে থাকতে হবে—সে আর কখনও দেশে ফিরতে পারবে না।

রাণী এবার একটি নতুন চাল চাললেন। তিনি ইমোজেনের কাছে ভাণ করলেন যেন তিনি কতই দুঃখিত হয়েছেন ইমোজেনের এই স্বামীবিচ্ছেদের দুঃখে। তিনি ইমোজেনকে বললেন পসথুমাস দেশ ছেড়ে রোমে চলে যাওয়ার আগে (পসথুমাস নির্বাসন হিসাবে রোম নগরীতেই বাস করবে স্থির করেছিল) তিনি দুজনের গোপণে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবেন। রাণীর এই যায়ে পড়ে দাক্ষিণ্য দেখানোর আসল উদ্দেশ্য ইমোজেনের মন জয় করা, কেননা পসথুমাস চলে যাওয়ার পর তিনি তাকে বুঝিয়ে বলবেন যে তার পিতার অমতে এই বিয়ে তো আইনসম্মত হয়নি, কাজেই ইমোজেনের এখন উচিত পসথুমাসের কথা ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে বিয়ে করা, আর সেই বিয়ের জন্য পাত্র তো হাতের কাছেই আছে, সে আর কেউ নয়, রাণীর সেই পূর্বোক্ত পুত্র, যার নাম ক্লোটন।

কাজেই রাণীর ব্যবস্থামত সাক্ষাৎ হল—গোপন সাক্ষাৎ পসথুমাস ও ইমোজেনের। আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় দুটি প্রাণই ভারাক্রান্ত—ইমোজেন পসথুমাসকে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে দিল তার মৃতা মায়ের একটি হীরার আংটি, পসথুমাস বলল জীবন থাকতে ঐ আংটি সে কিছুতেই হাতছাড়া করবেনা। এই অঙ্গীকার করতে করতে সে-ও ইমোজেনের হাতে বেঁধে দিল একটি ব্রেসলেট এবং ইমোজেনকে স্মরণ করিয়ে দিল সে-ও যেন ঐ অলংকারটি তার ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে বরাবরের জন্যে সযত্নে রক্ষা করে। স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে এই সাক্ষাৎ অচিরেই শেষ হয়ে গেল, বারবার অশ্রুপাতেও চিরকাল পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকার অঙ্গীকারে।

দিন যায়। ইমোজেনের দিন কাটে তার পিতার রাজপ্রাসাদের একান্ত কোণে,

বিষণ্ন মনে একা একা। আর ওদিকে রোমে গিয়ে উপস্থিত হল পসথুমাস—তার নির্বাসনের আবাস, রোম।

রোমে পসথুমাসের পরিচয় হল অনেক নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে, তার সঙ্গীসাথীও জুটে গেল অনেক। নানা দেশ থেকে আসা এই সাথীদের একটি দল ছিল হুল্লোড়বাজ প্রকৃতির। তাদের নানা আলোচনার মধ্যে একদিন তারা কথা তুলল দেশ বিদেশের মেয়েদের কারা বেশি ভালো বা প্রশংসনীয়। ঐ যুবকদের মধ্যে যে যার দেশের মেয়ের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। আর আরও বেশি করে গুণ গাইতে লাগল যে যার নিজের প্রণয়িনীর। পসথুমাসও যোগ দিল এই সুখ্যাতির পাল্লায়। তার মনের মধ্যে ছিল ইমোজেন এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইমোজেনের মত মেয়ে পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই—বুদ্ধি বিবেচনায়, আত্মমর্যাদাবোধে ও একনিষ্ঠ ভালবাসায় তার স্থান সবার উপরে।

এই তর্ক শেষপর্যন্ত শুধু কথাকাটাকাটিতেই শেষ হল না। এদের মধ্যে একজন ছিলেন রোমেরই মানুষ। তাঁর নাম ইয়াসিমো। ইয়াসিমো তাঁর নিজের দেশের নারী অপেক্ষা বৃটেনের কোনো নারীর উৎকর্ষ স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে রোমান রমণী অপেক্ষা অপর কোনো দেশের নারীই একনিষ্ঠ হতে পারে না। এই কথা প্রতিপন্ন করার জন্যে ভদ্রলোকটি ইঙ্গিতে পসথুমাসকে বলতে চাইলেন যে তার স্ত্রী ইমোজেনের নিষ্ঠাও সন্দেহের ঊর্ধে নয়। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর তিনি প্রস্তাব করলেন যে বৃটেনে গিয়ে ইমোজেনের সঙ্গে ভালবাসা করে তিনি হাতে নাতেই প্রমাণ করে দিতে পারেন তাঁর কথার সত্যতা। এ প্রস্তাবে সগর্বে রাজী হল পসথুমাস। সঙ্গে সঙ্গে বাজিও ধরা হল। স্থির হল যদি ইয়াসিমো তার খল অভিসন্ধি না কার্যকরী করতে পারে তবে পসথুমাসকে তার বেশ বড় রকমের একটা টাকা বাজিতে হেরে দিতে হবে। আর অপরপক্ষে যদি ইয়াসিমো সিদ্ধিলাভ করতে পারে ও ইমোজেনকে ভুলিয়ে তার হাত থেকে পসথুমাসের সেই ব্রেসলেটটি বাগিয়ে আনতে পারে যেটি পসথুমাস তাকে যত্নসহকারে আজীবন রক্ষা করতে বলেছিল তবে বাজিতে হারস্বরূপ সে পাবে ইমোজেনের দেওয়া পসথুমাসের হাতের হীরের আংটিটি, যে আংটি ভালবাসার চিহ্ন রূপে তার স্বামীকে দিয়েছিল ইমোজেন। আসলে পসথুমাসের মনে ইমোজেনের নিষ্ঠা সম্পর্কে এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সে ভাবতেই পারেনি এর মধ্যে কোনো ঝুঁকি থাকতে পারে।

ইয়াসিমো তার খল সংকল্প নিয়ে বৃটেনে উপস্থিত হল এবং ইমোজেনের কাছে তার স্বামীর বন্ধু হিসাবে পরিচয় দেওয়াতে যথেষ্ট আদর আপ্যায়নও লাভ করল। কিন্তু ক্রমশ সে যখন ইমোজেনের প্রতি ভালবাসার হাবভাব প্রকাশ করতে শুরু করল তখন ইমোজেন অবজ্ঞার সঙ্গেই তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং ইয়াসিমো বুঝে নিল যে তার কুমতলব সিদ্ধ হওয়ার কোন আশাই নেই।

কিন্তু বাজিতে জেতার নেশায় পেয়ে বসল ইয়াসিমোকে। যেন তেন প্রকারে

অকে কার্যসিদ্ধি করতে হবে। সে তখন এক চতুর কৌশলে প্রতারণার আশ্রয় নিল, যে করেই হোক পসথুমাসকে হারাতে হবে। ইয়াসিমো পরিচয় করে নিল ইমোজেনের একান্ত ঘরোয়া দু একটি কাজের লোকের সঙ্গে এবং টাকা দিয়ে তাদের বশীভূত করল। সে নিজে একটি বড় পেটরার মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিল এবং ঐ কাজের লোকেরা পেটরাটিকে বয়ে নিয়ে গিয়ে রেখে দিল ইমোজেনের শোওয়ার ঘরের ভিতরে। যথাসময়ে ইমোজেন নিজের ঘরে এল বিশ্রামের জন্যে এবং কিছুক্ষণ বাদে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এবার অতি সন্তর্পনে ইয়াসিমো বেরিয়ে এল পেটরার ভিতর থেকে এবং ঘরের প্রতিটি খুঁটিনাটি ভাল করে লক্ষ্য করে একে একে লিখে নিল একটি কাগজে, যাতে কীনা বর্ণনায় কোনরকম অসঙ্গতি না থাকে। সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখছে ইয়াসিমো, এমন সময় তার নজরে পড়ল একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য—ইমোজেনের গলায় সে লক্ষ্য করল একটি ছোট তিল, সে বুঝে নিল এটি তার বর্ণনায় কাজে লাগবে, পসথুমাসের বিশ্বাস উৎপাদন এতে নিশ্চিত। এবার সে খুব সন্তর্পণে ইমোজেনের হাত থেকে খুলে নিল পসথুমাসের উপহার দেওয়া সেই ব্রেসলেটটি। অভিষ্ট সিদ্ধির পর ইয়াসিমো আবার গিয়ে ঢুকে পড়ল সেই পেটরাটির মধ্যে। পেটরাটি যথাসময়ে চাকরেরা আবার বাইরে নিয়ে এল এবং পরের দিনই দিগ্‌বিজয়ী বীরের মত ইয়াসিমো যাত্রা করল রোমে। রোমে পৌঁছে তাকে আর দ্যাখে কে? সে পসথুমাসের কাছে বুক ফুলিয়ে নিজের বীরত্বের কাহিনী জাহির করতে শুরু করল, তাকে বলল সে ভালবাসা দিয়েই জয় করে এনেছে ইমোজেনের হাতের ব্রেসলেটটি, আর তাছাড়া সেই ভালবাসার ডাকেই সে একদিন রাত্রিবাস করে এসেছে ইমোজেনের শোওয়ার ঘরে। পসথুমাসের যাতে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকে তাই সে বলতে লাগল—কী অপূর্ব সে শয়নকক্ষ তার রেশমী পর্দায় কী অপূর্ব রূপোর জরির নকশা—সেখানে স্পষ্ট মুদ্রিত আছে আত্মমর্যাদাদীপ্ত 'গর্বিনী ক্লিওপেট্রার প্রথম সাক্ষাৎ তার প্রিয়তম অ্যান্টোনির সঙ্গে'।

পসথুমাস বলল—তোমার বর্ণনা ঠিকই বটে, তবে এমনও তো হতে পারে যে তুমি এসব অন্যের কাছে শুনে জেনেছ, নিজে দ্যাখনি।

ইয়াসিমো এর উত্তরে বলল—তবে আরও শোনো, ঘরের চিমনিটা দক্ষিণ দিক ঘেঁষে আছে আর চিমনিপিসটার গায়ে স্নানরতা ডায়েনার মূর্তি—এমন সুন্দর মূর্তি আমি আগে কোথাও দেখিনি।

পসথুমাস এবারও বলল—তা বাপু এটাও তো হয়তো তুমি অন্যের মুখে শুনে বলছ, ঐ মূর্তির কথা সবাই দিনরাত বলে, সকলেই ওর প্রশংসা করে।

ইয়াসিমোও সহজে দমবার পাত্র নয়। সে এবার নিখুঁতভাবে বর্ণনা করল ইমোজেনের ঘরের সিলিং-এর চিত্রকলা। বলতে বলতে কথার ছলে সে বলল, আরে তাইতো ভুলেই গিয়েছিলাম, কী সুন্দর শিক দিয়ে ঢাকা আগুনের জায়গাটা—যেন দুটো চোখ পিট পিট করা রূপোর কিউপিড মূর্তি, প্রত্যেকটি আবার

এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। এবার সর্বশেষ প্রমাণটি দেখানোর জন্যে ইয়াসিমো বের করল সেই ব্রেসলেট—সে বলল—এই রত্নটি কি চিনতে পারো? এটি সে-ই আমাকে দিয়েছে। তার হাত থেকে খুলে যখন সে এটা আমাকে দেয় তখন তার সেই ভঙ্গী আমি এখনও মানসচোখে দেখতে পাচ্ছি—এই মূল্যবান রত্নটির চেয়ে বহুগুনে মূল্যবান তার সেই নিবেদনের ভঙ্গী, তবু এই বস্তুটির মূল্যও তার ফলে আরও বেশি বেড়ে গেছে। আমাকে যখন এটি সে দিল তখন আস্তে আস্তে বলেছিল—'হ্যাঁ, একদিন তার কাছে এটি মূল্যবান ছিল বটে।' এর পরে সবশেষে সেই অব্যর্থ প্রমাণটি জাহির করল ইয়াসিমো যখন সে উল্লেখ করল ইমোজেনের গলার সেই তিলটির কথা।

পসথুমাস এ যাবৎ সংশয় ও সন্দেহের সঙ্গে অন্তর্বেদনার দোলায় একে একে শুনে চলেছিল ইয়াসিমোর সুচতুর বর্ণনা, কিন্তু এবার আর সে নিজেকে সম্বরণ করতে পারলনা, ইমোজেনের উপর ক্রোধ ও আক্রোশে সে ফেটে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতের হীরের আংটিটি খুলে দিয়ে দিল ইয়াসিমোকে। কেননা ইয়াসিমো ব্রেসলেট উদ্ধার করে আনতে পারলে সে বাজিতে হার মেনে আংটিটি দেবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

এরপর পসথুমাসের মনে ইমোজেনের জন্যে আর বিন্দুমাত্র ভালবাসা অবশিষ্ট রইলনা। তার প্রতি আক্রোশের বশে সে তাকে হত্যার একটা চক্রান্ত করে চিঠি লিখে পাঠালো পিসানিও নামে বৃটেনের এক ব্যক্তিকে। সেই লোকটি একসময়ে ইমোজেনের কাছে কাজ করত এবং সে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে বহুকাল পসথুমাসের কাছের মানুষ ছিল। পসথুমাস তার কাছে ইমোজেনের বিশ্বাসহীনতার কথা সব খুলে জানাল এবং যাবতীয় প্রমাণের কথাও উল্লেখ করতে ভুলল না। পরিশেষে সে পিসানিওকে নির্দেশ দিল ইমোজেনকে নিয়ে ওয়েলস-এর সামুদ্রিক বন্দর মিলফোর্ড হ্যাভেন-এ যেতে এবং সেখানে তাকে হত্যা করতে এদিকে আবার মিথ্যা করে একখানা চিঠি দিল ইমোজেনকে যেন তার সঙ্গে দেখা না হওয়ার দুঃখে তার আর দিন কাটছে না, তাকে না দেখতে পেলে সে আর বাঁচবে না। তাই বৃটেনে ফিরলে তাকে মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে সে জানে তবুও মিলফোর্ড হ্যাভেন-এ সে এসে দেখা করবে ইমোজেনের সঙ্গে। অতি সরলমনা ইমোজেন এই চিঠি পেয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি যে এর পিছনে এত বড় চক্রান্ত থাকতে পারে। সে তার স্বামীকে মনে করত সবচেয়ে আপন, সবার বড়, তাই তার কাছে স্বামীর দেখা পাওয়ার চেয়ে আর কিছুই বড় হতে পারে না। পত্র পাঠ মাত্র সেই রাতেই সে পিসানিওর সঙ্গে রওনা হল মিলফোর্ড হ্যাভেনের-এর উদ্দেশ্যে।

পিসানিও মানুষটি কিন্তু ছিল সৎপ্রকৃতির। সে পসথুমাসের নিতান্ত বিশ্বস্ত ছিল ঠিকই, কিন্তু এই অন্যায় ও অধর্মের কাজে যে পসথুমাসের নির্দেশ পালন করতে চাইল না। ইমোজেনের কাছে সে পথ চলতে চলতে নির্মম সত্যটা বলে দিল।

কোথায় স্বামীর সংগে দেখা হওয়ার আনন্দ ও আবেগ আর কোথায় সেই প্রিয়তম স্বামীর পাঠানো হত্যার চক্রান্ত—ইমোজেন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না—দুঃখে ও বিষাদে সে আত্মহারা হয়ে পড়ল।

ইমোজেনকে এই অবস্থায় আশ্বস্ত করার জন্যে তাকে নানা কথায় প্রবোধ দিতে লাগল পিসানিও। সে তাকে বলল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নিয়ে কিছুদিনের জন্যে শান্ত হয়ে থাকতে, পসথুমাস অবশ্যই নিজের ভুল বুঝতে পারবে এবং অচিরেই অনুতপ্ত হবে। কিন্তু ইমোজেনের মন ভেঙ্গে গেছে, সে আর কিছুতেই নিজের বাড়িতে তার বাবার কাছে ফিরতে চাইল না—পথই তার একমাত্র আশ্রয়। এমতাবস্থায় পিসানিও দেখল পথে একা চলতে ইমোজেনের মত এমন সুন্দরী অথচ অল্পবয়স্কা মেয়ের নানা বিপদ আসতে পারে, তাই সে তাকে পরামর্শ দিল পুরুষের পোশাক পরে ছদ্মবেশে আত্মগোপণ করতে। এ প্রস্তাবে ইমোজেন অগত্যা রাজী হয়ে গেল, কেননা, তার মাথায় এখন এক নতুন ভাবনার উদ্ভব হয়েছে। স্বামীর এই নিষ্ঠুর আচরণ সত্বেও সে তার স্বামীকে ভুলতে পারছে না, তাই সে মনস্থ করল যে করেই হোক সে রোমে গিয়ে তার স্বামীর শরণাপন্ন হবে।

পিসানিওর এদিকে রাজবাড়িতে না ফিরে উপায় নেই। তাই এই অনিশ্চিত অবস্থায় ইমোজেনকে তার ফেলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর না দেখে সে তাকে এক শিশি দিল এবং বলল, এটি তাকে দিয়েছেন স্বয়ং রাণী, আর এর গুণে মানুষের যাবতীয় রোগশোক নির্মূল হতে পারে।

এখন এটির আবার একটি বিশেষ ইতিহাস ছিল। রাণী ছিলেন পিসানিওর উপর অত্যন্ত বিরূপ এবং তার অন্যতম কারন পিসানিও ছিল ইমোজেন ও পসথুমাসের বিশ্বস্ত কাজের মানুষ। তাই গোপণে তিনি তাঁর বৈদ্যকে দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে চেয়েছিলেন বলবর্ধক সালসার নামে এক প্রাণঘাতি বিষ। বৈদ্য মানুষটিও ছিলেন সৎ প্রকৃতির, তিনি জানতেন রাণীর মতিগতি কী প্রকারের। রাণী অবশ্য বৈদ্য মহাশয়কে বলেছিলেন যে ঐ ওষুধটি তিনি প্রয়োগ করতে চান জীবজন্তুর উপর। যাহোক, বৈদ্য ভেবে চিন্তে এক নতুন ধরণের এক সালসা প্রস্তুত করলেন—এর প্রয়োগে একটি মানুষ এমনভাবে কয়েক ঘন্টার জন্যে ঘুমিয়ে পড়বে যে মনে হবে সে নিশ্চিত মৃত। কিন্তু কয়েকঘন্টা বাদে আবার তার জ্ঞান আগের মতই ফিরে আসবে। সালসাটির এই প্রক্রিয়ার কথা পিসানিওর জানা ছিল, তাই সে ইমোজেনকে এটি দিয়ে বলল যদি পথে কোথাও সে তেমনভাবে বিপন্ন হয় তবে যেন মৃত্যুর ভাণ করার জন্যে এটি গ্রহণ করে, তাহলে তাকে মৃত ভেবে আর কেউ উৎপাত করবে না। অতঃপর ঈশ্বরের কাছে ইমোজেনের মঙ্গল কামনা করে পিশানিও বলল যেন পথে তাকে কোনো বিপদ-আপদে না পড়তে হয়, ঈশ্বর তার সহায় হোন। এই বলার পর সে ফিরে চলল রাজবাড়িতে।

অদৃশ্য ভাগ্যদেবতা কিন্তু অলক্ষ্যে বসে ইমোজেনের জন্যে এক ভিন্ন পথ প্রস্তুত

করে রেখেছিলেন, তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অবিশ্বাস্য। কেননা, পথ চলতে চলতে জঙ্গলের মধ্যে সে দেখা পেয়ে গেল তার হারিয়ে যাওয়া দুটি ছোট ভাইয়ের যারা সেই শিশুকালেই রাজপ্রাসাদ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল এবং কোনোমতেই যাদের আর সন্ধান মেলেনি। আসলে এই কাণ্ডটি করেছিল রাজসভারই একজন গণ্যমান্য সভাসদ্। রাজা কোনো এক সময়ে তাঁর উপর রুষ্ট হয়েছিলেন এবং দেশদ্রোহের অপরাধে তাকে নির্বাসনদণ্ড দান করেছিলেন। ঐ সভাসদের নাম ছিল বেলারিয়াস। বেলারিয়াস আসলে নির্দোষ ছিলেন এবং মিথ্যা অপবাদে রাজার এই শাস্তিদানের জন্য তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে রাজার শিশুপুত্রদুটিকে অপহরণ করে নিয়ে আসেন এই জঙ্গলে এবং এখানেই তাদের লালন পালন করতে থাকেন। কালক্রমে শিশু দুটির উপর বেলারিয়াসের মমত্ববোধ জাগার ফলে তিনি তাদের নিজের পুত্রবৎ বড় করে তুলতে থাকেন। শিক্ষা দীক্ষা এবং রাজসিক যাবতীয় গুণে দিনে দিনে ঐ শিশুদুটির পূর্ণ বিকাশ হতে থাকে। শারীরিক বলবিক্রমেও তাদের জুড়ি ছিল না আর শিকারের প্রতি তাদের ছিল রাজসিক প্রবণতা। আবার শিকারই ছিল তাদের প্রাণধারণের একমাত্র অবলম্বন। তাদের শক্তি ও বীর্যবত্তার ফলে তারা সর্বদাই অদের পিতৃকল্প বেলারিয়াসকে উত্যক্ত করত লড়াই-এ যাওয়ার অভিপ্রায়ে। তাদের ধারণা ছিল একমাত্র যুদ্ধবিগ্রহের সাহায্যেই তাদের ভাগ্যোন্নতি সম্ভব।

আমরা জানি ইমোজেনের লক্ষ্য ছিল মিলফোর্ড হ্যাভেনে পৌঁছানোর, কেননা সেখানে গেলেই তার রোমে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। কাজেই মিলফোর্ড হ্যাভেনের সন্ধানে সে ঐ বিশাল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলছিল একা একা। পথ চলতে চলতে ক্রমশ ক্লান্তিতে তার পা আর চলেনা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সে যেন আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল। পুরুষের পোশাক তো বাইরের সাজ, আসলে তো সে একটি নারী, তায় অল্পবয়স্কা। কাজেই হয়রান হয়ে গিয়ে যখন তার হতাশায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল ঐ জঙ্গলের মধ্যে একটি গুহার দিকে। তার মনে একটু আশার উদয় হল, যদি ওখানে কিছু খাদ্য অথবা পানীয়ের সন্ধান মেলে, যদি কোনো মানুষের দেখা পাওয়া যায় যার কাছে সে অর্থের বিনিময়ে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। গুহাটির কাছে গিয়ে ইমোজেন দেখল কেউই সেখানে নেই। চারিদিকে লক্ষ্য করতে করতে তার চোখে পড়ল এক স্থানে কিছু বাসি মাংস রাখা আছে। তখন তার ক্ষুধা এতই প্রবল যে কারো কাছে অনুমতি নেওয়া বা কারো আহ্বানে খাদ্যগ্রহণ করার মত ভদ্রতাবোধ সে হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই সে বসে পড়ল ঐ মাংস নিয়ে এবং নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করে নিল। খাওয়া শেষ হলে ইমোজেন ভাবতে লাগল—জীবনধারণ ব্যাপারটা বড় জব্বর। এর ক্লান্তি আর কষ্টের শেষ নেই। এই তো পরপর দুটো রাত আমাকে কাটাতে হল ভূমি শয্যায়। যাক, মনের জোরেই আমাকে বাঁচতে হবে, নাহলে আমি শেষ পর্যন্ত পেরে উঠব না। পিসানিও যখন ঐ পাহাড়ের উপর থেকে আমাকে মিলফোর্ড হ্যাভেনের জায়গাটা

দেখিয়েছিল তখন মনে হয়েছিল ওটা বুঝি কত কাছে। এই সব ভাবতে ভাবতে তার মনে এল পসথুমাসের কথা, কেমন নির্দয়ের মত সে তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে—সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল—হায় প্রিয়তম পসথুমাস শেষপর্যন্ত তুমিই এমন শত্রুতা করলে।

ইমোজেনের ভাই দুটি গুহার বাইরে গিয়েছিল তাদের বাবার সঙ্গে (বেলারিয়াসকে তারা বাবা বলেই জেনেছিল)। শিকারের পরে তারা আবার গুহায় ফিরে এল। বেলারিয়াস তাদের নতুন করে নামকরণ করেছিলেন— একজনের নাম ছিল পলিডোর এবং আর এক জনের নাম ছিল কডওয়াল। তারা নিজেদের ঐ নামেই জানতো এবং বেলারিয়াসকেই জানতো তাদের পিতা বলে; কিন্তু রাজপুত্র হিসাবে তাদের প্রকৃত নাম ছিল গাইডোরিয়াস ও আরভিরেগাস।

গুহায় ফেরা মাত্রই ইমোজেনের দিকে প্রথম চোখ পড়ল বেলারিয়াসের। সে বালকদুটিকে বলল—এদিকে এসোনা। একটা কে যেন আমাদের খাবার মাংসটুকু খেয়ে নিচ্ছে, ও মানুষের মতই খাদ্য গ্রহণ করছে নাহলে ওকে দেখলে মনে হত কোনো পরীটরি হবে।

বালক দুটি জানতে চাইল—কি আছে ভিতরে? বেলারিয়াস বলল—ঈশ্বরের নামে বলছি গুহার ভিতরে যেন একজন দেবদূতের মত দেখছি, যদি দেবদূত না হয় তবে এমন রূপবান মনুষ্য পৃথিবীতে বিরল। আসল কথা পুরুষের ছদ্মবেশে ইমোজেনকে দেবদূতের মতই দেখতে লাগছিল।

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে ইমোজেন তৎক্ষনাৎ গুহার ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। বেলারিয়াস ও অপর দুটি বালককে দেখে সে বলল—দোহাই আপনাদের, আমাকে কিছু বলবেন না। আমি নিজের ইচ্ছায় আপনাদের এই খাবার খেয়ে ফেলিনি। আমি মনে করেছিলাম গুহার ভিতরে কেউ আছেন। তার কাছে হয় ভিক্ষা করে না-হয় কিনে নেব আমার প্রাণ ধারণের জন্যে সামান্য খাদ্য। চুরি করে কিছু নেওয়ার আমার উদ্দেশ্য ছিল না। যদি মেঝেতে কোথাও ছড়ানো থাকতো তাহলেও আমি তা স্পর্শ করতাম না। এই নিন, আমি যে খাদ্য নিয়েছি তার মূল্যবাবদ এই টাকা দিচ্ছি, আর, যদি আপনাদের সঙ্গে দেখা না হত তাহলেও আমি এখানে বোর্ডের উপর এই টাকাটা মূল্য হিসাবে রেখে যেতাম এবং যাওয়ার সময় আমার আহার দাতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রার্থনা করে যেতাম। ইমোজেনের এ কথার পর আগন্তুক ব্যাক্তিরা কিছুতেই তার দেওয়া টাকা নিতে চাইল না। তখন ভয়ে ভয়ে ইমোজেন বলল—নিশ্চয়ই আপনারা আমার উপর খুবই রাগ করেছেন, কিন্তু আমার এই অপরাধের জন্যে যদি আপনারা আমাকে মেরে ফ্যালেন, তবু জানবেন এই অপরাধ না করলেও ক্ষুধার ফলে আমার এমনিতেই মরতে হতো।

বেলারিয়াস প্রশ্ন করল—তুমি কোনদিকে যাবে বলে স্থির করেছ, আর তোমার পরিচয়ই বা কি?

ইমোজেন নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে বলল—আমার নাম ফিডেল, আমার একজন আত্মীয়ের ইটালিতে যাওয়ার কথা। মিলফোর্ড হ্যাভেন-এ সে আছে, আমি তারই সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। পথে এতই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি যে আমি আর এক পা-ও চলতে পারছিলাম না, তাই অনন্যোপায় হয়ে না-বলে আপনাদের আহার খেয়ে ফেলেছি।

ইমোজেনের কথা শুনে বেলারিয়াসের দয়ার উদ্রেক হল। সে বলল, ভয় পেওনা, আমরা অসভ্য বর্বর নই। আমাদের এই বাসস্থান দেখে আমাদের তুমি বুঝতে পারবে না। যাহোক, তোমার কোনো ভাবনা বা ভয় নেই, তুমি ভদ্র সংসর্গেই এসে পড়েছ। তা এখন তো বেশ রাত হল। তুমি এখনকার মত নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর। তোমাকে আমরা অতিথি হিসাবে সমাদর জানাচ্ছি এবং আমাদের সঙ্গে থাকতেই অনুরোধ করছি। এই বলার পর বেলারিয়াস তার ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলল—যাও ওকে ডেকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে নাও।

বালকদুটির আর দেরি সয়না। তারা ইমোজেনকে একেবারে নিজেদের সহোদর ভাইয়ের মতোই টেনে নিয়ে চলল গুহার ভিতরে। তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে বলতে বলল—তোমাকে আমরা ভালবাসব আমাদের এক ভাই-এর মতই। এর পর আর দূরত্ব রইল না। ঘরের ভিতরে শিকার করে আনা হরিণের মাংস প্রস্তুতই ছিল। ইমোজেন ঘর দোর গুছিয়ে পাকা গৃহিনীর মত রাত্রের আহারের জন্য মাংসও তৈরী করে ফেলল। একালের অভিজাত বংশীয়নারীরা তেমন একটা পাকশালার বিষয়ে মাথা ঘামান না, কিন্তু তখন ঠিক এমনটা ছিলনা, এবং ইমোজেন এই শিল্পে ছিল বিশেষ পারদর্শিনী। তার ভাইদুটি তার হাতের রান্না খেয়ে বলল—ফিডেল একেবারে ঠিক ঠিক মতন টুকরো করে কাটা থেকে রাঁধা পর্যন্ত এমন নিখুঁতভাবে সব করেছে যে মনে হচ্ছে জুনোর অসুস্থতায় তার মুখে রুচি আনার জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করেছে ফিডেল। পলিডোর তার ভাইকে ডেকে বলল—দেখেছিস, আবার কী সুন্দর গলায় ও গান গায়।

তারা দুই ভাই মিলে এ-ও আলোচনা করল যে তারা লক্ষ্য করেছে যদিও ফিডেলের হাসিটা খুবই মিষ্টি তবু কোথায় যেন ওর হাসির তলায় একটা চাপা দুঃখ লুকোনো আছে, আর ওর মুখে ফুটে উঠছে সেই দুঃখটাকে ধৈর্য নিয়ে বয়ে বেড়ানোর বিষণ্নতা।

ইমোজেনের সুমিষ্ট ব্যবহারের জন্যেই হোক অথবা তাদের সকলের অজ্ঞাতে তাদের পরস্পরের রক্তসম্পর্কের ফলেই হোক ইমোজেনের প্রতি পলিডোর এবং কডওয়েলের স্নেহভালবাসা দিনে দিনে বেড়েই চলল, তারা আর তাকে ছাড়া থাকতেই পারে না, যদিও তাদের কাছে সে ইমোজেন বলে পরিচিত নয়, ফিডেল বলেই তাকে তারা জানে। এদিকে ইমোজেনেরও ঐ ছেলে দুটির উপর মায়া পড়ে গেল, তারও মনে হতে থাকল যদি পসংথুমাসের স্মৃতিটা তাকে তাড়না করে না ফিরতো

তবে হয়তো সারা জীবন সে কাটিয়ে দিত এই পার্বত্য গুহায় ঐ আরণ্য বালক দুটির সঙ্গে। কিন্তু তাকে তো পসথুমাসের সন্ধানে রোমে যেতেই হবে। তবু তার এই ভাইদের অনুরোধে সে রাজী হল ওদের সঙ্গে আপাততঃ থেকে যাবে যতদিন না তার ঠিকমত বিশ্রামের ফলে শারীরিক ক্লান্তি দূর হয়। তারপর সে মিলফোর্ড হ্যাভেনের দিকে যাবে রোমের পথে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই এই অরণ্যবাসীদের গুহায় মজুত মৃগমাংস শেষ হয়ে এল। এবার আবার শিকারে বেরুবার তাড়া, ভাইদের সঙ্গে কিন্তু ইমোজেনের শিকারে যাওয়া হয়ে উঠল না, তার শরীর দিন দিনই যেন অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। একদিকে স্বামীর দুর্ব্যবহারের ফলে মনস্তাপ অন্যদিকে বনে জঙ্গলে অনাহারে পথ চলার শারীরিক ধকল—এই সব মিলে তার শরীর আর কিছুতেই সুস্থ হতে চায় না।

অগত্যা বেলারিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে দুই ভাই আবার বেরিয়ে পড়ল হরিন শিকারের উদ্দেশ্যে। যাওয়ার সময় সারা বনে তারা নিজেদের মধ্যে ফিডেলের গুণপনার কথা আলোচনা করতে করতে গেল।

ঠিক এই সময়েই আবার ইমোজেন যখন একা একা গুহার মধ্যে ছিল তার তখন মনে পড়ে গেল পিসানিওর দেওয়া সেই বলবর্ধক সালসাটার কথা। সে বেশি কিছু না ভেবেই সেই সালসা পান করে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ল যে যেন একটা মৃতদেহ পড়ে আছে।

ইমোজেনের ভাইয়েরা ও বেলারিয়াস শিকার শেষ হলে আবার তাদের গুহায় ফিরে এল। প্রথমে প্রবেশ করল পলিডোর। ইমোজেন ঘুমিয়ে আছে মনে করে সে সন্তর্পণে তার ভারী জুতোজোড়া খুলে হাতে নিল, পাছে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। জঙ্গলে বাস করলেও এই ভব্যতাবোধ তারা পেয়েছিল রক্তের মধ্যে, বংশের ধারায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পলিডোরের যেন মনে হল এ ঘুম যে সে ঘুম নয়, কোনো শব্দেই এ ঘুম ভাঙ্গবে না। পলিডোর আর নিজেকে সামলাতে পারল না। সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, যেন সে তার আপন সহোদরকে হারিয়েছে চিরকালের জন্যে।

বেলারিয়াস স্থির করল তারা ফিডেলকে নিয়ে যাবে দূরে জঙ্গলের মধ্যে এবং সেখানে মৃতের সৎকারের জন্যে প্রচলিত বিধান অনুসারে শোকসঙ্গীত সহ অন্ত্যেষ্টির যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করবে।

ইমোজেনের দুই ভাই তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এল বনের ভিতর একটা ছায়াঢাকা শূন্য যায়গায়। সেখানে তাকে তারা ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল নরম ঘাসের বিছানায়, এবং মৃদুস্বরে গান করতে লাগল তার আত্মার শান্তির কামনায়। সবুজ পাতায় আর ফুলে ফুলে তারা ঢেকে দিল ইমোজেনের দেহ, আর পলিডোর আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল—যতদিন বসন্ত থাকবে আর আমিও থাকবো, হে ফিডেল আমি তোমার কবরে ফুল ছড়িয়ে দেব প্রতিদিন। ঐ যে ম্লানমুখী প্রিমরোজ, ও যেন ঠিক তোমারই মুখের মত, ঐ যে ব্লুবেল, ও যেন তোমার শিরার রক্তধারার মত নীল, আর

ঐ যে ইগল্যানটাইনের পাতাগুলি থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে ওর সৌরভ তোমার নিঃশ্বাসের মত এত সুন্দর নয়। ঐ সব ফুল পাতাই আমি ছড়িয়ে দেব তোমার কবরে। শীতে যখন কোনো ফুলই আর ফুটবে না তখন তোমার সুন্দর দেহে বিছিয়ে দেব ফাব-এর মত করে শ্যাওলার আস্তরণ।

অন্ত্যেষ্টির ক্রিয়াকর্ম শেষ করার পর বিষণ্ন মনে ফিরে এল তিনজন তাদের সেই গুহার আবাসে।

ওরা ফিরে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ইমোজেনের ঘুম ভাঙ্গল, তার শরীরের উপর সেই সালসার ক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে, তাই তার চেতনা ফিরে এল। সে সহজেই তার দেহে ছড়িয়ে দেওয়া ফুল ও পাতাগুলি দুহাতে সরিয়ে ফেলে ভাবতে লাগল বোধ হয় এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল—'আরে আমি তো ভাবছি আমি পাহারায় আছি গুহার ভিতর, আর ঐ ভালোমানুষদের রান্নাবান্না সামলাচ্ছি—কিন্তু এখানে এলাম কী করে। আর এতো ফুলের নীচেই বা ঢাকা পড়লাম কেন'? সে যখন কাউকেই আর দেখতে পেল না এবং সেই গুহার পথটাও আর খুঁজে পেলনা তখন ভাবতে লাগল নিশ্চয়ই সবটাই একটা স্বপ্ন ছিল—ঐ গুহা, ঐ মানুষগুলি সবই এসেছিল তার স্বপ্নে। কাজেই আবার শুরু হল তার ক্লান্তিকর সেই তীর্থযাত্রা, স্বামীদর্শনে মিলফোর্ড হ্যাভেন-এর পথে এবং সেখানে পৌঁছে কোন একটি জাহাজে স্থান সংগ্রহ করে ইটালিতে পৌঁছানো। তার মনের একমাত্র সংকল্প তার স্বামী পসথুমাসের দেখা পাওয়া এবং এক বালক ভৃত্যের ছদ্মবেশে তার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া।

বাইরের জগতে ঠিক এই সময়ে যে কী পরিমান তোলপাড় চলছিল তার কোন সংবাদই ইমোজেনের জানা ছিলনা। রোম সম্রাট অগস্টাস সিজারের সঙ্গে বৃটেনের অধিপতি সিমবেলিনের যুদ্ধ উপস্থিত, তাই দিকে দিকে যুদ্ধের শিঙা বেজে উঠেছিল। রোমান সৈন্যদল আক্রমনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছে বৃটেনে এবং এই জঙ্গলের পথ দিয়েই তারা অগ্রসর হয়ে চলেছে রাজধানীর দিকে। এই সৈন্যদলের সঙ্গেই আবার চলেছিল পসথুমাস।

পসথুমাস যদিও রোমের সৈন্যদলের একজন অধিনায়ক হয়েই বৃটেনে উপস্থিত, তবুও মনে মনে সে জানত সে নিজের দেশবাসীর বিরুদ্ধে কিছুতেই রোমের পক্ষ নিয়ে লড়াই করবে না, বরং সময় এবং সুযোগ মত সে বৃটেনদের পক্ষ নিয়েই লড়াই করবে তাদের রাজার পক্ষে, যদিও সেই রাজাই তাকে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

ইমোজেনের সম্পর্কে এখনও তার সেই ভ্রান্ত ধারণাই ছিল—ইমোজেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। সে আরও জানতো ইমোজেন বেঁচে নেই, কেননা পিসানিও তাকে লিখে জানিয়েছিল যে সে তার নির্দেশমত ইমোজেনকে হত্যা করেছে। এসব সত্ত্বেও পসথুমাসের মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ফিরে আসেনি।

তাই নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কারে সে সৈন্যদলের সঙ্গে বৃটেনে ফিরেছে, যদি যুদ্ধে তার প্রাণ যায় সেই ভালো, নচেৎ দেশে ফেরার অপরাধে যদি সিমবেলিনের কাছে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয় তা-ও কাম্য।

এদিকে ইমোজেন বনের পথে চলতে চলতে ধরা পড়ে গেল রোমান সৈন্যদের হাতে। কিন্তু তার আচরণ ও হাবভাব দেখে রোমান সেনাপতি লুসিয়াস বিশেষ খুশি হলেন এবং তাকে নিজের বালক ভৃত্য হিসাবে নিয়ে নিলেন।

অপরদিকে সিমবেলিনের সৈন্যদলও এগিয়ে আসছে রোমের শক্তিকে বাধা দিতে। তারাও এসে প্রবেশ করল ঐ জঙ্গলে। পলিডোর ও কডওয়াল দেখল এতদিনে তাদের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সুযোগ উপস্থিত, তাই তারা বীরত্ব প্রকাশের এ সুযোগ হাতছাড়া করল না. তারা যোগ দিল সিমবেলিনের সৈন্যদলে, যদিও তারা ঘুণাক্ষরেও জানত না যে তাদেরই পিতার জন্যে তাদের এ যুদ্ধযাত্রা। বেলারিয়াসও দেখল এই তার সুযোগ। তার নিজের মনে একটা অপরাধবোধ সর্বদাই তাকে তাড়িত করত, দুই রাজপুত্রকে হরণের অপরাধ। তাই রাজার পক্ষে যুদ্ধযাত্রা করে সেই অপরাধ অপনোদনের আশায় সে-ও গিয়ে যোগ দিল সৈন্যদলে। তার বয়সকালে যোদ্ধা হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল. তাই যুদ্ধে যাওয়াটা সব দিক দিয়েই তার কাছে আনন্দের ছিল।

দুপক্ষের সৈন্যদল মুখোমুখি হওয়ার পর লড়াই শুরু হল এবং উত্তরোত্তর তা ভীষণ আকার ধারণ করল। রোমান সৈন্যদের শক্তি ছিল অনেক বেশি, তাদের বিক্রমে রাজা সিমবেলিনের সৈন্যদেরতো নাজেহাল, তাদের পরাজয়ই শুধু নিশ্চিত নয়, রাজার জীবনও বিপন্ন। এমন অবস্থায় পসথুমাসের রোমান পক্ষ ত্যাগ ও বৃটেনদের পক্ষ নিয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধের ফলে এবং তার সঙ্গে বেলারিয়াস ও রাজার দুইপুত্রের অসীম সাহসিকতার দরুণ রাজার প্রাণরক্ষা হল। রোমান সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু করল এবং অচিরে তাদের পরাজিত করে জয়ী হল বৃটেনের সৈন্যদল।

যুদ্ধ শেষ হল, কিন্তু পসথুমাস দেখল যুদ্ধে মৃত্যু তার ভাগ্যে জুটল না। তাই সে এবার গিয়ে আত্মসমর্পণ করল সিমবেলিনের এক সেনাধ্যক্ষের কাছে এবং প্রার্থনা জানাল তাকে যেন দেশে ফিরে আসার অপরাধে রাজাদেশ অনুসারে হত্যা করা হয়।

ইমোজেন ও তার প্রভু লুসিয়াসকে বন্দী হিসাবে উপস্থিত করা হল রাজা সিমবেলিনের কাছে। আবার ইমোজেনের সর্বনাশ করেছিল যে ইয়াসিমো সে-ও রোমের একজন সেনাপতি হিসাবে ধরা পড়ার ফলে তাকেও নিয়ে আসা হল বৃটেনের রাজার কাছে। পসথুমাসকেও আনা হল তার মৃত্যু দণ্ডাদেশের জন্যে। ঠিক এমন সময় আবার রাজার সামনে হাজির করা হল বেলারিয়াস, পলিডোর এবং কডওয়ালকে যুদ্ধের সময় সিমবেলিনকে তারা যে বীরত্বের সঙ্গে রক্ষা করেছিল তার উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়ার জন্যেই তাদের উপস্থিত করা। আবার রাজার একজন পরিচারক

হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিল পিসানিও।

অতএব রাজার সম্মুখে এখন উপস্থিত এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং তাদের মধ্যে কেউবা অপেক্ষারত সম্মানলাভের আশায় আবার কারো বা মনে ভয় আশু শাস্তি লাভের। পসথুমাস আছে, আর আছে ইমোজেন ছদ্মবেশে তার আপাতপ্রভু রোমান সেনাধ্যক্ষ লুসিয়াসের সঙ্গে, আছে বিশ্বাসী ভৃত্য পিসানিও যে একদিন রক্ষা করেছিল ইমোজেনের প্রাণ, আছে অবিশ্বাসী বন্ধু ইয়াসিমো যে দুঃখ ডেকে এনেছে ইমোজেনের জীবনে, আর আছে রাজার দুই অপহৃত পুত্র এবং তাদের অপহরণকারী রাজসভাসদ বেলারিয়াস।

সর্বপ্রথম কথা বলল রোমান-সেনাধ্যক্ষ। অপর সকলে সম্পূর্ণ নির্বাক, যদিও অনেকেরই মনে নানা আশঙ্কা ও আতঙ্ক।

পরিস্থিতিটি চূড়ান্ত এক নাটকীয় দৃশ্য। ইমোজেন দেখছে তার স্বামী পসথুমাস তার সামনে দাঁড়িয়ে, যদিও সে ছদ্মবেশ নিয়েছে কৃষকের, পসথুমাস তাকে দেখছে কিন্তু তার পুরুষের বেশ থাকায় তাকে শনাক্ত করতে পারছে না। ইমোজেন দেখছে ইয়াসিমোকে এবং দেখতে পাচ্ছে তার হাতে তারই সেই অঙ্গুরীয়টি, যদিও সে তখনও জানে না কী উপায়ে সেটি সে অধিকার করেছে এবং এ-ও জানে না যে সে-ই তার যাবতীয় দুর্ভাগ্যের কারণ, আর সবচেয়ে নাটকীয় এই যে সে দণ্ডায়মান তারই পিতার সম্মুখে এবং তার বর্তমান পরিচয় সে যুদ্ধবন্দী।

পিসানিও কিন্তু ইমোজেনকে ঠিকই চিনতে পেরেছে। আর পারবে না-ই বা কেন, সেই তো তাকে পুরুষের ছদ্মবেশে সাজিয়ে দিয়েছিলো। কাজেই তার মন আনন্দে নেচে উঠল—বেঁচে আছে ইমোজেন, তবে আর ভয় কিসের! আবার বেলারিয়াসও চিনতে পারছে ইমোজেনকে। সে কডওয়ালকে মৃদুস্বরে বলল—আরে সেই ছেলেটা নয়, যাকে আমরা মৃত বলে কবরে শুইয়ে দিয়েছিলাম? কডওয়াল বলল—অবিকল সে-ই, এতে আব সন্দেহ মাত্র নেই, একবিন্দু বালুকণার সঙ্গে যেমন অপর এক বিন্দু বালুকণার কোন পার্থক্যই থাকে না, ঠিক তেমনি এই ছেলেটির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল আমাদের সেই মিষ্টি গোলাপের মত ছোট ছেলেটি ফিডেলের। সেই মৃত ছেলেটিই এখানে জীবিত দাঁড়িয়ে আছে—বলল পলিডোর। বেলারিয়াস বলল চুপ, চুপ—যদি ও সেই ছেলেটিই হয় তবে নিশ্চয়ই ও আমাদের ডেকে কথা বলবে। পলিডোর চুপিচুপি সন্দেহ প্রকাশ করে বলল—কিন্তু আমরা তো ওকে মৃতই দেখেছিলাম। বেলারিয়াস বলল—চুপ কর না। দেখা যাক।

পসথুমাস একটিও কথা না-বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল নিজের মৃত্যু দণ্ডের অপেক্ষায় ও আশায়। সে রাজার কাছে কিছুতেই প্রকাশ করবে না যে যুদ্ধে সে রাজার প্রাণ রক্ষা করতে সাহায্য করেছে, কেননা এ কথা শুনলে রাজা হয়তো দয়াপরাবশ হয়ে তাকে জীবনভিক্ষা দেবেন। তা সে চায়না।

আগেই বলা হয়েছে যে লুসিয়াসই প্রথম মুখ খুলল রাজার সামনে। সে ছিল

বীর ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। সে তার মর্যাদাবোধ নিয়ে বলল—

আমি শুনেছি আপনি যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ গ্রহণ করেন না, আপনার দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের কোনো ক্ষমা নেই। আমার পরিচয় আমি রোমান, রোমানরা মৃত্যুকে ভয় পায়না। কিন্তু আমি আপনার কাছে একটিই মাত্র অনুরোধ করব। একথা বলার পর সে ইমোজেনকে রাজার সামনে এনে বলল—এই ছেলেটি জাতিতে বৃটন। পণের বিনিময়ে এর জীবন রক্ষা করুন। এ ছিল আমার বালকভৃত্য। আজ অবধি কোনো প্রভুর ভাগ্যেই বোধ হয় এমন মৃদুস্বভাব, কর্তব্যপরায়ণ-এবং সর্ববিষয়ে মনযোগী, সত্যনিষ্ঠ ও সেবাপরায়ণ ভৃত্য জোটেনি। সে একজন রোমানের কাছে কাজ করেছে এই মাত্র কিন্তু সে নিজে কোনো বৃটনের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করেনি। আর কোনো ব্যক্তিকে যদি আপনি ক্ষমা না-ও করেন, আমার অনুরোধে অন্ততঃ এই বালকটিকে প্রাণ ভিক্ষা দিন।

সিমবেলিন কেমন যেন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার কন্যা ইমোজেনের মুখের দিকে। তিনি তাকে তার ছদ্মবেশে চিনতে পারছেন না, কিন্তু তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি যেন তার ভিতরে কেমন উতলা হয়ে উঠছিল পিতৃস্নেহে, তিনি স্বগতোক্তি করে বললেন—যেন ওকে খুবই আমার চেনা বলে মনে হচ্ছে, কী জানি কোথায় বা কখন দেখেছি। তিনি ইমোজেনকে লক্ষ্য করে বললেন—বেঁচে থাক বালক, তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম, আর এ ছাড়া যদি তোমার অপর কোনো আশঙ্কা থাকে তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো, আমি নিশ্চয়ই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করব, তা সে যদি এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে সম্মানী বন্দীকেও তুমি মুক্ত করে নিতে চাও। আমি তা-ও দেব।

ইমোজেন তার পিতা রাজাকে বলল—আপনার এই মহত্বের জন্যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

তখনকার দিনে কোনো বরদানের প্রতিশ্রুতির অর্থই ছিল বরদান—অর্থাৎ যে কোনো বরই প্রার্থনা করা হোক তা সিদ্ধ হবে। প্রতিটি মানুষের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ইমোজেনের দিকে—সকলেই ভাবছে কী জানি কী বর সে প্রার্থনা করবে। তার রোমান প্রভু লুসিয়াসের নিশ্চিত ধারণা হল তার ভৃত্য অবশ্যই প্রভুর জীবন ভিক্ষা করবে, তাই সে নিজে থেকেই বলে উঠল, না না বালক, তুমি আমার প্রাণ ভিক্ষা করতে যেওনা, আমি জানি আমার জন্যেই তুমি বলবে, কিন্তু আমি তা চাই না, প্রাণ ভিক্ষায় আমি প্রস্তুত নই। ইমোজেন একথা শোনামাত্র বলল—না, আমি আপনার প্রাণ ভিক্ষা করতে চাইনা, তার চেয়েও আরও কিছু জরুরী চাওয়ার বস্তু আমার আছে।

নিজের পরিচারকের এই আপাত কৃতঘ্নতায় রোমান সেনাধ্যক্ষের মনটা বিরূপ হয়ে গেল ইমোজেনের প্রতি। সে আশা করেনি তার মুখের উপর ইমোজেন এমন ভাবে বলবে।

এবার ইমোজেন তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ইয়াসিমোর উপর এবং রাজাকে বলল—আমি একটি বর মাত্র প্রার্থনা করি। আপনি অনুগ্রহ করে এই যুবকটিকে বাধ্য করুন স্পষ্ট করে স্বীকার করতে যে তার হাতের ঐ আংটিটি সে কোথায় পেয়েছে এবং কী ভাবে পেয়েছে।

রাজা ইমোজেনের কামনা অনুসারে তৎক্ষণাৎ ইয়াসিমোকে আদেশ করলেন—ওহে যুবক, সব সত্য অকপটে খুলে বল, নচেৎ স্বীকারোক্তির জন্যে রাজবিধি অনুসারে তোমাকে শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে হবে যতক্ষণ না তুমি স্বীকার করতে বাধ্য হও।

ইয়াসিমো এবার আনুপূর্বিক সব কাহিনীই বিবৃত করল। সে বলল কেমন করে তার পসথুমাসের সঙ্গে কথায় কথায় বাজি জেতার প্রসঙ্গ উঠেছিল, পসথুমাস তার স্ত্রীর আনুগত্যের উপর কতখানি বিশ্বাসী ছিল এবং সে কী অসৎ উপায়ে ইমোজেনের ঘরে প্রবেশ করে তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিল, আর তারই ফলে কী ভাবে পসথুমাসের মনে ইমোজেনের সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই নিদারুণ কাহিনী শোনামাত্র পসথুমাস পাগলের মত নিজেকে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার জন্যে হাহাকার করতে করতে রাজাকে গিয়ে বলল—রাজামশাই, আমার প্রাপ্য শাস্তি আমাকে দিন, আমাকে আপনি হত্যার আদেশ দিন। আমি নরাধম, হায় ইমোজেন, হায় পবিত্র ইমোজেন, আমার অপরাধেই তোমার জীবন অবসান হয়েছে। আমিই পিসানিওকে দিয়ে তোমার মৃত্যুর আদেশ করেছিলাম— রাজামশাই, আজ আপনি আমাকে সেই মৃত্যুর আদেশ দিন।

নিজের স্বামীর এই নিদারুণ মনোকষ্টে ইমোজেনের মন দুলে উঠল, সে আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না। পসথুমাসের সামনে গিয়ে সে এবার নিজের পরিচয় প্রকাশ করে ইমোজেন হয়ে ধরা দিল। পসথুমাস তো এই আশাতীত ভাগ্য পরিবর্তনে হতবাক, যে স্ত্রীর প্রতি সে অমন নিষ্ঠুর আচরণ করেছে আজ কীনা সে-ই তাকে এমন করে মার্জনা করল।

রাজা সিমবেলিনও এই অপ্রত্যাশিত আনন্দে আত্মহারা। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি তাঁর গৃহত্যাগী মেয়েকে তিনি এমন এক চমকপ্রদ পরিস্থিতির মধ্যে ফিরে পাবেন। ইমোজেনকে তিনি পিতা হিসাবে নিজের বুকে টেনে নিলেন আর সেই সঙ্গে পূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করলেন পসথুমাসকে স্বীয় জামাতারূপে।

বৃদ্ধ বেলারিয়াস দেখল তার পুরোনো দিনের অপরাধ স্বীকার করার উপযুক্ত মুহূর্ত উপস্থিত। সে রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে বলল সে-ই একদিন দুটি রাজপুত্রকে আক্রোশবশে অপহরণ করেছিল। এই বলে সে দুই রাজকুমার—গাইডেরিয়াস ও আরভিরেগাসকে পরিচয় করিয়ে দিল সকলের কাছে।

সিমবেলিন পরমানন্দে বেলারিয়াসের অপরাধ মার্জনা করলেন। এই চরম আনন্দের মুহূর্তে কোনো মানুষের মনেই ক্ষোভ জমা থাকতে পারে না, তাই কাউকে শাস্তিদানের

প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। রাজা তার হৃত দুই পুত্রসন্তানকে ফিরে পেলেন শুধু তাই-ই নয়, তিনি নিজের চোখে দেখেছেন কেমন বীরত্বের সঙ্গে তার দুটি পুত্র তার জীবনরক্ষার জন্যে সংগ্রাম করেছে। এ আনন্দের কথা তিনি ভাবতেও পারেন নি।

এবার ইমোজেন তার বাকি কাজটুকু শেষ করার জন্যে এগিয়ে এল। সে তার পিতার কাছে আবদার জানাল তার আশ্রয়দাতা প্রভু লুসিয়াসকে মার্জনার জন্যে। রাজা সানন্দে মুক্তি দিলেন রোমান সেনাধ্যক্ষকে। আব এই বদান্যতার প্রতিদানে লুসিয়াস নিজের আগ্রহে রোমসম্রাটের সমীপে এক প্রস্তাব পাঠানোর ফলে বৃটেন ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হল এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হল। এই শান্তি তারপর থেকে দীর্ঘকাল বিঘ্নিত হয়নি।

রাজ্যের একপ্রান্তে ঘন অরণ্যে যখন সব পাওয়ার আনন্দে এতগুলি মানুষের জীবনে সার্থকতার জোয়ার তখন কিন্তু দূরে রাজপুরীতে বিষাদ আর ব্যর্থতার অন্ধকারে রাণী নিঃসঙ্গ, দিশাহারা। ইমোজেনকে কাজে লাগিয়ে ক্লোটেনকে রাজসিংহাসনে বসানোর স্বপ্ন তার চূরমার হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় যে ক্লোটেনকে নিয়ে তার স্বপ্ন সেই অপদার্থ ক্লোটেনই নিজের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে অহেতুক কলহ সৃষ্টি করে নিহত হয়েছে। হতাশা ও বেদনায় এমনিভাবেই অবসান হল রাণীর জীবন। এই 'যার শেষ ভাল তার সব ভাল' উপাখ্যানে রাণীর সেই বেদনার ইতিহাসেব দীর্ঘ বর্ণনা নিতান্তই বেমানান। এটুকু বলেই গল্প শেষ করা উচিত যে যাদের সুখের অধিকারী হওয়ার কথা তারা সকলেই সুখী হল, এমন কি ইয়াসিমোর মত খল ব্যক্তির দণ্ড হওয়া বাঞ্ছনীয় হওয়া সত্বেও তাকে বিনা সাজায় মুক্তি দেওয়া হল কেননা তার চক্রান্তে সাময়িক বিপন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত কাউকে দুঃখ পেতে হল না।

কিং লিয়র

রাজা লিয়র ছিলেন বৃটেনের অধীশ্বর। তিন কন্যার তিনি পিতা। তাদের মধ্যে প্রথমা গনেরিল। বিবাহিতা গনেরিলের স্বামী অ্যালবেনির ডিউক। দ্বিতীয়া কন্যার নাম রেগান, সে-ও বিবাহিতা। তার স্বামী কর্নওয়ালের ডিউক এবং সর্বকনিষ্ঠা কন্যার নাম কর্ডেলিয়া, সে বিবাহযোগ্যা। কর্ডেলিয়ার পাণিপ্রার্থী দুইজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ, তার মধ্যে একজন ফ্রান্সের রাজা স্বয়ং এবং অপরজন বারগ্যাণ্ডির ডিউক। এই কাহিনীর যখন সূত্রপাত তখন উপযুক্ত দুইজন পাণিপ্রার্থীই বৃটেনে উপস্থিত, লিয়রের রাজসভায় এবং উভয়েরই প্রত্যাশা এক-কর্ডেলিরার পাণিগ্রহণ।

রাজা লিয়র অশীতিপর বৃদ্ধ। বয়সের ভারে জীর্ণ ও দীর্ঘকালব্যাপী বাজকার্য পরিচালনার গুরুভারে ক্লান্ত। রাজা স্থির করলেন আর নয়, এবার এই রাজ্য শাসনভার ন্যস্ত করবেন শক্তসমর্থ নবীনদের হাতে এবং আত্মস্থ হয়ে প্রস্তুতি নেবেন মৃত্যুর, যে মৃত্যু আর দূরের নয়—আসন্ন। এই সঙ্কল্প অনুসারে রাজা ডেকে পাঠালেন তাঁর তিন কন্যাকে। উদ্দেশ্য—তাদের নিজেদের মুখ থেকেই তিনি শুনতে ইচ্ছুক কে তাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে এবং তাদের মুখের কথাই তাঁকে নির্ণয় করতে সাহায্য করবে তাঁর প্রতি কার ভালবাসা কতখানি, আর সেই অনুপাতেই তিনি ভাগ করে দেবেন তিন কন্যাকে তাঁর রাজ্য।

সবার বড় গনেরিল। সেই প্রথম বলল তার ভালবাসার কথা। সে বলল তার ভালবাসা প্রকাশের মত ভাষা সে জানে না, তার নিজের চোখের জ্যোতির চেয়ে তার কাছে প্রিয় তার বাবা, তার নিজের জীবন, তার স্বাধীনতা সবই সে ভালবাসার কাছে তুচ্ছ। সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলার কৌশল গনেরিলের জানা ছিল। এমনি করে প্রত্যয়ের সুরে কথা বলে সহজেই সত্যের মুখোশ পরে মিথ্যা ভালবাসা মানুষকে প্রতারণা করতে পারে। কাজেই মেয়ের মুখে এমন ভালবাসার প্রতিশ্রুতি শুনে রাজা তো পিতৃস্নেহে বিগলিত। আনন্দের আতিশয্যে তিনি গনেরিল ও তার স্বামীকে দান করলেন তাঁর বিশাল রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ।

এবার ভালবাসার পরিমাণ জানানোর পালা দ্বিতীয়া কন্যা রেগানের। তাকে ডেকে রাজা জানতে চাইলেন কী তার বক্তব্য। রেগান তার দিদির মত ঐ একই ধাতুতে গঠিত। সে-ই বা ভালবাসার কথায় গনেরিলের চেয়ে কম যাবে কেন? সে বলল তার দিদি বাবাকে যেটুকু ভালবাসা দিয়ে তুষ্ট মাত্র সেটুকু ভালবাসায় তার মন ভরে না, সে তার বাবাকে ভালবাসে আরও বেশি, কেননা বাবাকে ভালবেসে সে যে আনন্দ পায় সে আনন্দের কাছে তার অপর সব আনন্দ বর্ণহীন নিরানন্দের মত।

এমন হৃদয়জুড়ানো কথা শুনে লিয়রের মনে হল কজন পিতার ভাগ্যেই বা এমন সন্তান জোটে। রেগানের ভালবাসার অঙ্গীকারে তিনি এতই মুগ্ধ হলেন যে গনেরিলের চেয়ে কম কিছু তাকে কিছুতেই দেওয়া চলে না, তাই তাকে ও তার স্বামীকে তিনি বড় মেয়ে জামাইয়ের মতই তাঁর রাজ্যের অপর এক তৃতীয়াংশ দান করলেন।

ছোটমেয়ে কর্ডেলিয়া বৃদ্ধ রাজার অতি আদরের। রাজা এবার তার দিকে চোখ ফেলে জানতে চাইলেন তার মনের কথা। রাজার বড় আশা তার মুখ থেকেও তিনি শুনতে পাবেন তার দিদিদের মত ভালবাসার মধুর প্রতিশ্রুতি, হয়তো তার সেই কথাগুলি হবে আরও মধুর, কেননা সে তার পিতার বড় যত্নের এবং রাজা তাকে ভালবাসেন তার দিদিদের চেয়েও বেশি। কার্ডেলিয়ার মন বিরক্তিতে তিক্ত হয়ে ছিল তার দিদিদের ইনিয়ে বিনিয়ে বলা খোশামোদের কথায়। তার ভাল করেই জানা ছিল কী তাদের মনের কথা। বৃদ্ধ পিতাকে ভাল ভাল কথায় ভুলিয়ে তাঁর জীবৎকালেই তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজ্যলাভই তাদের লক্ষ্য। তাদের প্রতি অবজ্ঞায় কথা বলার প্রবৃত্তিটুকুও যেন তার ছিল না, সে শুধু বলল সে তার বাবাকে ভালবাসে ততটুকুই মাত্র যতটুকু তার কর্তব্য—এর চেয়ে একটুও বেশি নয়, কমও নয়।

রাজা তো অবাক, তাঁর অতি প্রিয় কন্যা কার্ডেলিয়ার মুখ থেকে কৃতঘ্নের মতো শুধুমাত্র কর্তব্যের জন্যে ভালবাসার কথা শুনে তাঁর মনে বড় লাগলো, তিনি কার্ডেলিয়াকে তার কথাগুলি ফিরিয়ে নিয়ে নতুন করে কিছু বলতে বললেন। বললেন—তুমি তোমার নিজের দুর্ভাগ্য ডেকে এনো না।

উত্তরে কার্ডেলিয়া বলল—তুমি আমার বাবা, তুমিই আমাকে এনেছ এই পৃথিবীতে, আমি তোমার স্নেহ ভালবাসায় বড় হয়েছি, আর আমি তারই প্রতিদানে তোমার প্রতি আমার কর্তব্য ভুলিনি, আমিও তোমার ভালবাসা পেয়েছি বলেই তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাই বলে গালভরা কথায় দিদিদের মতো তোমাকে তুষ্ট করতে আমি প্রস্তুত নই, এবং একথাও আমি বলতে পারবো না যে তোমাকে ছাড়া আর কোনো কিছুই কখনো আমার প্রিয় হবে না। দিদিরা তো বিবাহিতা, তাদের স্বামী আছে, তারা কি তাহলে সেই স্বামীদের ভালবাসে না? আমি যদি কখনো কারো স্ত্রী হই তবে আমার স্বামীর প্রতিও আমার থাকবে সমান ভালবাসা, সমান কর্তব্যবোধ—বিয়ে হবে, অথচ দিদিদের মত বলব আমার স্বামী কেউ নয়, বাবাই সব—এ আমি পারব না।

প্রকৃতপক্ষে, কর্ডেলিয়ার দুটি সহোদরা ভালবাসার অভিনয় করতে গিয়ে যত গালভরা সব মধুর শব্দ দিয়ে তাদের প্রীতির ডালি সাজিয়েছিল আর কর্ডেলিয়ার ভালোবাসা প্রকৃতই ছিল অনেক বেশি। অন্য কোন সময়ে হলে সে হয়তো বাবাকে খুবই মিষ্টি করে তার সেই মনের কথাগুলো বলত এবং স্বামীর প্রতি ভালোবাসার

প্রসঙ্গ তুলে সে তার কথাগুলোকে এমন করে শ্রুতিকটু করে তুলত না। কিন্তু দিদিদের তোষামোদের হীন দৃষ্টান্তে তার মন এমনই বিরূপ হয়ে গিয়েছিল যে তার মনে হল এমন একটা মুহূর্তে সবচেয়ে শোভন হবে বক্তৃতায় মুখর না হয়ে চুপ করে থেকে মনের কথা জানানো। অর মনে হল ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টি কথার মধ্যে যে স্বার্থের গন্ধ থাকতে পারে, এবং পোশাকি কথার মধ্যে যে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে তা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। তাই সে ভাবল তার অকৃত্রিম স্পষ্ট কথা কটির মাধ্যমেই প্রকাশ করবে দিদিদের তুলনায় তার বাবার প্রতি তার প্রকৃত ভালবাসা ও আন্তরিক নিষ্ঠা।

কার্ডেলিয়ার অকপট কথাগুলি কিন্তু লিয়রের একেবারেই মনঃপুত হল না, তাঁর মনে হল এ একধরনের স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য। রাজা ছিলেন স্বভাবতই বদমেজাজী বেপরোয়া ধরনের মানুষ। এর উপর আবার তাঁর বার্ধক্যজনিত স্নেহ মমতার লালসা তাঁকে একেবারেই অন্ধ করে দিয়েছিল। কোনটা প্রকৃত মায়া মমতা আর কোনটা তোষামোদের কথা, কোনটা আন্তরিক আর কোনটাই বা রঙচড়ানো মিথ্যা কথার ঝুড়ি তা বিচারের ক্ষমতা তাঁর ছিল না, কাজেই কর্ডেলিয়ার স্পষ্ট উক্তি যেন তাঁর খামখেয়ালী মেজাজ ঘৃতাহুতির মত হয়ে তাঁকে ক্ষিপ্ত করে দিল, তিনি ফিরিয়ে নিলেন তাঁর রাজ্যের যে এক-তৃতীয়াংশ কর্ডেলিয়াকে দেবেন বলে স্থির করে রেখেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই অংশ দিয়ে দিলেন সমান সমান তার দুই দিদিকে এবং তাদের স্বামীদের। এরপর রাজা কাছে ডেকে নিলেন তাঁর রাজ্যের ঐ উত্তরাধিকারীদের এবং সমবেত সভাসদদের সামনে তাদের হাতে দিলেন ছোট এক রাজমুকুট যার অর্থ রাজ্যের যাবতীয় ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার হস্তান্তর এবং রাজ্যপরিচালনার যাবতীয় কর্তৃত্ব। তাঁর নিজের জন্যে শুধু অবশিষ্ট রেখে দিলেন 'রাজা' এই উপাধিটুকু এবং তার সঙ্গে নিজের সহচর হিসাবে মাত্র একশত বীরযোদ্ধা অথবা নাইট—কথা রইল মেয়েদের বাড়িতে রাজা এবং এই নাইটদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাঁদের যাবতীয় ব্যয়ভার নিতে হবে উত্তরাধিকারী দুই কন্যাকেই—এ মাসে একজন, ও মাসে একজন, অর্থাৎ ক্রমানুসারে।

এমন অস্বাভাবিক এক ঝোঁকের মাথায় নিজের রাজ্যটিকে অন্যদের হাতে তুলে দেওয়া, এমন অযৌক্তিক ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্তে রাজার সভাসদরা যেমন বিস্ময়ে হতবাক তেমনি চিন্তিত ও দুঃখিত হলেন, কিন্তু ক্রোধের বশে সম্পূর্ণ বুদ্ধি বিবেচনালুপ্ত সেই বৃদ্ধকে কেউই কিছু বলতে সাহস পেলেন না, কেবলমাত্র কেন্ট-এর আর্ল সবে মাত্র কর্ডেলিয়ার সমর্থনে মুখ খুলতে গেলেন। কিন্তু ক্রোধান্ধ রাজা তাকে বললেন সে যেন একটি কথাও বলতে চেষ্টা না করে যদি জীবনের উপর তার মায়া থাকে। কিন্তু এত সহজে কেন্টকে চুপ করানো গেল না। কেন্ট ছিলেন রাজা লিয়রের প্রতি চিরকাল অনুগত, তাঁকে তিনি নিজের পিতার মত ভক্তি করতেন,

নিজের প্রভুর মত অনুসরণ করতেন এবং তাঁর সেই প্রভুর যারা শত্রু তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত ছিলেন না। লিয়রের নিরাপত্তা বিপন্ন হলে তিনি তাঁকে রক্ষা করার জন্য প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। এ হেন কেন্ট যখন দেখলেন রাজা নিজেই নিজের শত্রুতা সাধন করে তাঁর নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনতে চলেছেন তিনি তখন তাঁর বিনীত প্রভুভক্তি আর রক্ষা করতে পারলেন না। এবং সাহসের সঙ্গে রাজার কাজের প্রতিবাদ জানালেন। লিয়রের প্রতি তাঁর এই অসৌজন্যের একটিই শুধু কারণ—লিয়রের রাজ্যব্যবস্থায় এই উন্মাদের মত আচরণ। অতীতে অনেকবার কেন্ট রাজার সংকটে তাঁকে সুপরামর্শ দিয়েছেন, তাই তিনি বললেন রাজা যেন এবারও বিবেচনার সঙ্গে সবকিছু একবার ভেবে দ্যাখেন এবং তাঁব পরামর্শ গ্রহণ করেন। কেন্ট তাঁকে অনুরোধ করলেন তাঁর রাজ্য বিলিয়ে দেওয়ার আদেশ প্রত্যাহার করতে, এবং আরও বললেন তাঁর কন্যা কর্ডেলিয়া তাঁকে বিন্দুমাত্র কম ভালবাসে না, যদিও তার ভাষার মধ্যে অপরদের মত চাটুকারিতার মিষ্টত্ব ছিল না। তোষামোদের মোহে রাজা আত্মবিস্মৃত হয়েছেন, কাজেই কেন্টের আজ্ঞ আর জোরের সঙ্গে কোনো কথা বলতেই বাধা নেই। তিনি প্রকৃত সৎ ও শুভাকাঙ্খী। রাজার সেবাই তো তাঁর ব্রত, কাজেই রাজাকে রক্ষা করতে তাঁর প্রাণ গেলেই বা কী আসে যায়? কর্তব্যের তাগিদেই তাঁকে যা সত্যি তা বলতে হবে।

কেন্ট-এর এই সৎ ও সহজ রাজভক্তির কথাগুলি কিন্তু রাজার কাণে বিষের মতই মনে হল, রাগে সম্পূর্ণ দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়ে তিনি এমনই আচরণ করতে শুরু করলেন যার কোনই অর্থ নেই। রোগী যদি তার চিকিৎসককে হত্যা করে নিজের প্রাণঘাতী ব্যাধিকেই ভালবেসে আকড়ে ধরে তবে যেমনটি হয় এ-ও ঠিক তাই, রাজা কেন্টকে নির্বাসন দণ্ডের আদেশ দিলেন এবং তাঁকে মাত্র পাঁচটি দিন সময় দিলেন দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে। যদি ষষ্ঠ দিনে—বৃটেনের সীমানার মধ্যে তার মত ঘৃণ্য জীবকে দেখা যায় তবে দেখামাত্র তার হত্যা অবধারিত। ব্যর্থ কেন্ট বিদায় নিলেন রাজার কাছে। যাওয়ার সময় বলে গেলেন রাজার যেখানে বিবেক বুদ্ধির নাশ ঘটেছে সেখানে রাজার কাছে থাকাও নির্বাসনেরই নামান্তর। তিনি আরও বলে গেলেন ঈশ্বরই যেন রক্ষা করেন কর্ডেলিয়াকে, কেননা কর্ডেলিয়াই সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে, সে-ই প্রকৃত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে তার কথায়—অপর বোনেরা যেন তাদের মূল্যবান ভালবাসার কথাগুলির যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করে। সব শেষে কেন্ট বলে গেলেন তিনি নতুন দেশে চলেছেন তাঁর চিরকালের প্রভুভক্তির ব্রত সঙ্গে নিয়েই।

রাজসভায় এবার ডাক পড়ল কর্ডেলিয়ার দুই পাণিপ্রার্থী—ফ্রান্সের রাজা এবং বারগ্যাণ্ডির ডিউকের। নিজের কন্যার প্রতি রাজার নির্দয় আদেশের কথা তাদের জানিয়ে দেওয়ার পর তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া হল এই সর্বস্বান্ত কন্যার কথা,

যে তার পিতার রাজ্যের অংশই শুধু নয় তাঁর স্নেহ মমতা থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছে এবং বর্তমানে তার নিজের রূপলাবণ্য ছাড়া আর কোন সম্পদই নেই। ডিউক অব বারগ্যাণ্ডি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনস্থির করে নিলেন—রাজ্যবিহীন রাজকন্যার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি দেখা গেল না। কিন্তু ফ্রান্সের রাজা তাঁর বুদ্ধি বিবেচনায় প্রকৃত অবস্থাটা সহজেই অনুধাবন করে নিয়েছিলেন। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চাটুকারিতায় কর্ডেলিয়া তার বাবাকে জয় করতে চায়নি, সে সহজভাবে স্পষ্ট কথাটা মুখ ফুটে বলেছে, তাই ফ্রান্সের রাজা এগিয়ে এসে হাত ধরে নিলেন কর্ডেলিয়ার এবং বললেন কর্ডেলিয়াকে গ্রহণের প্রকৃত যৌতুক কর্ডেলিয়ার চারিত্রিক সম্পদ, তিনি তাই-ই পেয়েছেন, তা যে-কোনো রাজ্যলাভের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি কর্ডেলিয়াকে তাঁর রাণীর মর্যাদা দিয়ে নিয়ে চললেন নিজের রাজ্য ফ্রান্সে, যে রাজ্য কর্ডেলিয়ার অপর দুই বোনের প্রাপ্ত ঐশ্বর্যের তুলনায় অনেক সুন্দর। যাওয়ার সময় ফ্রান্সরাজ বারগ্যাণ্ডির ডিউককে শুনিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁর মানসিক দৈন্যের কথা—শুধু অর্থ ও সম্পদের লোভে যে ব্যক্তি বিবাহের স্বপ্ন দ্যাখে কত তুচ্ছ তার সেই বিবাহ ও ভালবাসা।

কর্ডেলিয়া পা বাড়ালো চোখের জল মুছতে মুছতে। যাওয়ার সময় তার দুই দিদিকে সে বলতে গেল—তোরা বাবাকে একটু দেখিস, দেখিস যেন তাঁর আদর যত্নের ত্রুটি না হয়—তোদের প্রতিশ্রুতি তোরা যেন রাখতে পারিস। তার বোনেরা তার উপর চটে গিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে বলতে লাগল—যা যা তোকে আর উপদেশ দিতে হবে না। আমাদের ব্যাপার আমরাই বুঝবো, তুই বরং তোর বরটিকে যত্নআত্তি করে তার মন পাওয়ার চেষ্টা দ্যাখ, তোর বর তো ভাগ্যের পায়ে ধর্ণা দিয়ে তোকে পেয়ে গেল। কর্ডেলিয়া কী আর করবে—মনে দুশ্চিন্তা আর ব্যাথার ভার নিয়ে সে চলে গেল—সে ভাল করেই জানতো তার দিদিদের মতিগতির কথা। তার বাবার জন্যে আর তো কিছু করার ছিল না তার।

কর্ডেলিয়া বিদায় নিয়েছে। রাজা তাঁর দানপত্রের শর্ত অনুসারে এখন বড় মেয়ে গনেরিলের অতিথি। কিন্তু কদিনই বা এই মেয়ের বাড়িতে কাটিয়েছেন—এরই মধ্যে মেয়ের আসল রূপ প্রকাশ পেতে দেরী হল না, রাজা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন কথায় আর কাজে কত ফারাক—সেদিনের সিংহাসন লাভের পূর্বের গনেরিল আর আজ এই ক্ষমতাসীনা গনেরিল। রাজা তো সবই দিয়ে দিয়েছেন, তার যাবতীয় ঐশ্বর্য মায় তার রাজমুকুটটি পর্যন্ত। বৃদ্ধের মানসিক তৃপ্তির জন্যে শুধু বাকী আছে তাঁর 'রাজা' এই পদবীটুকু। আর সেইটুকুও তাঁর কন্যার কাছে বিরক্তিকর—রাজা ও তাঁর যে একশত সভাসদ অনুচর হিসাবে তিনি সঙ্গে এনেছেন তাঁরা সকলেই গনেরিলের চক্ষুশূল—তাঁরা কেউ তার সামনে পড়লে তার বিরক্তির উদ্রেক হয়। লিয়রকে দেখামাত্রই তার ভ্রূ কুঁচকে যায়, রাজা যখনই মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চান—সে নানা অছিলায় শুধুই এড়িয়ে যায়, কখনও নিজের শরীর ভাল নেই

বলে, কখনও বা অন্য কোনো কারণ দেখায়। তাছাড়া, বুড়োটা তো একটা অর্থহীন ভার। তার ঐ একশো সঙ্গীর ভরণ পোষন এক অনভিপ্রেত অপব্যয় ছাড়া কিছুই নয়। গনেরিল তার নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে ইচ্ছাকৃত গাফিলতি দেখিয়েই শুধু যে ক্ষান্ত হল তাই নয়, সে তার উদাহরণ দ্বারা, চাই কি তার অনুক্ত নির্দেশ দ্বারা, পরিচারক বর্গকেও রাজাব প্রতি দুর্ব্যবহারে প্রবৃত্ত করালো। চাকর বাকরেরা হয় তাঁর আদেশ অবজ্ঞায় অগ্রাহ্য করে, না-হয় কানে শুনতে না পাওয়ার ভাণ করে এড়িয়ে যায়। নিজের মেয়ের আচরণে এই পরিবর্তন লিয়রের বুকে বড় বাজলো, কিন্তু তবু তিনি মুখ বুঁজে সবই সয়ে যেতে লাগলেন। মানুষের বোধ হয় এমনই হয়—অবিমৃষ্যকারিতার ফলে নিজের কৃতকর্মের ফল যখন যন্ত্রণা দিতে থাকে তখন মানুষ তা যেন বুঝেও বুঝতে চায় না, জেনেও না-জানার ভাণ করে।

সংসারের নিয়মই এই যে, প্রকৃত ভালবাসা যার মধ্যে আছে, যে প্রকৃত শুভাকাঙ্খী তার সঙ্গে হাজার দুর্ব্যবহার করলেও সে কখনও পর হয় না। যে মেকী ও মিথ্যাচারী তাকে হাজার উপকার করলেও সে কয়লার মত ময়লাই থাকে। এই সত্যের জ্বলন্ত নিদর্শন আমাদের পূর্বকথিত সেই সদাশয় আর্ল অব কেন্ট। কেন্ট রাজসভা থেকে বিতাড়িত, নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত, এমন কি দেশে তাকে দেখামাত্র হত্যার আদেশ বলবৎ আছে, কিন্তু এই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েই তিনি রয়ে গিয়েছেন দেশে, যদি কোনভাবে তিনি নিজেকে রাজার সেবায় লাগাতে পারেন। শুধু এটুকুই নয়, বিশ্বাসপরায়ণতা এমনই এক ধর্ম যার জন্যে মানুষকে কত হীনতা দীনতা মেনে নিতে হয়, সময়ে নিজেকে গোপণ রাখার প্রয়োজনে সম্মানহানিকর ছদ্মবেশ নিতে হয়, কিন্তু প্রকৃত যে বিশ্বাসপরায়ণ তার কাছে এ অগৌরবের নয়, ভালবাসা অথবা ভক্তিতে মানুষ এ সহজেই বরণ করে নেয়। ঠিক এই কারণেই কেন্টের মহামান্য আর্ল সামান্য ভৃত্যের ছদ্মবেশে হাজির হয়েছিলেন রাজা লিয়রের কাছে। লিয়রের একটুও সন্দেহ জাগেনি তাঁকে দেখে, কেননা ছদ্মবেশের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাষা ব্যবহার ও আচরণেও কেন্ট এক অতি সাধারণ ভৃত্যেরই অনুকরণ করেছিলেন। তাঁর কথাবার্তার ধরণ সাদাসিধে আর একটু চাঁছাছোলা ধরণের হওয়ায় রাজার বরং তাকে ভালই লেগেছিল, কেননা নিজের কন্যার চাটুকারিতা আর অতি বিনয়ের ফলে মিষ্টত্বের প্রতি তার আর একেবারেই রুচি ছিল না—কেন্টের কাঠখোট্টা কথায় তার প্রতি তিনি সহজেই আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁকে বহাল করলেন নিজের ভৃত্য রূপে—ভৃত্য কেন্টের নাম হল কেইয়াস। সেই নামেই তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন, একবারও কেন্ট অনুমান করতে দেননি যে তিনিই পরাক্রমশালী ও মহানুভব আর্ল স্বয়ং।

যে প্রভুভক্তি ও সেবা কেন্টের অভীষ্ট ছিল তার সুযোগ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হল। ঘটনাটা ঘটল গনেরিলের এক গোমস্তাকে নিয়ে। সে প্রকাশ্যেই সেদিন রাজার

প্রতি অসদাচরনের চূড়ান্ত করল, উদ্ধত দৃষ্টিপাত ও অশালীন ভাষায় সে অপমান করল রাজাকে—এই আচরনের পিছনে অবশ্যই গনেরিলের উস্কানি ছিল গোপণে। কেইয়াস তার চোখের সামনে রাজার এই অপমান একেবারেই বরদাস্ত করতে না পেরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে গোমস্তাটিকে সটাং পাঠিয়ে দিল নর্দমার নোংরা জলে আর লিয়র যখন দেখলেন তাঁর এই নবনিযুক্ত ভৃত্যটি তাঁর সম্মান রাখতে এমন করে এগিয়ে এল তখন স্বভাবতই তার প্রতি তিনি খুবই আসক্ত হয়ে উঠলেন।

লিয়রের প্রতি এই গভীর প্রভুভক্তি কেন্ট ছাড়া আরও একজনেরও ছিল। পরিচয়ের দিক দিয়ে সে নগণ্য হলেও তার ভালবাসা নগণ্য নয়। লোকটি ছিল রাজসভার সামান্য ভাঁড়, অর্থাৎ কৌতুকহাস্যে রাজাকে খুশি করাই যার পেশা। রাজা লিয়রের যখন রাজপ্রাসাদ ছিল তখন থেকেই সে রাজার সঙ্গী। সেকালে রাজা অথবা বড়মানুষেরা এই শ্রেণীর ভাঁড়দের আশ্রয় দিতেন, কেননা জটিল অথবা গুরুদায়িত্বের কাজকর্মের পর মানসিক অবসাদ দূর করার জন্যে এইসব ভাঁড়দের বিশেষ উপযোগীতা ছিল। লিয়রের ভাঁড়টি সর্বদাই লিয়রের পিছনে ছায়ার মত চলতো ফিরতো এবং তার কৌতুকগুলি ছিল বেশ বুদ্ধিদীপ্ত ও চতুর। রাজা যে তাঁর রাজমুকুটটি নেহাৎই আহাম্মুকের মত আগে ভাগে খুইয়ে বসে আছেন এবং এর ফলে যে তাঁর অদৃষ্টে উপযুক্ত শাস্তি লেখা হয়ে আছে সেই সত্যটি কখনও হাস্য পরিহাসে আবার কখনও বা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে রাজাকে শুনিয়ে দিত এই ভাঁড়টি। রাজকন্যাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া নিয়ে সে একটা ছড়াও বানিয়ে ফেলেছিল!

আনন্দে যেই আটখানা সে অমনি কাঁদতে বসে
দুঃখ হলে তাথৈ তাথৈ নাচে,
তা এমনি রাজা খেলবে বটে লুকোচুরির খেলা
আর ভিড়বে গিয়ে বোকার দলে মেলা।

এমনি সব আরও কত গান সে মুখে মুখে বানিয়ে ফেলতো তার আর ইয়ত্তা নেই। এমনকি মাঝে মাঝে এ ভালোমানুষ মজাদার ভাঁড়টি স্বয়ং গনেরিলের মুখের উপরই এমন সব কথা বলে বসত যে কথাগুলো একেবারে গনেরিলের আঁতে ঘা দিত—কখনো সে রাজাকে ঠাট্টা করত ঝোপের স্প্যারো পাখি বলে যারা কীনা কোকিলের ছানাকে খাইয়ে দাইয়ে দিব্বি বড় করে তোলে আর সেই বাচ্চা বড় হওয়া মাত্রই তার মাথাটিই আগে ঠোকরায়, কৃতজ্ঞতার এমনই নিদর্শন, আবার কখনো বা সে বলতো নিতান্ত যে গাধা সে-ও জানে ঘোড়ায় গাড়ি টানে না গাড়িতে ঘোড়া টানে—অর্থাৎ রাজা লিয়র এমনই গর্দভ যে নিজের কন্যাদের হাতে দিয়েছেন রাজ্যের কর্তৃত্ব এবং নিজের ভবিষ্যৎ এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হবার তাই হচ্ছে। ভাঁড়ের এইসব কটাক্ষের ফলে অনেক সময় বিভ্রাট দেখা দিত, কেননা কথার খোঁচায় চটে গিয়ে গনেরিলের সাঙ্গপাঙ্গরা তাকে বেত নিয়ে মারতে তাড়া

করত।

গনেরিলের মতো নিমকহারাম কন্যার কাছে পাওয়া অপমান ও অসম্মানের বোঝাই যে অবিমৃষ্যকারী রাজা লিয়রের একমাত্র পাওনা হল তাই নয়, তাঁর অদৃষ্টে আরও বড় বিড়ম্বনা দেখা দিল যখন গনেরিল বলল রাজার একশত সহচরের বিশাল বাহিনীর ব্যয় সঙ্কুলান আর তার পক্ষে সম্ভব হবে না, আর তাছাড়া কীইবা দরকার আছে এতগুলি অপ্রয়োজনীয় মানুষকে বসে বসে খাওয়ানোর। আরও একটু বাড়িয়ে সে এক মিথ্যা অপবাদের অজুহাত দেখালো যে লিয়রের সঙ্গী সাথীরা তার বাড়িতে বসে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়ে গৃহের শান্তিভঙ্গ করছে। কাজেই, লিয়রের উচিত তাঁর এই দলটিকে ছেঁটে ছোট করে ফেলা এবং শুধু গুটিকয়েক এমন মানুষ রাখা যারা তাঁরই মত বৃদ্ধ ও অক্ষম।

নিজের চোখ এবং কানকে লিয়র যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—তিনি ভাবতেই পারেন না তাঁরই মেয়ে গনেরিলের মুখ থেকে এমন কথা শুনতে হবে। যে মেয়েকে তিনি নিজের হাতে রাজমুকুট দিয়ে দিয়েছেন সে-ই কীনা চায় তাঁর সঙ্গী সাথীদের বিদায় দিয়ে তাঁকে এমনি অপদস্থ করতে—বৃদ্ধ পিতার প্রতি তার এতটুকুও শ্রদ্ধা অথবা ভালবাসা নেই! কন্যার দ্বারা বারবার এই একই বিষয়ে উত্যক্ত হওয়ার ফলে লিয়র আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না, তিনি রেগে গিয়ে গালমন্দ করলেন গনেরিলকে এবং বললেন তাঁর একশ জন সঙ্গীর প্রত্যেকটি মানুষ চলায় ফেরায়, আচারে ব্যবহারে যার-পর-নেই অমায়িক ও মার্জিত, তারা হৈ হট্টগোল বাধিয়ে বাড়ির শান্তিভঙ্গ করছে একথা ডাহা মিথ্যা। কাজেই, তাদের সম্পর্কে এই ধরণের মিথ্যা অপবাদ অত্যন্ত গর্হিত। রাজা রাগের বশে তখুনি তাঁর যাওয়ার জন্যে ঘোড়া প্রস্তুত করতে হুকুম দিলেন। গনেরিলের বাড়ি ছেড়ে তিনি এবার যাবেন তার দ্বিতীয়া কন্যা রেগানের কাছে। গনেরিলকে বললেন এক মুহূর্তও তিনি আর তার মুখদর্শন করবেন না, তার মত পাষাণহৃদয় কন্যার চেয়ে রাক্ষসীও বোধ হয় ভাল। এমন সব নানা কথা বলতে বলতে তিনি মেয়েকে এই বলে অভিশাপ দিলেন যে তার যেন কোনো সন্তান না জন্মায়, আর যদিবা সন্তান জন্মায় সে যেন ঠিক তার মায়ের মতই নিষ্ঠুর হয় যাতে সে বুঝতে পারে সাপের মত বিষ নিয়ে দংশনে দংশনে তাকে কেমন করে জর্জরিত করে দেওয়া যায়।

গনেরিলের স্বামী অ্যালবেনির ডিউক অপ্রস্তুতের মত রাজার কাছে এসে বলতে চাইলেন তিনি সম্পূর্ণই নির্দোষ, বাপ-মেয়ের এই অশান্তিতে তাঁর কোনই হাত ছিল না। রাজা কিন্তু এখন আর কারো কোনো কথাই শুনতে চান না, তিনি আদেশ দিলেন ঘোড়া প্রস্তুত করতে—আর এক মুহূর্তও তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা এখানে থাকবেন না, তারা যাত্রা করবেন রেগানের বাড়িতে। এই দুঃখের মুহূর্তে লিয়রের মনে প্রথম শুরু হল অনুশোচনা। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল তাঁর ছোট মেয়ের কথা।

মনে হতে লাগল অতি সামান্য কারণে কেমন তিনি তার উপর অবিচার করেছেন। আরও মনে হল, কর্ডেলিয়ার যে উক্তি তাঁর কাছে অপরাধ বলে সেদিন বোধ হয়েছিল তা কি প্রকৃতই কোনো অপরাধ? লিয়রের চোখে আপনা থেকেই জল এসে গেল—আর সেই চোখের জলে তাঁর নিজেকেই নিজের কাছে অতি দীন বলে বোধ হল, কেননা আজ গনেরিলের মত সামান্য এক নারীকে তিনি এমন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন যে সে তাঁকে কাঁদাতে পারে।

রেগান আর তার স্বামী কর্নওয়ালের প্রাসাদোপম বাড়ি। লোকলস্কর আর খানদানি আসবাব সজ্জায় সেখানে ঐশ্বর্য ও বৈভবের চূড়ান্ত প্রকাশ। সেই প্রাসাদেই লিয়র পাঠালেন তাঁর ভৃত্য কেইয়াস মারফৎ মেয়ের কাছে সংবাদ—যেন সে প্রস্তুত হয়ে থাকে, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা সেখানে যাওয়ার জন্যে রওনা হয়েছেন। কিন্তু সুকৌশলী গনেরিল আগেই তার অনুচর পাঠিয়েছে রেগানের কাছে এবং তার হাতে চিঠি পাঠিয়ে বোনকে সাবধান করে দিয়েছে বাবার সম্পর্কে। সে জানিয়েছে তাদের বাবা স্বেচ্ছাচারীর মত ব্যবহার করেন এবং তাঁর মেজাজও সর্বদাই তিরিক্কি হয়ে আছে, কাজেই রেগান যেন পিতার এতসব দলবলকে আদৌ পাত্তা না দেয়। এদিকে গনেরিলের বার্তাবহ ঠিক এমনি সময় গিয়ে পৌঁছল যে পড়বি তো পড় সে গিয়ে মুখোমুখি পড়ল কেইয়াসের। আর সেই ব্যক্তিটি কেইয়াসের সেই পুরনো শত্রু রেগানের কর্মচারী যাকে কীনা একদিন কেইয়াস ঘাড় ধাক্কা দিয়েছিল লিয়রের প্রতি অপমানজনক আচরনের জন্যে। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে কেইয়াসের সুবিধাজনক মনে হল না, সে অনুমান করে নিল তার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কী হতে পারে এবং সেই বুঝেই তাকে গালাগাল করতে শুরু করল যা মুখে এলো তাই বলে আর তাকে ডাকতে লাগল তার সঙ্গে একহাত লড়ার জন্যে। লোকটি তো ভয়েই কাঠ, সে কিছুতেই লড়তে এগুবে না। কেইয়াস তখন তার কুমতলবের জন্যে রেগে গিয়ে তাকে ধরে এমন উত্তম মধ্যম লাগিয়ে দিল যে সে তার বদমায়েসীর যথার্থ সাজা হাতে হাতে পেল। কিন্তু এই সংবাদটি রেগান ও তার স্বামীর কানে পৌঁছানমাত্রই তারা কেইয়াসকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিল, যদিও সে রেগানের বাবার সংবাদ নিয়েই দূত হিসাবে এখানে এসেছিল এবং সেই সুবাদে সে উচ্চতম সম্মানের অধিকারী। আর এর পর যা হওয়ার তাই ঘটল—রাজা লিয়র তাঁর মেয়ের বাড়িতে পৌঁছানমাত্রই দেখতে পেলেন তার প্রেরিত অতি বিশ্বাসী ভৃত্য কেইয়াসের ভাগ্যে কেমন আপ্যায়ন জুটেছে।

শুরুতেই যার এমন অশুভ সংকেত তার শেষটা কেমনতরো হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। লিয়রের ভাগ্যে তাঁর এই মেয়ে-জামাইয়ের যত্ন এমনিভাবেই শুরু হল। তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। ভিতর থেকে তাদের চাকর এসে বলল—এখন দেখা হবে না, তারা কাল সারারাত ঘুমুতে পারেন নি, বাইরে

বেরিয়েছিলেন, এখন একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। রাজা তো এ-কথা শুনে চটে আগুন, তিনি বললেন—এখুনি তাদের আসতে বল। রাজার চেঁচামেচির ফলে বাধ্য হয়েই রেগান ও তার স্বামীকে আসতে হল বটে কিন্তু এই প্রথম দেখাশোনাটা রাজার কাছে একেবারেই আকর্ষণীয় হওয়ার কথা নয়, কেননা রেগানদের সঙ্গে ছিল গনেরিল। সে এর মধ্যেই বোনের বাড়িতে এসে পড়েছে তাকে বাবার বিরুদ্ধে উসকে দেওয়ার জন্যে।

রাজা দেখলেন রেগান তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে গনেরিলের হাত ধরে। দুই বোনের এই মাখামাখির ব্যাপারটায় রাজার সুবিধা লাগল না। তিনি গনেরিলকে বললেন—এই বুড়ো মানুষটার দিকে চোখ তুলে তাকাতে তোর কি একটুও লজ্জা করছে না? রেগান এগিয়ে এসে তার বাবাকে বলল—তোমার ফিরে যাওয়া উচিত দিদির বাড়িতে, আর সেখানে গিয়ে আর কোনো ঝঞ্ঝাট না বাধিয়ে ভদ্রভাবে থাকতে চেষ্টা কর, আর দিদি যেমন বলছে সেই অনুযায়ী তোমার লোকজন কমিয়ে ফ্যালো। তাছাড়া দিদির কাছে একটিবার মাপ চেয়ে নেওয়াও তোমার উচিত। তোমার তো এখন যথেষ্ট বয়স হল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পেতে বসেছে। তোমার এখন আর কোন কথায় না থেকে যারা তোমার উপযুক্ত সন্তান তাদের উপরই নির্ভর করা উচিত। তারা যেমন বলে তেমনভাবেই চলা উচিত। এই অসম্ভব কথা শুনে লিয়র বললেন—তা কেমন করে সম্ভব? আমি গিয়ে গনেরিলের পায়ে পড়ব? তাকে গিয়ে বলব গনেরিল, আমাকে তুই দেখিস, আমার এই বয়সে তুই আমার অন্নবস্ত্রের মালিক। তিনি বললেন—না না, সে আমি পারবনা, রেগান, তুই বরং আমার দেখাশোনার ভার নে, আমি আমার এই একশো জন অনুচর নিয়ে আজ থেকে তোর এখানেই থাকব, তোর চোখে মুখে গনেরিলের চেয়ে অনেক দয়ামায়া দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি তুই ভুলিসনি আমি আমার রাজ্যের সবই তো তোদের দিয়েছি। যদি তোর আমাকে রাখতে না সম্মতি থাকে তবে গনেরিলের কাছে তার কথামত অর্ধেক লোকজন নিয়ে হীনতা স্বীকার করে থাকার চেয়ে আমি বরং ফ্রান্সেই চলে যাব। সেখানে গিয়ে রাজার কাছে হাত পেতে না-হয় আমার বাকী দিনকটির সামান্য ভরণপোষণ চেয়ে নেব, কেননা, আমি তো আমার ছোট মেয়েকে কিছুই দিইনি, তার কাছে দাবী করব কেমন করে?

রেগানের কাছে বৃদ্ধের এই করুণ প্রার্থনার কোন দামই জুটল না, যেমন তার দিদি গনেরিল ঠিক তেমনি সে-ও নির্মম। বরং সে তার দিদির উপর আর একটু বাহাদুরী দেখানোর জন্যে রাজাকে বলল—তা তোমার ঐ অনুচরদের যে পঞ্চাশ জনকে নিয়ে যাওয়ার কথা দিদি প্রস্তাব দিয়েছে আমি তো মনে করি সেটাও অনেক বেশি, গুটি পঁচিশই যথেষ্ট। রেগানের কথা শুনে লিয়র তো হতাশায় আকুল, কোনো কূল কিনারা না দেখে তিনি বললেন—ঠিক আছে, গনেরিল, তোর সঙ্গেই

তাহলে যাবো। তোর বোনের চেয়ে তোর ভক্তিশ্রদ্ধা দেখতে পাচ্ছি দ্বিগুণ, কেননা সে বলেছে পঁচিশজনকে থাকতে দেবে, তুই বলেছিলি পঞ্চাশ জন। গনেরিল বলল, বলেছিলাম বটে, এখন ভেবে দেখছি ওটা ভুলই বলেছিলাম, তা পঁচিশজনেরই বা কী দরকার? দশ জন, তা-ও তো অনেক, কী বলো? পাঁচ? না, না, তারই বা দরকারটা কি? তুমি বরং ওসব বিদায় করে দিয়ে আমাদের লোকজনদের উপর নির্ভর করেই থাকতে পারো—সে আমিও তোমাকে রাখতে পারি। কিংবা রেগানও পারে। কাজেই, স্পষ্টই বোঝা গেল গনেরিল ও রেগান—দুইবোন যেন পাল্লা দিয়ে দেখাতে চায় তাদের মধ্যে কে বেশি নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে বৃদ্ধ পিতার প্রতি। এই পিতাই স্নেহের বশে তাঁর সর্বস্ব দান করেছেন যে কন্যাদের তারাই একটু একটু করে তাঁর মান মর্যাদা এমনকি সামান্য কয়েকজন অনুচর থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করতে উদ্যত। মানুষের সুখ শান্তির জন্যে হয়তো লোকলস্কর অথবা অনুচরবর্গের কোনো প্রয়োজনই হয় না, তবু যে মানুষের একদিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়ানো ছিল রাজৈশ্বর্য ও রাজার সম্মান সে মানুষ যদি ভিখারী হয় তবে তা বড় মর্মান্তিক। আর তাছাড়া এই সর্বস্ব হারানোর যে বেদনা তার চেয়ে অনেক বড় ব্যথা লিয়রের বুকে বেজেছিল তাঁর মেয়েদের কৃতঘ্ন ব্যবহারে। এই দুঃখের ভার আরও বেশি করে লিয়রকে পীড়িত করে তুলল যখন তাঁর মনে হল কত বড় নির্বোধের মত তিনি তাঁর রাজ্যের সবটুকু বিলিয়ে দিয়েছেন—লিয়র আর কিছু ভাবতে পারছিলেন না, যেন তার যাবতীয় বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে তাঁর চেতনা তাকে উন্মাদের মত বিভ্রান্ত করে তুলছিল—তিনি প্রলাপের ঘোরে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতে গিয়ে অভিসম্পাত বর্ষণ শুরু করলেন মেয়েদের উদ্দেশ্যে—তিনি নিজেই বলে চললেন কী বলছেন তার কিছু না বুঝে—বললেন, তাদের সমুচিত শিক্ষার জন্যে এমন দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করবেন যার ভয়ে সারা পৃথিবী কেঁপে উঠবে।

কাহিনীর সবচেয়ে মর্মস্পর্শী দৃশ্যটির উদ্ঘাটন হল যখন হতবল রাজার এই নিষ্ফল আক্রোশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাইরে শুরু হল তুমুল ঝড় ও বর্ষা এবং মুহুর্মুহু বজ্র ও বিদ্যুতের তাণ্ডব আর তারই সঙ্গে নেমে এলো কালো রাত্রির ঘন অন্ধকার। রাজার মেয়েরা বারবার সেই একই কথায় রাজাকে উত্যক্ত করেছে—তোমার অনুচরদের ছাঁটাই কর তবেই তোমাকে আমরা স্থান দেব। রাজা উন্মাদের মত হেঁকে উঠলেন—ঘোড়া সাজাও, আমি ঝড় ঝঞ্ঝার এই দুর্যোগেই পথে নামব-এই আশ্রয়ে আমার আর একমুহূর্তও কাজ নেই, এই অকৃতজ্ঞ সন্তানদের আশ্রয়ে। রাজার কথায় একটুও মন টলল না তাঁর সন্তানদের, তারা বলে উঠল—এমন রগচটা খামখেয়ালী মানুষের তো নিজের কাজের ফলভোগ করতেই হবে, এই সাজা তার উপযুক্ত প্রাপ্য। এ কথার পর তারা রাজাকে সেই দুর্যোগের রাতে একলা পথে ছেড়ে দিয়ে তার মুখের উপর সদর বন্ধ করে নিজেরা অন্দরে চলে গেল।

ঝড় ক্রমশ বাড়ছে, আর তারই সঙ্গে বেড়ে চলেছে সমান তালে বজ্রপাত ও বৃষ্টি তবুও নিজের সন্তানদের নির্দয় আচরণের যে আঘাত তারই ঘায়ে এই অশক্ত বৃদ্ধ এগিয়ে চললেন বৃক্ষলতাহীন ঊষর প্রান্তরের পথে। যতদূর চোখ যায় কোথাও একটিও ঝোপঝাড় পর্যন্ত চোখে পড়ে না, আর সেই ঊষর ভূমিতে, সেই ঘন অন্ধকারে ঝড় ও বজ্রপাতকে উপেক্ষা করে ছুটে চলেছেন রাজা লিয়র—তাঁর মুখের ভাষায় অন্তরের রুদ্ধ ক্ষোভ ফেটে পড়ছে—ঝড়, তুমি এই গোটা পৃথিবীটাকে উড়িয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দাও সমুদ্রের গভীরে, কিংবা সমুদ্র, তোমার বিক্ষুব্ধ বিশাল ঢেউ যেন গ্রাস করে নেয় এই পৃথিবীটাকে—যেন সৃষ্টি লুপ্ত হয়ে যায়—মানুষ নামে এই কৃতঘ্ন জীবের চিহ্নমাত্র আর না থাকে। বৃদ্ধ রাজার এখন আর অনুচর বলতে কেউই নেই—শুধু সেই 'ফুল' অথবা ভাঁড়ই তাঁর একমাত্র অনুগামী। ভাঁড় এখনও ছায়ার মত তাঁর পিছনে, আর এখনও তেমনি তার ঠাট্টা তামাসার উক্তিতে লিয়রের দুর্ভাগ্যকে সমানে ব্যঙ্গ করে চলেছে। সে বলছে—আরে বাবা এতো বড় বজ্জাত রাত—এতে সাঁতার দিয়ে তো কূল পাওয়া যাবে না—রাজামশাই আপনি বরং ফিরে যান—আপনার মেয়েদের তুষ্ট করে বলুন তোদের কাছে একটু থাকতে দে মা :

তা ভাঁড়ে যদি থাকে কারো এক ছটাকও বুদ্ধি
হেই হো ঝড় আসুক কষে আসুক কষে বিষ্টি
ভাগ্য যদি গাদে ফ্যালে বলবে এই তো তোফা
নিত্য যদি এক নাগাড়ে বিষ্টি চলে চলুকঃ

তা আমি বাপু হলফ করে বলতে পারি রাতটা বহুৎ তেজী, ইজ্জতওয়ালী আওরতের গুমোর ভাঙ্গাতে ভারী মজবুত।

শুধু এই ভাঁড়ই একমাত্র সম্বল—আর একটিও সাথী নেই। উদভ্রান্ত রাজা প্রলাপ বকতে বকতে চলেছেন সেই ঝড় বৃষ্টির অন্ধকার রাতে—আর তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন কেন্ট। রাজা কেন্টকে চিনতে পারেন নি—কেমন করেই বা চিনবেন—এখন সে কেইয়াস। কেইয়াস বলল—হায়! হায়! একী দশা আপনার? রাত্রিচর প্রাণীরাও তো এমন দুর্যোগের রাতে বাইরে আসে না। বিভীষিকার এই রাতে তো বন্য পশুরাও লুকিয়ে পড়েছে তাদের গুহায়—মানুষের এত ক্ষমতা নেই যে সে এত কষ্ট ও এমনি বিভীষিকা সইতে পারে। লিয়র তাকে ভর্ৎসনা করে উঠলেন—বললেন, বড় রকমের রোগে মানুষ যখন জেরবার হয়ে যায় তখন সামান্য ব্যথা বেদনা তার গায়ে লাগেনা. মনটি যখন শান্ত থাকে তখন দেহ তার সূক্ষ্ম ব্যথা বেদনার বিলাস করতে পারে, কিন্তু মনের শান্তি যখন সমূলে নড়ে ওঠে তখন চেতনার সব বোধই লোপ পায়—শুধু সেইখানটিতেই ব্যথার মোচড় লাগে যেখানে থাকে হৃদপিণ্ডটি। এই তো ফল নিজের সন্তানস্নেহের—যে সুখের জন্যে মানুষের হাত খাবার তুলে দিতে চায়, সেই মুখই সে হাতকে কামড় দিয়ে

ছিঁড়ে ফেলতে চায়—সন্তানের জন্যে পিতামাতার এই তো কর্মফল।

এদিকে কেন্ট রাজার সঙ্গ ছাড়েনা, সে একনাগাড়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে বলছে, দোহাই আপনার, এই দুর্যোগে বাইরে এমন করে ঘুরবেন না, চলুন কোনো আশ্রয়ে যাই। তার পীড়াপীড়ির ফলে রাজা শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। তারা গিয়ে উপস্থিত হলেন নেহাৎই ভাঙ্গাচোরা একটা ছোট্ট কুঁড়ের সামনে। প্রথম গিয়ে সেখানে প্রবেশ করল ভাঁড়—সে তো ঢোকামাত্রই ভয় পেয়ে বেরিয়ে এল এক লাফে—বাপরে ওর ভিতরে একটা ভূত। অবশ্য পরে ভাল করে লক্ষ্য করে বোঝা গেল বেচারী ভূতটুত কিছু নয়, বোধহল নিতান্তই একটা ভিখিরি। সে-ও ঝড় বর্ষায় আশ্রয়ের জন্যেই মাথা গুঁজেছিল ওখানে আর শয়তানের কথা বলে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভাঁড়কে। এই শ্রেণীর মানুষের এক ধরণের ক্ষ্যাপা কিংবা দারিদ্র্যের জন্যে ক্ষ্যাপামির ভাণ করে এরা গ্রামাঞ্চলে সাদাসিধে কোমলপ্রকৃতির মানুষের কাছে কিছু ভিক্ষার বস্তু পায়। এদের কাজ হল এরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর পরিচয় দেয় গরীব টম কিংবা টারমিহুড নামে। আর বলে—কে আছ, কিছু ভিক্ষা দাও এই গরীব টমকে। এরা আবার নিজেদের গায়ে পেরেক কিংবা রোজমেরীর কাঁটা ফুটিয়ে রক্ত ঝরায়—এদের মতলব এই সব ভয়ের ব্যাপার দেখিয়ে, কখনো বা পাগলের মত শাপশাপান্ত করে অজ্ঞ গ্রামবাসীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের বাধ্য করা কিছু দান করতে। যে লোকটা ঐ কুঁড়েতে বসে ছিল সে-ও সেই একই ধরনের একজন। তার ঐ দুরবস্থা দেখে—দেহে জামাকাপড় বলতে কিছুই নেই। শুধু একটা ছেঁড়া ন্যাতা জড়ানো কোমরে—রাজা ধরে নিলেন যে লোকটা নিশ্চয়ই তাঁরই মত অধম হতভাগ্য এক পিতা যে তার মেয়েদের সর্বস্ব দান করে দিয়েছে আর তারই ফলে আজ এই অবস্থা—রাজার স্থির বিশ্বাস দয়ামায়াহীন কন্যাসন্তান ছাড়া মানুষের এমন দুরবস্থার আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।

কেইয়াস অর্থাৎ কেন্ট যতই রাজার এই প্রলাপের মত অনর্গল অর্থহীন কথা শুনলে লাগল ততই তার স্পষ্ট বোধ হল রাজার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে, তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির কারণ তাঁর মেয়েদের নির্দয় আচরণ। কেন্টের মনে হল প্রভুভক্তির এই তো প্রকৃত সময়—এর আগে সেবার এমন অবকাশ সে কখনো পায়নি। তাই এখনও পর্যন্ত আশে পাশে রাজার যে কজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিল তাদের সাহায্যে সকাল হতে-না-হতেই সে রাজাকে তুলে নিয়ে গেল ডোভারের দুর্গে, কেননা সেখানেই তার বন্ধুবান্ধব ও প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি কেন্টের আর্ল হিসাবে। রাজাকে সেখানে অন্যদের তত্ত্বাবধানে রেখে সে জাহাজে গিয়ে উঠল ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে, কেননা সেখানে সে কর্ডেলিয়াকে গিয়ে বলবে তার বাবার দুরবস্থার কথা। সে বলবে কেমন করে তার দিদিরা বাবার উপর নির্যাতন করেছে নির্মমভাবে। কেন্ট জানে কর্ডেলিয়ার মত মেয়ে তার বাবার এই সংবাদে কিছুতেই স্থির থাকতে

পারবে না। কেন্টের উদ্দেশ্য সফল হল। কর্ডেলিয়া তার বাবার এই অবস্থা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামী অর্থাৎ ফ্রান্সের রাজার কাছে গিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বলল—সে তার স্বামীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল এবং বৃটেনে যাওয়ার সম্মতি চাইল। সে চাইল তার সঙ্গে যাবে ফ্রান্সের এক শক্তিশালী সেনাদল যাতে কিনা সে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে তার দুই দিদি ও তাদের স্বামীদের এবং তাদের পরাস্ত করে তার বাবার সিংহাসনে আবার তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কার্ডেলিয়ার স্বামী এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলেন—কর্ডেলিয়া যাত্রা করল জলপথে এবং অবিলম্বে এসে জাহাজ থেকে নামল ডোভারে।

এদিকে উন্মাদ রাজাকে চোখে চোখে রাখার জন্যে কেন্ট যার উপর দায়িত্বভার দিয়ে গিয়েছিল তার সামান্যমাত্র অসাবধানতার সুযোগে লিয়র আবার বেরিয়ে পড়েছেন বাইরে—আবার তেমনি একা একা মাঠের পথে চলতে চলতে গিয়ে পড়েছেন ডোভারের কাছাকাছি, আর ঠিক সেই সময়ে তাঁকে দেখতে পেল কর্ডেলিয়ার সঙ্গে যে সৈন্যদল এসেছিল তাদের কয়েকজন—লিয়র তখন সম্পূর্ণ উন্মাদ, জীর্ণ ও অবিন্যস্ত তাঁর বেশভূষা, অতিদীন ও করুণ তাঁর সেই রূপ, আর আপন মনে চিৎকার করে গান গাইছেন, উন্মাদের গান—আর নিজের মাথায় পরে নিয়েছেন এক মুকুট—বুনো পাতালতা, খড় কুটো আর বিচুটি দিয়ে বানিয়ে নিজেই তিনি মুকুট পরেছেন মাথায়। পিতার এই করুন অবস্থার কথা অচিরেই কর্ডেলিয়ার কানে পৌঁছল। সে তার বাবাকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে উঠল, কিন্তু চিকিৎসকেরা বললেন এখন এই অবস্থায় বাবার সামনে তার যাওয়া উচিত হবে না।

চিকিৎসার সাহায্যে ঘুম পাড়িয়ে ধীরে ধীরে রাজাকে প্রকৃতিস্থ করার পরই তাঁর সাক্ষাতে যাওয়া চলবে। কর্ডেলিয়া চিকিৎসকদের বলল তার সব ধন দৌলত নিয়ে যেন তাঁরা তার বাবাকে সুস্থ করে তোলেন, সে তার সব ঐশ্বর্যই দিতে প্রস্তুত। চিকিৎসকদের চেষ্টায় রাজা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে এবার তাঁর দেখা হল।

পিতা ও কন্যার এই সাক্ষাতের করুণ দৃশ্য বড় মর্মস্পর্শী। সর্বস্বান্ত ও বেদনার্ত এক বৃদ্ধের চোখের সামনে তার অতি আদরের সেই কন্যা কর্ডেলিয়া, আর যে কন্যাকে একদিন তিনি অতি তুচ্ছ কারণে নিজের খুশীতে অবহেলায় দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, আজ কীনা সীমাহীন স্নেহ ও যত্ন নিয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে তারই এই অপরিসীম দৈন্য দুর্দশার পাশে—রাজার সদ্য উজ্জীবিত জ্ঞানটুকু যেন আবার মিলিয়ে যাচ্ছে—তিনি যেন সঠিক উপলব্ধি করতে পারছেন না কোথায় তিনি আছেন, অথবা ঐ যে মেয়েটি এমন সস্নেহে তাকে আদর করছে, তার সঙ্গে কথা বলছে, সে-ই বা কে—তাই তাঁকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি মিনতি করে বললেন—তোমরা

যেন আমাকে নিয়ে হেসনা, যদি আমি ভুল করে এই মেয়েটিকে আমার কর্ডেলিয়া বলে মনে করে থাকি। এ দৃশ্য বড় করুণ—পিতা লিয়র নিজে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন তারই কন্যার কাছে, আর সেই বিনম্র কর্ডেলিয়া সর্বক্ষণ পিতার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে পিতার আশীর্বাদ, আর বলছে—বাবা কেন তুমি অমন করে আমার কাছে মাথা নত করছ, আমি তো তোমার সন্তান, আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও, আমি-ই তো তোমার সেই প্রিয় কর্ডেলিয়া। এই কথা বলে সে তার পিতাকে আদর করল। বলল, আমার এই আদরে যেন আমার বোনদের কাছে অবিচার পাওয়ার সব গ্লানি তোমার মুছে যায়। আমার সেই বোনেরা যা করেছে তার জন্যে তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত, এই বুড়োমানুষ বাবাটাকে এই ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়ার মধ্যে বাইরে বার করে দিয়েছে---আমার পরম শত্রুর কুকুরটা যদি আমাকে কামড়েও দিত তবু এমন দুর্যোগের ঠাণ্ডা রাতে আমি তাকে আমার ঘরে চুল্লির ধারে বসিয়ে রাখতাম, তাকে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতাম! এরপর কর্ডেলিয়া তার বাবার কাছে সব কথা খুলে বলল—কেন সে ফ্রান্স থেকে সৈন্যদল নিয়ে এসেছে এবং কী ভাবে সে তার বাবাকে আবার সিংহাসন ফিরিয়ে দিতে চায়। লিয়র সব শুনে আবারও তাঁর মেয়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে বললেন বার্ধক্যে তাঁর বুদ্ধিলোপ ঘটেছিল। তাই তিনি না বুঝেই এত বড় ভুল করেছেন, এবং তাঁর সেই ভুলের জন্যে কর্ডেলিয়ার অবশ্যই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতে পারে, সে যদি তার বাবাকে ভাল না বাসে তবে তার কিছুমাত্র দোষ নেই। কিন্তু তার দিদিদের তো তেমন অভিযোগ থাকার কথা নয়। কর্ডেলিয়া বলল—এ কী বলছ তুমি বাবা। আমারও তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকার কথা নয়, আমি তো তোমার সন্তান।

আপাতত রাজার কথা থাক। তাঁকে আমরা রেখে দিই তাঁর মেয়ে কর্ডেলিয়ার সেবা ও যত্নে এবং চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠুন। নিষ্ঠুর মেয়েদের নির্যাতনে তাঁর স্নায়ুতে যে নিদারুণ চাপ ও তার ফলে তাঁর এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা, এ তো সম্পূর্ণ নিরাময় হতে সময় লাগবে। এই অবসরে আমরা ফিরে যাই সেই শয়তান দুটো মেয়ের কথায়—দেখি তারা এখন কেমন আছে।

এই দুটি মূর্তিমতী কৃতঘ্নতা যারা তাদের বৃদ্ধ পিতার প্রতিই এমন অকৃতজ্ঞ আচরণ করতে সংকোচ বোধ করেনি, তারা তাদের স্বামীদের প্রতি অনুগত হবে এ বড় দুরাশা। অতএব বেচারী স্বামীদের প্রতি ভালবাসায় তাদের রুচি অচিরেই মিটে গেল—এবং যত দিন যায় তাদের প্রতি সামান্যতম কর্তব্যবোধ অথবা লোক-দেখানো ভালবাসাটুকুও অবশিষ্ট রইল না—প্রকাশ্যেই তারা প্রণয়ের নেশায় মেতে উঠল অপর এক ব্যক্তির প্রতি। ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে পড়ল অন্য এক কারণে। গনেরিল ও রেগান তাদের প্রেম নিবেদন করে ফেলেছে একই ব্যক্তিকে। ব্যক্তিটির

নাম এডমাণ্ড এবং তার পরিচয় সে ছিল গ্লস্টারের স্বর্গত আর্লের অবৈধ পুত্র। এডমাণ্ড মানুষটি মোটেই সুবিধার ছিল না, সে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তার ভাই এডগারকে অর আইনসম্মত ভূসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিল। অর্থাৎ গ্লস্টারের জমিদারির উত্তরাধিকারের জন্যে সে নানা চাতুরী ও হীনতার আশ্রয় নিয়েছিল এবং এখন সে-ই যাবতীয় জমিদারির মালিক। তার মত দুশ্চরিত্র ব্যক্তিই গনেরিল ও রেগানের মত নিষ্ঠাহীন নারীদের প্রেমিক হওয়ার বিশেষ উপযোগী এবিষয়ে সন্দেহ নেই। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে খেলাটা জমে উঠল তা হল ঠিক এই সময়ে রেগানের স্বামী কর্নওয়ালের ডিউকের মৃত্যু। রেগান মনে করল তার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত, সে এবার ঘোষণা করল গ্লস্টারের আর্ল অর্থাৎ এডমাণ্ডকে সে তার নতুন স্বামী হিসাবে বরণ করবে। কিন্তু তার এই সুখস্বপ্নে বাধ সাধল তারই দিদি গনেরিল। গনেরিল ঈর্ষায় জ্বলে উঠল—কেননা ঐ দুশ্চরিত্র আর্লটি তো কখনো গনেরিলকে আবার কখনো রেগানকে মাঝে মাঝেই প্রেম নিবেদন করে সুখস্বপ্নের খোয়াব দেখাতো—কাজেই গনেরিলই বা ছাড়বে কেন? সে কোমর বেঁধে লেগে গেল কী উপায়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফ্যালা যায় রেগানকে। কিন্তু পাপের ফল তাকে হাতে নাতে পেতে হল। তার চক্রান্ত ধরা পড়ে গেল তারই স্বামীর কাছে, আর তার স্বামী অ্যালবেনির ডিউক যখন স্ত্রীর গোপণ প্রণয় ও তার জন্যে এই চক্রান্তের ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে বন্দী করলেন কারাগারে। কারাগারে বেশিদিন আর রেগানকে কাটাতে হল না, কেননা ব্যর্থতার হতাশায় ও রোষে অল্পকালের মধ্যেই সে আত্মহত্যা করল! ঈশ্বরের বিচারে এমনিভাবেই শাস্তি পেল দুটি বোন—যারা অসদুপায়ে জীবনে মস্ত লাভ করতে চেয়েছিল।

এই কাহিনীর যারা দর্শক তারা দেখতে পেল বিধির বিধানে কেমন সমুচিত শাস্তি পেল যারা অপরাধী ও পাপী—সেই দর্শকেরাই এবার চোখ ফিরাল অন্যদিকে যেখানে তাদের দেখার প্রত্যাশা প্রকৃত নিষ্ঠা ও ধর্ম কেমন ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে—কর্ডেলিয়ার মত মহীয়সী নারী যে বিনা অপরাধে এতকাল দুঃখ ভোগ করে এসেছে কেমন বিস্ময়করভাবে সে লাভ করবে তার প্রাপ্য পুরস্কার। কিন্তু বড় দুর্জ্ঞেয় বিধির বিধান-অধর্মের পরাজয় ও ধর্মের জয় বুঝি বা মানুষের প্রত্যাশা অনুসারে ঘটে না, তাই নিষ্পাপ কর্ডেলিয়ার মত নারীর ভাগ্যেও যে পুরস্কার আমরা দেখব আশা করি তা মিলল না। আর্ল অব গ্লস্টারের অর্থাৎ এডমাণ্ডের সেনানায়কত্বে গনেরিল ও রেগান যে সৈন্যদল পাঠিয়েছিল তাদের কাছে পরাজিত হল কর্ডেলিয়ার সেনারা এবং গ্লস্টার চক্রান্ত করল নিজের সিংহাসন লাভের পথ নিষ্কন্টক করার জন্যে-কর্ডেলিয়া বন্দিনী হল কারাগারে। এই কারাগারেই এডমাণ্ডের চক্রান্তে নিজের জীবন দিতে হল কর্ডেলিয়াকে—এই তার পুরস্কার—মৃত্যু দিয়ে সে পিতৃভক্তির শেষ পূজা সমাপ্ত করল। পৃথিবীর মানুষের সামনে এক অসামান্য নারীর এই অকাল

বিনষ্টি চিরদিনের জন্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল স্বার্থহীন পিতৃভক্তির। এর পর রাজা লিয়রের জীবনও অবসান হল দীর্ঘ দুঃখভোগের শেষে—সামান্য আশার আলোটিও যখন এমন করে নিভে গেল।

সেই প্রথম দিন থেকে, যেদিন রাজা তাঁর অবিমৃষকারিতার ফলে কেন্টকে রাজসভা থেকে দূর করে দিয়েছিলেন ও দেশ থেকে নির্বাসিত করেছিলেন এবং তারপর তাঁর মেয়েদের অকৃতজ্ঞ ব্যবহারে পথের ভিখারী হয়ে নিদারুণ দুঃখ যন্ত্রণায় পাগল হয়ে ঝড়ের রাতে পথে নেমে এসেছিলেন—এই সবকিছু বিপদ বিপর্যয়ের মধ্যে রাজার পাশে তাঁর অতি বিশ্বস্ত অনুচরের মত ছিল সেই কেন্ট। কেন্ট এই দীর্ঘকাল শুধু অতি দীন ভৃত্য কেইয়াস। এবার তার মনে হল রাজার এই শেষ অবস্থায় তাঁর কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় জানানো কর্তব্য। কেন্ট নিজের পরিচয় বললেন, কিন্তু বারবার আঘাতে আঘাতে রাজার তখন সব বোধ হারিয়ে যাওয়ার পথে—কেন্ট ও কেইয়াসের মধ্যে কেমন করে একই ব্যক্তিকে মেলানো যায় তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। কেন্ট বুঝলেন তাঁর ঐ বৃথা চেষ্টায় আর কাজ নেই। রাজাও অচিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর আজীবন অনুরক্ত কেন্টও নিজের বয়সের ভার ও প্রভুর মৃত্যুর বেদনায় নিজের শেষ দিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এর পরের কাহিনী অতি দ্রুত—সে কাহিনীতে আছে কেমন করে অচিরে শয়তান গ্লস্টারের যাবতীয় চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেল এবং সে মারা পড়ল তার নিজের ভাইয়ের সঙ্গে সরাসরি লড়াই-এ—যে ভাই ছিল গ্লস্টার জমিদারির প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তারই হাতে হল তার মৃত্যু—আর এদিকে, অ্যালবেনির ডিউক প্রথম থেকেই যিনি নিজেকে কোনো চক্রান্তে জড়ায়নি, কর্ডেলিয়ার মৃত্যুর কথা যাঁর ঘৃণাক্ষরেও জানা ছিল না এবং নিজের স্ত্রীর অপরাধেও যাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না—সেই অ্যালবেনির ডিউকই লাভ করলেন বৃটেনের রাজসিংহাসন। কিন্তু লিয়র ও তাঁর তিন কন্যার জীবনের দুঃখময় পরিণতিই এই কাহিনীর মূল বিষয়—অন্য সবই সেই বেদনার কাছে ম্লান।

ম্যাকবেথ

এই গল্পের যখন শুরু তখন ডানকান ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের রাজা—তাঁকে লোকে বলত কোমলহৃদয় ডানকান। ডানকানেরই এক নিকট আত্মীয় ম্যাকবেথ। সেই সময়ে সে দেশের এক প্রতাপশালী ভূস্বামী বা থেন। ম্যাকবেথ বীর, যুদ্ধক্ষেত্রে যে পরম পরাক্রমশালী যোদ্ধা, আর সেই কারণে রাজসভায় তার মস্ত সম্মান ও প্রতিপত্তি। কিছুকাল আগেই সে তার বীরত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে রাজসৈন্যদলের বিদ্রোহ শক্ত হাতে দমন করে। বিদ্রোহী সৈন্যদল নরওয়ের রাজার গোপণ সহায়তায় বহু সংখ্যক সেনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু ম্যাকবেথের প্রবল বিক্রমের কাছে তারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়।

সন্ধ্যা হয় হয়। এই যুদ্ধের শেষে ম্যাকবেথ ফিরে আসছিল। তার সঙ্গে ছিল তারই সহযোগী স্কটল্যাণ্ডের অপর এক সেনাপতি ব্যাংকো। ম্যাকবেথ ও ব্যাংকো ফিরছিল বিশাল এক মাঠের পথে। ভয়ঙ্কর এক রুক্ষ মাঠ চারিদিকে ধূ ধূ করছে। হঠাৎ তাদের সামনে এসে উপস্থিত হল যেন তিনটি মেয়েছেলে, কিন্তু অদ্ভুত তাদের আকৃতি—তাদের মুখে দাড়ি, কোঁচকানো গায়ের চামড়া আর গায়ে ভূতুড়ে পোষাক থাকার ফলে তাদেরকে ইহজগতের কোনো প্রাণী বলে মনেই হয় না।

এদের দিকে চোখ পড়াতে ম্যাকবেথই প্রথম ডেকে কথা বলতে গেল। প্রথমটা মনে হল যেন ম্যাকবেথের এই ডেকে কথা বলার জন্যে তারা বিরক্তই হল। তিনজনেই যার যার বাঁকাট্যারা আঙ্গুল তুলে চামড়া ঝুলে পড়া ঠোঁটে ঠেকিয়ে ইশারায় বলল চুপ করতে। ওদের মধ্যে যে সবার আগে ছিল সে হাত তুলে ম্যাকবেথকে স্যালুট করে বলল—আমার অভিবাদন নিন, 'থেন অব গ্লামিস'। এই সব কোথাকার কোন কিম্ভুতকিমাকার জীবেরা আবার তার পরিচয়ও জানে— ম্যাকবেথ তো চমকে উঠল। সে আবারও চমকে উঠল যখন ওদের মধ্যে দ্বিতীয় জন তাকে ঠিক তেমনি ভাবে সেলাম জানিয়ে অভিবাদন করল 'থেন অব কডর' বলে। ম্যাকবেথ নিজেও কখনও ভাবেনি যে ঐ সম্মান সে পেতে পারে, কেননা কডরের যে ভূস্বামী সে তো জীবিত। বিস্ময়ের পর আবার বিস্ময়—ওদের মধ্যে যে তৃতীয় সে বলে উঠল জয় হোক ম্যাকবেথ, আপনিই পরবর্তী অধিরাজ। কী বিস্ময়! ম্যাকবেথের তো অভিভূত হওয়ারই কথা—এ কেমন ভবিষ্যদ্‌বাণী? রাজার পুত্রসন্তানেরা তো সকলেই জীবিত, ম্যাকবেথ রাজা হবে! তা কেমন করে সম্ভব! আর এর পরেই ব্যাংকোর দিকে ফিরে ওরা কেমন যেন একটু ধাঁধাঁর মতো করে বলে উঠল তুমি হবে তুলনায় একটু কম, কিন্তু বেশিই বটে, সুখীও হবে একটু কম বটে, কিন্তু আবার অনেক বেশিও। ব্যাংকোর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী হল—তুমি কখনও রাজসিংহাসনে বসবে

না, কিন্তু তোমার অবর্তমানে তোমার পুত্রেরা হবে স্কটল্যাণ্ডের রাজা। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মূর্তিগুলি হাওয়ায় মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ম্যাকবেথ ও ব্যাংকো এতক্ষণে বুঝলো ওরা নিশ্চয়ই সেই তিন জন নিয়তিদেবী অথবা ডাইনি।

হঠাৎ এমন একটা ঘটনায় ব্যাংকো আর ম্যাকবেথ তো বিস্ময়ে হতবাক, তারা কী ভাববে আর না ভাববে তার কিছুই ঠাওর করতে পারছে না। ঠিক এমন সময় তাদের সম্মুখে উপস্থিত হল রাজার সংবাদবহ কয়েকজন দূত—রাজার আদেশ অনুসারেই তারা ম্যাকবেথকে ভূষিত করল থেন অব কডর সম্মানে। ডাইনিদের কথা মুহূর্তের মধ্যে এমনভাবে সত্য হয়ে যাবে এ কেমন করে সম্ভব! ম্যাকবেথ তো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এমনই তার মানসিক অবস্থা যে রাজার প্রেরিত দূতদের সঙ্গে সামান্য কথাটুকুও বলতে সে ভুলে গেল। আর সেই অতি সামান্য কয়েকটি মুহূর্তের অবসরে তার মনে দোলা দিল এক ঝলক আশার স্বপ্ন—থেন অব কডর—যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে থাকে—তাহলে সেই তৃতীয় ডাইনিটা যা বলেছিল তা-ই বা সত্য হবে না কেন? ম্যাকবেথ স্কটল্যাণ্ডের রাজা হবে—সে-ই ভবিষ্যদ্বাণী।

ম্যাকবেথ হঠাৎ ব্যাংকোর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সে ব্যাংকোকে বলল—দেখলে, কেমন হাতে হাতে ফলে গেল ডাইনিদের কথা? তাহলে তুমিও তো আশা করতে পারো তোমার সম্পর্কে ওরা যা বলেছে—তোমার সন্তানেরা রাজা হবে স্কটল্যাণ্ডের? ব্যাংকো খুব শান্তগলায় বলল—তা আশার কথাই বটে, ওদের আশার বাণী তোমার মনে রাজসিংহাসনের স্বপ্ন জাগাবে বটেই, তবে অন্ধকারের এই মন্ত্রণাদাত্রীরা অনেক সময়ে ছোট ছোট ইচ্ছাপূরণের জালে জড়িয়ে আমাদের টেনে নেয় বড় রকমের বিপদের মুখে।

কিন্তু কে শোনে বন্ধু ব্যাংকোর উপদেশ—ডাইনিদের সর্বনাশা ইঙ্গিতে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে আছে ম্যাকবেথের মন। তার অপর সব জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়েছে—এখন তার মাথায় একমাত্র চিন্তা কেমন করে সেই স্বপ্নটি সার্থক করে তোলা যায়—স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন।

অপার্থিব ঐ তিনটি শক্তির কথা ম্যাকবেথ ভুলতে পারছে না—আরও ভুলতে পারছে না তার মনের জেগে ওঠা সুপ্ত আকাঙ্খার কথা। সে ঐ ডাইনিদের কথা লিখে জানালো তার স্ত্রীর কাছে, আরও জানালো কেমন হাতে হাতে সে ফল পেয়েছে ওদের ভবিষ্যদ্বাণীর। ম্যাকবেথের স্ত্রীর বিন্দুমাত্র শুভবুদ্ধি ছিল না। ম্যাকবেথ তার তুলনায় অনেক কোমল—শুভাশুভের দ্বন্দ্বে সে বিচলিত হত, কিন্তু লেডি ম্যাকবেথের নীতির বালাই নেই—উচ্চাকাঙ্খার ফলে সে অন্ধ ও নির্মম। ম্যাকবেথের চরিত্রে দ্বিধা দ্বন্দ্বের কথা সে জানতো, তাই সে ইন্ধন জোগাতে লাগল তার সুপ্ত উচ্চাকাঙ্খায়। রাজা ডানকান ম্যাকবেথের আত্মীয়, তিনি ম্যাকবেথকে বিশ্বাস করেন,

ভালবাসেন—তাকেই হত্যা করে রাজসিংহাসন লাভ—এই রক্তের পথে পা ফেলতে ম্যাকবেথের মন সায় দেয় না, কিন্তু লেডি ম্যাকবেথ তার সঙ্কল্পে অনড়—ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হতেই হবে—তা যেমন করেই হোক।

সুযোগ আসতে দেরী হল না। রাজা ডানকান তাঁর রাজসিক মহানুভবতায় কখনও কখনও আতিথ্য গ্রহণ করতেন দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের গৃহে। এবার ম্যাকবেথের বাড়িতে আসবেন বলে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ম্যাকবেথ যে বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তার স্বীকৃতি দেওয়াই এই উপস্থিতির কারণ। রাজার সঙ্গে তাঁর দুই পুত্র— ম্যালকম ও ডোনালবেন—তাছাড়া বহুসংখ্যক অভিজাত নাগরিক এসে উপস্থিত হলেন ম্যাকবেথের বাড়িতে।

ম্যাকবেথের বাড়ি অর্থাৎ দুর্গ। সুন্দর তার পরিবেশ, মনোরম তার দৃশ্য এবং জলহাওয়ার গুণে নানা শ্রেণীর পাখি বাসা রচনা করেছে দুর্গের আনাচে কানাচে। পাখিদের ঐ বাসা বানানোতেই বোঝা যায় সেই স্থানের জলবায়ু। রাজা ভারী খুশি হলেন এখানে এসে, তিনি আরও খুশি হলেন আশাতীত আদর আপ্যায়নে। গৃহের কর্ত্রী লেডি ম্যাকবেথ—আদর যত্নে মানুষকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা তার তুলনাহীন—মুখে তার নিষ্পাপ সরলতা, ফুলের মত সুন্দর তার হাসি, আর সেই হাসির আড়ালে সে লুকিয়ে রাখতে জানে কালসাপের বিষ।

সারাদিনের পথ চলার ক্লান্তিতে রাজা সেদিন কিছু আগেই বিশ্রাম ও ঘুমের জন্যে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট রাজকীয় কক্ষে প্রবেশ করলেন—রাজকীয় প্রথা অনুসারেই তাঁর শয়নকক্ষে দুই প্রহরীও পাহারারত রইল। ম্যাকবেথের আতিথেয়তায় প্রসন্ন রাজা ঘুমুতে যাওয়ার আগে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে বিতরণ করলেন নানা উপহার—আর লেডি ম্যাকবেথের আদরযত্নের বিনিময়ে তাঁকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন অতি মূল্যবান এক হীরক খণ্ড। তার অতিথিপরায়ণতার স্মারক উপহার।

ম্যাকবেথের দুর্গ। নিশুতি রাত্রির ঘুমে রাজ অতিথিরা আচ্ছন্ন। বিশ্বচরাচরের অর্ধাংশ যেন মৃতের মত নিশ্চল। শুধুমাত্র হিংস্র শ্বাপদ আর নৃশংস হত্যাকারী এমন গভীর রাতে বের হয় শিকারের সন্ধানে। এই গভীর রাতে দুর্গের ভিতরে জেগে আছে লেডি ম্যাকবেথ তার অতিথি রাজা ডানকানের হত্যার চক্রান্ত মাথায় নিয়ে। সে তার নারীসুলভ স্নেহ মমতাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়েছে কেননা সে জানে তার স্বামী ম্যাকবেথের হৃদয় কত কোমল, সে জানে ঠাণ্ডামাথায় চক্রান্ত করে কোন মানুষকে খুন করা তার মত চরিত্রের মানুষের দ্বারা কিছুতেই হতে পারে না। তার স্বামী উচ্চাকাঙ্খী এ কথা সে জানতো, কিন্তু তার উচ্চাভিলাষ যে বেপরোয়া নয় তা-ও সে জানতো—এমন অসম্ভব এক আকাঙ্খার কাম্য বস্তু পেতে হলে যত রক্তের পথ পার হতে হয়, তা আর সাধ্যাতীত। ম্যাকবেথকে সে প্ররোচিত করেছে তার কথার ইন্দ্রজালে, তবু সে তার স্বামীর মানসিক দৃঢ়তার উপর ভরসা করতে

পারে না, যে কোনো মুহূর্তে ম্যাকবেথের কোমল প্রকৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে, তার সঙ্কল্প থেকে সে বিচ্যুত হতে পারে তার ফলে। লেডি ম্যাকবেথ তাই তীক্ষ্ণ ছোরা তুলে নিল তার নিজের হাতে, সন্তর্পণে সে এগিয়ে গেল রাজার শয়নকক্ষের দিকে। দ্বাররক্ষী প্রহরীদের সে মৃতের মত অচেতন করে দিল তীব্র সুরার নেশায়। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন রাজা ডানকান সারাদিনের ক্লান্তিতে সম্পূর্ণ অবশ—লেডি ম্যাকবেথ গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল তার শান্ত মুখের দিকে—তার মনে হল ঐ মুখে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে তার পিতার মুখচ্ছবি—শুধু সাদৃশ্য মাত্র, আর কিছু নয়—সে পিছিয়ে গেল—তার শক্তি হারিয়ে গেছে ছোরা হাতেই রয়ে গেল—ফিরে এল লেডি ম্যাকবেথ।

স্বামীর সঙ্গে আবার শুরু হল বৈঠক—ম্যাকবেথকেই এগিয়ে যেতে হবে রাজার ঘরে। কিন্তু ম্যাকবেথ এরই মধ্যে ভাবতে শুরু করেছে ফলাফলের কথা। আর পিছিয়ে এসেছে তার সঙ্কল্প থেকে। তার মনকে সে কী করে বোঝাবে—ডানকান তার রাজা, শুধু তাই নয়, সে ডানকানের নিকট আত্মীয়। উপরন্তু ডানকান আজ তার পবিত্র অতিথি, তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা আজ তার পবিত্র কর্তব্য। তাছাড়া ম্যাকবেথের বিবেক কিছুতেই সায় দেয় না এমন একজন সৎ ও দয়ালু রাজার কোনো ক্ষতি করতে—ডানকান তো কখনও তাঁর প্রজাদের উপর কোনো অবিচার করেন নি। দেশের যারা অভিজাত তাদের প্রতি তিনি সর্বদাই স্নেহের দৃষ্টি নিয়ে আচরণ করেছেন, আর তাকে তো তিনি সবার বেশী ভালবাসেন। ঈশ্বরপ্রেরিত এমন রাজার প্রতিটি প্রজারই কর্তব্য তাঁকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা। ম্যাকবেথের আরও মনে হল আজ তার সব মানমর্যাদার মূলে রাজা ডানকানের অবদান। এছাড়া দেশের মানুষের কাছে আজ তার যা সম্মান তার সবটুকুই ভূলুণ্ঠিত হবে যদি সে এই হীন কাজে নিজেকে কলঙ্কিত করে।

অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ম্যাকবেথের মধ্যে ধীরে ধীরে শুভবুদ্ধির উদয় লেডি ম্যাকবেথকে চিন্তিত করে তুলল। কিন্তু ম্যাকবেথকে দিয়ে এ কাজ তো করাতেই হবে—লেডি ম্যাকবেথ কিছুতেই এ সুযোগ হারাতে রাজী নয়—সে নির্দয়, মমতাহীন। তাই সে নানা কথায় চেষ্টা করতে লাগল তার স্বামীকে উত্তেজিত করতে—তাকে বলল এই সহজ কাজটুকু করতে তোমার এত ভয়? মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের ব্যাপার, আর আজ রাতের ঐ মুহূর্ত দিয়ে আমরা কিনে নেব সারাজীবনের দিন ও রাত্রির যাবতীয় রাজকীয় ক্ষমতা ও সম্মান। ম্যাকবেথকে যেমন করেই হোক উত্তেজিত করতে হবে। তাই এবার সে তাকে কাপুরুষ ও দুর্বল বলে অবজ্ঞার সুরে বিদ্রূপ করতে শুরু করল—সে বলল—আমি যে শিশুকে বুকের দুধ দিয়ে পালন করেছি জানি সেই শিশু আমার কাছে কত প্রিয়, সে কত অসহায়—কিন্তু যদি আমি কোনো কারণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই তবে সেই শিশুকেই আমার নিজের বুক থেকে

টেনে নিয়ে আমি আছড়ে তার মাথাটা চূরমার করে দিতে পারি—আর তুমিও তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজাকে খুন করবে বলে...। আর তাছাড়া এতো ভাবনারই বা কী আছে—অতি অনায়াসেই খুনের দায়টা চাপিয়ে দেওয়া যাবে প্রহরীদের উপর। এমনিভাবেই লেডি ম্যাকবেথ তার বাক্যবাণে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করল ম্যাকবেথকে—ম্যাকবেথ সাহস সঞ্চয় করল—তার মাথায় চাপলো খুনের ভূত।

শক্ত মুঠোয় ছোরাটা চেপে ধরল ম্যাকবেথ—অন্ধকারের আড়ালে নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে সে এগিয়ে চললো ডানকানের শয়নকক্ষে, যেখানে রাজা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কিন্তু হঠাৎ কী দেখলো ম্যাকবেথ তার চোখের সামনে? সে দেখলো যেন তারই হাতের ছোরার মতন একটি ছোরা তার চোখের সামনে শূন্যে ভাসছে, আর তার হাতল এবং তীক্ষ্ণ ফলাতে টপটপ করে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। ম্যাকবেথ আঁকড়ে ধরতে গেল শূন্যের ঐ ছোরাটিকে—কিন্তু কোথায় গেল ছোরা? সে দেখলো কিছুই নেই তার সামনে—এ শুধু আর দুশ্চিন্তাভারাক্রান্ত মস্তিষ্কের এক অলীক সৃষ্টি—অসুস্থ মনোবিকার।

ভয়ের কাছে হার মানবে না ম্যাকবেথ—সে অগ্রসর হল। ঘুমন্ত রাজার কাছে এগিয়ে গিয়ে তরবারির শুধু একটি আঘাত করল সে—তারপর সব শেষ। খুন শেষ হল, কিন্তু শেষ হতে না হতেই যেন ঘরের ভিতরের একজন নিদ্রামগ্ন প্রহরী খিলখিল করে হেসে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রহরীটিও ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠল খুন খুন বলে এবং সেই শব্দে জেগে উঠল দুজনেই। তারা অতি স্বল্পক্ষণের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে নিল—একজন বলল—'ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন', অপর জন সাড়া দিল 'আমেন' অর্থাৎ তবে তাই হোক বলে। কিন্তু ওরা দুটিতেই তৎক্ষণাৎই আবার আচ্ছন্ন হল ঘুমে। ম্যাকবেথ চুপ করে দাঁড়িয়ে ওদের প্রার্থনার কথা শুনছিল—প্রথম প্রহরীর 'ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন উচ্চারণের শেষে সে-ও বলতে চেষ্টা করেছিল 'আমেন', কিন্তু পারেনি সে। ঈশ্বরের আশীর্বাদের জন্যে তার সারা মনপ্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ঐ শব্দটি যেন তার কণ্ঠরোধ করে তাকে সম্পূর্ণ অসহায় করে দিয়েছিল—সে বলতে পারেনি—'আমেন'।

এটুকুই সব নয়—আরও বিভীষিকায় জর্জরিত হয়েছিল ম্যাকবেথ—সে শুনেছে কে যেন চিৎকার করে বলছে—আর ঘুমিও না; ম্যাকবেথ ঐ খুন করলো ঘুমকে—নিষ্পাপ যে ঘুম, যে ঘুম জীবনের প্রাণদায়ী। যেন তার দুর্গের প্রতিটি কক্ষে ম্যাকবেথ শুনেছে আরও চিৎকার—ঘুমিওনা আর, গ্লামিস খুন করেছে নিদ্রাকে, তাই আর কোনদিনই ঘুমবে না কডর। চিরকালের জন্যে চলে গেছে ম্যাকবেথের চোখের ঘুম।

এরই মধ্যে উপস্থিত হয়েছে দরজার বাইরে লেডি ম্যাকবেথ। ম্যাকবেথের মুখে এই সব প্রলাপের উক্তি শুনে তার ধারণা হল ম্যাকবেথ বুঝিবা সব কাজ পণ্ড

করে দিয়েছে। কিন্তু তার হাতে রক্ত দেখে ও তার ঐ বিভ্রান্ত অবস্থা দেখে লেডি ম্যাকবেথ ভর্ৎসনা করে স্থির করতে চাইল তার স্বামীকে। সে বলল—এমন দুর্বল কেন তুমি, যাও তোমার রক্তমাখা হাত ধুয়ে এসো। এই বলে সে ম্যাকবেথের হাতের ছোরাখানা নিয়ে এগিয়ে গেল ঘুমন্ত প্রহরী দুটির দিকে—তার উদ্দেশ্য ওদের গায়ে রক্তের চিহ্ন মাখিয়ে দেওয়া যাতে কীনা হত্যার অপরাধ ওদের উপরেই গিয়ে পড়ে।

রাত শেষ হল। দুর্গের দরজায় উপস্থিত রাজার দুই বিশ্বাসী অমাত্য-লেনকস্ ও ম্যাকডাফ। রাজা তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন সকালে সাক্ষাৎ করতে। তারা দরজায় ধাক্কা দেওয়ার ফলে নেশাগ্রস্তের মত ঘুম ভেঙ্গে বেরিয়ে এলো দ্বাররক্ষী আর তার প্রায় পিছন পিছন এলো ম্যাকবেথ। অচিরেই সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল—রাজহত্যার বিভীষিকায় ছড়িয়ে পড়ল সন্ত্রাস। ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ উপস্থিত সবার সামনে এমনভাবে অভিনয় শুরু করল যেন তারা দুঃখ ও শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছে—প্রহরীদের গায়ে রক্তের চিহ্নের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই শুধু নয়, ম্যাকবেথ এমনভাবে প্রহরীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যে তার ঐ বাড়াবাড়ির ফলে তার উপরেই সকলের সন্দেহ ঘনীভূত হল। দুই রাজপুত্র অনুমান করে নিল স্কটল্যাণ্ড আর তাদের পক্ষে নিরাপদ স্থান নয়, তাই তারা নিরাপত্তার জন্যে অবিলম্বে পাড়ি দিল দেশের বাইরে—বড় ভাই ম্যালকম গেল ইংল্যাণ্ড রাজসভার আশ্রয়ে এবং ছোট ভাই ডোনালবেন গেল আয়ারল্যাণ্ডে।

ডানকান নিহত। দুই রাজপুত্র দেশত্যাগী। রাজসিংহাসন শূন্য। সিংহাসনের নিকটতম উত্তরাধিকার এখন ম্যাকবেথের। ম্যাকবেথের অভিষেক হল স্কটল্যাণ্ডের রাজসিংহাসনে—নিয়তির দেবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হল।

ভাগ্যের এই উত্তুঙ্গ শীর্ষে পৌঁছেও কিন্তু সুখ নেই ম্যাকবেথ ও তার স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথের। তারা কিছুতেই ভুলতে পারছে না ডাইনিদের উক্তির সেই কথাগুলি—ম্যাকবেথ রাজা হবে, কিন্তু তার রাজসিংহাসনে তার সন্তানদের অধিকার বর্তাবে না, সিংহাসন লাভ করবে ব্যাংকোর সন্তান। দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলো ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ—তাহলে কেন এমন নিষ্ঠুর অপরাধের পথে এই সিংহাসন লাভ, কেন এত রক্তপাত, যদি না তাদেরই উত্তরপুরুষ সিংহাসনের অধিকারী হয়? এত বড় অপরাধ কি শুধু ব্যাংকোর সন্তানদের রাজ্যলাভের জন্যে? ম্যাকবেথ ও তার স্ত্রী স্থির করল যেমন করেই হোক ব্যাংকোকে ও তার পুত্র ফ্লিয়ান্সকে সরিয়ে দিতে হবে সিংহাসনের পথ থেকে, তাদের মরতেই হবে—যে ভবিষ্যদ্বাণী আজ তাদের জীবনে সত্যি বলে প্রতিভাত হয়েছে সেই ভবিষ্যদ্বাণীকেই নস্যাৎ করে দিতে হবে।

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ—ছক আঁকা হয়ে গেল ও সেই অনুযায়ী ম্যাকবেথ

আয়োজন করল রাজকীয় এক নৈশভোজের। দেশের যাবতীয় গণ্যমান্য থেন নিমন্ত্রিত হল সেই ভোজসভায়, আর বিশেষ অতিথির আমন্ত্রণ জানানো হল ব্যাংকো ও তার পুত্র ফ্লিয়ান্সকে। এদিকে যে পথ দিয়ে ব্যাংকোর রাজপ্রাসাদে ঐ নৈশভোজে আসার কথা ঠিক সেই পথে ম্যাকবেথ পূর্বাহ্নে পাঠিয়ে দিল তার নিযুক্ত ঘাতকদের। যথাসময়ে ঘোড়সওয়ারে ব্যাংকো ও ফ্লিয়ান্স সেই পথ ধরেই আসছে প্রাসাদের দিকে—ঘাতকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল—নিহত হল ব্যাংকো—অন্ধকারে হাত ছিটকে বেরিয়ে গেল ফ্লিয়ান্স—ম্যাকবেথের চক্রান্ত ব্যর্থ হল—ফ্লিয়ান্স বেঁচে রইল। সেই ফ্লিয়ান্স থেকেই নতুন ইতিহাসের শুরু হল—একে একে তারই উত্তরাধিকারীরা রাজত্ব করল স্কটল্যাণ্ডে—এবং ষষ্ঠ জেমসই সেই বংশের সর্বশেষ নরপতি। আর পরবর্তী কালে স্কটল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমস ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড এই দুটি রাজ্যের এক ও অভিন্ন রাজা হিসাবে শাসনভার গ্রহণ করার সময় থেকেই যুক্ত হল দুটি রাজ্য ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড একই রাজার অধীনে।

ম্যাকবেথের রাজপ্রাসাদে যথাসময়ে সান্ধ্য ভোজসভা অতিথিদের আগমনে জমজমাট। লেডি ম্যাকবেথ তার রাণীসুলভ মর্যাদায় একে একে অতিথিদের প্রতি তার সুপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপের নিখুঁত অভিনয়ে ব্যস্ত। তার অমায়িক ব্যবহারে সমাগত অতিথিরা আপ্যায়িত। ম্যাকবেথও গণ্যমান্য থেনদের সঙ্গে কথাবার্তায় সুন্দর অভিনয় করে চলেছে—সে বলছে আজ তার এই সভায় দেশের যারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তারা সকলেই উপস্থিত—কী মহান এই সভা—তবে এর ষোলকলা পূর্ণ হতে যেটুকু বাকী তা শুধু ব্যাংকোর অভাব—সে এখনও কেন যে এসে পৌঁছল না সেটাই চিন্তার। ম্যাকবেথ বলল আমি নিশ্চয়ই বকুনি লাগাবো ওকে, ওর ইচ্ছাকৃত দেরীর জন্যে—কেননা পথে ওর কোনো বাধা বিঘ্ন ঘটেছে এ আমার মনে হয় না। ঠিক এই মুহূর্তে—ম্যাকবেথের কথা শেষ হতে না হতেই, ম্যাকবেথ দেখল ব্যাংকো এসে পড়েছে, আর শুধু এসে পড়াই নয়, সে এসে বসে পড়েছে ঠিক সেই আসনটিতে যেটিতে বসতে যাচ্ছিল ম্যাকবেথ নিজে। বীর ও সাহসী ম্যাকবেথের বুক কেঁপে উঠল—তার মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল এক মুহূর্তে—সে তার চোখের সামনে দেখলো ব্যাংকোর প্রেতাত্মা যে ব্যাংকোকে সে খুন করেছে গুপ্ত ঘাতকের সাহায্যে। ম্যাকবেথ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেই প্রেতাত্মার দিকে, সে বসে আছে তারই আসনে—ভয়ে ও আতঙ্কে সম্পূর্ণ বিবশ তার দেহমন। উপস্থিত অতিথিদের চোখ পড়ল ম্যাকবেথের ঐ অস্বাভাবিক ভাবে শূন্য আসনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা—লেডি ম্যাকবেথের দৃষ্টি পড়ল ম্যাকবেথের দিকে। অতিথিরা মনে ভাবল হয়তো কোনো কারণে রাজা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন—কিন্তু লেডি ম্যাকবেথ তার স্বামীকে ভালো করেই জানে, আর এ-ও জানে কী কারণে তার এই ভয় ও সন্ত্রাস। সে সমস্ত পরিস্থিতিটা নিজের আয়ত্বে এনে ফেলার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে

ম্যাকবেথকে চাঙ্গা করতে চাইল বকুনি দিয়ে—তার কানে কানে বলল—সেই একই ভূতে তোমাকে পেয়ে বসেছে। ডানকানের ঘরে ঢোকার সময় তুমি যেমন শূন্যে ছোরা দেখে আঁতকে উঠেছিলে—এ ঠিক তেমনি তোমার মন-গড়া ভয়। কিন্তু কোনো ফলই হচ্ছে না লেডি ম্যাকবেথের সাবধান করায়—ম্যাকবেথ সমানেই তার চোখের সামনে দেখছে বসে রয়েছে ব্যাংকো—তারই সিংহাসনে। সে উন্মাদের মত কথা বলতে শুরু করল ব্যাংকোকে লক্ষ্য করে—তার কথার মধ্যে দিয়ে ফাঁস হয়ে পড়ছিল তার চক্রান্ত। লেডি ম্যাকবেথ দেখল অবস্থা ক্রমশই আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে—সবই জানাজানি হয়ে যেতে চলেছে—কাজেই সে স্থির মাথায় রাতের ভোজসভা মুলতুবী করে দিল—অতিথিদের বলল তার স্বামীর প্রায়ই ঐ রকম একটা অসুস্থতা দেখা দেয়—তখন সে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে। অতিথিরা একে একে বিদায় নিল।

ম্যাকবেথের মনের শান্তি হারিয়ে গেছে। কাল্পনিক বিভীষিকা তার পিছু নিয়েছে ছায়ার মত। স্বামী স্ত্রী দুজনেই এখন ভয়াবহ স্বপ্নে বিভ্রান্ত—ব্যাংকোর রক্তের বিভীষিকা তো আছেই, কিন্তু তারও বেশি ভয়ঙ্কর তার পুত্র ফ্লিয়ান্স-এর পালিয়ে যাওয়া। কী জানি কী হবে ভবিষ্যতে—তবে কি মৃত ব্যাংকোর উত্তর পুরুষেরাই হবে স্কটল্যাণ্ডের ভাবী অধীশ্বর—আর তাদের উত্তরপুরুষ বঞ্চিত হবে'? এই দুর্ভাবনা স্বামী স্ত্রী উভয়েরই সব শান্তি কেড়ে নিয়েছে—তাই মরিয়া হয়ে ম্যাকবেথ স্থির করলো সে আর একবার যাবে সেই ডাইনিদের কাছে, জানতে চাইবে কী রহস্য লুকোনো আছে ভবিষ্যতে।

ধূ ধূ করছে ঊষর প্রান্তর, তারই এক গুহাগর্তের মুখে গিয়ে ম্যাকবেথ খুঁজে পেল সেই মায়াবীদের। মায়াবীরা তাদের জাদুবিদ্যার গুনে আগেই জানতো ম্যাকবেথের এই আসার কথা। সেইজন্যেই তারা প্রস্তুত করছিল এক ভয়ঙ্কর জাদু যার মধ্যে তারা জড় করেছিল নারকীয় প্রেতাত্মাদের যারা ভবিষ্যতের রহস্য খুলে ধরতে পারে। সেই জাদু প্রস্তুতির অনুপান ছিল বড় ভয়াবহ— কুনো ব্যাং, বাদুড়, নানা জাতের সাপ, গোসাপের চোখ, কুকুরের জিভ, টিকটিকির ঠ্যাং, নিশাচর প্যাঁচার ডানা, ড্রাগনের আঁশ, নেকড়ের দাঁত, মৃতশিশুর আঙ্গুল, বিষাক্ত হেমলকের শিকড় আরও কত কী সব গায়ে কাঁটা দেওয়া বস্তু। একটা মস্ত বড় কড়ায় ঐ সব ফুটিয়ে তারপর আবার তার সঙ্গে বেবুনের রক্ত মিশিয়ে সেই ভয়ঙ্কর তরল পদার্থটাকে তারা ঠাণ্ডা করে নিল। এরপর তার মধ্যে ঢেলে দিল এমন এক শূয়রের রক্ত যে শূয়র কীনা নিজেই তার বাচ্চাকে খেয়ে নিয়েছে। আরও সব নানা বিকট প্রক্রিয়ার পর সেই জাদুতে ধরা পড়ল নারকীয় প্রেতাত্মারা—আর তারাই উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ বিষয়ে সব প্রশ্নের।

ডাইনিরা ম্যাকবেথকে প্রশ্ন করল—ম্যাকবেথ, তুমি যা জানতে চাও তার উত্তর আমাদের মুখ থেকে শুনবে, না কী আমরা যাদের ভজনা করি সেই প্রেতাত্মাদের

মুখ থেকে শুনতে চাও? ম্যাকবেথ এতক্ষণ যাবৎ যে বীভৎস দৃশ্য নিজের সামনে ঘটতে দেখেছে তাতে বিন্দুমাত্র আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে বলল—কই, আসুক দেখি সেই প্রেতাত্মারা আমার সামনে, আমি তাদেরই দেখতে চাই। ম্যাকবেথের ইচ্ছা অনুসারে ডাইনিরা ডাকল প্রেতাত্মাদের। প্রথম যাকে দেখা গেল সে এক সশস্ত্র নরমুণ্ড—দেখা দিয়েই সে নামধরে সম্বোধন করল ম্যাকবেথকে এবং বলল—ম্যাকবেথ, ফাইফ-এর থেন সম্বন্ধে সাবধান। এই সাবধানবাণীর জন্যে ম্যাকবেথ ধন্যবাদ জানালো প্রেতাত্মাকে, কেননা, মনে মনে সে ম্যাকডাফকে ঈর্ষা করত, এবং ম্যাকডাফই ছিল ফাইফ-এর থেন।

এর পর আবির্ভূত হবার পালা দ্বিতীয় প্রেতাত্মার। সে দেখা দিল এক সর্বাঙ্গে রক্তাক্ত শিশুর মূর্তিতে। সে-ও নাম ধরে সম্বোধন করল—ম্যাকবেথকে। সে বলল—ম্যাকবেথ, ভয় করিস না, মানুষের এত শক্তি নেই যে তোর কেশাগ্র স্পর্শ করে, মানুষের শক্তিকে তুই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দে—মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ কোন সন্তান তোর কোন ক্ষতি করতে পারবে না—তুই খুন করে যা যেমন তোর মন চায়, মনে সাহস রাখিস, শক্তি রাখিস। এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তো ম্যাকবেথ আনন্দে আত্মহারা। সে বলে উঠলো —তবে রে ম্যাকডাফ তোকে আমি থোড়াই ভয় পাই। কিন্তু ঝঞ্ঝাট জিইয়ে রেখেই বা লাভ কি? তোকে শেষ করে তবেই আমি নিশ্চিন্ত—ভয়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমি নাকডেকে ঘুমব—দুনিয়া উলটে গেলেও আমার সিংহাসন অটুট।

দ্বিতীয় প্রেতাত্মাকে আর দেখা গেল না—এবার আবির্ভূত হল তৃতীয়। এই প্রেতাত্মা এল রাজমুকুট মাথায় একটি শিশুর মূর্তিতে, আর তার হাতে ধরা আছে একটি ছোট গাছ। সে-ও এসে নাম ধরে ডাকল ম্যাকবেথকে। বলল—ম্যাকবেথ কোন চক্রান্তেই তোর ভয় নেই। যতদিন না বিরনাম জঙ্গল ধেয়ে আসে তোর কাছে ডানসিনান পাহাড়ের দিকে ততদিন কোনো শক্তিই তোকে হারাতে পারবে না। ম্যাকবেথ বলল—সাবাস! আমাকে আর পায় কে! কার এত বড় হিম্মত আছে যে গোটা জঙ্গল কে মাটি থেকে শিকড় সমেত উপড়ে ডানসিনানের দিকে চালান করবে? আমার সারা জীবনভরই তবে সিংহাসন থাকছে আমার দখলে। আমাকে মারবে এ সাধ্য কারো নেই। কিন্তু একটা কথা তো জানা হল না, আর তা জিজ্ঞাসা করতে কেমন যেন বুক কাঁপছে আমার। সে সাহসে ভর দিয়ে প্রশ্ন করল—তোমরা এতই যদি জানো তবে বল দেখি ব্যাংকোর সন্তানরা কি রাজা হবে ভবিষ্যতে? যে মুহূর্তে ম্যাকবেথের মুখ থেকে এই কথা কটি উচ্চারিত হল অমনি সেই ভয়ঙ্কর কড়াইটা ডুবে গেল মাটির তলায়, আর সেখান থেকে উঠতে লাগল সংগীতের ধ্বনি এবং তারই সঙ্গে ম্যাকবেথের চোখের সামনে একের পর এক ভেসে উঠল আটটি রাজার ছায়ামূর্তি, তাদের সবার পিছনে একটি আরসি

হাতে ব্যাংকো। সেই আরসির মধ্যে দেখা যাচ্ছে আরও অনেক ছায়ামূর্তি, আর রক্তাক্ত ব্যাংকো দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বিদ্রূপ করছে ম্যাকবেথকে ঐ ছায়ামূর্তিগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ম্যাকবেথের আর বুঝতে বাকী রইল না—ঐ ছায়ামূর্তিগুলি ব্যাংকোরই বংশোদ্ভব যারা তার মৃত্যুর পর রাজত্ব করবে স্কটল্যাণ্ডে। ডাইনিরা এবার মৃদু সংগীতের তালে নাচতে নাচতে মিলিয়ে গেল—এবং যাওয়ার আগে তারা ম্যাকবেথকে রাজা হিসাবে কুর্নিশ করে সম্মান জানাতে ভুলল না। ম্যাকবেথের জীবনে এবার উপস্থিত হল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সময়—নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেশা তাকে গ্রাস করল—তার চোখে শুধু রক্ত আর রক্তের ছবি।

ডাইনিদের গুহামুখ থেকে বাইরে আসার পর যে সংবাদ সর্বপ্রথম ম্যাকবেথের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল তা হল ম্যাকডাফের ইংল্যাণ্ডে অন্তর্ধান। সে শুনলো ম্যাকডাফ ইংল্যাণ্ডে গিয়ে মিলিত হয়েছে ডানকানের জ্যেষ্ঠপুত্র ম্যালকমের সঙ্গে এবং সেখানে ম্যালকম গড়ে তুলেছে এক সৈন্যদল। ঐ সৈন্যদল অবিলম্বে স্কটল্যাণ্ডে এসে আক্রমণ করবে ম্যাকবেথকে—তার অবৈধ সিংহাসন থেকে তাকে দূর করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করবে বৈধ উত্তরাধিকারী ম্যালকমকে। ম্যাকবেথ উন্মাদের মত ছুটল ম্যাকডাফের বাড়ির দিকে যেখানে ম্যাকডাফ রেখে গিয়েছিল তার স্ত্রী, পুত্র, সন্তানসন্ততি এবং অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন। সেখানে পৌঁছে নির্বিচারে ম্যাকবেথ একে একে হত্যা করল ম্যাকডাফের স্ত্রী পুত্র ও প্রতিটি প্রাণীকে নির্মমভাবে—ম্যাকডাফের আপন বলতে একটি প্রাণীও আর জীবিত রইল না।

এবার গোটা দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। স্কটল্যাণ্ডের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সরে এল ম্যাকবেথকে ত্যাগ করে, কেউই আর তার পাশে নেই। অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে গেল ম্যালকম ও ম্যাকডাফের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে। ইংল্যাণ্ডে তাদের গড়ে তোলা সৈন্যদল তখন এগিয়ে আসছিল স্কটল্যাণ্ডের দিকে। আর যে ব্যক্তিরা দেশে রয়ে গেল তারা ম্যাকবেথের ভয়ে মুখে কোনো কথা উচ্চারণ না করলেও গোপণে প্রতীক্ষা করছিল ম্যালকমের সৈন্যদলের উপস্থিতির আশায়। দেশের সাধারণ মানুষের চোখে ম্যাকবেথ এখন ঘৃণার পাত্র, স্বৈরাচারী ও নৃশংস। প্রতিটি মানুষ তাকে দেখে সন্দেহের চোখে। ম্যাকবেথের রাজসিংহাসন আজ তার কাছে মনে হয় দুঃসহ—তর ঈর্ষা হয় মৃত ডানকানের প্রতি—ডানকানকে সে খুন করেছে, কিন্তু আজ সেই ডানকান শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে তার কবরের নিচে—রাজদ্রোহীর নিকৃষ্টতম আঘাত সত্ত্বেও আজ সে সব আঘাতের উর্দ্ধে—মানুষের কোনো ঈর্ষা, কোনো আক্রমণ, কোনো অস্ত্রই আজ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

ম্যাকবেথ এখন উন্মাদ—তার নৃশংসতা ও খুনের নেশা যত বাড়ছে ততই তার মনে হচ্ছে তাকে যেন বিপদ ঘিরে ধরছে চারিদিক থেকে। এমন দুর্দিনে আবার তার পাপকাজের একমাত্র সঙ্গী. যার কাছে সে নিজের বুকের ভার হালকা করতে

পারে—সেই লেডি ম্যাকবেথেরও ঘটল মৃত্যু। তার নারীহৃদয় একের পর এক এত নিষ্ঠুরতার চাপে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গিয়েছিল, প্রতি রাত্রে আতঙ্কে অনুশোচনায় আর রক্তের বিভীষিকায় সে ঘুমতে পারত না অবশেষে অসহায়ের মত শেষ করে দিয়েছে নিজের জীবন সম্ভবত নিজেরই হাতে। এখন ম্যাকবেথ সম্পূর্ণ একা। তার পাশে কেউ নেই—এমন একটিও বন্ধু নেই যার কাছে সে তার নিজের অভিসন্ধির কথা বলতে পারে।

জীবন সম্পর্কে এক অনীহা যেন ক্রমশ ম্যাকবেথকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে—জীবনে তার আর বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই, তার কাছে মৃত্যুই এখন শ্রেয়। কিন্তু অকস্মাৎ ম্যালকমের সেনাবাহিনী এসে পড়ায় আবার তার মধ্যে জেগে উঠল সেই নির্ভীক প্রকৃতি—না, সে শত্রুর হাতে পরাভব মানবে না, বরং যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মৃত্যু বরণ করবে। এছাড়া তার মনে আবারও উঁকি দিল ডাইনিদের সেই অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতির কথা—স্ত্রীলোকের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট কোন ব্যক্তিই তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। পরন্তু, যতক্ষণ না বীরনাম অরণ্য ডানসিনানে এসে উপস্থিত হয় ততক্ষণ যুদ্ধে কিছুতেই পরাজিত হবে না ম্যাকবেথ। নিশ্চিন্ত হল ম্যাকবেথ—বীরনাম অরণ্য...সে তো অসম্ভব। অতএব সে গিয়ে প্রবেশ করল তার সুরক্ষিত দুর্গে—ঐ দুর্গ অবরোধ করে কার সাধ্য! ম্যাকবেথ ঐ দুর্গের অন্দরে স্থির হয়ে অপেক্ষায় রইল ম্যালকমের সৈন্য আগমনের।

এরই মধ্যে একদিন অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হল ম্যাকবেথের এক চর। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সংবাদ দিতে এসেছে ম্যাকবেথকে। ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে সে কোন কথাই প্রায় গুছিয়ে বলতে পারছে না। শুধু বলল যে সে একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল এবং তখন সে দেখেছে যেন বিরনাম জঙ্গল এগিয়ে আসছে। শোনামাত্রই রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল ম্যাকবেথ। সংবাদবাহী চরটিকে সে বলল—মিথ্যাবাদী নচ্ছার কোথাকার—তোর কথা যদি মিথ্যা হয় তবে তোকে জ্যান্ত ঝুলিয়ে দেব হাতের কাছে যে গাছ পাব তার ডালে—আর তুই সেখানে খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরবি। আর যদি সত্যি হয় তোর কথা তবে তুই ঝুলিয়ে দিস আমাকে, আমার কিছুই এসে যায় না। ম্যাকবেথ আর নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারছে না, সে এবার বুঝতে পারছে ডাইনিদের কথার মারপ্যাঁচ, বুঝেছে আর তার নিস্তার নেই। হ্যাঁ, বিরনাম আসছে, আসুক। চলো, আমরাও অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ি, আমরা পালাব না—ভেরি বাজাও—যুদ্ধ—হ্যাঁ মৃত্যু—তাই চাই, জীবনের সাধ আমার ফুরিয়ে গেছে—যদি প্রলয় আসে আসুক। উন্মাদ ম্যাকবেথ এমনি বিভ্রান্তের মত চীৎকার করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্গের বাইরে আর দেখা গেল এরই মধ্যে সেখানে অবরোধ করে ঘিরে আছে ম্যালকমের সেনাদল।

ম্যাকবেথের চরটি যে বিরনাম বন এগিয়ে আসার সংবাদ নিয়ে এসেছিল এতক্ষণে

সেই অসম্ভব ঘটনাটির রহস্য পরিষ্কার হল। আসলে ম্যালকমের ছিল দক্ষ সেনাপতির বুদ্ধি। তার সৈন্যদল যখন বিরনাম জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ম্যাকবেথের দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছিল তখন যুদ্ধবিদ্যাসংক্রান্ত এই কৌশলটি তার মাথায় আসে। যাতে কীনা সৈন্যদের লুকিয়ে রেখে প্রকৃত সৈন্যসংখ্যা গোপণ রাখা যায় সেইজন্যে ম্যালকম তার সেনাদের বলেছিল গাছের ডালপালা ভেঙ্গে নিজেদের মাথার উপর সেগুলি নিয়ে চলতে—এই আত্মগোপণকারী কৌশলেই প্রতারিত হয়েছিল ম্যাকবেথের চর এবং এরই কথা শুনে ম্যাকবেথ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল—তার মনের গভীরে সেই ডাইনিদের ভবিষ্যদ্‌বাণী থাকার ফলে সে সহজেই দুর্বল হয়ে পড়ে, কেননা তার মনে হয়েছিল বিরনামের জঙ্গল সত্যিই তাহলে এগিয়ে আসছে—ডাইনিদের কথামত এই তাহলে তার নিয়তি।

ডানসিনানে ম্যাকবেথের দুর্গের বাইরে শুরু হল প্রচণ্ড লড়াই। ছোট ছোট দলে বিভক্ত সেনাদল পরস্পরের মুখোমুখি। ম্যাকবেথকে ঘিরে এতক্ষণ তার নিজের দলের যারা ছিল লড়াই-এর সময় দেখা গেল তারা অনেকেই বিপক্ষ দলের সেনাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ম্যাকবেথ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর বলে সকলের কাছে সে আজ ঘৃণ্য। কিন্তু ম্যাকবেথ দুর্দমনীয়, অসীম তার সাহসিকতা, তার অস্ত্রের সম্মুখে প্রতিপক্ষের যত বড় সৈনিকই আসুক তার মৃত্যু অনিবার্য। আর শৌর্য ও দক্ষতা নিয়ে একের পর এক শত্রু নাশ করে ম্যাকবেথ এসে উপস্থিত হল ম্যাকডাফের মুখোমুখি। এবার ম্যাকবেথের মনে পড়ল ডাইনিদের সেই সাবধানবাণীর কথা। তারা বলেছিল ম্যাকবেথের সবার বড় শত্রু ম্যাকডাফ, আর তাকে এড়িয়ে চলাই ম্যাকবেথের পক্ষে মঙ্গলের, কেননা তার কাছ থেকেই বিপদ আসতে পারে। ম্যাকবেথ থমকে দাঁড়াল—সে চাইল ম্যাকডাফকে এড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াতে, কিন্তু ম্যাকডাফ এসে দাঁড়াল তার সামনে, তার পথরোধ করে। উপায় নেই, যুদ্ধ সুরু হল। ম্যাকডাফের স্ত্রী পুত্র ও যাবতীয় নিকট জনকে হত্যা করেছে ম্যাকবেথ, রক্তের নেশা তার টুটে গেছে, সে আর যুদ্ধ করতে চায় না, কিন্তু ম্যাকডাফ যার পর নেই কটু ভাষায়—স্বৈরাচারী, খুনী, নারকীয় শয়তান বলে তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল।

এমন সময়ে ম্যাকবেথের মনে পড়ে গেল ডাইনিদের সেই আশ্বাসবাণীর কথা। তারা বলেছিল স্ত্রীলোকের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে এমন কেউই ম্যাকবেথকে হত্যা করতে পারবে না। সাময়িকভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল ম্যাকবেথ—আত্মবিশ্বাসের হাসি মুখে নিয়ে সে ম্যাকডাফকে লক্ষ্য করে বলল—মিথ্যাই তুমি তোমার শক্তি ক্ষয় করছ, ম্যাকডাফ। আমাকে তোমার অস্ত্র স্পর্শও করতে পারবে না, আমার সঙ্গে লড়াই আর হাওয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ তোমার পক্ষে একই হবে। আমার প্রাণকে ঘিরে রয়েছে এক আশ্চর্য জাদুশক্তি, রমণীগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ কোন সন্তান আমাকে কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

রাখ তোর জাদু, তোর মৃত্যু সামনেই। তোর সেই জাদুকরীদের গিয়ে বল যে তুই বৃথাই তাদের ভজনা করেছিস---কেননা, ম্যাকডাফের জন্ম স্বাভাবিকভাবে কোনো নারীগর্ভে হয়নি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মাতৃজঠর থেকে তাকে বাইরে আনা হয়েছে---সে সাধারণ মানুষের মত মাতৃগর্ভজাত শিশু নয়।

ম্যাকডাফের কথা শোনামাত্র ম্যাকবেথের সারা শরীর ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। মরীয়া হয়ে সে চীৎকার করে উঠল---জাহান্নমে যাও, খসে পড়ুক তোমার জিভ। সে এখন বুঝেছে তার আর নিস্তার নেই---হাহুতাশ করে সে বলতে লাগল কেউ যেন আর কোনদিন ডাইনিদের হেঁয়ালী কথায় না ভোলে---এরা পিশাচের মত কথার ভোজবাজীতে ফাঁদে ফ্যালে---এরা যে কথা বলে হাতে হাতেই তার ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সে ফলের অর্থ হয়ে যায় অনর্থ, এরা আশার আলো দেখায় নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবাবে বলে। না, আমি আর লড়াই করব না, ম্যাকডাফ।

ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল ম্যাকডাফ---ঠিক আছে বেঁচে থাক তুই। তোকে আমরা প্রকাশ্য পথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মানুষকে দেখাব পাষণ্ড দানবকে যেমন করে দেখানো হয়, আর একটা কাঠের ফলকে লিখে তোর সামনে রাখব---অত্যাচারী অমানুষ শাসক। সবাই সাবধান।

ম্যাকবেথ এবার রাগে দপ করে জ্বলে উঠল---না, তা হতে দেব না, ম্যাকডাফের পায়ে মাথা খোঁড়ার জন্যে বেঁচে থাকবে না ম্যাকবেথ---রাস্তার জনতা দেবে ম্যাকবেথের গায়ে থুথু---না, তা হতে পারেনা। জানি বিবনাম এসে পড়েছে ডার্নসিনানে, আর বুঝেছি ম্যাকডাফ তোর জন্ম স্বাভাবিক নয়---তবু লড়ব আমি, লড়তে গিয়ে মরব সে-ও ভাল। ম্যাকবেথ ঝাঁপিয়ে পড়ল---প্রবল পরাক্রমে লড়াই-এর পর ম্যাকডাফ তাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে তার মুণ্ডচ্ছেদ করে ফেলল এবং সেই মুণ্ডু নিয়ে উপহার দিল ম্যালকমকে। ডানকানপুত্র ম্যালকম---এতদিন যে নিজের বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল ম্যাকবেথের শয়তানির ফলে। সে পেল তার পিতার সিংহাসন---কোমলহৃদয় ডানকানের যোগ্য উত্তরাধিকারী-রূপে। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ও সাধারণ মানুষ সকলে মিলে তাকে সাদরে রাজা বলে গ্রহণ করল।

অল’স্ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্ ওয়েল

ফ্রান্সের অন্তর্গত.....ভূস্বামীর মৃত্যুতে তাঁর পুত্র বারট্রাম সবেমাত্র অভিষিক্ত হয়েছে কাউন্টের পদ মর্যাদায় ও যাবতীয় ভূসম্পত্তির অধিকারে। বারট্রামের পিতা ছিলেন ফ্রান্সের রাজার অতি প্রিয় একজন সভাসদ। প্রিয় সভাসদের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ামাত্রই রাজা বারট্রামের কাছে সংবাদ পাঠালেন প্যারিসের রাজদরবারে এসে অবিলম্বে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। স্বর্গত কাউন্ট ছিলেন রাজার অতি প্রিয় ও বন্ধুর মত আপণ, তাই সেই বন্ধুর পুত্রকে যথোচিত সম্মানে ভূষিত করা ও তার আপদে বিপদে তাকে রক্ষা করার আশ্বাস দেওয়াই ছিল রাজার উদ্দেশ্য।

বারট্রামের মা সদ্য স্বামীহারা কাউন্টেসের তখন একমাত্র সান্ত্বনা ও অবলম্বন তাঁর পুত্র। তাকে কাছ ছাড়া করতে তাঁর মন সায় দেয় না, কিন্তু রাজদরবার থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন লেফ্যু--তিনিই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন বারট্রামকে। তখনকার দিনে ফ্রান্সে রাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা। রাজার প্রেরিত কোন আমন্ত্রণের অর্থ রাজাদেশ, এবং তা অবশ্য পালনীয়। রাজার অধীনস্থ যে কোন প্রজা, তা সে অর্থকৌলিন্যে অথবা মানসম্মানে যত শ্রেষ্ঠই হোক না কেন রাজার আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারোরই ছিল না। অতএব, যদিও বারট্রামকে ছেড়ে থাকা মানে তার মায়ের কাছে আরো একবার স্বামীহারা হওয়ার মত বেদনাদায়ক, তবু তাঁর পুত্রকে রাজাদেশের বিরুদ্ধে আর একটি দিনের জন্যেও কাছে রাখতে কাউন্টেসের সাহস হল না---তিনি পুত্রকে অবিলম্বে গিয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নির্দেশ দিলেন। লেফ্যু নিয়ে যেতে এসেছিলেন বারট্রামকে। সদ্যস্বামীহারা জননীর দুঃখ তাঁকে বড় কাতর করল। তিনি যতদূর সম্ভব বিনয় ও নম্রতা সহকারে কাউন্টেসকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন রাজা তাঁদের বন্ধুর মতই ডেকে পাঠিয়েছেন বারট্রামকে, তার সর্ববিধ কল্যাণ সাধনই তাঁর কাম্য এবং তাঁর মৃত স্বামীর মত করেই তিনি তার পুত্রকে দেখাশোনার দায়িত্ব নেবেন। কথাপ্রসঙ্গে লেফ্যু বললেন যে রাজামশাই সম্প্রতি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং দেশের যাবতীয় চিকিৎসক ও বৈদ্য একমত হয়ে বলে দিয়েছেন যে ঐ রোগ থেকে নিরাময়ের আর কোন আশাই অবশিষ্ট নেই—ঐ রোগই হবে রাজামশাইয়ের মৃত্যুর কারণ। রাজার এই দুরারোগ্য ব্যাধির কথা শুনে কাউন্টেস বড় কাতর হয়ে উঠলেন এবং বললেন আজ যদি আমাদের হেলেনার বাবা জীবিত থাকতেন তবে তিনিই একমাত্র পারতেন রাজামশাইয়ের এই রোগ থেকে তাকে সুস্থ করে তুলতে। হেলেনা ছিল এক বিখ্যাত চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ জেরারড ডি নারবোনের কন্যা। নারবন তার মৃত্যুর সময়ে কন্যা হেলেনাকে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন কাউন্টেসের হাতে, তাঁর সেবিকা বা পরিচারিকা হিসাবে

এবং সেই সময় থেকেই হেলেনা ছিল কাউন্টেসের নিত্যসঙ্গী। কাউন্টেস এই প্রসঙ্গে লেফ্যুর কাছে বললেন কত বড় চিকিৎসক ছিলেন হেলেনার বাবা এবং তাঁর মেয়ে স্বভাবে চরিত্রে এমন কি চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তিতেও অনেক পরিমাণে পেয়েছে তার বাবার যাবতীয় গুণ। সে যথার্থই যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা। লেফ্যুর সঙ্গে কাউন্টেসের যখন এই কথাবার্তা চলছিল তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে শোক ও দুঃখে নীরবে অশ্রুপাত করছিল হেলেনা। তার কান্না দেখে কাউন্টেস তাকে স্নেহের সুরে ভর্ৎসনা করে বললেন, বাবা নেই, তা বলে এত কাঁদছিস কেন? তুই কি বাবা ছাড়া আর কিছুই জানিস না?

বারট্রামের যাওয়ার সময় হল। অনেক চোখের জল ও আশীর্বাদের সঙ্গে মা তাঁর সন্তানকে বিদায় জানালেন। যাওয়ার সময় বারবার তিনি লেফ্যুকে অনুনয় করে বললেন যেন তিনি তাঁর ছেলের প্রতি নজর রাখেন। তিনি বললেন—দয়া করে ওর সব দোষ মাপ করে নেবেন। রাজদরবারের আদব কায়দা এখনও পর্যন্ত ও কিছুই জানে না।

বারট্রামও যখন যায় তখন তার শেষ কথাগুলি সে হেলেনার উদ্দেশ্যেই বলে গেল। তবে তার কথাগুলি নিতান্তই সৌজন্যমূলক ও প্রাণহীন—সে বলল—ভাল করে থেকো, সুখে থেকো, আর, দেখো যেন আমার মায়ের কোনো কষ্ট না হয়। তোমার উপর তার সেবার দায়িত্ব, তিনিই তোমার কর্ত্রী—তার সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখাই তোমার কাজ।

হেলেনা চুপ করে রইল। সবারই অগোচরে তার মনের আসনে সে বসিয়েছিল বারট্রামকে। এতক্ষণ তার চোখে যে জল ঝরছিল তা তার মৃত পিতার দুঃখে নয়। সে তার বাবাকে একান্তভাবেই ভালবাসত, কিন্তু এই মুহূর্তে পিতার জন্যে শোক তাকে ব্যাকুল করেনি—তার মনের মুকুরে এখন একটিই ছায়া যা অপর সব মূর্তিকে আচ্ছন্ন করে জেগে উঠেছে—সে ছায়া বারট্রামের এবং সে দুঃখের কারণ বারট্রামের আসন্ন বিচ্ছেদ।

বারট্রামের প্রতি হেলেনার এই দুর্বলতা অনেক দিনের। কিন্তু নীরব ভালবাসা সে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলো তার বুকের গভীরে। পাছে বারট্রামের কাছে ধরা পড়ে যায়। সে জানে বারট্রাম তার চেয়ে অনেক বড়—সে...কাউন্ট, সে ফ্রান্সের এক অতি অভিজাত বংশের উত্তরাধিকারী বংশধর। আর সে নিজে এক অতি সাধারণ পরিবারের কন্যা, বংশপরিচয়ের কোন গৌরবই যার নেই। পুরুষানুক্রমে বারট্রাম অভিজাত, কাজেই উচ্চকুলোদ্ভব বারট্রামকে সে মনে মনে তার প্রভুর আসনেই স্থাপন করেছিল এবং এর বেশি অপর কোন বাসনা কামনাকেই সে প্রশ্রয় দিতে চায়নি—সে শুধু এটুকু স্বপ্ন নিয়েই খুশি ছিল যে সে চিরকাল দাসী হয়ে বারট্রামের সেবা করবে এবং মৃত্যুর সময়ও তার অধীনস্থ এক সামান্য প্রজার মতই জীবন

অবসান করবে। বারট্রামের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের সঙ্গে যখন সে তার নিজের অতি সাধারণ অবস্থার কথা তুলনা করে দেখত তখন তার মনে হত—তাকে কামনা করা মানে আকাশের অনেক উর্ধে এক অতি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে স্বামীরূপে বরণ করার আকাঙ্খা—বারট্রাম অনেক দূরের—ঐ নক্ষত্রের মতই দূরের।

বারট্রাম চলে গেছে। তার বিচ্ছেদ অনেক অলস মুহূর্তে অলক্ষ্যে জল নিয়ে আসে হেলেনার চোখে — তার মন তার অজ্ঞাতসারে ভরে ওঠে বেদনায়। সে জানত তার ভালোবাসা কোনদিনই সার্থক হবার নয়, তবু সেই প্রত্যাশাহীন ভালোবাসাও তার কাছে ছিল মধুর — সে তো প্রতিক্ষণই তাকে দেখতে পেত চোখের সামনে — নীরবে বসে তাকিয়ে থাকত তার দুটি কালো চোখের দিকে, তার বাঁকা ভুরুর দিকে, তার অতি সুন্দর কুঞ্চিত চুলের দিকে — আর সেই ছোট ছোট ছবিগুলি অপরূপ করে এঁকে দিত একটি মূর্তি তার হৃদয়ের পাতার উপর—যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাটিও স্পষ্ট জাগরুক থাকতো একটি প্রিয় মুখশ্রীর আদলে।

জেরারড ডি নরবোন মারা গিয়েছিলেন নিঃসম্বল অবস্থাতেই, মেয়ের জন্যে রেখে যাওয়ার মত কোন কিছুই তার ছিল না। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন গভীর মনোনিবেশে, এছাড়া ছিল তাঁর চিকিৎসায় দীর্ঘকালের অভিক্ষতা। মৃত্যুর সময় তাঁর ঐ অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি রেখে গিয়েছিলেন কয়েকটি ঔষধ প্রস্তুত বিধি অর্থাৎ প্রেসক্রিপশান। ঐ ঔষধগুলির গুণ তার বহু পরীক্ষিত এবং সেগুলির ব্যবহারে বহু দুরারোগ্য ব্যাধিরই নিরাময় ছিল সুনিশ্চিত। ভাগ্যক্রমে নরবোনের প্রেসক্রিপশানগুলির ভিতর ছিল এমনই একখানি ঔষধব্যবস্থা যার প্রয়োগ হুবহু মিলে যায় লেফ্যু বর্ণিত রাজামশাইয়ের রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে। হেলেনা এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে ছিল—রাজামশাইয়ের রোগের লক্ষণগুলি শোনার পর সে যেন তার যাবতীয় দীনতা হীনতার বোধ কাটিয়ে এক নতুন আশায় বুক বাঁধার কথা ভাবল। সে স্থির করল সাহস সঞ্চয় করে সে যাবে প্যারিসে এবং সেখানে পৌঁছে রাজামশাইয়ের আরোগ্যের দায়িত্ব তার নিজের হাতে নেবে। কিন্তু ভাবাটা যত সহজ, করাটা তত সহজ নয়। হেলেনা সাধারণ গরীব ঘরের এক শিক্ষাদীক্ষাহীন গ্রাম্য মেয়ে, রাজার কাছে পৌঁছান তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তদুপরি রাজামশাইয়ের বড় বড় বৈদ্যেরা অনেক বিচার বিবেচনা করে রায় দিয়ে দিয়েছেন যে ঐ রোগের চিকিৎসা শিবের অসাধ্য— সেই সব নামজাদা চিকিৎসকেরা তার মত একটা আনাড়ি মেয়ের হাতে রাজার চিকিৎসার ভার ছেড়ে দেবেনই বা কেন? হেলেনা তবুও নিরাশ হল না, তার বাবা সুদক্ষ চিকিৎসক ছিলেন এবং তার ওষুধের গুণ খুবই শক্তিশালী সন্দেহ নেই। কিন্তু হেলেনার ক্ষেত্রে ওষুধের দক্ষতাগুণের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল তার দৃঢ় বিশ্বাস, সে তার অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিল যে ঐ ওষুধ পবিত্র, কেননা সুলক্ষণযুক্ত

যত নক্ষত্র আছে তার সবকটির দৃষ্টি আছে ওর উপর—আর ঐ নক্ষত্রগুলিরই সহায়তায় তারও ভাগ্যের উন্নতি ঘটবে—চাই কি সে হবে কাউন্টের স্ত্রী-কাউন্টেস।

বারট্রামের চলে যাওয়ার অল্পকাল পরেই আর এক ঘটনা ঘটল। একদিন কাউন্টেসের দেওয়ান তাঁর কাছে এসে খবর দিলেন যে তিনি হেলেনাকে নিজের মনে বলতে শুনেছেন সে বারট্রামকে ভালবাসে এবং বারট্রামের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশায় সে প্যারিসে যাবে বলে মনস্থ করেছে। কথাটা শুনে কাউন্টেস তাঁর দেওয়ানকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললেন—আপনি যান এবং হেলেনাকে গিয়ে বলুন সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে—আমার কিছু দরকারী কথা আছে। বারট্রামের প্রতি হেলেনার এই গোপণ প্রণয়ের কথা শোনামাত্র কাউন্টেসের মনে পড়ে গেল বহুকাল আগেকার অনেক কথা—তাঁর স্মৃতিতে তখন ভেসে উঠল যখন তিনি ছিলেন হেলেনারই মত এক কিশোরী—আর সেই কিশোরীর মনে সেদিনের এক যুবক কেমন দোলা দিয়েছিল এবং পরে সেই যুবকই হয়েছিলেন বারট্রামের বাবা—হ্যাঁ, আমার মনে পড়ে আমার সেই সেদিনের কথা—যৌবনের গোলাপ তো ভালবাসার কাঁটা নিয়েই ফোটে। আমরা যখন কিশোর কিশোরী তখন তো আমাদের প্রকৃতিরই এটা ধর্ম—এই ভুল করা, যদিও তখন ভুলকে আমরা ভুল বলে ভাবতে পারিনা। কাউন্টেসের মনে এমনি করে যখন তার কৈশোর স্মৃতি ও ভালবাসার ভুলভ্রান্তি উথাল পাথাল করছিল ঠিক সেই সময়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল হেলেনা। কাউন্টেস হেলেনাকে বললেন — হেলেনা তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি তোমার মায়ের মতো। হেলেনা বলল— আপনি আমার কর্ত্রী, সম্মানের পাত্রী। কাউন্টেস আবার বললেন —তুমি আমার মেয়ে—আমি বলছি, আমি তোমার মা-ই—কেন অকারণে তুমি আমার কথায় এমন করে চমকে উঠছ কেনই বা তোমার মুখে ভয়ের ছায়া পড়ছে? হেলেনার চোখে মুখে তখন নিদারুণ ভয়ের ছায়া, সে যেন কিছুই ভেবে উঠতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে হয়তো বা কাউন্টেস কোনভাবে অনুমান করতে পেরেছেন তার গোপণ প্রণয়ের কথা—হেলেনা তবুও আবার বলল—আমার অপরাধ মার্জনা করুন, ম্যাডাম, আপনি আমার মা নন, রউসিলনের কাউন্ট তো আমার ভাই হতে পারেন না, আর তাই আমিও আপনার মেয়ে হতে পারিনা। উত্তরে কাউন্টেস বললেন—কিন্তু হেলেনা, তুমি তো আমার কন্যা হতে পার পুত্রবধূ হয়ে। আর আমার তো মনে হয় তোমার তাই-ই ইচ্ছা—মা ও মেয়ে শব্দ দুটি বোধহয় সেইজন্যেই তোমার ভাল লাগছে না। হেলেনা, বলতো, তুমি কি আমার ছেলেকে ভালবাস? হেলেনা ভয় পেয়ে বলল—আমার অপরাধ মার্জনা করুন, আপনি আমার কর্ত্রী। কাউন্টেস কিন্তু আবারও প্রশ্ন করলেন হেলেনাকে—তুমি ভালবাস কি আমার ছেলেকে? হেলেনা উত্তরে বলল—আপনিও কি তাঁকে ভালবাসেন না? কাউন্টেস এর পর বললেন—দ্যাখ, এমনি করে এড়িয়ে গেলে চলবে না। ঠিক করে বল—খুলে

বল তোমার মনের প্রকৃত অবস্থাটা কী—কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার হাবভাবে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে তোমার ভালবাসা। একথার পর হেলেনা সম্পূর্ণ নতজানু হয়ে তার ভালবাসার কথা স্বীকার করল কাউন্টেসের কাছে। লজ্জা ও ভয়ে সে তখন সঙ্কুচিত। কাউন্টেসকে সে বলল—আমাকে মার্জনা করুন। আমি জানি আমার মত সামান্য মেয়ের পক্ষে এ কতবড় অপরাধ, কুলে, মানে আমি নিতান্তই অযোগ্য। তবে আমার এই মনের কথা আমি কোনদিনই আপনার পুত্রকে বুঝতে দিইনি—আমি সামান্য এক ভারতীয়ের মতো। সূর্য্যকে সে পূজা করে—সূর্য্যের আলোক তার উপর পড়ে সত্য। কিন্তু তাই বলে সূর্য তাকে কিছুমাত্রই চিনে রাখে না। একথা শোনার পর কাউন্টেস হেলেনার কাছে জানতে চাইলেন তার অভিপ্রায়ের কথা—সে প্যারিসে যাবে বলে মনস্থ করেছে কী না। হেলেনা তার অভিপ্রায়ের কথা স্বীকার করল এবং বলল লেফ্যু যখন রাজার দুরারোগ্য অসুখের কথা বলছিলেন তখনই সে ঐ সঙ্কল্প করেছে। কাউন্টেস বললেন—বটে? তাহলে প্যারিসে যাওয়ার ইচ্ছাটা রাজার চিকিৎসার উদ্দেশ্যেই—আর কিছু নয়—ঠিক বলছ? হেলেনা এবার আর নিজেকে গোপণ করতে পারল না। সে বলল, আজ্ঞে না, তা নয়। আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা হবে এই কথাটাই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। নচেৎ প্যারিস অথবা রাজা অথবা তাঁর জন্যে ওষুধ ওসব কোন কথাই আমার মাথায় আগে আসে নি। কাউন্টেস হেলেনার যাবতীয় স্বীকারোক্তির কথা মন দিয়ে শুনলেন। তাঁর নিজের মনোভাব একটুও কিন্তু প্রকাশ করলেন না—বুঝতে দিলেন না এই প্রেমে তাঁর সম্মতি আছে অথবা নেই। তবে খুব কঠোরভাবেই তিনি হেলেনার কাছে জানতে চাইলেন—তুমি কি সত্যিই বলতে চাও তোমার ঐ ওষুধের গুণে রাজামশাই ভাল হয়ে যাবেন? হেলেনার সম্মতিসূচক নীরবতা দেখে কাউন্টেস ভাবতে লাগলেন সত্যিই তো হেলেনার বাবা ছিলেন প্রকৃতই ধন্বন্তরি। তাঁর চিকিৎসার তুলনা নেই, আর তাছাড়া বেচারা নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুর সময় তাঁর একমাত্র মেয়েকে দিয়ে গিয়েছিলেন আমার হাতে তুলে, এবং আমিও তাঁকে সেদিন কথা দিয়েছিলাম তাঁর মেয়ের সব দায়িত্ব আমি নিলাম বলে। তাঁর আরও মনে হল হয়তো ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত বলে রাজার এমন একটা অসুখ করেছে এবং সেই রোগের চিকিৎসার জন্যে হেলেনা প্যারিসে যেতে চাইছে, ঈশ্বরের হয়তো এটাও অভিপ্রেত যে রাজার সম্পূর্ণ নিরাময়ের মধ্যে দিয়েই ভাগ্যের পরিবর্তন হবে জেরারড ডি নরবোনের মেয়ে হেলেনার। অতএব আর দ্বিধা নয়। কাউন্টেস তাঁর পূর্ণ সম্মতি জানালেন হেলেনাকে—বললেন, তুমি প্যারিসে চলে যাও, তোমার যাওয়ার জন্যে লোকজন, টাকাকড়ি যা কিছু প্রয়োজন সে সবই আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। অতএব হেলেনা যাত্রা করল প্যারিসের পথে—কাউন্টেসের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা তার মনে নতুন আশার সঞ্চার করল।

প্যারিসে পৌঁছে রাজদরবারে প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হেলেনাকে তেমন অসুবিধায় পড়তে হল না। প্রধান সভাসদ লেফ্যুর সঙ্গে তো তার পূর্বেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তিনিই তাকে পৌঁছে দিলেন রাজার কাছে। কিন্তু রাজামশাইকে সম্মত করানো বড় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল—হেলেনার মত এমন কমবয়স্কা একটি মেয়ে, তা সে যতই সুন্দরী হোক না কেন, রাজাকে চিকিৎসা করবে এ কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? রাজামশাই কিছুতেই রাজী হতে চান না। হেলেনা তাঁকে অনেক করে বুঝিয়ে বলল সে যত সামান্যই হোক তার বাবা ছিলেন জেরার্ড ডি নরবোন। নরবোনের চিকিৎসার খ্যাতি সম্পর্কে রাজামশাই সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন তার ওষুধের গুণাগুণের কথা। হেলেনা তাঁকে বলল তার কাছে তার বাবার সেই ওষুধের ব্যবস্থাই আছে, সে যত্নসহকারে তার বাবার দীর্ঘকালের সাধনার বস্তুটি রক্ষা করে চলেছে। সে আরও জোর করে বলল তার দেওয়া ওষুধে রাজামশাইয়ের রোগ প্রতিকারের বিনিময়ে সে নিজের জীবন পন করতে প্রস্তুত—এবং এই জন্যে সে সময় চায় মাত্র দুটি দিন। সে প্রতিজ্ঞা করে বলছে ঠিক দুদিনেই রাজামশাই সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবেন। অনেক দ্বিধার পর রাজামশাই অগত্যা হেলেনার চিকিৎসায় সম্মতি জানালেন—হেলেনার হাতে মাত্র দুটি দিন সময়—জীবন অথবা মৃত্যু। সে চিকিৎসা শুরু করল। হেলেনা তার এই চিকিৎসার দর্শনী হিসাবে একটি শর্ত করে নিয়েছিল। সে বলেছিল রাজামশাই যদি সুস্থ হয়ে ওঠেন তবে যেন রাজার নির্দেশে সে তার স্বনির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করার অনুমতি পায়। আনন্দের সঙ্গেই রাজামশাই তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, তবে একটি শর্তে, হেলেনা যে পাত্রকে ইচ্ছা নির্বাচন করতে পারে—শুধুমাত্র রাজকুমারদের কাউকে সে নির্বাচন করতে পারবে না।

যে ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে হেলেনা এই দুঃসাধ্য পথে ভাগ্যের সঙ্গেই লড়াইতে নেমেছিল, মনের যে গভীর নিষ্ঠা নিয়ে সে তার বাবার চিকিৎসাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল, অবশেষে তা সার্থক হল—দুদিনের চিকিৎসা শেষ হওয়ার আগেই রাজামশাই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। এবার হেলেনার প্রার্থিত পুরস্কার পাওয়ার পালা। রাজামশাই অবিলম্বে তার রাজসভার যাবতীয় অভিজাত যুবাপুরুষদের একসাথে মিলিত হয়ে বসার জন্যে আহবান জানালেন—সুরূপা চিকিৎসকের স্বম্বর সভার মত। হেলেনাকে এবার নির্দেশ দিলেন তার পছন্দমত স্বামী বাছাই করে নিতে, এই সমবেত পাত্রদের মধ্যে। ঠিক পাত্রটির দিকে চোখ পড়তে হেলেনার বেশি দেরী হল না—সমবেত এই বহু পাত্র সমাগমের মধ্যে সে তার সেই এক-কেই বরমাল্য পরিয়ে দিল—তার নির্বাচিত পাত্র হল কাউন্ট বারট্রাম। সে বারট্রামের মুখে চোখ রেখে বলল—আপনিই আমার স্বামী। আমার বুকে এত সাহস নেই যে আমি আপনাকে শুধু বর বলে বেছে নিলাম—আমি আমার নিজেকে সমর্পণ

করলাম আপনার সেবায়—এবং যতদিন জীবন থাকবে ততদিন আপনার আনুগত্যই হবে আমার একমাত্র লক্ষ্য। একথা শুনে রাজা বললেন—এত কথার কী আছে—বারট্রাম তুমি ওকে গ্রহণ কর—ও তোমার স্ত্রী। বারট্রাম সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে উঠল—না, সে হতে পারে না। আমার পক্ষে সম্ভব নয় ওকে স্ত্রী হিসাবে মেনে নেওয়া, ও তো অতি দরিদ্র এক চিকিৎসকের মেয়ে, ওর বাবা ছিলেন আমাদেরই অন্নজীবী এবং ওর বাবার মৃত্যুর পর ও এখন আমার মাকে দেখাশোনা করে, তার দয়াতেই বেঁচে আছে। হেলেনা মুখ বুঁজে শুনল বারট্রামের এই প্রত্যাখ্যানের কথা এবং তার প্রতি তার তাচ্ছিল্যের উক্তি। সে রাজামশাইকে বলল—আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, প্রভু, এটুকুই আমার পুরস্কার—এতেই আমি খুশি। আর কিছু প্রত্যাশা আমার নেই। কিন্তু রাজার আদেশ অমান্য করে এমন সাধ্য কার! বিশেষত, তখনকার কালে ফ্রান্সের রীতি অনুসারে রাজা নিজেই তার সভাসদদের বিবাহের পাত্রী নির্বাচন করে দিতেন—রাজার বিশেষ অধিকারগুলির এ অন্যতম। কাজেই বারট্রাম কোন ছার। সেই দিনেই বারট্রামকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হল হেলেনাকে। নিতান্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক এই দারপরিগ্রহে কি পেল হেলেনা? এক মহামূল্য স্বামীকে সে লাভ করেছে এবং তাকেই পাওয়ার জন্যে সে করেছিল তার জীবনপণ—পরিবর্তে সে পেল এমনি এক মহার্ঘ বস্তু যা তার কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক—রাজশক্তি তাকে স্বামী দিতে পারে—স্বামীর ভালবাসা দিতে পারে না।

বিবাহের অব্যবহিত পরেই বারট্রাম হেলেনাকে আদেশ করল—যাও রাজামশাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি সংগ্রহ করে নিয়ে এস যেন কিছুকালের জন্যে তিনি আমাকে রাজদরবারে অনুপস্থিত থাকার ছুটি মঞ্জুর করেন। বারট্রামের আদেশ পালন করল হেলেনা। বারট্রামের ছুটি মঞ্জুর হল। সে তখন হেলেনাকে বলল—দ্যাখ তোমাকে এমন খামকা বিয়ে করার জন্যে আমি একেবারেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। ফলে এই বিবাহে আমি মানসিক ভারসাম্য হারাতে বসেছি, অতএব আমি এখন কী করব অথবা কোথায় যাব সে সব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাতে যেও না। হেলেনা শুনল বারট্রামের এই কঠোর নির্দেশ। সে মাথা ঘামাতে যদিও না চায়, তবু তার দুঃখ তো কেউ নিতে পারে না—সে বুঝেছে তার স্বামী তাকে ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে চলল। বারট্রাম হেলেনাকে নির্দেশ দিল বাড়িতে ফিরে গিয়ে তার মাকে দেখাশোনা করতে। দয়ামায়াহীন এই নির্দেশ — হেলেনা শুধু বলল—আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম। আমি চিরদিনের মতই আপনাদের দাসী হয়ে জীবন কাটাব—আমার মত দীন দরিদ্রের ভাগ্য নিয়ে আমি কখনই আপনাদের মত ভাগ্যবানদের সমান হতে চাইব না—আমার ভাগ্যে এত সুখ সইবে কেন? হেলেনার এই কাতরোক্তি কিন্তু কঠিন হৃদয় বারট্রামকে বিন্দুমাত্র বিচলিত

করতে পারল না—সে তার স্বভাবজাত ঔদ্ধত্য নিয়ে ত্যাগ করে গেল হেলেনাকে—বিদায় গ্রহণের সামান্য সৌজন্যটুকুও দেখানোর কোন প্রয়োজন বোধ করল না।

হেলেনা ফিরে এল—এখন সে এক হতভাগ্য স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রী। যখন সে প্যারিসে যাত্রা করেছিল তখন কত আশা তার বুকে, সে ভেবেছিল তার চিকিৎসাগুণে সে নির্ঘাৎ রাজাকে রোগমুক্ত করবে আর তারই বিনিময়ে সে লাভ করবে তার জীবনসর্বস্ব ধন বারট্রামকে। কিন্তু আজ আর তার কোন আশাই অবশিষ্ট নেই। এই বিমর্ষ ফিরে আসা জীবনে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল তার মহীয়সী শ্বশ্রুমাতা—তার স্বামী বারট্রামের জননী। তাঁর কাছে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই হেলেনার হাতে পৌঁছল বারট্রামের একখানি পত্র—তার সমস্ত আশা নির্মূল হওয়ার পরও এই চিঠি নতুন করে আর এক আঘাত হানল তার বুকে।

কাউন্টেস কিন্তু হেলেনাকে গ্রহণ করলেন যথাযথ মর্যাদায়। সে তাঁর একমাত্র পুত্রের স্ত্রী-এবং যেন এই মেয়েটিকে তাঁর ছেলে স্বেচ্ছায়ই বিয়ে করেছে, অর্থাৎ বারট্রামের স্বীয় স্ত্রীর প্রতি যে দুর্ব্যবহার সেটুকু ভুলিয়ে দিতে চাইলেন কাউন্টেস তাঁর মধুর ব্যবহারে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন কত বড় অন্যায় করেছে বারট্রাম তার বিয়ের দিনেই এমন করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে। কিন্তু এই মহীয়সী নারীর সর্বক্ষণের আদরেও হেলেনার দুঃখ দূর হওয়ার নয়। সে কাউন্টেসকে বলল—ম্যাডাম, আমার প্রভু চলে গেছে—চিরকালের জন্যে চলে গেছে—আর ফিরবে না। এর পর সে বারট্রামের চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগল। তাতে লেখা আছে—যেদিন তুমি আমার হাতের আঙটিটি লাভ করবে সেদিন থেকেই আমাকে তুমি স্বামী বলে ডাকতে পার। তবে সেই দিনটি কোককালেই আসবে না। আমি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলাম তেমন একটি 'সেইদিন' আসবেনা 'কোনোদিনই'। হেলেনা বলে উঠল—হায়, এ তো এক সর্বনাশের উক্তি! কাউন্টেস সান্ত্বনা দিয়ে হেলেনাকে বললেন—বাছা, এখুনি অধৈর্য্য হয়োনা। বারট্রাম চলে গেছে, আমি তো রয়েছি। আজ থেকে আমাকেই তুমি তোমার মা বলে ভাবতে শেখো। তোমার মত মেয়ের মর্যাদা কেমন করে বুঝবে বারট্রামের মত কাণ্ডজ্ঞানহীন সামান্য বালক—অমন বিশটা বারট্রামকে শয়েস্তা করতে পারে এমন যোগ্য বরের তুমি যোগ্য পাত্রী। কাউন্টেসের আদর যত্ন ও সান্ত্বনা দানের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও হেলেনা তার হৃদয়ের গভীর দুঃখ নীরবেই বয়ে বেড়াতে লাগল। সে বড় একা—বড় অসহায়।

হেলেনার চোখ দুটি একই ভাবে স্থির হয়ে ছিল তার স্বামীর লেখা চিঠিখানির উপর। ঐ ভাবেই সে নিদারুণ যন্ত্রনায় কান্নার সুরে পড়তে লাগল—যতদিন না আমার স্ত্রীকে আমি পাই ততদিন পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। কাউন্টেস জিজ্ঞাসা করলেন—ঐ কথাগুলিও চিঠিতে লেখা আছে নাকি? হেলেনা

বলল—হ্যাঁ। আর কোন কথাই তার মুখ থেকে বেরুল না।

পরদিন সকালে দেখা গেল হেলেনা বাড়ি ঘর ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছে। সে কখন গিয়েছে কেউ জানে না। শুধুমাত্র কাউন্টেসের কাছে লেখা একখানি চিঠিতে সে তার আকস্মিক গৃহত্যাগের কারণ জানিয়েছে। সে লিখেছে তারই অপরাধে আজ বারট্রাম দেশত্যাগী, সে জন্যে এখন সে অনুতাপে দগ্ধ—তাই তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্যের জন্য সে চলেছে তীর্থযাত্রায়—সেন্ট জেকস্ লে গ্রাণ্ডে। আর তার এই প্রায়শ্চিত্য করতে যাওয়ার সংবাদ যেন কাউন্টেস অনুগ্রহ করে বারট্রামকে জানিয়ে দেন—এবং জানিয়ে দেন যে তার ঘৃণিত স্ত্রী আর কোনদিনই তাকে বিরক্ত করতে ফিরে আসবে না।

বারট্রাম এই সময়ে ছিল ফ্লোরেন্সে। প্যারিস থেকে চলে এসে সে যোগ দেয় ফ্লোরেন্সের ডিউকের সেনাদলে। সেখানে যুদ্ধের সময় স্বীয় বীরত্ব ও কৃতিত্বের ফলে সে ডিউকের কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করে। এমন সময়ে সে তার মার চিঠিতে সংবাদ পেল যে হেলেনা চিরদিনের জন্যে দেশত্যাগ করে চলে গিয়েছে। সে আর এখন তার পথের বাধা নয়। অতএব দেশে ফেরার জন্যে বারট্রাম প্রস্তুত হল। আর ইত্যবসরে হেলেনাও এসে উপস্থিত হল ফ্লোরেন্সে, তীর্থযাত্রীর বাহুল্য বর্জিত সাদা পোশাকে।

সেন্ট জেকস্ লে গ্রাণ্ড তীর্থে যেতে হলে পথে পড়ে ফ্লোরেন্স নগরী। সেই পথ অতিক্রম করেই যেতে হয় তীর্থযাত্রীদের। হেলেনা যখন ফ্লোরেন্সে এসে পৌঁছল তখন সে জানল যে ঐ শহরে একজন বিধবা আছেন অতিথিসৎকারই যার ব্রতের মত। যে তীর্থযাত্রীরা ঐ শহরের পথে যায় তাদের মধ্যে যত নারী যাত্রী তাদের সকলকেই তিনি আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করে দেন। হেলেনার কাছে এ এক সুবর্ণ সুযোগ। সে সরাসরি সেই বিধবাটির কাছেই উপস্থিত হল, এবং তিনি অতি যত্নসহকারে তাকে আপ্যায়িত করলেন। শুধু তাই নয় মহিলাটি হেলেনাকে সঙ্গে নিয়ে ফ্লোরেন্স শহরের যা কিছু দর্শনীয় তার সবই ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি হেলেনাকে বললেন সে যদি ডিউকের সৈন্যদল দেখতে চায় তবে তিনি তাকে এমন স্থানে নিয়ে যেতে পারেন যেখান থেকে সবকিছু খুব ভাল করে দেখা যায়। এই কথা বলতে বলতে মহিলাটি আরো বললেন—তুমি ওখানে গেলে তোমার নিজের দেশের একজনকেও দেখতে পাবে। তার পরিচয় রাউসিলনের সে কাউন্ট। এখানে আসার পর যুদ্ধে যোগ দিয়ে বীরত্বের ফলে সে মস্ত সম্মান লাভ করেছে। হেলেনাকে আর দ্বিতীয়বার বলতে হল না—বারট্রামকে দেখার এই সুযোগ সে হাতছাড়া করতে রাজী নয়। অতএব সেই মহিলার সঙ্গে সে এগিয়ে যেতে লাগল—বুকে এক অনির্বচনীয় বিষাদের বোঝা নিয়ে সে চলেছে তার একান্ত প্রিয়জনকে আরও একবার দেখার আনন্দে।

দেখা শেষ হলে ফেরার পথে বিধবা মহিলাটি হেলেনাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখলে? লোকটাকে দেখতে ভারী সুন্দর, তাই না? উত্তরে হেলেনা যে কথাটি বলল তা তার প্রকৃতই মনের কথা। সে বলল—ওকে আমার খুবই ভাল লাগে। এর পর সারাটা পথ বারট্রামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মহিলাটি হেলেনার কান ঝালাপালা করে দিলেন তার রূপ ও গুণের বর্ণনায়। এ ছাড়াও তিনি বললেন বারট্রামের অতীত জীবনের ইতিহাস, অর্থাৎ, সে একটি মেয়েকে অনিচ্ছায় বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল এবং তাকে নিয়ে ঘর করবে না বলেই সে দেশ ছেড়ে চলে এসে ডিউকের সেনাদলে যোগ দিয়েছিল ইত্যাদি। নিজের জীবনের এই দুর্ভাগ্যের ইতিকথা এতক্ষণ নিতান্তই মুখ বুঁজে শুনে চলেছিল হেলেনা, কিন্তু এর পর কাহিনীর যে উপসংহারটুকু তার কানে এল তা তার পক্ষে নিদারুণ মর্মান্তিক। মহিলাটি বললেন বারট্রামের সঙ্গে তাঁর মেয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা—সে ভালবাসে তার মেয়েকে।

একথা ঠিকই যে এক অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতে বারট্রাম বাধ্য হয়েছিল হেলেনাকে বিয়ে করতে এবং হেলেনার জন্যে তার ভালবাসা না-ও থাকতে পারে। কিন্তু ভালবাসার মত মন একেবারে বারট্রামের ছিল না তা নয়। ফ্লোরেন্সে এসে সে যখন সেনাদলে যোগ দিল এবং স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করতে শুরু করল তখনই তার চোখে পড়ে ডায়েনা বলে একটি মেয়ে। ডায়েনাই ছিল আমাদের পূর্ব বর্ণিত বিধবা মহিলাটির কন্যা। সে সুন্দরী ও তার মন পাওয়ার জন্যে নানা প্রেমসংগীত রচনা করে বারট্রাম গীতবাদ্য সহকারে প্রতি নিশিতে অভিসার করত তার বাতায়ন তলে। সেই সব সংগীতের মধ্যেই থাকত ডায়েনার রূপ ও গুণের বন্দনা এবং চারিধারে সকলে যখন নিদ্রায় মগ্ন তখন চুপিচুপি বারট্রামের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে ডায়েনার প্রতি আবেদন নিবেদন। ডায়েনা কিন্তু বারট্রামের শত অনুরোধেও তার মনস্কামনা পূর্ণ করতে সম্মতি দেয়নি, কেননা সে জানত বারট্রাম বিবাহিত। ডায়েনা বড় হয়ে উঠেছিল এক অতি নিষ্ঠাবান পরিবেশে, তার মায়ের সৎ পরামর্শই ছিল তার জীবনের আদর্শ। উপরন্তু, যদিও আজ ভাগ্যের পরিহাসে সে ও তার মা দরিদ্র ও হৃতগৌরব, একদিন তারা বংশগৌরবে ছিল ফ্লোরেন্সের অন্যতম অভিজাত পরিবার—ক্যাপুলেট বংশের তারা উত্তরাধিকারী।

বিধবা মহিলাটি হেলেনাকে বললেন—দ্যাখো, আমার মেয়েকে ভোলানো অত সহজ নয়। তাকে আমি যে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছি তার ফলে সে বুঝতে শিখেছে তার ভাল মন্দ। তবে বারট্রামও দেখছি নেহাৎই নাছোড়বান্দা। সে ডায়েনার কাছে কাকুতি মিনতি করছে অন্তত আজ রাতে একটিবার যেন ডায়েনা তাকে দেখা করার সম্মতি জানায়, কেননা, আগামী কালই খুব ভোরে সে চলে যাচ্ছে ফ্লোরেন্স ত্যাগ করে।

বারট্রামের এই পরনারীর জন্য আকুলতা হেলেনাকে সাময়িকভাবে বেদনায় বিহ্বল

করে দিয়েছিল সন্দেহ নেই, তবু এই দুঃখের ভিতরও তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাকে এক নতুন আশার আলো দেখাল—সে ভাবল হয়তো এক অভূতপূর্ব কৌশলের সাহায্যে সে ফিরে পেতে পারে তার পথভ্রষ্ট স্বামীকে। যদিও সে আগে একবার ব্যর্থ হয়েছে, বারট্রামকে জয় করেও সে আবার তাকে হারিয়েছে, তবু নতুন আশায় বুক বেঁধে সে আবারও তাকে জয় করতে উৎসাহী হল। হেলেনা এবার সবকিছুই খুলে বলল তার আশ্রয়দাতা বিধবা মহিলাটির কাছে। সে আত্মপ্রকাশ করে বলল সে-ই হেলেনা, এবং বারট্রামের পরিত্যক্তা স্ত্রী সে-ই। বিধবা মহিলাকে সে অনুরোধ করল যেন তার মত একটি হতভাগ্য মেয়ের উপকার হবে এই কথা ভেবে তিনি আজ রাতে বারট্রামের অভিপ্রেত গোপন মিলনে সম্মতি দেন, এবং ডায়েনার পরিবর্তে সে-ই বারট্রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এবং ডায়েনার ছদ্মবেশে। হেলেনা বলল তার এই মিলনের উদ্দেশ্য বারট্রামের হাত থেকে তার অঙ্গুরীয়টি নিয়ে নেওয়া. কেননা, বারট্রাম তাকে জানিয়েছিল যদি কোনদিন ঐ আংটিটি সে পায় তবেই বারট্রাম তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবে।

ডায়েনা ও তার মা সম্মতি জানাল হেলেনার প্রস্তাবে। তারা প্রতিশ্রুতি দিল তাদের সাধ্যমত তারা তাকে সহায়তা করবে। তাদের সম্মতির কারণ, প্রথমত, তারা হেলেনার দুঃখের কথা শুনে তার প্রতি সমবেদনা বোধ করেছিল। দ্বিতীয়ত, তারা হেলেনার কাছে কিছু অর্থলাভেরও আশা পেয়েছিল—বস্তুত হেলেনা কিছু টাকা তাদের হাতে অগ্রিম হিসাবে দিয়েও ছিল। এবার হেলেনা এক কৌশল অবলম্বন করল। সে অবিলম্বে লোক মারফৎ বারট্রামের কাছে একটি সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা করে জানিয়ে দিল হেলেনা মারা গিয়েছে। তার এই সংবাদ পাঠাবার উদ্দেশ্য এই সংবাদ পাওয়ার ফলে বারট্রাম মানসিকভাবে ভারমুক্ত বোধ করবে এবং তখন আর তার পক্ষে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে দ্বিধা থাকবে না। সেই সুযোগে ডায়েনাবেশী হেলেনা বারট্রামের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এবং আংটি-এই দুইই আদায় করে নেবে। এই ভাবেই হেলেনা তার ভবিষ্যতের পথ পরিস্কার করতে চাইল।

সন্ধ্যা হল। ধীরে ধীরে চারিদিকে বেশ অন্ধকার নেমে এল। বারট্রাম নিঃশব্দে এসে প্রবেশ করল ডায়েনার ঘরে এবং সেখানে ছদ্মবেশী হেলেনা তাকে আদর করে নিজের পাশে বসতে দিল। নানা ছলে নানা কথায় বারট্রাম শুরু করল তার প্রেম নিবেদন—তার সেই সুমধুর কথাগুলি যেন বাঁশীর সুরের মত আচ্ছন্ন করছিল হেলেনাকে, যদিও সে জানতো যে কথাগুলি সবই ডায়েনার উদ্দেশ্যে বলা। এদিকে বারট্রামও যেন তার অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করেছে এবং সেই আনন্দে সে ডায়েনারূপী হেলেনাকে বলল সে তাকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে চায়। তার ভালবাসায় সে তাকে চিরকালের জন্যে বাঁধতে চায়। হেলেনা ভাবল এই প্রতিশ্রুতিই ভবিষ্যতে কাজে লাগবে প্রকৃত স্ত্রীকে ভালবাসায়—যদিও ভবিষ্যতে বারট্রাম জানবে যাকে সে সেদিন

কথা দিয়েছিল সে ডায়েনা নয়, সে হেলেনাই তখন তবু আজকের এই মধুস্মৃতি সে ভুলতে পারবে না। তাই তখন তার ভুল ভাঙ্গবে।

হেলেনাকে যথার্থ জানার অবকাশ কোনদিনই হয়নি বারট্রামের। সে কত বুদ্ধিমতী মেয়ে তার কিছুই সে জানত না, জানলে হয়তো এমনভাবে সে তাকে এতকাল অবহেলা করত না। বারট্রামের এই অজ্ঞতার কারণ হেলেনার সঙ্গে তার প্রতিদিনের ঘরোয়া পরিচয়—এই প্রতিদিনের দেখার ফলে এক অতি-সুন্দর মুখেরও প্রথম সাক্ষাতের বিস্ময় হারিয়ে যায়, অথবা অতি সহজ সৌন্দর্য্যটুকুও ধরা পড়ে না। আর তাছাড়া হেলেনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় তার কাছে ধরা পড়ার কথা নয়, কেননা হেলেনা তো সর্বদাই এক অতি নগন্য দাসীর মত এতদিন তাকে শুধু সেবাই করতে প্রয়াসী হয়েছে—সে কখনই মুখ তুলে কথা বলেনি—নীরবেই নিজের কর্তব্য পালন করেছে। কিন্তু আজ তো আর চুপ করে থাকার দিন নয়। আজ রাতের কয়েকটি মুহূর্তের ছলা কলার উপর নির্ভর করছে হেলেনার সারাজীবনের সুখ দুঃখ। আজ যদি বারট্রামের কাছে সে তার প্রিয়তমা রূপে যোগ্য হওয়ার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারে তবে তার ভাগ্য কোনকালেই আর মুখ তুলে চাইবে না। অতএব হেলেনা কথার মাধুর্যে ও বুদ্ধির দীপ্তিতে, সাবলীল গতিবিধি ও সরল প্রকাশভঙ্গীতে সেই রাত্রির অল্প সময়ের অবকাশেই বারট্রামের সমস্ত চিত্ত জয় করে নিল। বারট্রাম প্রতিশ্রুতি দিল তাকে সে বিয়ে করবে। এই সময় হেলেনা সুকৌশলে বারট্রামের কাছে তার আংটিটি কামনা করল ভালবাসা ও শ্রদ্ধার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এবং বারট্রাম প্রসন্নমনেই সেটি দিয়ে দিল হেলেনাকে। আর ঐ আংটিটি পাওয়ার পর প্রতিদানে হেলেনাও তাকে একটি আংটি উপহার দিল এবং সেই আংটিটি আর কিছুই নয়—সেটি সে লাভ করেছিল রাজামশাই-এর কাছে পুরস্কার রূপে তার রোগ নিরাময়ের বিনিময়ে। এই অঙ্গুরী বিনিময় শেষ হতে হতে রাতও প্রায় শেষ হয় হয়—দিনের আলোয় নিজেকে প্রকাশের ভয় ছিল হেলেনার—তাই অন্ধকার থাকতেই সে বারট্রামকে বলল চলে যেতে। বারট্রাম যাওয়ার পর আর বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করে হেলেনাও বেরিয়ে পড়ল ফ্রান্সের পথে—তার শ্বশ্রুমাতার গৃহের উদ্দেশে।

হেলেনা তার সাহায্যকারী বিধবা মহিলা ও তার মেয়ে ডায়েনাকে সম্মত করাল তার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে, কেননা তার কৌশলটির সার্থক রূপায়ণের জন্যে ঐ দুইজনকে তার দরকার হবে। তারা ফ্রান্সে পৌঁছে শুনল রাজামশাই রউসিলনের কাউন্টেসের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সেই দিকেই যাত্রা করেছেন। অতএব আর অপেক্ষা নয়, যত দ্রুত সম্ভব রাজামশাইয়ের পিছু নিয়ে হেলেনা ঐ দুই মহিলাকে সঙ্গে করে ছুটল রউসিলনের দিকে।

রাজামশাই-এর স্বাস্থ্যের এখন যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তাঁর আর পূর্বতন রোগের কোন উপসর্গই এখন নেই। যার চিকিৎসার ফলে তাঁর এই রোগের উপশম তার

প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ এখনও তাঁর মনে স্পষ্ট জাগরুক এবং সেই জন্যই কাউন্টেসের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই তিনি হেলেনার প্রসঙ্গ তুলে বললেন—এমন একটি অমূল্য রত্নকে বারট্রাম হারাল শুধু তার নিজের বোকামির ফলে। রাজামশাইয়ের কথার উত্তরে কাউন্টেস বললেন—কিন্তু আজ আর সেকথায় লাভ কি? হেলেনা তো আর বেঁচে নেই, আমরা তাকে চিরকালের জন্যেই হারিয়েছি। রাজামশাই একথা শোনা মাত্র বুঝতে পারলেন কাউন্টেস তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ এই দুজনকেই হারিয়ে বড় শোকবিহ্বল। তাই তিনি অনুতাপের সুরে বললেন—যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই—আমি বারট্রামের সব অপরাধ মার্জনা করেছি। এই কথোপকথনের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন লেফ্যু, যিনি প্রথম এসেছিলেন ও হেলেনাকে আবিষ্কার করেছিলেন। হেলেনার দুঃখের কথা ভেবে তাঁর বড় কষ্ট হল। তাই তাঁর মোটেই ভাল লাগল না যে হেলেনার স্মৃতি এত সহজে সবাই বেমালুম মুছে ফেলুক। তিনি জোর করে বললেন—আমি কিছুতেই একথা ভুলতে পারছি না যে অর্বাচীন এই লর্ড—কাউন্ট বারট্রাম অপরাধ করেছে রাজার প্রতি, অন্যায় করেছে তার নিজের মায়ের প্রতি এবং অবিচার করেছে তার স্ত্রীর প্রতি—আর, সবচেয়ে বেশি অবিচার সে করেছে তার নিজের উপর, কেননা যে স্ত্রীকে সে অবহেলায় হারিয়েছে তার রূপ একদিন প্রতিটি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তার যাবতীয় গুণের ফলে সে জয় করেছিল সবারই অন্তর। রাজামশাই বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ লেফ্যু—যে ধন আমরা হারাই তার স্মৃতিচারণ করতে ভালই লাগে। সে যা হোক, ডাক দেখি ওকে. অর্থাৎ, বারট্রাম ইত্যবসরে দেশে ফিরে এসেছে এবং হাজির হয়েছে রাজার সামনে। রাজামশাই দেখলেন হেলেনার প্রতি দুর্ব্যবহার করার জন্য বারট্রাম এখন অনুতপ্ত, তাই তিনি তার মা ও মৃত পিতার কথা স্মরণ করে তার অপরাধ মার্জনা করলেন এবং নিজের রাজদরবারে পুনরায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই বারট্রামের প্রতি রাজামশাই-এর প্রসন্ন দৃষ্টি অকস্মাৎ রোষনেত্রে পরিবর্তিত হল—বারট্রামের হাতের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে পড়ল সে যে আংটিটি পরে আছে সেটি হেলেনাকে দেওয়া তাঁরই সেই আংটিটি। তাঁর মনে পড়ল হেলেনা ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আংটিটি সে কখনও কাউকে দেবেনা এবং যদি কখনও এমন কোনো দৈব দুর্বিপাক ঘটে সে আর ওটি রক্ষা করতে পারছে না তাহলে আংটিটি সে পুনরায় রাজামশাইকেই ফিরিয়ে দেবে। বারট্রামকে রাজামশাই প্রশ্ন করলেন কোথায় সে ঐ আংটিটি পেল। উত্তরে বারট্রাম বলল যে একটি মেয়ে ঐ আংটিটি জানালা দিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে—হেলেনার সঙ্গে কোনো যোগাযোগের কথা সে উল্লেখমাত্রও করল না। এই ভূতুড়ে গল্পে রাজামশাই বিরক্ত হলেন—তাঁর মনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হল—তিনি জানতেন বারট্রাম হেলেনাকে কী পরিমাণ অপছন্দ

করে—তবে কি বারট্রাম হেলেনাকে হত্যা করল ? রাজা তাঁর প্রহরীদের আদেশ দিলেন—বন্দী কর ঐ বারট্রামকে, আমার মনে বড় ভয়ঙ্কর এক আশঙ্কা দেখা দিয়েছে হেলেনার বিষয়ে। তাকে চক্রান্ত করে মেরে ফেলা হয়েছে। ঠিক এমনি সময়ে সেখানে হাজির হল ডায়েনা ও তার মা। তারা এসে রাজামশাই-এর কাছে এক বিনীত আবেদন পেশ করল। আবেদনে তারা বলল রাজামশাই যেন বারট্রামকে বাধ্য করেন ডায়েনাকে বিয়ে করতে। কেননা, সে ডায়েনাকে বিয়ে করবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ। রাজমশাই-এর কাছে শাস্তি পাওয়ার ভয়ে বারট্রাম সমস্ত ব্যাপারটা বেমালুম অস্বীকার করল। ডায়েনা তখন তার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে তাকে দেওয়া বারট্রামের আংটিটি দেখাল। (বলাই বাহুল্য যে ঐ আংটিটি তাকে হেলেনাই দিয়েছিল) এবং বলল যে বারট্রামের হাতে যে আংটিটি সে পরে রয়েছে সেটি তারই দেওয়া, কেননা ঐ ভাবেই তাদের অঙ্গুরী বিনিময় হয়েছিল বিবাহের অঙ্গীকার হিসাবে রাজামশাই দেখলেন ডায়েনা যা বলছে তার সঙ্গে বারট্রামের কথার কোনো সঙ্গতি নেই, ফলে তার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন ডায়েনাকেও যেন বারট্রামের সঙ্গে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দুজনকেই তাদের অপরাধের জন্য একই সাথে হত্যা করা হয়। ডায়েনা তখন রাজামশাই-এর কাছে অনুনয় করে বলল যেন তিনি তার মাকে একবার অনুমতি দেন—সে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসবে সেই জহুরীকে যে ঐ আংটি তাকে বিক্রী করেছে। রাজমশাই ডায়েনার মাকে যেতে অনুমতি দিলেন। সে ফিরে এল অল্পসময়ের মধ্যেই জহুরীকে সঙ্গে নিয়ে— এ জহুরী আর কেউ নয়—সে হেলেনা।

কাউন্টেস এতক্ষণ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—নীরব বিষাদে নিজের পুত্রের হত্যাদণ্ডের জন্যে নিজের মনকে প্রস্তুত করছিলেন—তাঁরও মনে সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল যে বারট্রামই হয়তো হেলেনাকে হত্যা করেছে। হেলেনাকে উপস্থিত হতে দেখে তিনি নিজেই যেন নতুন করে বেঁচে উঠলেন, হেলেনাকে তাঁর চেয়ে ভাল আর কেউ বাসতনা। আর, রাজামশাইও তাঁর প্রিয় চিকিৎসককে জীবিত দেখে যার-পর নেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—আরে এই তো দেখছি আমাদের বারট্রামের স্ত্রী। হেলেনা জানতো সে স্ত্রী বটে তবে এখনো পর্যন্ত সে স্ত্রীর মর্যাদা বা স্বীকৃতি লাভ করেনি। তাই সে রাজামশাইকে বলল—হ্যাঁ প্রভু, আমি তাঁর স্ত্রীর ছায়ামাত্র, নামে স্ত্রী, কিন্তু প্রকৃতঅর্থে স্ত্রী নই। বারট্রাম একথা শুনে অভিভূত হয়ে বলল—না, না, তুমিই আমার স্ত্রী। শুধু পরিচয়ের দিক দিয়েই নয়, প্রকৃতই তুমি স্ত্রী। আমাকে তুমি মার্জনা কর। হেলেনা তখন বারট্রামকে বলল—হায়, যখন আমি ডায়েনা সেজে তোমার সঙ্গে দেখা করি তখন দেখেছি তুমি কত সংবেদনশীল, দয়ালু। দ্যাখ, তোমার লেখা চিঠি—তুমি লিখেছিলে—আমার আঙ্গুলের এই আংটি যদি নিতে পারো.....হ্যাঁ, আমিই তোমার আংটি জয় করে

নিয়েছি, আমাকেই তুমি দিয়েছিলে আংটিটি। তাই আজ থেকে তুমি তো আমারই, কেননা, আমিই দুইবার তোমাকে জয় করেছি। বারট্রাম বলল—যদি তুমি প্রমাণ করতে পার যে সেই রাত্রে আমি যার সঙ্গে কথা বলেছি সে তুমিই তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে আমার সব ভালবাসা উজাড় করে দেব। এই জটিল ব্যাপারটি প্রমাণ করতে সামান্যই কষ্ট হল, কেননা ডায়েনা ও তার মা তো হেলেনার সঙ্গেই এসেছিল ফ্লোরেন্স থেকে। ডায়েনার এই সততা ও হেলেনার প্রতি প্রকৃত বন্ধুর মত আচরণের জন্যে রাজামশাই এতই খুশি হলেন যে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন ডায়েনাকেও তিনি একটি সুন্দর বরের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। রাজার যে অধিকারের বলে তিনি একদিন তার ভাল কাজের বিনিময়ে হেলেনাকে তার স্বামী নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছিলেন এক্ষেত্রেও সেই একই কারণে এবং একই ক্ষমতার বলে তিনি ডায়েনার পাত্র নির্বাচনে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

হেলেনার আর কোন সন্দেহই রইলনা যে তার বাবার ঔষধ দৈব আশীর্বাদপূত—তারই প্রভাবে আজ সে বারট্রামের প্রিয় সহধর্মিনী, তার শ্বশ্রুমাতা কাউন্টেসের অতি প্রিয় পুত্রবধূ এবং নিজে .... কাউন্টেস।

দ্যা টেমিং অব দ্যা শ্রু

নাম তার দজ্জাল ক্যাথারিন—ক্যাথারিন পদুয়া শহরের এক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি ব্যাপতিস্তার বড় মেয়ে। শহরের যত মানুষ তারা সকলেই তাকে ঐ নামে চিনতো—তার কারণ তার মেজাজের বহর, গলার জোর আর বেপরোয়া হালচাল। এ হেন একটি সুকন্যার বর জুটবে এমন দুরাশা ক্যাথারিনের পিতৃ মাতৃ কুলে কেউই কখনো করে না, আর ভয়ও পায় তার বিয়ের কথা উচ্চারণ করতে। তাছাড়া ও মেয়ে যার ঘরে যাবে তার অবস্থাটা কী হবে সেকথা ভেবেও সবাই ভয় পায়। এদিকে ব্যাপতিস্তার বাইরে মুখ দেখানো মুস্কিল হয়ে পড়ছে দিন দিন, সকলেই তাঁকে দোষারোপ করছে ছোট মেয়ে বিয়াংকাকে তিনি ঘরে বসিয়ে রেখেছেন আর তার বয়সও বাড়ছে দিন দিন। কিন্তু ব্যাপতিস্তার উপায়ই বা কি—বড় মেয়েকে ঘাড় থেকে না নামালে ছোট মেয়ের তিনি বিয়ে দেবেন কেমন করে? বিয়াংকার ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে—কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না ব্যাপতিস্তা—আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে বিদ্রূপ আর কটাক্ষ তাঁকে মুখ বুঁজেই সয়ে যেতে হচ্ছে।

এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ঘটনা ঘটল। পেট্রুশিয়ো নামে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল ঐ পদুয়া শহরে এবং তার আসার উদ্দেশ্য নিজের জন্যে একটি উপযুক্ত পাত্রী খুঁজে বের করা। শহরে এসে লোকমুখে ক্যাথারিনের নামডাক পেট্রুশিয়োর কানেও পৌঁছল—কিন্তু ঐ দুর্ধর্ষ মেয়েটিকে যে করে হোক একবার বাগ মানাতে পারলে ত অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা—কেননা, ক্যাথারিনের স্বভাব যাই হোক সে রূপসী সন্দেহ নেই, আর তার বাবার টাকাকড়িও প্রচুর। পেট্রুশিয়ো এককাট্টা হল—ঐ মেয়েকেই সে বিয়ে করবে আর, একবার বিয়ে করতে পারলে তাকে পথে আনতেই বা কদিন? আসলে, এই ঝুঁকি নেওয়ার মত বুকের পাটাও ছিল পেট্রুশিয়োর। ক্যাথারিন যেমন বুনো ওল সে-ও তেমনি বাঘা তেঁতুল। এ ছাড়া তার ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং রঙ্গতামাসার ব্যাপারেও সুনিপুণ দক্ষতা। তার বিচক্ষণ বিচারবুদ্ধি দিয়ে সে বুঝেছিল যে দরকার মত কৃত্রিম রাগের ভাণ করে সঠিক জায়গায় মেজাজটি সপ্তমে চড়াতে পারলে কাজ হাসিল করতে কষ্ট হবে না। মানুষ হিসেবে সে কিন্তু নিতান্তই ঠাণ্ডা প্রকৃতির এবং নিজের এই যা-নয়-তাই ভেক ধরাতে তার নিজেরই মজা লাগছিল নিজের কাছে। সে যে প্রকৃত স্থির বুদ্ধির সঙ্গে কাজ করতে পারে তার প্রমাণ সে দিল কৃত্রিম চণ্ড মূর্তি ধরে ক্যাথারিনকে যে উপায়ে বিয়ের পরে সে তার মন মতন গড়ে নিল। ক্যাথারিনের মত উগ্রমূর্তি রণচটা মেয়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে ঐটিও ছিল তার হাতিয়ার।

অতঃপর পেট্রুশিয়ো শুরু করল তার বিবাহ অভিযান—দজ্জাল ক্যাথারিনকে

যেমন করেই হোক সে জয় করে ফিরবে। তার প্রথম কাজ হল ক্যাথারিনের পিতা ব্যাপতিস্তার কাছে ক্যাথারিনকে দার পরিগ্রহের জন্যে প্রার্থনা জানানো—আবেদনের ভাষার মধ্যে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা ছিল—ভালমানুষীর চালাকি। সে বলল—আপনার ঐ নম্র ও বিনয়ী মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চাই—আমি তার কুমারীসুলভ লজ্জাগুণ ও নম্রস্বভাবের কথা অনেকের মুখে শুনেছি, তাই সেই সুদূর ভেরোনা থেকে আসছি তাকে পাওয়ার আশায়। পিতা ব্যাপতিস্তা তাঁর কন্যাটিকে পাত্রস্থ করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন সন্দেহ নেই তবে এমন দিনকে রাত করার ইচ্ছা তার ছিল না। তাই তিনি বললেন—মহাশয় বোধ করি কিঞ্চিত ভুল শুনে থাকবেন, আমার মেয়েটি একটু অন্য প্রকৃতির। আপনি তাকে নিয়ে মুস্কিলেই পড়বেন। ব্যাপতিস্তার কথা শেষ হতে না হতেই মেয়ের স্বরূপ আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়ল পেট্রুশিয়োর চোখের সামনে। ক্যাথারিনের সঙ্গীত শিক্ষক দৌড়তে দৌড়তে এসে উপস্থিত হল ব্যাপতিস্তার সামনে এবং এসে বলল, দেখুন আপনার মেয়ের রকম—তার বীণাযন্ত্রটি দিয়ে সে আমার মাথায় মেরেছে—দেখুন মাথা ফেটে কেমন রক্ত পড়ছে—আমার অপরাধ, আমি তার বাজনায় ভুল ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। পেট্রুশিয়ো ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল—বাঃ বেশ বেশ, এমনি সাহসী মেয়েই তো চাই। আমার খুবই পছন্দ এই ধরণের তেজস্বিনী মেয়েদের, তা অনুগ্রহ করে তাকে একবার এখানে আসতে বলুন—আমি তার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করতাম। ব্যাপতিস্তা দ্বিধা করছেন দেখে সে তাঁকে বেশি ভাবতে না দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলল—আমার একটু তাড়া আছে, তাই আর দেরী করবেন না—যা কিছু কথাবার্তা তা আজই সেরে ফেলতে চাই। আমার এত কাজের চাপ যে বারবার আমার পক্ষে বিয়ের ব্যাপার নিয়ে এখানে আসার সময় হবে না। আপনি তো জানেন, কিছুকাল হল আমার বাবা স্বর্গত হয়েছেন, আর, একরাশ টাকাকড়ি বিষয় আশয় চাপিয়ে দিয়ে গেছেন আমার ঘাড়ে। আমিই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী। তা যাক সে কথা, এখন বলুন দেখি আপনার মেয়েকে দেওয়া-থোওয়ার কথাটা আপনি কেমন ভেবেছেন? ব্যাপতিস্তার মনে হল ছেলেটি প্রেমের ব্যাপারে একেবারেই আকাট, তবু তাঁর মেয়ের যা চরিত্র তাতে এই ছেলে পেলেই তিনি বর্তে যাবেন। কাজেই তিনি বললেন—আমি তো ভেবেছি যৌতুক হিসাবে দেব কুড়ি হাজার ক্রাউন, আর আমার অবর্তমানে পাবে আমার সম্পত্তির আধাআধি। পণের কথা শেষ হলে বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গেল। ব্যাপতিস্তা অন্দরে গেলেন মেয়েকে তার ভাবী বরের কথা বলতে এবং তাকে নিজের কানেই সব কথা শোনার জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন পেট্রুশিয়োর কাছে।

ইত্যবসরে নিজের মনে মনে পেট্রুশিয়ো ছকে নিয়েছে কেমন করে সে তার ভাবী বধূর প্রবেশের পর প্রেম সম্ভাষণ করবে—কী উপায়ে সে অগ্রসর হবে সেই

ছলাকলা। সে নিজের মনে বলল—ও আসামাত্র আমি খুব সাহস নিয়েই কথা বলতে শুরু করব। যদি ও এসে আমাকে ঝাড় দেয় আমি তৎক্ষণাৎ বলব—আহা কী সুন্দর গলা তোমার—যেন সাক্ষাৎ নাইটিংগেল। যদি ভ্রূ কোঁচকায় তবে বলব, আহা কী সুন্দর তোমার চোখের চাহনি, যেন শিশিরধোয়া গোলাপের মত স্বচ্ছ ও সুন্দর। যদি একেবারেই চুপ করে থাকে তবে বলব—আহা কী সুন্দর তোমার কথা বলার ভঙ্গি. কেমন সাবলীল তোমার কথা, আর যদি সে আমাকে চলে যাওয়ার জন্যে ঘাড় ধাক্কা দিতে যায় তবে আমি বলব—আহা যদি সম্ভব হ্ত তবে ঠিকই থেকে যেতাম তোমার কথা মত আরো এক সপ্তাহ, কিন্তু বড় কাজের চাপ। এই সব অনুচ্চারিত সগতোক্তির মাধ্যমে পেট্রুশিয়ো যখন নিজের মনে শক্তি সঞ্চয় করছে ঠিক তখনই এসে প্রবেশ কবল ক্যাথারিন রাজকীয় ভঙ্গিতে। পেট্রুশিয়ো সঙ্গে সঙ্গে তাকে সম্ভাষণ করল—সুপ্রভাত, কেটি—কেটি-ই নাম তোমার, আমি তাইতো শুনেছি। সম্ভাষণটি ক্যাথারিনের একেবারেই মনঃপুত হয়নি সেকথা বলাই বাহুল্য—তাই সে অবজ্ঞার সুরে বলল—বাজে কথা বলবেন না। আমার সঙ্গে যারা কথা বলতে আসে তারা আমাকে ক্যাথারিন বলেই সম্বোধন করে। পেট্রুশিয়ো বলল—না না, সে কী কথা। তোমাকে ত সবাই শুধু কেটি-ই বলে। বলে, সুন্দরী মেয়ে কেটি, আবার কখনও বা বলে ঝগড়াটি মেয়ে কেটি। তা যে-যা-ই বলুক কেটি আমি জানি গোটা খ্রীস্টান জগতে তোমার দোসর সুন্দরী আর একটাও নেই। আর সেই জন্যেই তো কেটি, চারিদিকের নানা শহরে তোমার নম্র স্বভাবের গুণকীর্তন শুনে আমি তোমার কাছে এসেছি, আমার স্ত্রী হবে তুমি।

তুলকালাম বাধতে আর দেরী হল না। পাত্র পাত্রীর প্রথম প্রেম সম্ভাষণটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমশ মাত্রায় চড়তে লাগল — ক্যাথারিন সামান্যতম আব্রু না রেখে পেট্রুশিয়োর কাছে প্রমাণ করে দিল কেন তাকে দজ্জাল ক্যাথারিন নামটি দেওয়া হয়েছে, আর পেট্রুশিয়োও নিজেও প্রতিমুহূর্তে প্রমাণ করতে থাকল কত তার ধৈর্য ও বিচক্ষণতা, কেননা সে সর্বদাই ক্যাথারিনকে প্রশংসা ও স্তুতি করে চলেছে। ঠিক এমন সময়ে এসে প্রবেশ করলেন ক্যাথারিনের পিতা এবং তাঁকে দেখামাত্র পেট্রুশিয়ো তার কথার রকম বদল করে বিয়ের ব্যাপারটি একেবারে সম্পূর্ণ পাকা করে নিতে চাইল। সে বলল—এসব আজে বাজে কথা এখন থাক, এসো ক্যাথারিন আমরা কাজের কথাটা সেরে ফেলি। তোমার বাবার সঙ্গে আমার সব কথাই হয়ে গেছে, আমাদের বিয়েতে তার সম্পূর্ণই সম্মতি আছে, টাকাকড়ির কথাও পাকা হয়ে গেছে, এখন তুমি রাজী হলে কী না হলে আমার তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই, আমাদের বিয়ে হচ্ছেই।

ব্যাপতিস্তা যখন ঘরে এসে ঢুকলেন তখন পেট্রুশিয়ো আগ বাড়িয়ে বলল—আপনার মেয়ের সঙ্গে সব কথা হয়ে গেল, ও আমাকে বিয়ে করবে বলে

খুবই উৎসাহ দেখিয়েছে। তা, আর দেরীতে কাজ নেই, আগামী রবিবারেই বিয়ের ব্যাপারটা সেরে ফ্যালা যাক। ক্যাথারিন তো একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। বলল—বটে, রবিবারে তোমার সঙ্গে বিয়ে না ছাই, রবিবারে তোমাকে শূলে চড়াব। সে তার বাবাকে গালমন্দ করতে লাগল এমন একটা হতচ্ছাড়া মাথাখারাপ বোম্বেটের সঙ্গে তার বিয়ের কথা বলার জন্যে। পেট্রুশিয়ো তেমনি ধূর্ত—সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—না না, সীনিয়্যর ব্যাপতিস্তা, আপনি কিছু দুশ্চিন্তা করবেন না—আমাদের দুজনের মধ্যে কথা হয়েছে, ও বলেছে আপনার কাছে প্রথমটায় ঐ রকম অনিচ্ছার ভাণ করবে—আসলে সকলের আড়ালে আমাদের সম্পর্ক একেবারেই অন্যরকম। সে ব্যাপতিস্তার কাছে নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে বলল—কই, তোমার হাতখানা এগিয়ে দাও কেটি—আমি তো ভেনিসে যাচ্ছি— আমাকে আবার সব বিয়ের জামাকাপড় কিনতে হবে তোমার জন্যে—তোমার পছন্দমত পোশাক তো চাই। সীনিয়্যর আপনি বিয়ের দিনের খানাপিনার ব্যবস্থা করুন আর বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্যে আত্মীয়স্বজনকেও খবরাখবর করুন। আমি যাই দেখি, বেশ ভাল দেখে একটা আংটি আর পোষাক-আশাক ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সবই তো কেনাকাটা করতে হবে—আমার কেটিকে সবাই যাতে সুন্দর বলে বাহবা দেয় তো করতেই হবে। এস কেটি, আমাকে চুমু দাও—রবিবাবেই তো আমাদের বিয়ে।

রবিবার আসতে দেরী হল না। অতিথিঅভ্যাগত সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছে বিয়ে বাড়িতে—কিন্তু আসল যে বর—সে-ই এখনও এসে পৌঁছল না। ক্যাথারিন নিজের কপাল চাপড়ে কাঁদতে বসল— সে ভাবল নিশ্চয়ই পেট্রুশিয়ো তাকে নিয়ে মজা করেছে— বিয়ের ব্যাপারটা ফাঁকি। কিন্তু তা নয়—ইচ্ছে করেই দেরীতে এসে উপস্থিত হল পেট্রুশিয়ো—আর ক্যাথারিনের জন্যে বাহারী পোশাক আনা তো দূরের কথা সে নিজেও পরে এসেছে একেবারে আটপৌরে জামাকাপড়—আর তার না আছে ছাঁদ না আছে ছিরি—মনে হল যেন সে গোটা বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে একটা তামাশা করতেই এসে উপস্থিত হয়েছে। তার সঙ্গে যে লোকজন চাকরবাকর এসেছে তাদেরও সেই একই শ্রী। আর যে ঘোড়ায় চেপে তারা এসেছে সেগুলো যেন মড়া কাঠ—কতকাল কিছু খেতে পায় না।

অনেক বলা-কওয়া সত্ত্বেও পেট্রুশিয়োকে রাজী করানো গেল না তার পোশাক পরিচ্ছদ পালটাতে। সে চড়া গলায় বলল—আমি তো মশাই এসেছি ক্যাথারিন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে বলে—সে কি আমার পোশাককে মালা পরাবে না কি? উপস্থিত সকলে দেখল এই বরকে বাগ মানানো যাবে না, অগত্যা ঐ ভাবেই বিয়ের অনুষ্ঠান করতে গির্জায় যেতে হল। সেখানে গিয়েও পেট্রুশিয়োর সেই একই মেজাজ যাজক তাঁর প্রথামত জিজ্ঞাসা করলেন—পেট্রুশিয়ো, তুমি

ক্যাথারিনকে তোমার পত্নী বলে মেনে নেব ত? অমনি তিরিক্ষী মেজাজে পেট্রুশিয়ো চীৎকার করে উঠলো—তাই নয় তো আবার কী বলে মেনে নেব? সকলে তো অবাক এবং ধমকানি শুনে যাজকমশাইয়ের হাত থেকে বাইবেল খানা ছিটকে পড়ল মাটিতে, আর যেই তিনি বইখানা হাত দিয়ে তুলতে গেলেন অমনি পাগলা পেট্রুশিয়ো দিল তাকে কষে এক ঘুষি যার ফলে যাজক হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মাটিতে আর তার হাতের বই লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। যাই হোক, বিয়ে তো আর বন্ধ করা যায় না, কাজেই কোনরকমে নম নম করে বিয়ের মন্ত্র পাঠ হতে থাকলো এবং সেই সর্বক্ষণই পেট্রুশিয়ো ঘোড়ার মত কেবলই তার পা দিয়ে মাটি ঠুকতে লাগল এবং চীৎকার করে মন্ত্র পড়তে লাগল যেন পাঠশালায় নামতা পড়ছে। তার রকম দেখে শুনে ক্যাথারিনের তো নাড়ি বসে যাওয়ার উপক্রম। সে ভয়েতে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। কন্যাদান যাহোক করে সারা হতেই ঐ গির্জার মধ্যে দাঁড়িয়েই পেট্রুশিয়ো হাঁকল—লে আও সুরুয়া—আর মদে টইটুম্বর হয়ে নৃত্যগীত করতে করতে তার হাতের পানপাত্রের তলানিটুকু ছুঁড়ে ভিজিয়ে দিল বেচারা সেক্সটনের সারাটা মুখ। সেক্সটনের অপরাধ—কেন তার দাড়িতে যথেষ্ট তেজী ভাব দেখা যাচ্ছে না, কেন চুল ওঠার ফলে দাড়ি এত ক্ষীণ হয়ে গেছে—মদেব ঐ তলানিটুকুকেই যেন তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। এমনতরো মাথামুণ্ডুহীন বিবাহ এর আগে কেউ কখনো দেখেনি, কিন্তু পেট্রুশিয়োর কাছে এর সবটুকুই তার সাজানো একটা নাটক—এক দজ্জাল মেয়েকে বাগে আনার জন্যে পাগলামি তার কৌশলমাত্র।

গির্জার পর্ব শেষ হওয়ার পর সকলে বাড়িতে ফিরে এসেছে। ব্যাপতিস্তা আয়োজন করেছেন বিশাল এক ভোজসভার। কিন্তু এ সবের কে ধার ধারে—পেট্রুশিয়ো প্রথমেই গিয়ে তার স্ত্রীর হাত ধরে বলল—চললাম, বৌকে নিয়ে আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে। শ্বশুরমশাই অনেক অনুনয় বিনয় করলেন—ক্যাথারিনও চটে গিয়ে খানিক চেঁচামেচি করল—কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা—পেট্রুশিয়ো তার সিদ্ধান্তে অনড়। সে বলল স্বামী হিসাবে এখন স্ত্রীর উপর তার সম্পূর্ণ অধিকার—তাকে নিয়ে সে যা খুশি তাই করতে পারে—বাধা দেওয়ার কেউ নেই, কাজেই সকলের অনিচ্ছাতেই সে রওনা দিল নিজের বাড়ির দিকে, কারোরই সাধ্যে কুলাল না যে তার পথরোধ করে।

অতঃপর স্ত্রীর জন্যে পেট্রুশিয়ো বাছাই করে দিল একটি হাড়িডসার ঘোড়া-সেটিকে সে এই উদ্দেশ্যেই তৈরী রেখেছিল-এছাড়া তার নিজের জন্যে অথবা লোকজনের জন্যে যে ঘোড়াগুলি তৈরী ছিল সেগুলিরও দশা তথৈবচ। শুরু হল যাত্রা—আর এমন সব পথ দিয়ে বর কনে ও বরযাত্রীরা ফিরতে লাগল যে রাস্তা বলতে সেখানে কিছু নেই—শুধু খানা-খান্দ, জলকাদায় চারিদিকে থৈ থৈ। এবং এই পথে চলতে চলতে ক্যাথারিনের দুবলা ঘোড়াটা যখনই হোঁচট খাচ্ছে অমনি পেট্রুশিয়ো বেচারী

ঘোড়াটাকে কষে ধমক লাগাচ্ছে— পথ দেখতে পাও-না, বেটা বেয়াদব—দেখছ না আমার স্ত্রীর কত কষ্ট হচ্ছে। ভাবখানা যেন স্ত্রীর জন্যে তার ভালবাসা উথলে উঠছে।

শেষ মেশ এই পরিত্রাহি যাত্রার অবসান হল, তবে সারাটা পথ পেট্রুশিয়ো গরু তাড়ানোর মত তার লোকজন ও ঘোড়াগুলোকে গালমন্দ করতে করতে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। বাড়িতে ফিরে সে যেন অতি সুবোধ এক স্বামী — সুবিবেচক এবং স্ত্রীর যত্নের জন্যে ব্যাকুল। তার আসল ফন্দি কিন্তু অন্যরকম—সে ঠিক করে রেখেছে সেই রাত্রে স্ত্রীকে দাঁতে কুটোটিও কাটতে দেবে না, বিশ্রাম দেওয়া তো দূরের কথা। দেখা গেল, চাকরবাকরেরা তার কথামত খাওয়ার টেবিলে চাদর বিছিয়ে একে একে খানা এনে সাজিয়ে দিল, কিন্তু পেট্রুশিয়ো টেবিলে গিয়ে বসামাত্রই শুরু করল চীৎকার—উল্লুক কাঁহাকা কোথাকার, যত্তোসব—এ কেমন খানা দিয়েছিস, কোন মানুষ এই খানা খেতে পারে? এই বলে সে ভাল ভাল যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী পাত্র সমেত ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে আর তার ভৃত্যদের বলল—নিয়ে যা, তোরা গিয়ে গেল্ যত পারিস। সে ভাবখানা ধরল যেন সে তার স্ত্রীর আহার্য ব্যাপারে কত সাবধান—পাছে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের ফলে তার কোন ক্ষতি হয়। খাওয়ার পালা মিটল এইভাবে মহা আড়ম্বরে, এর পর শয়নপর্ব। ঘরে ঢুকেই পেট্রুশিয়ো চেঁচাতে লাগল—এ কেমন সব বালিশ তোষক তোরা আমদানি করেছিস—এতে কি কোন ভদ্রমহিলা রাত কাটাতে পারে। এই বলে সে যাবতীয় বালিশ তোষক ঘরময় ফেলল ছড়িয়ে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর বেচারী ক্যাথারিন তখন একটু বিশ্রাম করতে পারলে প্রাণে বাঁচে—কিন্তু তা হবার নয়—তার দরদী স্বামী তাকে যে সে শয্যায় শুতে দেবে কেন? অগত্যা চেয়ারের উপরেই খাড়া হয়ে বসে থাকতে হল নববধূ ক্যাথারিনকে। যদি কখনও সারাদিনের ধকলের ফলে সে একটু ঘুমে ঢুলে পড়েছে অমনি তৎক্ষণাৎ তার স্বামী হৈ চৈ বাধিয়ে চাকরদের গালিগালাজ শুরু করে দেয় কেন তারা তার সাধের ফুলশয্যা ঠিকমত বিছিয়ে রাখতে পারে নি।

রাতটা এইভাবেই কাটল। কিন্তু পরের দিনেও পেট্রুশিয়োর আচরণে কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না। তার স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার যেন বেড়েই চলেছে, মিষ্টভাষী স্বামী সর্বদাই স্ত্রী সেবাযত্নে অতি আগ্রহী—রাতের খাবারেও যেমন নানা খুঁত ছিল, সকালেব প্রাতরাশেও দেখা গেল চাকরদের যত্নের অভাব এবং পেট্রুশিয়ো সেই কারণেই সকালের খাবারও ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে। ক্যাথারিন অর্থাৎ, সেই বদমেজাজী মেয়েটি এখন সুড় সুড় করে ঠাণ্ডা মাথায় চাকরদের কাছে গিয়ে গোপণে বলছে—দোহাই তোমাদের আমাকে যা হয় কিছু খেতে দাও। কিন্তু ভৃত্যকুল তো প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারে না, তাই তারা বলল—কী করি বলুন, কর্তার অজ্ঞাতসারে

আপনাকে কোনরকম খাবার দেওয়ার হুকুম নেই—আমাদের দেওয়া খাবার পরখ করে তবেই তিনি আপনাকে খেতে দেবেন। ক্যাথারিন বলল—বটে, তোমাদের কর্তার মতলব তাহলে আমাকে খেতে না দিয়ে শুকিয়ে মারা? আমার বাপের বাড়িতে খাবারের ছড়াছড়ি, সেখানে একটি দিনের জন্যেও কোনো ভিখিরী এসে ফিরে যায় না — আর আমার কীনা এই দুর্দশা! আমি জন্মে কখনও কোনো জিনিসের জন্যে কারো কাছে হাত পাতিনি—হুকুম করার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু আমার কাছে এসে গিয়েছে, আর আজ কীনা সে-ই আমাকেই খাবার চেয়ে খেতে হচ্ছে, ঘুমের জন্যে ছটফট করতে হচ্ছে— চীৎকারের ঠেলায় আমার ঘুম যাচ্ছে মাথায় উঠে—আর, যে ব্যাপারটি সবার বড় উৎপাত হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল এই সব কিছু অত্যাচার আমার উপর করা হচ্ছে আমাকে ভালবাসা দেখানোর নামে, যেন কতই দরদ আমার উপর—যে সে খাবার খেলে কিংবা যে সে বিছানায় ঘুমলে যেন আমি অসুস্থ হয়ে মরে যাব। ক্যাথারিনের স্বগতোক্তিতে ছেদ পড়ল—পেট্রুশিয়োর আকস্মিক প্রবেশে। ক্যাথারিনকে নিতান্ত প্রাণধারণের জন্যে কিছু একটু খাওয়ানোর দরকার, তাই সে যৎসামান্য মাংসের ঝোল একটি পাত্রে নিয়ে এসে বলল—কেমন লাগছে তোমার কেটি, ভালতো? তা তোমার জন্যে লক্ষ্মীটি দ্যাখ কেমন নিজের হাতে বানিয়ে একটু মাংসের সুপ নিয়ে এসেছি, লোকজনকে ভরসা কি, তাই ওদের উপর তোমার খাবারের দায়িত্ব দিতে সাহস হল না—তা তুমি তো স্বচক্ষে দেখছ, আমি কী না করতে পারি তোমার জন্যে। কী হল? তুমি মাংস পছন্দ করনা, তাহলে ওদের ডেকে বলি, ওরা এটাকে সরিয়ে নিয়ে যাক এখান থেকে। স্বামীর রকম সকম দেখে ক্যাথারিনের সারা শরীর রাগে রী রী করে জ্বলছিল, কিন্তু বেচারা পড়েছে মোগলের হাতে। অগত্যা অনন্যোপায় হয়ে রাগে গজ গজ করতে করতে পেট্রুশিয়োকে বলল— দোহাই তোমার, ওটা ফেরৎ দিও না। যেন উত্তরটা পেট্রুশিয়োর মনঃপুত হল না, সেই অজুহাতে সে বলল—দ্যাখ বাপু, যতো সামান্য দানই হোক তার জন্যে একটু ধন্যবাদ দেওয়া নিতান্তই ভদ্রতার ব্যাপার, তোমার কি সে কৃতজ্ঞতাটুকুও নেই? ঠিক আছে, ঐ মাংস তোমাকে স্পর্শ করতে হবে না। ক্যাথারিন আর কি করবে! সে বাধ্য হয়েই অনিচ্ছাসহকারে স্বামীকে খুশি করার জন্যে বলল— ধন্যবাদ। অতএব পেট্রুশিয়োর অনুমোদনে ক্যাথারিনের কোনরকমে পিত্তরক্ষা হল। কিন্তু খাওয়া শেষ হতে না হতেই পেট্রুশিয়ো বলল—চটপট খাওয়া সেরে নাও, এখুনি আমরা রওনা হব তোমার বাপের বাড়ির দিকে। বুঝলে লক্ষ্মীটি। দেখো এবার কেমন মজা হবে—নতুন নতুন সব সিল্কের কোট, টুপি, গলাবন্ধ, স্কার্ফ, আরো কত সব সুন্দর পাখা, সোনার আংটি ইত্যাদি নিয়ে আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হব। এই সব জিনিসের ফর্দ পেশ করতে করতে সে ডেকে পাঠাল দর্জি ও ফিতে টুপি ইত্যাদি বানানোর দোকানীদের। তারা ঘরে ঢোকার সঙ্গে

সঙ্গে প্রভুর ইঙ্গিত অনুসারে চাকর এসে তুলে নিয়ে গেল ক্যাথারিনের খাওয়ার প্লেটটা, যদিও তার খাওয়া তখনও অর্ধেকও শেষ হয়নি। পেট্রুশিয়ো চালাকি করে বলল—খেয়ে নিয়েছ তো? ফিতে ও টুপিওয়ালা তখন বের করল একটা অতি সুন্দর টুপি। সে বলল এই যে স্যার, আপনি যেমন টুপির কথা বলে পাঠিয়েছিলেন। পেট্রুশিয়ো বলল—ইয়ার্কি পেয়েছ, এটা কি একটা টুপি না বাটি, এ দেখছি একটা বাদামের খোলার মত—হটাও ওটা, একটু বড় দেখে আনতে পারনি? ক্যাথারিন মধ্যস্থতা করে বলল— কেন, ঠিকই তো আছে টুপিটা, আজকাল ভদ্রমহিলারা ঐ রকম টুপিই ব্যবহার করে থাকে, ওটাই আমার বেশ হবে। পেট্রুশিয়ো বলল—ভদ্রমহিলারা ব্যবহার করে থাকে। তা তুমি আগে ভদ্র হও, তখন ওটা পাবে—তার আগে নয়। ইতিমধ্যে পেটে একটু দানাপানি পড়ার ফলে ক্যাথারিন সামান্য খাড়া হয়ে উঠেছে। সে বলল—তুমি দেখছি একতরফা যা খুশি করে যাচ্ছ— আমার কথার কি কোনো মূল্যই থাকবে না? আমি নিশ্চয়ই আমার কথা বলব— আমি শিশু নই, দুধের বাচ্চা নই যে যা বলবে তাই মেনে নেব। তোমার চেয়ে যারা বড়, তোমার গুরুজন, তারাই কোনদিন আমার মতামতকে উপেক্ষা করতে সাহস করেনি, তোমার যদি এতই অসহ্য বোধ হয় তুমি চুপ করে থাক, নিজের কানে আঙুল দাও। কিন্তু এই মেজাজের কথায় পেট্রুশিয়ো কান দেওয়ার পাত্র নয়। সে ভাল করেই বুঝে নিয়েছে কোন পথে চললে স্ত্রীকে বাগে আনতে পারবে, তাই সে কথা কাটাকাটি কিংবা তর্কের পথে না গিয়ে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, টুপিটা একেবারেই খেলো। তোমার পছন্দের প্রশংসা করতে হয়—তোমার এই রুচির জন্যে তোমাকে আরো ভালো লাগে। ক্যাথারিন বলল—ওসব ছেঁদো কথা ছাড়—তোমার ভালবাসায় আমার মাথাব্যথা নেই—ঐ টুপিটাই আমি নেব—নেবই নেব। ওটা ছাড়া অন্য কোনো টুপি আমি নেব না।

পেট্রুশিয়ো তবুও না-বোঝার ভাণ করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। সে বলল—যাক্ টুপিটা তাহলে তোমার পছন্দ হয়েছে। তা, এবার গাউনের কথায় আসা যাক—দেখেছ তোমার জন্যে কেমন গাউন আনিয়েছি? ইঙ্গিতমাত্র দরজি এনে হাজির করল একটা অতি বাহারি গাউন। পেট্রুশিয়োর আসল মতলব যাতে ক্যাথারিন টুপি অথবা গাউন-এর কোনটাই না নিতে পাবে। তাই সে গাউনটাকে হাতে নিয়েই বলল—এ কেমন তরো গাউন? এটা কি একটা গাউন হল? কেমন কাপড়ে এটা বানিয়েছ? আর এর হাতা দুটোই কেমন? এতো দেখছি ছোটখাট কামানের নলের মত, নকশাটাও ইতর রুচির। দর্জিটা বলল—আজ্ঞে, আপনি তো বলেছিলেন হাল ফ্যাশানের মত বানাতে। ক্যাথারিনও বলল—ভারী সুন্দর হয়েছে গাউনটা, এত সুন্দর গাউন সে আগে কখনো দেখেনি। পেট্রুশিয়ো দেখল সে যেমনটি আশা করেছিল ঠিক তেমনটি ঘটেছে, অর্থাৎ ক্যাথারিনের মুখের খাবার কেড়ে নেওয়ার মত তার পছন্দসহ

গাউনটিকেও এবার বাতিল করে তাকে জব্দ করা যাবে। কাজেই সে গোপনে পূর্ব ব্যবস্থামত দর্জি এবং জারি টুপীওয়ালাদের খুশি করে পয়সা কড়ি দিয়ে দিল এবং প্রকাশ্যে তাদের ধমকাতে ধমকাতে বাড়ি থেকে বের করে দিল। ক্যাথারিন বেচারা তো ভয়ে কাঠ। এবার পেট্রুশিয়ো তাকে বলল— কী আর করা যাবে বলো, মনমতন পোশাক তো পাওয়া গেল না, অগত্যা এই আটপৌরে জামাকাপড়েই চলো তোমাকে বাপের বাড়িতে নিয়ে যাই। এর পর শুরু হল বৌকে জব্দ করার নতুন এক কৌশল। পেট্রুশিয়ো তার লোকজনকে বলল—সহিসকে ঘোড়া তৈরী করে নিতে বল—আমরা ডিনারের আগেই সেখানে পৌঁছে যাব, এখন তো সবে সাতটা। আসলে কিন্তু তখন আদৌ প্রাতঃকাল নয়—দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। ক্যাথারিন তো বরের হালচাল দেখে একেবারেই হকচকিয়ে গেছে। সে খুব নরম সুরে বলতে চেষ্টা করল—এখন তো বেলা দুটো বেজে গেছে—সকাল কোথায়—আমরা এখন যদি রওনা দিই তাহলে পৌঁছব গিয়ে রাতের খাওয়ার সময়। কিন্তু পেট্রুশিয়োকে বোঝায় কার সাধ্য—সে এককাট্টা হয়ে শুরু করেছে তার স্ত্রীর দখল নিতে, তাকে সিধে পথে আনতে, যাতে কীনা সে যখন পিত্রালয়ে আবার ফিরবে তখন তার খোলনলচে সব পাল্টে যায়। কাজেই ঘড়ির কাঁটা তার হুকুমেই সময় দেবে—সময়ের উপরেও তার সম্পূর্ণ অধিকার। সে বলল—আমি ওসব বাঁধা নিয়মের সময় টময় বুঝিনা—আমি যা বলব সেটাই ঘড়ির সময়— সাতটা বললে সাতটা, দুটো বললে দুটো। এখনও দেখছি তুমি আমার কথার উপর কথা বলছ—ওটি চলবে না। ঠিক আছে, আজ যাওয়া হবে না, এর পর যেদিন যাবো সেদিন আমি যদি খেয়ালখুশি মত ঘড়ির উপর হুকুম চালাই—তোমাকে তাই মানতে হবে—তবেই যাবো। কাজেই আরো একটি গোটা দিন ক্যাথারিনকে তার নতুন শিক্ষা, অর্থাৎ মুখ বুঁজে স্বামীর যথেচ্ছ আদেশ পালনের ব্যায়াম অভ্যাস করতে হল। যতক্ষণ না তার মেরুদণ্ডটা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায় ততক্ষণ ক্যাথারিনের নিস্তার নেই, তার ঔদ্ধত্য বা অহংকারের রেশমাত্র আর থাকবে না—যদি স্বামীর কথার উপর একটি কথাও বলেছে তবে আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে—বাপের বাড়ি যেতে যেতে মাঝপথ থেকেই হয়তো ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দেবে। ঠিক দুপুর বেলায় মাথার উপর সূর্য যখন তার আগুণ ঢালছে তখন পেট্রুশিয়ো যদি বলে—আহা দ্যাখ, কী সুন্দর চাঁদের আলো—তবে সেই কথাই মেনে নিয়ে বলতে হবে—চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে ইত্যাদি। পেট্রুশিয়ো বলল—দ্যাখ, আমি আমার মায়ের নামে দিব্যি করে বলছি, যদি আমি আমার মায়ের ছেলে হই তবে তোমার মনে রাখতে হবে আমি চাঁদই বলি আর তারাই বলি অথবা আমার যা মন চায় তাই বলি তবে তোমাকে সেটাই স্বীকার করে নিতে হবে, নতুবা তোমার বাপের বাড়ি যাওয়া আমি মাথায় তুলে দেব। এই কথা বলতে বলতে পেট্রুশিয়ো মাঝ পথ থেকে ঘোড়ার মুখ ঘরিয়ে আবার ফিরে আসার

উপক্রম করছে দেখে ক্যাথারিনের মুখ শুকিয়ে গেল—সে এখন আর সেই দজ্জাল কলহপ্রিয় ক্যাথারিন নয়, সে এখন পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য মন্ত্রে বিশ্বাসী একান্ত অনুগত স্ত্রী, তাই সে স্বামীকে অনুনয় করে বলল—দোহাই তোমার এতটা পথ এসে পড়েছি এখন আর ফিরতে চেওনা, চাঁদ হোক, সূর্য হোক, দিন বা রাত যা তোমার মনে হয় বল, আমি বলব সব সাচ্চা। ক্যাথারিনকে তবুও ভালমতই যাচাই করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে পেট্রুশিয়ো বলল—ঐ দ্যাখো চাঁদ উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথারিন বলল—হ্যাঁ চাঁদই তো দেখছি। তৎক্ষণাৎ জোর গলায় পেট্রুশিয়ো বলে উঠল—মিথ্যাবাদী কোথাকার—ঐ তো পরিস্কার সূর্য উঠেছে দেখা যাচ্ছে, ক্যাথারিন অমনি সায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ, ঐ তো পবিত্র সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি, আর তুমি যদি বল ওটা সূর্য নয় তবে নিশ্চয়ই ওটা সূর্য নয়। তুমি যখন যে বস্তুকে যা বলবে সে বস্তু তাই হবে, আর এই অধম ক্যাথারিন তার সবই মেনে নেবে। অতএব তখনকার মত ক্যাথারিন রেহাই পেল এবং তার বাপের বাড়ির দিকে অগ্রসর হওয়া বহাল রইল। কিন্তু পেট্রুশিয়ো ভাবল আরো একটু পরখ করে দেখতে হবে তার স্ত্রীর এই সুমতি স্থায়ী হয় কী না। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পথে দেখা হল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভদ্রলোকটিকে দেখামাত্রই পেট্রুশিয়ো তাকে সম্ভাষণ করল এমনভাবে যেন সে একটি যুবতী স্ত্রীলোক— তাকে সে বলল—সুপ্রভাত, দিদিমণি। স্ত্রী ক্যাথারিনকে সে জিজ্ঞাসা করল—এমন সুন্দরী মহিলা কখনও দেখেছ কি? কী সুন্দর ওর লালটুকটুকে গালদুটো, চোখ দুটো যেন দুটি উজ্জ্বল তারার মত। সে আবারও সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সম্বোধন করল—হে সুন্দরী, আরও একবার তোমাকে সুপ্রভাত জানাই। এরপর সে তার স্ত্রীকে বলল—কেটি, লক্ষ্মীটি আমার, এত সুন্দরী ওই মেয়েটি, তুমি একবারটি ওকে আলিঙ্গন কর। ক্যাথারিনের এখন নবজন্ম হয়েছে, সে আর কথা কাটাকাটি করতে জানে না, তাই সে স্বামীর কথা মত সেই বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে বিগলিতভাবে বলতে শুরু করল—হে তন্বী শ্যামা শিখর দশনা, কী অপরূপা তুমি, কেমন তাজা, কেমন মিষ্টি; তা কোথায় চলেছ বোন, কোথায় তোমার ঘর? তোমার মত এমন সুন্দর মেয়ে যে মা বাবা লাভ করেছেন কত কপাল তাদের। একথা শেষ না হতেই পেট্রুশিয়ো বলে উঠল—আরে এ তোমার কী হাল? কেটি, তুমি কি একেবারেই ক্ষেপে গেলে? দেখছ না উনি একজন পুরুষ, বৃদ্ধ ভদ্রলোক—ওঁর কপালের চামড়া কুঁচকে গেছে, গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে চামড়া গেছে ঝুলে—ওঁকে তুমি কুমারী বলে ঠাওরালে? স্বামীর কথামৃত সেবন করামাত্রই ক্যাথারিন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করে বলল—আমাকে মাপ করবেন নিজ গুণে, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, এই চড়া রোদে আমি সবই দেখছি কাঁচা সবুজ। আমার চোখ ঝলসে গেছে। এখন আমি বুঝতে পারছি, আপনি একজন প্রবীণ পিতৃতুল্য ব্যক্তি, আমার অপরাধ নেবেন

না। আমি ভুল করে ফেলেছি। পেট্রুশিয়ো বলল, হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই, ওকে মাপ করে দিন। তা জ্যাঠামশাই, আপনার কোনদিকে যাওয়া হচ্ছে? যদি কিছু মনে না করেন তবে এই পথেই যদি আপনি যান তবে আমরাও আপনার সঙ্গে যাব। বৃদ্ধটি বললেন—আরে ভুল করেছেন তাতে কী হয়েছে, আমার একটু খটকা লাগছিল বটে, প্রথমটায় আপনাদের সম্ভাষণের বহর দেখে, তা ওসব যাক—আমি এই পথেই চলেছি, আমার ছেলে থাকে পদুয়ায়, তার সঙ্গে দেখা করতে। আমার নাম ভিনসেনটিয়ো। কথায় কথায় সব পরিচয় বেরিয়ে পড়ল। ভদ্রলোকের ছেলের নাম লুসেনটিয়ো। লুসেনটিয়োর আবার বিয়ে ঠিক হয়েছে পেট্রুশিয়োর শ্যালিকার সঙ্গে, অর্থাৎ ব্যাপতিস্তার কনিষ্ঠা কন্যা বিয়াংকার সঙ্গে। পেট্রুশিয়ো বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলল—মশাই, খুব ভাল সম্বন্ধ পেয়েছেন—মেয়েটি তো ভাল বটেই, তবে তার চেয়েও ভাল তার বাবার টাকা পয়সা। একথা শুনে তো বৃদ্ধ খুবই খুশী। তারা গল্প করতে করতে একসাথে পথ পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছে গেল ব্যাপতিস্তার আলয়ে। বাড়িতে তখন অতিথি অভ্যাগতের ভিড়, উৎসবের কলরব। ব্যাপতিস্তা মনের আনন্দে ছোট মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, কেননা এখন তিনি বড় মেয়ের মত গলগ্রহ থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

বড় মেয়ে, জামাই এবং হবু বেয়াই মশাই প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামী ব্যাপতিস্তা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভোজসভায় গিয়ে বসতে অনুরোধ করলেন। ঐ সভার আরো একটি নবপরিণীত দম্পতি ছিল। হরটেনশিয়ো এবং তার স্ত্রী।

লুসেনটিয়ো ও হরটেনশিয়ো তাদের বৌদের পেয়ে খুব খুশি। ওদের দুজনের স্ত্রীই বেশ মিষ্টি স্বভাবের ও নম্র। পেট্রুশিয়োর স্ত্রীর দজ্জাল খ্যাতির কথা তাদের অজানা ছিল না। তাই তারা পেট্রুশিয়োকে নিয়ে একটু তামাশা করার লোভ সামলাতে পারল না। তারা মাঝে মাঝে খুব আলতোভাবে এক-আধটা টিপ্পুনি কাটছিল। প্রথমটায় ওদের টিটকিরিতে পেট্রুশিয়ো কান দেয়নি, কিন্তু যখন মহিলারা সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেল তখন স্বয়ং ব্যাপতিস্তা এসেও ঐ তামাশায় যোগ দিলেন। ব্যাপতিস্তা ক্যাথারিনের বাবা, তবু তিনি জামাইকে খোঁচা দিয়ে বললেন—তা বাবাজি পেট্রুশিয়ো, ব্যাপারটা হরষে বিষাদই বলতে হবে—তুমি বাবা যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছ সে কিন্তু দুনিয়ার সেরা ঝগড়াটে। পেট্রুশিয়ো সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানিয়ে বলল—মাপ করতে আজ্ঞা হয়, আমার স্ত্রী সবচেয়ে বেশি স্বামীর অনুগত। যদি বিশ্বাস না হয়, আসুন একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাক। আমি বলি কি, আমরা তিনজন যে যার স্ত্রীকে ডেকে পাঠাই দেখা যাক কার স্ত্রী সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে আগে এসে পৌঁছয়। যার স্ত্রী আগে আসবে বাজিতে জিত হবে তার—আসুন বাজি ধরা যাক। একথায় অপর দুজন তো মহাখুশি, তারা স্থির জানতো বাজিতে জিতবে তারাই, কেননা তাদের স্ত্রীরা পতিভক্তিতে সেরা। অতএব তারা কুড়ি ক্রাউন করে বাজি

ধরে বসল। পেট্রুশিয়ো বলল—ছোঃ, ওটা তো কোনো বাজির অংকই হল না, আমি বাজপাখী কিংবা শিকারী কুত্তার পিছনে ওটুকু বাজি ধরে থাকি—আমার স্ত্রীর ব্যাপারে আমি ওর বিশ গুণ বাজী ধরছি। বাধ্য হয়েই লুসেনটিয়ো এবং হরটেনশিয়ো তাদের টাকার অংক তুলল একশো ক্রাউনে।

লুসেনটিয়োই প্রথম ডেকে পাঠালো তার স্ত্রীকে একজন ভৃত্যের মারফৎ, যাতে কীনা বিয়াংকাই এসে পড়ে সবার আগে। কিছু পরেই ভৃত্যটি এসে সংবাদ দিল—আজ্ঞে, তিনি তো এখন বড় ব্যস্ত আছেন বললেন, তাই আসতে পারবেন না। পেট্রুশিয়ো হেসে বলল—তাই নাকি, ব্যস্ত আছে বলে আসতে পারবে না? এটা কি প্রকৃত স্ত্রীর যোগ্য উত্তর হল? পেট্রুশিয়োর মুখে এই কথা শুনে সকলে তো হেসে লুটোপুটি। তারা বলল—দেখা যাবে তোমার পতিব্রতা স্ত্রী কেমন ভালোমেয়েটির মত তোমার আজ্ঞা পালন করে। এবার হরটেনশিয়োর পালা তার স্ত্রীকে ডেকে পাঠানোর। সে ভৃত্যকে ডেকে বলল—যাও তো, আমার গিন্নিকে গিয়ে আমার অনুরোধের কথা বল, তার কাছে ব'লো আমি অনুনয় করছি সে যেন একবারটি এখানে আসে। কথাটা শোনামাত্র বিদ্রূপ করে পেট্রুশিয়ো বলল—অনুনয় করে যখন ডেকে পাঠাচ্ছ তখন সে কি আর না এসে পারে। কিন্তু ইত্যবসরেই ভৃত্যটি যখন ফিরে এল তখন হরটেনশিয়োর মুখ চুন হয়ে গেল। ভৃত্যটি একাই ফিরে এল দেখে সে প্রশ্ন করল—কি হল? তিনি এলেন না? উত্তরে ভৃত্য বলল—আজ্ঞে না, তিনি বললেন আপনি নাকী রসিকতা করছেন। তাই তিনি আসবেন না, বরং আপনাকেই তিনি অন্দরে ডেকে পাঠালেন। পেট্রুশিয়ো বলল—বেড়ে, এ দেখি আর এক কাঠি সরেস। অতঃপর পেট্রুশিয়োর পরীক্ষা। সে তার ভৃত্যকে ডেকে বলল—ওহে যাও, গিয়ে তোমার দিদিমণিকে বল আমি হুকুম করছি সে যেন এখুনি এখানে আসে। উপস্থিত সকলে এই আদেশের ফলাফল কেমন হবে তা ভাবার আগেই ক্যাথারিন এসে হাজির। তার বাবা বললেন—এ দেখি স্বপ্ন দেখছি, অন্য সবাইও বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল ক্যাথারিন অতি বিনীত ভাবে প্রবেশ করে পেট্রুশিয়োকে বলছে—আজ্ঞে প্রভু, বলুন কী আদেশ আপনার, কী জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? পেট্রুশিয়ো আদেশের সুরে বলল—তোমার বোন বিয়াংকা কোথায়? হরটেনশিয়োর স্ত্রীই বা কী করছে? ক্যাথারিন বলল—তাদের তো দেখলাম দালানে চুল্লীর ধারে বসে গল্পগুজব করছে। পেট্রুশিয়ো বলল—যাও, এখুনি তাদের এখানে নিয়ে এস।

ক্যাথারিন আর মুহূর্তমাত্র দেরী না করে ছুটল সেই দুটিকে ডেকে আনতে। তার স্বামীর আদেশ বলে কথা। সবাই তো তার রকম দেখে ভ্যাবাচ্যাকা। লুসেনটিয়ো বলে উঠল—বাপরে এ যে দেখি সপ্তম আশ্চর্যের পরে আর এক আশ্চর্য। হরটেনশিয়ো বলল—তাইত দেখছি বটে। তবে কে জানে এ কোন বিপদের সংকেত। পেট্রুশিয়ো

বলল—আরে ঘাবড়ে যেওনা বন্ধু, এ শান্তির অশুভ সংকেত—প্রেম প্রীতি ভালবাসা ও শান্তিপূর্ণ জীবনের সংকেত—স্ত্রীর উপর স্বামীর যথার্থ প্রভুত্বের সংকেত—সংক্ষেপে বলতে গেলে যা কিছু সুন্দর ও সুখের তারই সংকেত। একথা শোনার পর ব্যাপতিস্তা তো স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন— বাবা পেট্রুশিয়ো, আজ বড়ই আনন্দ পেলাম। এই আনন্দের বিনিময়ে তোমাকে আমি যৌতুক স্বরূপ আরো বিশ হাজার ক্রাউন দিলাম — আমার আজ মনে হচ্ছে এ যেন আমার সেই মেয়ে নয়, অন্য একটি মেয়ে এবং এ যৌতুক তারই জন্যে। পেট্রুশিয়ো বলল—না, না। আরো একটু বাকী আছে, বাজিতে আমার প্রাপ্য আরও অনেক বেশি। এবার দেখুন, আপনার মেয়ের এই নতুন জীবনে কী পরিমাণ পরিবর্তন এসেছে কী পরিমাণ আনুগত্যের শিক্ষা সে লাভ করেছে। এমন সময় দেখা গেল ক্যাথারিন সেই অপর দুজন মহিলাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পেট্রুশিয়ো তার দিকে আঙুল দিয়ে বলল—ঐ দেখুন ক্যাথারিন কেমন বাধ্য মেয়ের মত এদের দুটি অবাধ্য স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে এসেছে, যেহেতু আমি তাকে আদেশ করেছি। পেট্রুশিয়ো এবার ক্যাথারিনকে বলল—কেটি, তোমার মাথার ঐ টুপিটা আমার পছন্দ নয়, ওটা তুমি ফেলে দাও। তার কথা শেষ না হতেই ক্যাথারিন তার টুপিটা ছুঁড়ে ফেলল পায়ের তলায়। এই সব দেখেশুনে হরটেনশিয়োর স্ত্রী তার স্বামীকে বলল—আমরা তো এসব হাস্যকর স্বামীভক্তি কখনো দেখিনি, তবু বেশ তো আছি এতকাল। বিয়াংকাও তার কথা শুনে বলল—দুত্তোর, এই নিরেটের মত পতিভক্তির নিকুচি করতে হয়—এর নাম ভক্তি? স্ত্রীর কথায় তাচ্ছিল্যের ভাব দেখে বিয়াংকার স্বামী লুসেনটিয়ো তার স্ত্রীকে বলল—বাছা, তোমার ভিতর যদি এমন নিরেটের মত স্বামীভক্তি একটুখানিও থাকত তবে আমি কৃতার্থ হতাম, তোমার সপ্রতিভ স্বামীভক্তির দায়ে আমাকে আজ ডিনারের পর থেকে এই অল্প সময়ের মধ্যে একশোটি ক্রাউন জখ দিতে হয়েছে। বিয়াংকা বলল—বেশ হয়েছে একশো ক্রাউন গেছে- যেমন মোটা তোমার বুদ্ধি। পেট্রুশিয়ো এতক্ষণ চুপ করে এদের সব কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে ক্যাথারিনকে বলল—কেটি, এই রগচটা মহিলা দুটিকে একটু শিখিয়ে দাও তো স্বামীভক্তি কাকে বলে। ক্যাথারিনও অমনি শতমুখে শুরু করল পতিভক্তির বাখ্যান। তার বক্তৃতা শুনে তো উপস্থিত সকলের একদম চক্ষু ছানাবড়া—বাপরে! এই নাকী সেই এককালের নামজাদা দজ্জাল ক্যাথারিন! ক্যাথারিন অবশ্য এরপর থেকেও নামজাদা হয়েই রইল—তবে নামজাদা দজ্জাল মেয়ে বলে নয়—এখন সে পরিচিত হল নামজাদা পতিভক্তিপরায়ণা স্ত্রী নামে।

দ্যা কমেডি অব্ এররস্

সাইরাকুজ আর এফিসাস। দুটি দেশ বা রাজ্য। তাদের মধ্যে বনিবনা তো ছিলই না, বরং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক যেন অহিনকুলে। এহেন বৈরিতার ফলে এফিসাস রাজ্য এক অতি কঠিন আইনের প্রবর্তন করল। সেই আইন অনুসারে যদি সাইরাকুজের কোনো বণিক স্বেচ্ছায় অথবা ভুলক্রমে এফিসাসের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে এসে পড়ে তবে তার শাস্তি পেতে হবে প্রাণদণ্ডের, তবে সে যদি তার মুক্তিপণ বাবদ এক সহস্র মার্ক দিতে সক্ষম হয় তবেই সে নিষ্কৃতি পেতে পারে।

একদিন এমনই এক দৈবদুর্বিপাক ঘটল ঈজিয়ন নামে সইরাকুজের এক বৃদ্ধ বণিকের ভাগ্যে। সে কিছুই না বুঝে আপন মনে চলছিল এফিসাসের পথ ধরে, আর অমনি চারিধার থেকে লোকজন তাকে ঘিরে ধরল, এবং টেনে নিয়ে চলল ডিউকের দরবারে। দরবারে পৌঁছানমাত্র তার দণ্ডও নির্ধারিত হয়ে গেল—পার যদি একহাজার মার্ক জমা দাও, নতুবা শূলে যাও।

ঈজিয়ন বেচারার তেমন কিছু সামর্থ্য নেই, ঐ বিপুল অর্থ সে পাবে কোথায়। তবে ডিউকের কী জানি কেন তার উপর একটু দয়া হল ; তিনি বললেন—তোমার প্রাণদণ্ড আমি মুকুব করতে পারব না, তবু বল দেখি, তোমার কী বলার আছে। এখানে তুমি এলে কেন ? ধরা পড়লে তার ফলাফল যে নিশ্চিত মৃত্যু তা জানা সত্বেও এত বড় ঝুঁকি তুমি নিয়েছ কেন ? তুমি তো সাইরাকুজের মানুষ।

ঈজিয়ন বলল—দেখুন হুজুর, মরতে আমার একটুও ভয় নেই। জীবনে যত বড় দুঃখ আমি পেয়েছি মৃত্যু তার তুলনায় কিছু নয়। জীবনের সাধ আমার আর একটুও নেই—আপনি আমাকে বরং মৃত্যুদণ্ডই দিন, কেননা, যে জীবন-কাহিনী বর্ণনা করার জন্যে আপনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন মৃত্যুও তার কাছে শ্রেয়—বড় বেদনাময় আমার জীবন। তাহলে শুনুন।

সাইরাকুজেই আমার জন্ম—বণিক বংশে জন্ম, তাই ছেলেবেলা থেকেই আমার পরিবারে তেমন শিক্ষাদীক্ষাই পেয়েছিলাম যাতে ভবিষ্যতে দেশদেশান্তরে বাণিজ্যের পথে নামতে পারি।

সময়ে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। বাণিজ্যেও ধীরে ধীরে লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করি। কিন্তু আমার ভাগ্যে এই সুখ বেশিদিন সইল না। ব্যবসার কাজে আমাকে মাঝে মাঝেই দেশ বিদেশে যেতে হত, তাই একবার এপিডামনামে গিয়ে কর্মসূত্রে আটকে পড়লাম। ছটি মাস সেখানে থাকতে হল, কিন্তু ছয়মাসেও সব কাজ মিটছে না দেখে আরো কিছুকাল সেখানে থেকে যাব মনস্থ করলাম। কিন্তু বউকে আর কতকাল দেশে একলা ফেলে

রাখা যায়, বলুন ? তাই তাকে আমার কাছে নিয়ে এলাম।

এই ভাবেই কাজকর্মও তার সঙ্গে নতুন সংসার চলছিল। অল্পকিছুদিন পরে স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হলেন এবং যথাসময়ে দুটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। সে বড় অদ্ভুত ব্যাপার—দুটি শিশুকেই একই রকম দেখতে। একটির সঙ্গে অপরটির এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য যে কেউই, এমন কি আমরা, ওদের মা বা বাবা, আমরাই ওদের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝতে পারতাম না।

আরো এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল—এবং ঠিক একই সময়ে। আমার স্ত্রীকে এনে যে সরাইখানায় আমরা উঠেছিলাম সেই বাড়িতেই ঐ সময়ে একটি দাসীরও ঠিক একইরকম দুটি যমজ সন্তান জন্মাল। আর ঐ পুত্রসন্তানদুটিও ঠিক একই প্রকার যেমনটি আমাদের দুটি। ওদেরও পরস্পরকে আলাদা করে চেনা যেত না। বড় দুঃখী ছিল ওদের মা বাপ, বড় দরিদ্র। তাই আমিই দায়িত্ব নিলাম বাচ্চা দুটিকে মানুষ করার—ভেবেছিলাম একটু বড় হলে ওরা দুটি ভাই মিলে আমাদের সন্তানদুটিকে দেখাশোনা করবে, তাদের কাজকর্ম করে দেবে।

আমার দুটি ছেলেই হয়েছিল মনের মতন। আমরা স্বামী-স্ত্রী অমন দুটি ছেলে পেয়ে ভেবেছিলাম কী ভাগ্য আমাদের, ঈশ্বর আমাদের উপর কত দয়া করেছেন। কিন্তু বিদেশ বিভুঁইয়ে আমার স্ত্রীর আর মন টিকছিল না, দেশে ফেরার জন্যে তার মন বড় অস্থির হয়ে পরেছিল। আমার মন চাইছিল না যে তখনই দেশে যাই, তাছাড়া আমার যে জন্যে আসা তা ও তখনও শেষ করে উঠতে পারি নি। কিন্তু কী আর করা যাবে—স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধের ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন দেশে ফেরার জাহাজে চাপতে হল। এখন ভাবি কী কুক্ষণেই না আমরা সেদিন যাত্রা করেছিলাম, কেননা আমাদের জাহাজ এপিডামনাম ছেড়ে অল্প কিছু দূর এগোনোর পরই সমুদ্রে উঠল এক তুমুল ঝড়—উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে সেই ঝড় এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করল যে জাহাজের নাবিকেরা ভয় পেয়ে গেল। তারা যখন দেখল যে জাহাজকে বাঁচানোর আর কোন আশাই নেই তখন তারা দল বেঁধে গিয়ে উঠল নৌকোতে—নিতান্তই প্রাণের দায়ে। কিন্তু আমরা যারা যাত্রী তারা পড়ে রইলাম অসহায়ের মত—আমাদের বাঁচার কোনো আশাই রইল না—যে কোন মুহূর্তে সেই প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে সমুদ্রের তুফানে আছড়ে পড়বে এই জাহাজ—একটি যাত্রীও আর ফিরবে না।

যাত্রীদের মধ্যে কান্নার রোল উঠল। আমার স্ত্রীও কান্নায় হা-হুতাশ করতে লাগলেন—সঙ্গের শিশুরাও প্রাণপণ চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। তারা জাহাজডুবির কিছুই বোঝেনি, তবু তাদের মায়ের কান্না দেখে তারা স্বভাবতই অস্থির হয়ে পড়েছিল। ওদের সকলের কান্না আর আতঙ্কের ফলে আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। আমি নিজের প্রাণের জন্যে কোনদিনই ভয় পাই না, শুধু ওদের বিপদে আমি আর স্থির থাকতে

পারি নি, কেবলই ভাবতে লাগলাম কী উপায়ে এখন এদের বাঁচাতে পারি। সমুদ্রযাত্রী নাবিকেরা তাদের জাহাজে সবসময়েই ঝড়ের কথা ভেবে দুএকটি বাড়তি মাস্তুল মজুত রাখে। তেমনি একটি মাস্তুলের একদিকে আমি আমার ছোট ছেলেটিকে বেঁধে নিলাম ; মাস্তুলটির অপর দিকে বাঁধলাম আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সেই দুই ভৃত্য বালকের মধ্যে ছোটটিকে। স্ত্রীকে বললাম ঠিক অনুরূপভাবে অন্য একটি মাস্তুলে অপর দুটি শিশুকে বেঁধে নিতে। অর্থাৎ, বড় দুটি শিশুর দায়িত্ব দিলাম আমার স্ত্রীর উপর এবং ছোট দুটির দায়িত্ব নিলাম আমি নিজে। এবার স্ত্রী ও আমি যে যার মাস্তুলের সঙ্গে নিজেদেরও বেঁধে নিলাম পৃথকভাবে। আমাদের পরম ভাগ্য যথাসময়ে আমরা প্রাণরক্ষার ঐ কৌশলটি করে নিয়েছিলাম, কেননা, অব্যবহিত পরেই ঝড়ের দাপটে জাহাজটি ধাক্কা খেল এক কঠিন শিলার গায়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল সেই বিশাল জাহাজ। তৃণখণ্ডের মত সেই সামান্য মাস্তুলদুটিকে আশ্রয় করে আমরা কোনরকমে ভেসে রইলাম জলের উপরে। দুটি শিশুর প্রাণ নিয়ে আমি তখন হিমসিম খাচ্ছি, কাজেই আমার সাধ্য ছিল না কোনপ্রকারে আমার স্ত্রীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসি—ফলে, অপর দুটি শিশুকে নিয়ে সে কিছুক্ষণের মধ্যে কোথায় ভেসে গেল আমি প্রথমে কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। একটু পরে চোখে পড়ল একটি জেলে নৌকো তাদের দিকে এগিয়ে এসে তাদের তুলে নিল। যতদূর মনে হল ঐ জেলেদের নৌকোটা এসেছিল করিন্থের থেকে—সে যাই হোক, আমি নিশ্চিন্ত হলাম ওদের বিপদ কাটল ভেবে।

আমার তখন একমাত্র চেষ্টা হল সেই প্রবল তুফানের সঙ্গে লড়াই করে অপর দুটি শিশুকে যদি প্রাণে বাঁচাতে পারি। ঈশ্বর আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন, আমাদেরও সাহায্যের জন্যে কিছুক্ষণ বাদে একটি জাহাজ এলো এগিয়ে। জাহাজের নাবিকেরা আমাকে দেখে চিনতে পারল, তারা ছিল আমার পূর্ব পরিচিত। কাজেই অতি যত্নসহকারে আমাদের তারা তুলে নিল এবং সেবাশুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলল। তারাই আমাদের পৌঁছে দিল আমার নিজের দেশ সাইরাকুজে। আমি দেশে ফিরলাম, কিন্তু তার পর থেকে আজ অবধি আমার স্ত্রী ও সেই দুটি শিশুসন্তানের কোন সন্ধানই পাইনি। আমার বড় ছেলেটি তার মধ্যে একটি।

দিন যায় দিন আসে। স্ত্রী এবং আমার বড় ছেলেটির দেখা পাওয়ার সব আশাই কালে কালে স্তিমিত হয়ে গেল। এমনিভাবে কেটে গেল আঠারোটি বছর। আমার একমাত্র সম্বল ছোট ছেলেটি এখন আঠারো বছরের যুবা। সে তার মা ও দাদাকে দেখার আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠল, কেননা সে শুনেছিল তারা প্রাণে রক্ষা পেয়ে জেলেদের নৌকায় আশ্রয় নেয়। ছোট ছেলে বলল সে তার ভৃত্যটিকে নিয়ে মা ও দাদাকে অনুসন্ধান করতে যাবে। ভৃত্যটিরও তার দাদাকে খুঁজে পাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়েছিল। আমার মন কিছুতেই চাইছিল না যে ওদের ঐ অনিশ্চিত যাত্রায়

সম্মতি দিই, কিন্তু ছোটছেলের প্রবল ইচ্ছার কাছে আমাকে বাধ্য হয়েই হার মানতে হল। নিজের স্ত্রীকে এবং অপর সন্তানটিকে খুঁজে পাওয়ার ইচ্ছা আমার অন্তরেও প্রবল ছিল ঠিকই, কিন্তু পাছে তাদের খুঁজতে গিয়ে আমার শেষ সম্বল ছোট ছেলেটিকেও হারাতে হয় এই ভয়ে আমি সংকুচিত ছিলাম। আমার ভাগ্যে তাই-ই ঘটল। ছোট ছেলে আজ সাত বছর হল তার মা ও দাদার সন্ধানে বেরিয়েছে, আজও সে ফেরেনি। আর তার সন্ধানে আমি সারা পৃথিবীতে ছুটে বেড়াচ্ছি আজ পাঁচ বছর হল—আমি কোথায় না গিয়েছি? গ্রীসের সেই শেষ প্রান্ত থেকে শুরু করে গোটা এশিয়ার দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে আমি অবশেষে এসে পৌঁছেছি আপনার দেশ এই এফিসাসে—পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যেখানেই মানুষের বসতি আছে তার কোন অঞ্চলই আমি খুঁজে দেখতে বাকী রাখব না—এই ছিল আমার সংকল্প। কিন্তু, আজই তো আমার সেই অন্বেষণের শেষ হতে চলেছে—আমার দুঃখময় জীবনের যে কাহিনী আপনি শুনতে চেয়েছিলেন এখানেই তার যবণিকা—এর পর আমার আর কোন গল্প থাকবে না, শুধু যদি জানতে পেতাম যে আমার সেই সন্তানেরা ও আমার স্ত্রী আজও জীবিত আছে, তবে আমার মৃত্যুও হত শান্তির।

হতভাগ্য ঈজিয়ন তার কাহিনী শেষ করল। ডিউক এতক্ষণ মন দিয়ে সব কথা শুনছিলেন। ভাগ্যহীন বৃদ্ধের জন্যে তার মনে বড় করুণার উদ্রেক হল। তিনি ভাবলেন, আহা বেচারী নিজের হারানো সন্তানের খোঁজে কত দুঃখই না বরণ করেছে! যদি আইনের পবিত্রতার দরুণ তার হাত পা বাঁধা না হত তবে অবশ্যই তিনি ঈজিয়নকে মুক্তি দিতেন। কিন্তু হাকিমকে যদিবা পালটানো যায়, হুকুম পালটানো অসম্ভব, তাই তিনি ঈজিয়নকে বললেন—দ্যাখ বাপু, আমি তো তোমার প্রাণদণ্ড মকুব করতে পারিনা, তবে এটুকু করতে পারি যে তোমাকে আমি আজকের দিনটুকু সময় দিচ্ছি, তুমি চেয়ে চিন্তে হোক বা ধার করে হোক যদি তোমার মুক্তিপণের টাকাটা সংগ্রহ করে আনতে পার তবে তোমাকে আমি বাঁচাতে পারব।

কিন্তু কে দেবে ঈজিয়নকে এক হাজার মার্ক ধার? কার কাছেই বা সে ভিক্ষা করে চাইতে পারে ঐ পরিমাণ মুদ্রা? কাজেই একটি দিনের মুক্তির মেয়াদ তার কাছে নিতান্তই মূল্যহীন দাক্ষিণ্য। এফিসাস তার কাছে এক অচেনা দেশ—এখানে কোনো কূলেই সে কিছুমাত্র আশার আলো দেখতে পেল না। অগত্যা সে ডিউকের আদালত ছেড়ে জেলরক্ষীর হেপাজতেই নিজেকে সমর্পণ করল।

বিধাতা কিন্তু অলক্ষ্যে বসে নতুন এক রহস্যের জাল উন্মোচন করছিলেন। এফিসাসে এমন একজনও নেই যে তাকে চেনে—ঈজিয়নের এই ধারণা যে ভুল তা যথাসময়ে প্রকাশ পেল। বেচারী যখন তার নিজের ছোটছেলের সন্ধানে এখানে এসে জীবন বিপন্ন করেছিল, ঠিক সেই সময়ে শুধু তার ছোট ছেলেই নয়, আঠারো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া তার সেই বড় ছেলেও তখন ছিল এফিসাস শহরে।

দুটি ভাই, কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না। আরো অদ্ভুত ব্যাপার এই যে দুজনকেই দেখতে ঠিক একই রকম—তাদের মুখশ্রী, দেহের গঠন, হাবভাব—সব অবিকল এক। আর তাদের দুজনের নামও এক—দু'জনই অ্যান্টিফোলাস নামে পরিচিত। এদিকে আবার দুই ভাইয়ের ভৃত্য দুটি—অর্থাৎ সেই যমজ দুই ভাই—তাদেরও চেহারা, হাবভাব, এমনকি নাম পর্যন্ত অবিকল এক। তাদের দুজনেরই নাম ড্রোমিও। ঈজিয়নের ছোট ছেলে, অর্থাৎ সাইরাকুজের অ্যান্টিফোলাস, যার খোঁজে ঈজিয়ন এফিসাসে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সে-ও দৈবক্রমে এফিসাসে এসে পড়েছিল ঐ একই দিনে। তার সঙ্গে ছিল তার ভৃত্য ড্রোমিও। অ্যান্টিফোলাসও সাইরাকুজের মানুষ, কাজেই এফিসাসে আসার ফলে তার বাবার যে সাজা হয়েছে সেই একই সাজা তারও প্রাপ্য। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তার পরিচয় প্রকাশ হওয়ার আগেই তার দেখা হয়ে গেল পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুটির কাছে সে শুনল সেইদিনই সাইরাকুজের এক বৃদ্ধ নাবিক এফিসাসে ধরা পড়েছে এবং তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। অতএব, বন্ধুটি অ্যান্টিফোলাসকে সাবধান করে দিয়ে বলল—কিছুতেই যেন নিজের দেশের পরিচয় দিওনা। বলবে তুমি এখানে এসেছ এপিডামনামের থেকে, বাণিজ্য করতে। অ্যান্টিফোলাস বলল—তাই হবে। কিন্তু মনে মনে সে বড় দুঃখিত হল—তারই দেশের একজন বৃদ্ধ এখানে এসে নিজের প্রাণ খোয়াতে বসেছে। সে কিন্তু বিন্দুমাত্রও অনুমান করতে পারেনি যে সেই বৃদ্ধটি আর কেউই নয়—সে তারই বাবা।

ঈজিয়নের বড় ছেলে অর্থাৎ এফিসাসের অ্যান্টিফোলাস (ছোটছেলের পরিচয় যেহেতু সাইরাকুজের অ্যান্টিফোলাস) এফিসাসে বসবাস করছিল প্রায় বিশ বছর যাবৎ। ব্যবসা বাণিজ্য করে সে এখন রীতিমত একজন ধনী এবং নিজের পিতার মুক্তিপণের একসহস্র মার্ক দেওয়া তার পক্ষে খুবই সহজ। কিন্তু সে তো তার বাবাকে চেনে না, কোনদিনই তাকে সে দ্যাখেনি। তার শুধু অস্পষ্ট মনে আছে সেই জাহাজডুবির কথা—আরো মনে আছে সেদিন কেমন করে সে রক্ষা পেয়েছিল তার অস্পষ্ট স্মৃতি। কিন্তু তার পরের যে ঘটনা তা সে কিছুই জানে না। যে জেলে নৌকোর মাঝিরা তাদের তুলে নিয়েছিল সেই মাঝিরা তারপর তাকে ও অপর ছোট শিশুটিকে জোর করে নিয়ে যায়। তার মার হাজার কান্নায়ও তাদের মন ভেজেনি। বাচ্চাদুটিকে বিক্রী করে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তারা করেও ছিল তাই। আর অপর সেই ছোট শিশুটিই বর্তমানে তার ভৃত্য—এফিসাসের ড্রোমিও। অ্যান্টিফোলাস জানে না তার মা কোথায়, কিংবা তার বাবা কোথায়, কিংবা কেমন তাদের দেখতে—তাদের সম্বন্ধে কোন স্মৃতিই তার নেই।

অ্যান্টিফোলাস ও ড্রোমিওকে জেলেরা বিক্রী করেছিল মেনাফোন নামে বিখ্যাত যোদ্ধার কাছে। মেনাফোন ছিলেন এফিসাসের ডিউকেরই কাকা। তিনি তাঁর ভাইপোর

কাছে বেড়াতে যাওয়ায় সময় ঐ শিশুদুটিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই ডিউকের নজরে পড়ে অ্যান্টিফোলাস।

অনেক বছর পরে যখন অ্যান্টিফোলাস বড হয়েছে তখন তার চেহারা দেখে আরো মুগ্ধ হলেন ডিউক এবং তাকে তাঁর সেনাবিভাগের এক উচ্চপদে নিযুক্ত করলেন। অ্যান্টিফোলাস ছিল সাহসী এবং বীর। অল্পদিনের মধ্যেই সে নিজের যোগ্যতার ফলে বিশেষভাবে ডিউকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এরই মধ্যে আবার এক যুদ্ধে তারই সাহসিকতার ফলে ডিউকের জীবন রক্ষা পায়। এই সাহসিকতায় খুশি হয়ে ডিউক অ্যান্টিফোলাসকে পুরস্কৃত করলেন এক অভিনব উপায়ে। তিনি এড্রিয়ানা নামে এফিসাসের এক ধনী মহিলার সঙ্গে অ্যান্টিফোলাসের বিয়ে দিলেন। সেই এড্রিয়ানাই বর্তমানে অ্যান্টিফোলাসের ঘরণী এবং তাদের সঙ্গে আজও বাস করে ভৃত্য ড্রোমিও।

এদিকে ছোট অ্যান্টিফোলাস তার বন্ধুর পরামর্শমত এপিডামনামের বণিক পরিচয় নিয়ে এফিসাস শহরে বেরিয়ে পড়েছে। কিছুদূর যাওয়ার পর সে তার ভৃত্য ছোট ড্রোমিওকে কিছু টাকাকড়ি দিয়ে বলল একটা সরাইখানায় গিয়ে তাদের দুজনের মত খাওয়া থাকার একটা বন্দোবস্ত করতে। তাকে সে বলল—তুই গিয়ে টাকাটা জমা দে, আমি এর মধ্যে শহরটাকে একটু ঘুরে দেখে আসি। এখানকার হালচাল, মানুষজন কেমন তার তো কিছুই জানি না।

ড্রোমিওর সঙ্গে অ্যান্টিফোলাসের প্রভুভৃত্য সম্পর্ক ছিল একটু অন্য ধরণের। এর একটা কারণও ছিল। অ্যান্টিফোলাস তার নিজের মা ও দাদাকে হারানোর ফলে অনেক সময়েই থাকতো বিমর্ষ বা মনমরা হয়ে। ড্রোমিও তার স্বভাবসুলভ চটুলতা ও হাসিঠাট্টার মাধ্যমে সর্বদাই চেষ্টা করত নিজের প্রভুকে হাসিখুশী রাখতে। ফলে তাদের কথাবার্তায়, চালচলনে মনেই হত না যে তারা প্রভুভৃত্য।

ড্রোমিওর হাতে টাকা দিয়ে তাকে সরাইখানা দেখতে পাঠানোর পর অ্যান্টিফোলাস একা একা দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল—মাকে আর বড় ভাইকে কতদিন ধরে খুঁজে চলেছি, একের পর এক দেশ তন্ন তন্ন করে দেখেছি—কই কোথাও তো তাদের কোন সন্ধানই পেলাম না। আজ শুধু মনে হচ্ছে মহাসমুদ্রে আমি একবিন্দু জল মাত্র—যে জলবিন্দুটি অপর এক বিন্দুকে খুঁজতে গিয়ে বিশাল জলধিতে বিলীন হয়ে যায়। আমার মা ও ভাইকে সন্ধান করতে করতে আমিও যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছি বিশ্বের এই মানবসমুদ্রে।

অ্যান্টিফোলাস যখন নিজের মনে তার এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা ভাবছে, ভাবছে কত কষ্ট করে কত দেশ ঘুরলাম, কিন্তু সবই মিথ্যা হয়ে গেল, ঠিক সেই সময়ে একটা ভারী মজার ঘটনা ঘটল। অ্যান্টিফোলাস দেখল সরাইখানার দিকে না গিয়েই ড্রোমিও তার দিকে ফিরে আসছে। সে ড্রোমিওকে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে

তো অবাক। তাকে সে বলল—কী ব্যাপার, এত জলদি ফিরে এলি, টাকাকড়িগুলো কোথায় রাখলি? আসলে যে ড্রোমিওকে অ্যান্টিফোলাস টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে এ সেই ড্রোমিও নয়। এ বড় ভাই ড্রোমিও যে কীনা এফিসাসে থাকে এবং বড় অ্যান্টিফোলাসের ভৃত্য। দুটি ড্রোমিওকে একই রকম দেখতে, একই তাদের বয়স—কাজেই এ ভুল খুবই স্বাভাবিক—অ্যান্টিফোলাস স্বভাবতই মনে করেছে তার ভৃত্যটি বুঝি কাজ না সেরেই ফিরে এসেছে। আবার অ্যান্টিফোলাসের চেহারাও ঠিক তার দাদার অনুরূপ এবং সেইজন্যই তাকে এফিসাসের অ্যান্টিফোলাস মনে হওয়া ড্রোমিওর পক্ষেও স্বাভাবিক। অ্যান্টিফোলাসের প্রশ্নের উত্তরে তাই ড্রোমিও বলল—দিদিমণি আপনাকে বাড়িতে ফিরতে বললেন—তিনি খাবার নিয়ে আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন। আপনি আর দেরী করবেন না, তাহলে খাবার জুড়িয়ে যাবে।

অ্যান্টিফোলাস বলল—এখন কি রসিকতা করার সময়? বল, টাকাটা কোথায় ফেলে এলি? ড্রোমিও তবু সেই একই কথা বলছে—আজ্ঞে, দিদিমণি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে ডেকে দিতে, তিনি খাবার নিয়ে বসে আছেন। অ্যান্টিফোলাস তো রেগে আগুন—সে বলল—কে তোর দিদিমণি? ড্রোমিও বলল—কেন? আজ্ঞে, আপনার ইস্ত্রি। সাইরাকুজবাসী অ্যান্টিফোলাস অকৃতদার, কাজেই বৌ-এর কথা শুনে সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল এবং ড্রোমিওকে বলল—ব্যাটা, দিনরাত শুধু ফাজলামি। আমি তোর সঙ্গে খোলা মনে কথাবার্তা বলি বলে তুই যখন তখন যা নয় তাই বলবি? এখন আমার ও সব বাজে কথা ভাল লাগছে না, ঠিক করে বল, টাকাটা কোথায় গোল্লায় দিয়েছিস। এখানে আমরা কাউকে চিনিনা, এই বিদেশে অতগুলো টাকার দায়িত্ব তুই কার হাতে দিলি? ড্রোমিও ভাবল তার প্রভু বুঝি তার সঙ্গে মস্করা করছেন, কেননা তিনি বলছেন এখানে কাউকে চেনেন না, তিনি বিদেশী, তাই সে-ও একটু ঠাট্টার সুরে বলল—আজ্ঞে মস্করা করতে হয় খেতে বসে করবেন, আমার উপর টাকাকড়ি কেন কোন দায়িত্বই নেই, শুধুমাত্র আপনাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাওয়া ছাড়া—সেখানে চলুন, আপনার অপেক্ষায় বসে রয়েছেন দিদিমণি এবং তাঁর বোন। অ্যান্টিফোলাস আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারল না, প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সে ড্রোমিওকে এক চোট ঠ্যাঙানি দিল। মার খেয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়িতে ফিরে ড্রোমিও সব কথা বলল তার দিদিমণির কাছে—একথাও বলল যে দাদাবাবু বলেছেন তার স্ত্রী বলে কেউ নেই।

আদ্রিয়ানা তো রেগে আগুন। সে ভাবল তার স্বামী অর্থাৎ এফিসাসবাসী অ্যান্টিফোলাস নিশ্চয়ই ইদানীং পরনারীতে আসক্ত হয়েছে। আসলে সে ছিল স্বভাবতই ঈর্ষাপরায়ণা, তাই স্বামীকে সন্দেহ করাটাই ছিল তার প্রকৃতি। ড্রোমিও এসে ঐ কথা বলার পর সে তার স্বামীকে শাপশাপান্ত করতে শুরু করল—এত বড়

কথা—বিয়ে করেনি—আমি দেখে নেব, আজ ফিরুক একবার বাড়িতে। আদ্রিয়ানার রাগ যত বেড়ে চলেছে তার বোন লুসিয়ানাও তাকে তত শান্ত করতে চেষ্টা করছে। সে তার দিদিকে বোঝাতে চেষ্টা করছে কেন সে অকারণ কিছু না জেনেশুনে তার স্বামীকে এমন সন্দেহ করছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

এদিকে অ্যান্টিফোলাস কিছুক্ষণ পরে সরাইখানায় এসে দ্যাখে ড্রোমিও টাকাকড়ি নিয়ে সাবধানেই সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। ড্রোমিওকে দেখে (অর্থাৎ তার ভৃত্য যে ড্রোমিও তাকেই এবার সে দেখল) আবার তার উপর সে চোটপাট শুরু করল। তাকে বলল—ব্যাটা একটু আগে কেন তবে আমার সঙ্গে বাঁদরামি করছিলি, কেন বলছিলি—আপনার বৌ আপনার জন্যে খাবার নিয়ে বসে আছে? তার এই বকাবকির মধ্যেই সেখানে এসে হাজির হল আদ্রিয়ানা। আদ্রিয়ানা ভাবল তার স্বামীই বুঝি চাকরের সঙ্গে বকাবকি করছে। সে তৎক্ষণাৎ অ্যান্টিফোলাসের কাছে গিয়ে তাকে গালমন্দ করতে শুরু করল—কেন সে ড্রোমিওর কাছে ঐ সব বাজে কথা বলেছে ইত্যাদি। এদিকে মহিলাটির কথা শুনে তো অ্যান্টিফোলাস একেবারেই হকচকিয়ে গেছে, সে বেচারা মহিলাটিকে আগে কখনো দ্যাখেনি। কাজেই তার মুখে ঐ সব কথার সে কিছুই মানে বুঝতে পারছে না। আদ্রিয়ানা বলে চলেছে—একদিন তুমি আমার জন্যে পাগল হয়ে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে, তখন আমার জন্যে তোমার কত দরদ, আর আজ কোথাকার কোন মেয়েছেলের জন্যে তুমি আমাকে এমন করে অপমান করলে। বল, কী অপরাধ করেছি আমি, কীসের জন্যে আমাকে তুমি ভুলে যেতে বসেছ? আদ্রিয়ানার এই কথার তোড়ে অ্যান্টিফোলাসের অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠল। সে যতই বোঝাতে চেষ্টা করছে যে সে তার স্বামী নয়, আদ্রিয়ানা ততই তাকে চেপে ধরছে। অ্যান্টিফোলাস বলল—দেখুন, আমি সবে মাত্র দু'ঘন্টা হল এফিসাসে এসে পৌঁছেছি, আমি এখানকার লোক নই। কিন্তু আদ্রিয়ানা তবুও নাছোড়বান্দা। সে বলল—আমি কোন বাজে কথা শুনছি না, আমার সঙ্গে তোমাকে এখুনি বাড়িতে আসতে হবে।

অ্যান্টিফোলাস, অর্থাৎ সাইরাকুজের অ্যান্টিফোলাস, আর কী করবে—অগত্যা তাকে আদ্রিয়ানার পিছু পিছু যেতে হল তার দাদা অ্যান্টিফোলাসের বাড়িতে এবং সেখানে গিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবেশে তার দাদার স্ত্রী ও শ্যালিকার সঙ্গে মধ্যাহ্নের আহারে বসতে হল। খেতে বসে আদ্রিয়ানা প্রতি মুহূর্তেই অ্যান্টিফোলাসকে তার স্বামী ধরে নিয়ে ঘরোয়া কথাবার্তা বলে যাচ্ছে এবং তার ভগ্নি লুসিয়ানাও তাকে ভগ্নিপতি বিশ্বাসে রঙ্গরসিকতা করতে দ্বিধা করছে না। অ্যান্টিফোলাস তো হতভম্বের মতো কিছুই ঠাওর করতে পারছে না—সে ভাবছে বোধ করি স্বপ্নে কখনো তার এমন একটা বিয়ে হয়ে থাকবে এবং সেই অসম্ভব স্বপ্নটি বোধ করি এখনও ভাঙ্গেনি। এদিকে আবার ড্রোমিও তার প্রভুর পিছন পিছন এসেছিল—সে-ও

পড়েছে মহা তালেগোলে। বাড়ির রাঁধুনিটি ছিল তার দাদা ড্রোমিওর স্ত্রী। সেই রাঁধুনিও ভাবল বুঝি এই ড্রোমিওই তার স্বামী—অতএব সে-ও স্বামীজ্ঞানে সাইরাকুজের এই ড্রোমিও বেচারাকে আদরযত্ন করে বিপন্ন করে তুলল।

এই অভূতপূর্ব স্বামী স্ত্রী অবস্থানে যখন এফিসাসের অ্যান্টিফোলাসের গৃহে সেদিনের মধ্যাহ্ন ভোজন পর্ব চলেছে সেই সময়ে সেই গৃহে এসে উপস্থিত হল আসল গৃহস্বামী। সে তখন তার ভৃত্য ড্রোমিওকে সঙ্গে নিয়ে নিত্যকার মত বাড়িতে ফিরেছে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে। কিন্তু বাড়ির বাইরের ফটক ভিতর থেকে বন্ধ। শত ডাকাডাকির ফলেও অন্দরের দাসদাসীরা দরজা খুলতে রাজী নয়। তাদের এক কথা—বাড়ির গৃহিণী বলেছেন যেন বাইরের কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া না হয়। অ্যান্টিফোলাস এবং ড্রোমিও যতই ডাকাডাকি করছে, ভিতর থেকে তারা কেবলই হাসি বিদ্রূপ করে তাদের হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা বলছে—মশাই কে আপনি অ্যান্টিফোলাসের ভেক ধরে বাড়িতে ঢুকতে চাইছেন—স্বয়ং অ্যান্টিফোলাস তো সবে তাব স্ত্রীকে নিয়ে খেতে বসেছেন। আর ড্রোমিও তো তার স্ত্রীর কাছে রান্নাঘরে বসে আছে। আপনাবা অত চিল্লাচ্ছেন কেন ? অ্যান্টিফোলাস এবং ড্রোমিও চেঁচামেচি ও ধাক্কাধাক্কি করে কিছুতেই কিছু করতে পারল না। অবশেষে রেগে মেগে অ্যান্টিফোলাস বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল—সে শুধু অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—এ আবার কে কোথা থেকে এসে বাড়িতে কর্তা হয়ে বসল।

অতঃপর সাইরাকুজের অ্যান্টিফোলাসের মধ্যাহ্নভোজন সমাপ্ত হল। কিন্তু ঐ অপরিচিতা মহিলাটির তাকে নাছোড়বান্দার মত স্বামী বানানোর প্রয়াসে সে বড়ই বিব্রত বোধ করতে লাগল। এদিকে আবার তার কানে এল যে তার ভৃত্য ড্রোমিওরও অনুরূপ একটি স্ত্রী জুটে গেছে এবং সে-ও ড্রোমিওকে নিয়ে পড়েছে। প্রভুভৃত্য দুই-ই এখন মনে মনে ভাবছে—য পলায়তি স জীবতি—এখন এখান থেকে 'প'এ আকার দিতে পারলে প্রাণে রক্ষা পাই। অ্যান্টিফোলাসের যদিও ঐ কুমারী মেয়েটি, অর্থাৎ আদ্রিয়ানার ভগ্নি লুসিয়ানাকে একটু মনে ধরেছিল, কিন্তু আদ্রিয়ানা যে পরিমাণ সন্দেহ বাতিকে উঁচিয়ে আছে সে কিছুতেই তার এই স্বামীকে বোনের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেয় না। বেচারী কী আর করবে, ঐ ভালোলাগাটুকু তার মাঠেই মারা গেল। এখন পৈত্রিক প্রাণটি হাতে নিয়ে কোনপ্রকারে কপাটের বাইরে পা বাড়াতে পারলে সে বাঁচে। রাঁধুনির স্বামী সম্ভাষনে বিব্রত ড্রোমিওরও অবস্থা তথৈবচ—সে-ও এখন বাড়ির বাইরে যেতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। অতঃপর একথা ওকথা বলে কোনরকমে তারা পতিপ্রানা স্ত্রীদের হাত থেকে বাইরে এসে সেদিনের মত তাদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।

কিন্তু বাঁচব বললেই বাঁচা যায় না। আদ্রিয়ানার হাত থেকে তখনকার মত মুক্তি পেলেও সাইরাকুজের অ্যান্টিফোলাসের গেরো তখনও তার পিছনে ধাওয়া করছে।

ঘটনাটা হল এই যে বাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে কিছুদূর আসতে না আসতেই অ্যান্টিফোলাস পড়ল এক স্যাকরার হাতে। সে একটি সোনার হার গড়িয়ে নিয়ে চলছিল এফিসাসের অ্যান্টিফোলাসের বাড়িতেই। পথে এই অ্যান্টিফোলাসকে দেখতে পেয়ে সে তাকে আদত অ্যান্টিফোলাস বলেই ঠাওরালো এবং হারগাছা তার হাতে দিয়ে বলল—এই নিন মশাই আপনার গড়তে দেওয়া হার। অ্যান্টিফোলাস যতই বলে সে কস্মিনকালেও কাউকে হার গড়তে বলেনি, স্যাকরাও উত্তরে বলে—আপনি গড়তে না দিলে আমি কি নিজের ইচ্ছায় গড়েছি? এই নিন আপনার হার, পয়সাকড়ির হিসাব পরে হবে। এই বলে স্যাকরাটি ঐ হারগাছা অ্যান্টিফোলাসের হাতে গুঁজে দিয়ে সেখান থেকে চটপট এগিয়ে গেল। অ্যান্টিফোলাস ভাবল এ আবাব কোন ধন্দে পড়লাম রে বাবা! সে আর অপেক্ষা না করে ভৃত্য ড্রোমিওকে বলল—আর দেরী নয়, শীগগির করে এখান থেকে পাততাড়ি গোটা—মালপত্র যা আছে নিয়ে গিয়ে জাহাজে তোল—এ দেশে আর এক মুহূর্তও থাকা নিরাপদ বোধ হচ্ছে না—মনে হচ্ছে আমরা কিছু তুকতাকের খপ্পরে পড়ে গেছি।

ঘটনায় এবাব আর এক জট পাকালো। যে স্যাকরাটি হার গড়িয়ে ভুল অ্যান্টিফোলাসের হাতে দিয়েছিল সে যখন কিছুদূর এগিয়ে গেছে তখন তাকে পুলিশ এসে হাতকড়া পরাল। বাজারে তার কিছু দেনা ছিল এবং সেই দেনার দায়ে পুলিশ তাকে খোঁজ করছিল। বেচারা পুলিসের হাতে পড়ে যখন কূলকিনারা দেখতে পাচ্ছে না ঠিক সেই সময়েই সেখানে এসে উপস্থিত হল তাকে যে হার গড়তে দিয়েছিল সেই আদি অ্যান্টিফোলাস। স্যাকরা তাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। সে তাকে বলল—মশাই দেখুন তো কী হয়রানি। তা আপনাকে যে হারগাছা এখুনি দিয়ে এলাম তার বাবদ যে টাকাটা আমার প্রাপ্য সেটা আপনি দিয়ে দিন—ঐ টাকাটা পেলে আমি ঋণের দায় থেকে মুক্তি পাব। এ কথা শুনে অ্যান্টিফোলাস তো আকাশ থেকে পড়ল। সে বলল—সে কী কথা? তুমি কখন আমাকে হার দিলে, আমার সঙ্গে তোমার দেখাই বা হল কোথায়? ব্যাস, শুরু হল পরস্পর কথাকাটাকাটি। স্যাকরা বলে আমি নিশ্চয়ই হার আপনাকে দিয়েছি, অ্যান্টিফোলাস বলে—তুমি মিথ্যাবাদী, ধাপ্পা দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাইছ। এমনিভাবে বহুক্ষণ ঝগড়াবিবাদ চলল—উভয়েই যে যার কথার সত্যতা সম্পর্কে নিজের নিজের কাছে নিঃসন্দেহ—কার আর মাথায় আসবে যে আসল গোলটা বেধেছে কোথায়। পুলিসের লোক আর কতক্ষণইবা এই গোলমাল বরদাস্ত করবে। তাই তারা স্যাকরাকে টেনে নিয়ে চলল আটক করতে। স্যাকরাও তখন পুলিশকে বলল ঠকবাজীর দায়ে অ্যান্টিফোলাসকে আটক করতে—সে হারগাছা পেয়েছে অথচ বলছে পাইনি। পুলিশ তো কাউকে বাগে পেলে ধরার বদলে বেঁধে আনতে পারলে খুশি। অতএব অ্যান্টিফোলাসের ভাগ্যেও হাতে পড়ল হাতকড়া—দুটি আসামীকে টানতে টানতে

নিয়ে চলল পুলিশ—থানা হাজতের দিকে।

এদিকে পুলিশের হেপাজতে হাজতের দিকে যাওয়ার পথে অ্যান্টিফোলাসের চোখে পড়ল তার ভৃত্য ড্রোমিও সেই দিক দিয়ে চলেছে। সে ড্রোমিওকে দেখে হাতে আকাশের চাঁদ পেল। তাকে কাছে ডেকে সে বলল—শীগগির যা দেখি, তোর দিদিমণির কাছে গিয়ে আমার অবস্থার কথাটা বল—আর বলবি কিছু টাকা দিয়ে দিতে তোর হাতে। টাকাটা নিয়ে এখুনি চলে আয়। বেচারা ড্রোমিও আবার পড়ল মহা ফাঁপরে। সে তো সাইরাকুজের ড্রোমিও এবং এই মাত্র তথাকথিত দিদিমণির বাড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। তার মাথায় কিছুতেই আসছে না তার কর্তা এ আবার কোন ঝামেলায় পড়ল এবং কেনইবা সে আবার তাকে সেই বিপজ্জনক বাড়িতে পাঠাচ্ছে। এফিসাসের অ্যান্টিফোলাসকে সে তার প্রভু সাইরাকুজের অ্যান্টিফোলাস বলেই ভুল করছে, কাজেই তার এই ধন্দ। সে রীতিমত ঘাবড়েই গেল তার প্রভুর কথাবার্তা শুনে। কেননা সে একটু আগেই জাহাজে মালপত্র তোলার নির্দেশ নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই কাজ শেষ করে অ্যান্টিফোলাসের কাছে জানাতে এসেছিল। যাই হোক, বর্তমান অবস্থায় আর হাসিতামাসা করা শোভা পায় না—তাকে বাধ্য হয়েই মুখ বুঁজে ছুটতে হল আদ্রিয়ানার কাছে। সেখানে তার বাঘের ভয়, কেননা সেখানে যাওয়ামাত্র রাঁধুনি ডাউসাবেল তাকে স্বামী স্বামী করে ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু গত্যন্তর নেই—ঈশ্বর যাদের পরের গোলামী করতে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাদের তো আর নিজের ইচ্ছা বলে কিছু থাকতে নেই। অতএব ডাউসাবেলই ধরুক আর বাঘেই খাক।

আদ্রিয়ানার সঙ্গে দেখা করে ড্রোমিও সহজেই টাকাটা পেয়ে গেল। তার কোন অসুবিধাই হওয়ার কথা নয়; কেননা আদ্রিয়ানা তাকে এফিসাসের ড্রোমিওই মনে করেছে। যাই হোক, সে যখন ফিরে আসছে টাকা নিয়ে তখনই আবার তার দেখা হয়ে গেল তার আসল প্রভু সাইরাকুজের অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে। অ্যান্টিফোলাস সমানেই বিভ্রান্তির ঘোরে হিমসিম খাচ্ছে। সে পথ দিয়ে আসার সময় সকলেই তার সঙ্গে ডেকে এমনভাবে কথাবার্তা বলছে যেন সে তাদের নিজেদেরই লোক। তার দাদা অ্যান্টিফোলাস এই অঞ্চলে খুবই পরিচিত ও সম্মানী ব্যক্তি, কাজেই সকলে তাকে তার দাদা মনে ভেবে যে যার মত কথাবার্তা বলে যাচ্ছে। কেউবা তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলেছে—এই নিন, আপনার টাকাটা এতদিন দিতে পারি নি, কেউবা বলেছে—আপনার কিন্তু ঐ দিনে আমার বাড়িতে একবার আসতেই হবে, না হলে মনে বড় দুঃখ পাবো, কেউবা তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে এই বলে যে—আপনার জন্যেই আমার সেদিন মুখরক্ষা হল, না হলে কী বিপদেই না পড়েছিলাম ইত্যাদি। আসলে সকলেই তাকে এফিসাসের অ্যান্টিফোলাস বলে ভুল করে চলেছে। একজন দরজি তো এসে বলল—আপনার জন্যেই এই সিল্কের থানটা নিয়ে এলাম।

আসুন, আপনার যেমন দরকার পোশাকের মাপটা আজই দিয়ে যান।

অ্যান্টিফোলাস কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। সে ভাবল নিশ্চয়ই সে এসে পড়েছে এক আজব দেশে—সে পড়েছে জাদুকরী আর ডাইনিদের খপ্পরে। তাকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা দূরে থাক, আরও বেশি মুস্কিলে ফেলল তার ভৃত্য ড্রোমিও। ড্রোমিও তাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল—আজ্ঞে আপনি পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেলেন কী করে? এই নিন, আপনি যে টাকা আনতে পাঠিয়েছিলেন ধার শুধতে তা আদ্রিয়ানা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই বলে সে এক থলিভর্তি টাকা দিল অ্যান্টিফোলাসের হাতে। পুলিসের হাতে পড়া, দেনার টাকা আনতে আদ্রিয়ানার কাছে পাঠানো—ড্রোমিওর কাছে এই সব তাজ্জব কথা শুনে অ্যান্টিফোলাসের মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম হল। সে ড্রোমিওর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—এই ব্যাটা নিশ্চয়ই পুরো পাগল হয়ে গিয়েছে—আমরা এ কোন মুলুকে এসে পড়েছি কে জানে—হে ঈশ্বর, আমাদের রক্ষা করুন, যত সত্বর সম্ভব এখান থেকে মুক্তি দিন।

অ্যান্টিফোলাসের হয়রানির এখনো অনেক বাকী। একটি ঘটনা শেষ হতে না হতেই আর একটি ঘটনা তাকে তাড়া করে। এবার এসে উপস্থিত সম্পূর্ণ অচেনা এক মহিলা। সে এসে অ্যান্টিফোলাসকে নাম ধরে ডেকে বলল—তুমি যে সোনার হারটি দেবে বলে কথা দিয়েছিলে সেটি না দিয়ে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? তোমাকে কত আদর যত্ন করলাম—একসঙ্গে বসে পানাহার করলাম, সে সব ভুলে গেলে? অ্যান্টিফোলাসের মেজাজ এমনিতেই গরম ছিল, এখন তার সম্পূর্ণই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল। সে বলল—ডাইনি মেয়েছেলে কোথাকার—আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছ? আমি কখন বলেছি তোমাকে সোনার হার দেব? কখনই বা তোমার বাড়িতে গিয়ে পানাহার করলাম? আমি তো তোমাকে কখনও চোখে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মেয়েটিও সমানে তার দাবী করে চলল—সে বলল—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমার বাড়িতে তুমি গিয়েছিলে, নিশ্চয়ই সেখানে দিন কাটিয়েছ, খাওয়াদাওয়া করেছ এবং তার পরিবর্তে সোনার হার দেবে বলে কথা দিয়েছ। অ্যান্টিফোলাস কিছুতেই তার দাবী মানতে চায় না দেখে সে বলল—মনে পড়ছে না, তোমাকে আমি সেই যে সোনার আংটিটা দিয়েছিলাম, তা-ও অস্বীকার করছ? ঠিক আছে। হার আমি না-ই পেলাম, তুমি দয়া করে আমার সোনার আংটিটি ফেরৎ দাও বাপু। অ্যান্টিফোলাস আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারল না—মেয়েটিকে জাদুকরী, ডাইনি ইত্যাদি গালাগাল করতে করতে আংটির কথা সম্পূর্ণই অস্বীকার করে সে সেখান থেকে পালানোর জন্য ছুটতে আরম্ভ করল। মেয়েটি তো তার এই মেজাজ দেখে ও গালাগাল শুনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল—সে বুঝতেই পারছে না একটা মানুষ কেমন করে এত অল্প সময়ে সব কথা অস্বীকার করতে পারে। কেননা, সে যা

যা বলেছে তার প্রতিটি কথাই সত্যি—অ্যান্টিফোলাস তার বাড়িতে গিয়েছিল এবং সোনার হার দিতে চেয়েছে। আসলে, মেয়েটির ভুল যেটুকু সেটা এই অন্য এক অ্যান্টিফোলাসকে নিয়ে। যে তার বাড়িতে গিয়েছিল সে এই অ্যান্টিফোলাসের দাদা—বড় অ্যান্টিফোলাস।

এবং বড় অ্যান্টিফোলাসের এমন একটি মেয়েছেলের বাড়িতে যাওয়ার পিছনেও এমনি একটি উদ্ভট রহস্য। সে যখন দুপুরে তার বাড়িতে যায় তখন বাড়ির চাকর দাসীরা তাকে তার নিজের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয়নি, কেননা তারা জানতো তাদের বাড়ির কর্তা ভিতরে গিন্নীর সঙ্গে খেতে বসেছে। বাড়িতে ঢুকতে না পেয়ে অ্যান্টিফোলাস নিদারুণ চটে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল তার স্ত্রী তাকে জব্দ করার জন্যে ঐ রকম করছে। তার স্ত্রী যেহেতু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, সে মাঝে মাঝেই তার স্বামীর উপর দোষারোপ করত এই বলে যে তার স্বামীর অন্য মেয়েছেলেদের বাড়িতে যাওয়া-আসার অভ্যাস আছে। সেই কারণেই আজ বাড়িতে ঢুকতে না পেরে অ্যান্টিফোলাস তার স্ত্রীব উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে ঐ স্ত্রীলোকটির বাড়িতে যায়। স্ত্রীলোকটি সত্যিই তার প্রতি খুব শিষ্ট আচরণ করে ও তাকে যত্ন করে আহারের ব্যবস্থা কবে দেয়। তার শিষ্টতায় ও যত্নে অভিভূত হয়ে অ্যান্টিফোলাস তাকে একটি সোনার হার দেবে অঙ্গীকার করেছিল ঠিকই। সোনার হারটিরও একটু ইতিহাস আছে। ওটি তার স্ত্রীর জন্যেই অ্যান্টিফোলাস স্যাকবাকে গড়তে দিয়েছিল এবং ঐ হারটিই স্যাকবা ভুল করে দিয়ে দিয়েছে ছোট অ্যান্টিফোলাসকে। এদিকে আবার একটি দামী সোনাব হার পাওয়া যাবে সেই আনন্দে মেয়েটি তার আংটিটি উপহার দিয়েছিল অ্যান্টিফোলাসকে এবং ছোট অ্যান্টিফোলাসকে যখন সে কিছুক্ষণ আগে ঐ আংটির কথা বলছিল তখন স্বাভাবিকভাবেই সে চটে যায়। কিন্তু মেয়েটিরই বা দোষ কোথায়? সে কেমন করে জানবে যে এরা দুটি ভাই এবং দুজনকে একই রকম দেখতে?

অতঃপর ছোট অ্যান্টিফোলাস যখন স্ত্রীলোকটির কথায় চটে গিয়ে তাকে গালাগাল করতে করতে পালিয়ে গেল তখন স্ত্রীলোকটি স্থির করল আদ্রিয়ানার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলবে তার স্বামীর আচরণ সম্পর্কে (কেননা, সে ছোট অ্যান্টিফোলাসকেই আদ্রিয়ানার স্বামী বড় অ্যান্টিফোলাস বলে ভুল করেছিল)—তার এই উন্মাদের মত আচরণ সম্পর্কে।

আদ্রিয়ানার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল স্ত্রীলোকটি। সে তার কাছে যখন অ্যান্টিফোলাসের আচরণের কথা বলতে শুরু করেছে ঠিক তখনই আবার পুলিশের লোকেরা সেখানে এসে হাজির করল অ্যান্টিফোলাসকে। জেলের অফিসার তাকে নিয়ে এসেছেন, কেননা সে তাঁকে অনুরোধ করে বলেছে বাড়িতে গেলে সে টাকাটা হাতে হাতে দিয়ে দেবে। এদিকে যে আদ্রিয়ানার কাছ থেকে ছোটভাই অ্যান্টিফোলাসের

ভৃত্য ড্রোমিও ভুল করে আগেই টাকাটা নিয়ে গেছে তা এরা জানে না।

আদ্রিয়ানা ঐ স্ত্রীলোকটির মুখে তার স্বামীর পাগলামির যে ইতিবৃত্ত শুনল তার সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হল না, বরং তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে তার স্বামী সত্যিই উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। তার এই প্রত্যয়ের মূলে মধ্যাহ্নভোজনের সময় অ্যান্টিফোলাসের বারবার বলা—সে তার স্বামী নয়, সে তার স্বামী নয়—সে একেবারেই এফিসাসের মানুষ নয়, সবেমাত্র সেদিনই এসে পৌঁছেছে এফিসাসে। অতএব আদ্রিয়ানার আর দ্বিধা রইল না যে তার স্বামী দুপুরে খেতে বসে যে পাগলামি করেছিল সেই ধরনের পাগলামিই করেছে ঐ স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়ে। সে জেলের অফিসারের কাছে টাকা জমা দিয়ে তার স্বামীকে মুক্ত করে নিল। এবার সে বাড়ির চাকরবাকরকে বলল অ্যান্টিফোলাসকে একগাছা দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধতে এবং বাঁধা হলে তাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির ভিতরের দিকে অন্ধ কুঠুরীতে বন্ধ করে রেখে ডাক্তারকে খবর দেওয়ার জন্যে—এখুনি এই উন্মাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। অ্যান্টিফোলাস বেচারা সারাক্ষনই বলে চলেছে সে কিছুই জানে না—সে সম্পূর্ণই সুস্থ আছে—কিন্তু কে তার কথা শোনে? তার নিজের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্যই যে তার এই হয়রানির কারণ তা সে-ও জানে না, অন্য কেউও অনুমান করতে পারে না। কাজেই তাকে পাগল বলাতে সে যতই রেগে উঠছে অন্যেরা ততই তাকে বদ্ধ উন্মাদ বলে মনে করছে। ড্রোমিওরও সেই একই অবস্থা—সে-ও যত বলছে সে এসব জানে না ততই তাকেও সকলে পাগল সাব্যস্ত করে তার প্রভুর মতই দড়ি দিয়ে বেঁধে ঢুকিয়ে দিল সেই অন্ধকার ঘরে।

এবারে আরো এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আদ্রিয়ানা তার স্বামীকে অন্ধকার ঘরে আটক করার একটু পরেই বাড়ির এক ভৃত্য এসে খবর দিল সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে অ্যান্টিফোলাস এবং ড্রোমিও বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙ্গে বেরিয়ে বাড়ির ওধারের রাস্তা দিয়ে দিব্বি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংবাদটি শোনামাত্র আদ্রিয়ানা ছুটে বেরিয়ে গেল তার পাগল স্বামীকে ফের ধরে আনতে এবং সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল বেশ কিছু লোকজন যাতে পাগলকে আটক করা যায়। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা গিয়ে পড়ল একটা কনভেন্টের গেটের কাছে এবং সেখানে তারা সত্যিই দেখল অ্যান্টিফোলাস আর ড্রোমিও হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল অ্যান্টিফোলাস দরজা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাকে তারা দেখতে পেল সে ছোট ভাই অ্যান্টিফোলাস—যমজ ভাইদের চেহারার সাদৃশ্য বরাবরই ভ্রান্তির লুকোচুরি খেলায় এতগুলি মানুষকে নাজেহাল করে ছাড়ছে।

সাইরাকুজের অ্যান্টিফোলাস এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না গোলমালটার মূল কোথায়। সে কেবল তার পরিস্থিতির মোকাবেলা করতেই হিমসিম খাচ্ছে। স্যাকরা তাকে যে সোনার হারগাছা দিয়েছিল সেটা সে গলায় পরে নিয়েছে—আবার

স্যাকরাও তাকে টাকা না দেওয়ার জন্যে গালমন্দ করতে শুরু করেছে, আর সে-ও সমানে বলে চলেছে যে স্যাকরা তাকে আজ সকালে ঐ হারটা এমনিতেই দিয়েছিল—তার পর থেকে স্যাকরার সঙ্গে তার আর একবারও সাক্ষাৎ হয়নি।

এমন সময়ে সেখানে পৌঁছে গেল আদ্রিয়ানা তার লোকজন নিয়ে। তার পাগল স্বামীকে শনাক্ত করে সে বলল—ওইত' পালিয়ে এসে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ধরো ওকে। লোকজনেরা তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে তাকে অর্থাৎ ছোট অ্যান্টিফোলাস আর ড্রোমিওকে জোর করে আটকাতে গেল। তারা দুজন প্রাণের দায়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকে পড়ল কনভেন্টের ভিতর এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পেল মঠাধ্যক্ষাকে। তারা তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা করে বলল—আমাদের বড় বিপদ, দয়া করে আপনার ঘরে আমাদের একটু আশ্রয় দিন।

মঠাধ্যক্ষা কনভেন্টের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরে কীসের এত গোলমাল অথবা কী জন্যে লোক দুটি ভিতরে গিয়ে আশ্রয় চাইল তা তিনি নিজেই দেখতে এসেছেন। তাঁর চেহারায় যেমন গাম্ভীর্যের ছাপ, তেমনি সকলেই তাকে বিশেষ মান্য করে। তাঁর বিচারবুদ্ধিও প্রখর এবং কোন কিছু ঘটলে তা বুঝতে তাঁর দেরী হয় না, কাজেই কী কারণে লোক দুটি তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছে তা ভাল করে না বুঝে তিনি বাইরের লোকেদের হাতে তাদের ছেড়ে দেবেন না। বাইরে বেরিয়ে তিনি আদ্রিয়ানার কাছে তার সব অভিযোগ শুনলেন—আদ্রিয়ানা বলল তার উন্মাদ স্বামীই ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। মঠাধ্যক্ষা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার স্বামীর হঠাৎ এই দশা হল কেন? সমুদ্রে তার বাণিজ্যব্যাপারে কিছু কি খোয়া গিয়েছে? না কী তার কোনো নিকটজন মারা গিয়েছে বলে সে দুঃখে এমন উন্মাদ হল? আদ্রিয়ানা বলল—না, এমন তো কিছু ঘটেছে বলে জানি না। মঠাধ্যক্ষা তখন বললেন—তাহলে এ-ও হতে পারে যে সে তোমাকে ছাড়া অপর কোনো স্ত্রীলোককে ভালবেসে ফেলেছে এবং সেই সব কারণেই এই মানসিক বিকৃতি। আদ্রিয়ানা বলল— আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়—অন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ওর ভাব আছে এবং সেইজন্যেই প্রায়ই ও বাইরে চলে যায়—বাড়িতে থাকে না। আদ্রিয়ানার স্বামী অ্যান্টিফোলাসের বাড়িতে অনেক সময়েই না থাকার আসল যেটা কারণ তা অপর কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি নয়, ঘরে তার নিজের স্ত্রীর সন্দেহ বাতিক ও তার ফলে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। আদ্রিয়ানার কথাবার্তার ধরণ দেখে এই ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর বেশি দেরী হল না। কাজেই ব্যাপারটাকে আরো পরিস্কার করে বুঝে নেওয়ার জন্যে তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন—তা বাছা তোমার স্বামীর যে বাইরে এমন মন তার জন্যে তুমি তাকে কিছু শাসনটাশন করোনি? আদ্রিয়ানা বলল—তা করবনা কেন, খুবই করেছি। মঠাধ্যক্ষা আবার বললেন—হয়তো করেছ ঠিকই, তবে যতটা দরকার তা হয়তো করোনি। আদ্রিয়ানা

তখন মঠাধ্যক্ষাকে বোঝাতে চাইল কী পরিমাণ শাসন সে তার স্বামীকে করতে চেষ্টা করেছে। সে বলল—শাসন করিনি মানে, ওকে শায়েস্তা করার জন্যে যখনই ওর সঙ্গে কথা বলেছি তখন ঐ একই প্রসঙ্গে ওকে কথা শুনিয়েছি—রাতে বিছানায় শুয়ে ঐ কথা তুলে ওর ঘুমের দফারফা করে দিয়েছি—যখন খেতে বসেছি তখন ওর ঐ চরিত্রদোষের খোঁটা দিয়ে ওকে খেতে শুদ্ধু দিইনি। ওর সঙ্গে যখন একা কথা বলার সুযোগ হয়েছে তখন ঐ একই প্রসঙ্গে ওকে জ্বালাতন করেছি, আর যখন অন্যসকলের সামনে কথাবার্তা বলতে হয়েছে তখন আকারে ইঙ্গিতে কথা শোনাতে ছাড়িনি। ঐ একটি বিষয়েই আমি ওকে দিবারাত্র উত্যক্ত করেছি যে ও কেন আমাকে অবহেলা করে অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হল।

মঠাধ্যক্ষা বুঝে নিলেন আড্রিয়ানা কী পরিমাণ সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। এবার তিনি তাকে বললেন—তাহলে দিনরাতই তুমি তাকে এমনি করে লাঞ্ছনা দিয়েছ, তবে তো সহজেই বুঝতে পারছো কী করে সে পাগল হয়েছে। একথা কি জান না যে কারো স্ত্রী যদি সন্দেহ বাতিকের ফলে স্বামীকে দিনরাত গঞ্জনা দেয় তবে সেই গঞ্জনার বিষ পাগলা কুকুরের দাঁতের বিষের চেয়েও ভয়ঙ্কর? বোঝা গেল তোমার গঞ্জনার ফলে সে বেচারা রাতে ঘুমতে পারে নি, তাহলে অবাক হওয়ার কি আছে যে তার মাথায় এখন বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তুমি বলছ যে খেতে বসেও তুমি তাকে সোয়াস্তিতে দুটো খেতে দাওনি, তাই যদি হয়, তবে একথা নিশ্চয়ই জান যে অভক্তি নিয়ে আহার করলে তাতে হজমের গোলমাল হবেই। অতএব হজমের গোলমাল থেকেও এই ধরনের উৎপাত ঘটতে পারে। তুমি আরো বলেছ যে তোমার চেঁচামেচির ফলে তোমার স্বামীর সবরকমের আমোদ-প্রমোদ পণ্ড হয়ে যেত। তাই যদি হয়ে থাকে তবে তো সহজেই বুঝতে পারছ যে একটা মানুষকে যদি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাধারণ আমোদ-আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত করা যায় তবে দিনে দিনে মনমরা হয়ে সে তো হতাশায় ভুগতে বাধ্য। অতএব সহজেই অনুমান করতে পারো যে তোমার সন্দেহবাতিকের ফলেই তুমি তোমার স্বামীর মাথাটি খারাপ করে দিয়েছ।

লুসিয়ানা নিজের দিদিকে বাঁচানোর জন্যে মনে মনে তার পক্ষ হয়ে বলতে চাইল যে তার দিদি ভর্ৎসনা করে থাকে বটে তবে তেমন উৎকটভাবে কিছু করে না—সে তার স্বামীকে মৃদুভাবেই ভর্ৎসনা করে। অতএব সে তার দিদিকে বলল—তুমি কি জন্যে সব দোষ মুখ বুঁজে মেনে নিচ্ছ? কিন্তু আড্রিয়ানা সে কথা কানে তুলল না। মঠাধ্যক্ষার কথায় এবার সে নিজের ভুল বুঝতে পারল।

আড্রিয়ানা নিজের ভুল বুঝতে পারল ঠিকই, এবং তার জন্যে সে লজ্জিত হল তাও সত্যি কিন্তু তবু সে তার জেদ ছাড়বে না, সে তার স্বামীকে তার হাতে দেওয়ার জন্যে মঠাধ্যক্ষার কাছে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। মঠাধ্যক্ষা কিছুতেই তার হাতে তার স্বামীকে ছাড়তে রাজী হলেন না—বাইরের কাউকে তার মঠের ভিতরে প্রবেশ

করতেও নিষেধ করলেন। তিনি মনে মনে স্থির করলেন ঐ মুখরা স্ত্রীর হাতে তার স্বামীকে এখন সমর্পণ করা ঠিক হবে না, বরং অপর কোনভাবে ধীরে সুস্থে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। অতএব তিনি আর কিছু না বলে তাঁর বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন এবং সদরের দরজা বন্ধ করার জন্যে তাঁর প্রহরীদের আদেশ করে গেলেন।

যমজ দুটি ভাই-এর চেহারার সাদৃশ্যের ফলে যে গোলযোগের উদ্ভব হয়েছে তা একের পর এক ঘটনার দ্রুতগতিতে ঐ একটি দিনকে সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যায় এনে হাজির করল—আর সন্ধ্যা হয়ে আসা মানেই বেচারী বৃদ্ধ ঈজিয়নের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ডিউক যে সময়টুকু মঞ্জুর করেছিলেন তা শেষ হতে চলল—একটু পরেই সূর্য্যাস্ত এবং ঈজিয়নেরও মৃত্যুদণ্ড অবধারিত, যদি না এই সময়টুকুর মধ্যে সে পণের টাকা শোধ করতে পারে।

ঐ কনভেন্টের কাছেই নিয়ে আসা হল ঈজিয়নকে। ফাঁসিমঞ্চ সেখানেই। তাঁর সঙ্গে ডিউকও রয়েছেন, কেননা শেষ মুহূর্তেও যদি কোনো ব্যক্তি ঈজিয়নের হয়ে টাকাটা দিতে আসে তাহলে ডিউক ঈজিয়নকে বাঁচাতে পারবেন। ঈজিয়নকে নিয়ে ফাঁসিমঞ্চে আসার কিছুক্ষণ আগেই কনভেন্টের সামনে ঘটে গেছে আদ্রিয়ানার সঙ্গে মঠাধ্যক্ষার কথাবার্তা।

আদ্রিযানা সেখান থেকে ফিরে আসার সময়েই তার চোখে পড়ল ডিউক চলেছেন লোকজন নিয়ে ঐ মঠের দিকেই। সে ডিউকের সামনে গিয়ে তার কাছে বিচার প্রার্থনা করল। সে বলল—ঐ মঠের মধ্যে রয়েছে তার পাগল স্বামী এবং মঠের অধ্যক্ষা তার স্বামীকে তার হাতে দিতে অস্বীকার কবেছেন। আদ্রিয়ানার কথা শেষ হওয়ার আগেই সেখানে এসে উপস্থিত হল তার প্রকৃত স্বামী এবং তার ভৃত্য ড্রোমিও। তাদের যে ঘরে পাগল বলে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল তারা সেই ঘরের দরজা ভেঙ্গে নিজেদের কোনরকমে মুক্ত করে চলে এসেছে ডিউকের কাছে। স্বামী অ্যান্টিফোলাসও বিচারপ্রার্থী—তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার নালিশ সে তাকে পাগল অপবাদ দিয়ে ঘরের ভিতর বেঁধে রেখেছিল। সে আরও বলল কী উপায়ে বাঁধন ছিঁড়ে তারা পাহারায় থাকা লোকজনের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছে। আদ্রিয়ানা তো বিস্ময়ে হতবাক—এই তো তার স্বামী অ্যান্টিফোলাস—তবে যে সে স্বচক্ষে দেখল কনভেন্টের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে তার স্বামী—এ কেমন ব্যাপার! এদিকে অ্যান্টিফোলাসকে দেখতে পাওয়ামাত্র বৃদ্ধ ঈজিয়ন আশার আলো দেখতে পেল। সে ভাবল এই অ্যান্টিফোলাসই বুঝি তার সেই ছোট ছেলে যে তার মা ও ভাইকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। তার ছেলেই তার মুক্তিপণ দিয়ে তাকে উদ্ধার করবে, তার আর ভাবনা কি! অতএব সে অ্যান্টিফোলাসকে পুত্র সম্বোধনে তার সব কথা খুলে বলল এবং মনে ভাবল এবার আর তার কোন ভয় নেই। কিন্তু অ্যান্টিফোলাস

বলল—আপনি এসব কী বাজে বলছেন? আমি তো আপনার ছেলে নই তবে কিজন্যে আপনার দায় নিতে যাবো? বৃদ্ধ তো অবাক। কিন্তু অ্যান্টিফোলাসেরই বা দোষ কি? সে তো কোনদিনই তার পিতাকে দ্যাখেনি। সেই যে জাহাজডুবি হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল তারপর থেকে আর কোনদিনই তাদের দেখা হয়নি। ঈজিয়ন তবু বুঝতে পারছে না কেন তার ছেলে এমনটা করছে - তার মনে হল হয়তো মা আর ভাইকে খুঁজতে খুজতে হতাশায় আর দুঃখে তার সব স্মৃতি লোপ পেয়ে গেছে। নতুবা এ-ও হতে পারে যে পিতার এই বন্দীদশা দেখে লজ্জায় সে বাবাকে বাবা বলে পরিচয় দিতে চাইছে না। ঠিক এই সংকটের মুহূর্তে মঠের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন অধ্যক্ষা এবং দেখা গেল তার সঙ্গে রয়েছে অ্যান্টিফোলাসে এবং ড্রোমিও। আদ্রিয়ানা তো হকচকিয়ে গিয়ে ভাবল এ কী রে বাবা—এ যে চোখের সামনে দুটো স্বামীকে দেখছি আর দুটো ড্রোমিও।

অবশেষে এ যাবৎ কাল যে ধাঁধাঁর ফলে এই পরিমাণ ভ্রান্তির উদ্ভব তার উত্তর মিলে গেল। ডিউক যখন তার সামনে মূর্তিমান একজোড়া অ্যান্টিফোলাস এবং এক জোড়া ড্রোমিওকে দেখলেন তখন তাঁর মাথায় এই রহস্যের সূত্রটি ধরা পড়ল। আজই সকালে তিনি ঈজিয়নের মুখ থেকে তার দুঃখময় জীবনের করুণ কাহিনী অবগত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হল এই দুটি একই রকম চেহারার অ্যান্টিফোলাস অবশ্যই ঐ বৃদ্ধের যমজ সন্তান এবং যমজ ড্রোমিও দুটিও তাদেরই ভৃত্য।

কিন্তু অভূতপূর্ব এই ঘটনার রহস্যজাল উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পেল আরও অপ্রত্যাশিত অথচ চমকপ্রদ একটি আনন্দের সংবাদ—বৃদ্ধ ঈজিয়নের যে মর্মান্তিক কাহিনী আজ সকালে সে ডিউকের কাছে বর্ণনা করেছিল এবং যে কাহিনীর শেষটুকু নির্মমভাবে সমাপ্ত হতে চলেছিল আজ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুদণ্ডে তা এই এক মুহূর্তের বিস্ময়কর সংঘটনে পরিণত হল অকল্পনীয় আনন্দে। মঠের অধ্যক্ষা সেই শান্ত ও আত্মসমাহিত সন্ন্যাসিনী যাঁকে এতক্ষণ মনে হয়েছিল সাধারণ মানুষ থেকে অনেক উর্ধের ও অনেক দূরের তাঁরই মুখ থেকে আমরা শুনলাম তিনিই ঈজিয়নের স্ত্রী—একদিন জাহাজডুবির ফলে একটি সন্তানসহ যে স্ত্রীকে সে চিরকালের জন্যে হারিয়েছিল। তিনিই এই যমজ অ্যান্টিফোলাসের জননী।

জাহাজডুবির পর জেলেরা তাদের নৌকায় ঈজিয়নের স্ত্রী এবং বড় অ্যান্টিফোলাস ও বড় ড্রোমিওকে তুলে নেওয়ার পর তারা যখন শিশুদুটিকে কেড়ে নেয় তখন ঈজিয়নের স্ত্রী মনের দুঃখে আশ্রয় নেয় এক সন্ন্যাসিনী-আশ্রম বা মঠে। সেখানে দীর্ঘদিন নানা কৃচ্ছ্রসাধন ও পূজা উপাসনায় তার দিন অতিবাহিত হয় এবং নিজের স্বভাবগুণে সে কালে ঐ মঠের প্রধান বা অধ্যক্ষার আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঈশ্বরের এমনই খেলা যে আজ মঠাধ্যক্ষা হয়ে সে যে বিপন্ন মানুষটিকে আশ্রয়

দিয়েছিল সেই মানুষটি তারই ছোট ছেলে।

শুধু ভ্রমের নিরসনই নয় অপ্রত্যাশিতভাবে একটি পরিবারের এতগুলি মানুষের হারিয়ে যাওয়া নিতান্ত আপনজনদের ফিরে পাওয়ার আনন্দে তারা পরস্পরকে আদর ও আলিঙ্গনে সব দুঃখ ভুলে গেল। কিন্তু একটি গুরুতর বিষয় এখনও কারো খেয়াল হয়নি। ঈজিয়নের মুক্তিপণ সূর্যাস্তের আগেই দেওয়া না হলে তার প্রাণদণ্ড অনিবার্য। আনন্দের প্রথম পর্ব মিটতেই সকলের সম্বিত ফিরে এল এবং বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে এফিসাসের অ্যান্টিফোলাস গিয়ে নিয়ে এল তার বাবার মুক্তিপণ। ডিউক সমস্ত পরিস্থিতির বিচারে ঐ পণ গ্রহণ করলেন না। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল ঐ মানুষগুলির সঙ্গী হয়ে তাদের কথা শোনার আশায় মঠে গিয়ে প্রবেশ করলেন। এই সঙ্গে ঐ যমজ দুই ড্রোমিওর আনন্দের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। তারা একে অপরের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল—বলল—আরে এতো ভালো দেখতে তোকে? যেন আয়নায় নিজের নিজের মুখ দেখেই তারা এক ভাই আর এক ভাই-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

আদ্রিয়ানাকে তার শ্বশ্রুমাতা নানাভাবে সৎ পরামর্শ দিলেন। এর পর থেকে সে আর তার স্বামীকে অন্যায়ভাবে সন্দেহ করে নিজেও কষ্ট পায়নি, স্বামীকেও নির্যাতন করেনি।

সাইরাকুজের অ্যান্টিফোলাস এতকাল বিয়ে করার কথা ভাবেনি, এবার সে-ও তার ভার্যা নির্বাচন করল তার দাদার শ্যালিকাকে অর্থাৎ লুসিয়ানাকে এবং এর পর বহু বছর যাবৎ ঈজিয়ন তার স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে এফিসাসেই রয়ে গেল। যাবতীয় ভ্রমের সংশোধন ও সমাধানের ফলে দুই ভাইকে ভুল হওয়ার ব্যাপারটি যে বরাবরের জন্যে মিটে গিয়েছিল সেটা ভাবা ভুল হবে, কেননা এই পুরোনো কাহিনীটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যেই বোধ করি কখনও কখনও রাস্তাঘাটে দুই অ্যান্টিফোলাস এবং দুই ড্রোমিওর ধাঁধাঁর ফলে সৃষ্টি হত অতি মজাদার সব ছোট ছোট হাসির নাটক যার মূলে ভ্রান্তি।

মেজার ফর মেজার

অতি ভদ্র ও কোমল প্রকৃতির একজন ডিউক কোন এক সময়ে ছিলেন ভিয়েনা নগরের অধীশ্বর। ডিউকের কোমলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রজারা প্রায়শই দেশের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল—শাস্তির ভয় নেই, কে কার ধার ধারে? এর পর আবার একটি আইন এই ডিউকের আমলে একেবারেই নিপাত্তা হয়ে গিয়েছিল, কেননা তাঁর শাসনকালে একটি বারের জন্যেও ডিউক ঐ আইনটি কুত্রাপি প্রয়োগ করেননি। আইনটি ছিল ভারী জব্বর—এর বিধি অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী ব্যতিরেকে অপর কোনো নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে তার সঙ্গে অবৈধভাবে বাস করে তবে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু ডিউকের ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে এই আইনটিকে কেউ পাত্তাই দিত না এবং তার ফলে বিবাহনামক সামাজিক প্রথাটির পবিত্রতা একেবারেই নস্যাৎ হয়ে শিকেতে উঠে গিয়েছিল। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন অবিবাহিতা কন্যার বাপমায়েরা এসে ডিউকের কাছে নালিশ জানাত যে তাদের মেয়েকে ফুসলে নিয়ে গিয়েছে অমুক কিংবা অমুক এবং মেয়েটি এখন সেই বাউণ্ডুলে অকৃতদার লোকটির সঙ্গে থাকতে শুরু করেছে।

ভালোমানুষ ডিউক পড়লেন মহা বিপদে। একদিকে দেশে এই অনাচার কদাচার দিন দিন বেড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর মনের শান্তি যেমন বিঘ্নিত হতে লাগল, অন্যদিকে আবার ভয় হল যে হঠাৎ আইনের কড়াকড়ি শুরু করলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। তাঁকে তারা স্বৈরাচারী অপবাদও দিতে পারে, কেননা তারা আইনের কড়াকড়িতে একেবারেই অভ্যস্ত নয় এবং তারা সকলেই তাঁর অনুগত। কাজেই ডিউক ভেবে চিন্তে একটা পথ বের করলেন। তিনি স্থির করলেন কিছুকালের জন্যে নিজের রাজ্যের বাইরে গিয়ে থাকবেন এবং এই অন্তর্বর্তী সময়টুকুতে তাঁরই নিযুক্ত একজন প্রতিনিধির উপর শাসনকার্যের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করবেন। আইনের যেটুকু কড়াকড়িতে এই অনাচার বন্ধ হতে পারে তা সেই প্রতিনিধির দ্বারাই সম্ভব হবে, তবে কড়াকড়িটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়—সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

অ্যাঞ্জেলো নামে এক ব্যক্তির সারা ভিয়েনাতে অত্যন্ত নিষ্ঠাচারী হিসাবে সুনাম ছিল। নিয়মশৃঙ্খলায় বাঁধা কাঠখোট্টা ধরনের মানুষ অ্যাঞ্জেলো। তাঁকেই প্রতিনিধি নিযুক্ত করার কথা মাথায় এল ডিউকের। ডিউক তাঁর মুখ্য উপদেষ্টা লর্ড এসকেলাসকে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বললেন। লর্ড এসকেলাস ডিউকের কথা শুনে বললেন—সমগ্র ভিয়েনাতে যদি আপনার দেওয়া এই সম্মানের ভার কারো উপর ন্যস্ত করা ঠিক হয় তবে তিনি লর্ড অ্যাঞ্জেলো।

অতএব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। ডিউক প্রচার করলেন যে তিনি পোল্যাণ্ড

ভ্রমণে যাবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতির কালে লর্ড অ্যাঞ্জেলোই থাকবেন তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে ভারপ্রাপ্ত। আসলে কিন্তু ডিউকের এই পোল্যাণ্ড ভ্রমণে যাওয়ার ব্যাপারটি একেবারেই ভূয়া এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কেননা তিনি তখনই আবার ভিয়েনাতেই ফিরে এলেন, কিন্তু একেবারে গোপণে এক সন্ন্যাসীর বেশে। তাঁর আসল উদ্দেশ্য নিজেকে গোপণ রেখে আড়াল থেকে শাহ্যত সাধুপ্রকৃতির অ্যাঞ্জেলোর শাসন পরিচালনা লক্ষ্য করা।

অ্যাঞ্জেলোর হাতে এই নতুন কর্তৃত্বভার আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি থেকে মেয়ে বের করে নেওয়ার একটি ঘটনা ঘটে গেল। ক্লডিও নামে এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে তার মা-বাবার অজ্ঞাতে ফুঁসলিয়ে বাড়ি থেকে বের করে এনেছে। অ্যাঞ্জেলোর কাছে মেয়ের পিতামাতার নালিশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বহুকাল অপ্রচলিত আইনকে বলবৎ করা হল। প্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলো তাঁর ক্ষমতা বলে ক্লডিওকে ধরে আনালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার শিরশ্ছেদের আদেশ হল। ক্লডিওকে নিয়ে সারা ভিয়েনা শহরে রীতিমত সোরগোল পড়ে গেল। সে ছিল বিশেষ পরিচিত এক উচ্চ বংশের ছেলে। তাকে বাঁচানোর জন্যে অনেকেই এসে অনুরোধ জানালেন অ্যাঞ্জেলোর কাছে। এমনকি সকলের কাছে মাননীয় যে লর্ড এসকেলাস তিনিও এসে অনুরোধ করলেন তার মুক্তির জন্যে। এসকেলাস বললেন —এই ভদ্রব্যক্তিটিকে আমি ক্ষমা করতে অনুরোধ করছি, কেননা এর পিতা অতিশয় ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁরই কথা ভেবে এর অপরাধ এবারের মত মার্জনা করা হোক। লর্ড অ্যাঞ্জেলো বললেন- —না না সে হয় না। আমরা আইনকে একটা কাকতাড়ুয়ায় পরিণত করতে চাইনা। শুধু ভয় দেখানোর জন্যে ধর্মের নামে একটা আইন প্রতিষ্ঠা করলে কালে দেখা যাবে শিকারী বাজগুলো ওটা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং ওটাকে নিয়ে ছেলেখেলা করবে, আদৌ ভয় পাবে না। ক্লডিওর মৃত্যুদণ্ড বহালই থাকবে।

লুসিও নামে ক্লডিওর এক বন্ধু ছিল। লুসিও দেখা করতে গেল ক্লডিওর সঙ্গে জেলখানার ভিতরে। ক্লডিও তার এই বিপদে বন্ধুকে দেখতে পেয়ে তার কাছে অনুনয় করে বলল—ভাই লুসিও, আমার এই উপকারটুকু তোমাকে করতে হবে—আমার বোন ইসাবেল আজই যাবে সেন্ট ক্লারে কনভেন্টে। সেখানে সে দীক্ষার জন্যে চলেছে। তুমি সেখানে গিয়ে তাকে আমার এই বিপদের কথা খুলে বলবে। আর বলবে সে যেন আমার প্রাণরক্ষার জন্যে গিয়ে অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং কট্টর লোকটির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে। সে যেন দ্বিধা বা দেরী না করে। আমার বোনটি গেলে কাজ উদ্ধার হতে অসুবিধা হবে না। সে সহজেই মানুষকে কথা বলে অভিভূত করে ফেলতে পারে। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া বড় শক্ত। তাছাড়া অমন কমবয়সী মেয়ের করুন মুখে এক ধরণের না-বলা কথার আভাস থাকে, মানুষ সহজেই তার কাছে দুর্বল হয়ে পড়ে।

ক্লডিওর বোন ইসাবেলা সেদিনই প্রথম গিয়ে যোগ দেয় ঐ কনভেন্টে নবদীক্ষিতা হওয়ার জন্যে। তার ইচ্ছা তার দীক্ষার পর্ব শেষ হলে সে সম্পূর্ণভাবেই সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করবে। কনভেন্টে যাওয়ার পর সে একজন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল কনভেন্টের আচরণবিধি সম্পর্কে। এমন সময় তার কানে এল কে যেন তার খোঁজ করছে। ক্লডিও প্রেরিত লুসিওই তখন ঐ পবিত্র মঠে প্রবেশ করেছে। ইসাবেল শুনতে পেল কে যেন বলছে—শান্তি, শান্তি। ইসাবেল এই শোনামাত্রই বলল—কে কথা বলছে? সন্ন্যাসিনী উত্তরে বললেন যেন পুরুষের গলা বলেই মনে হচ্ছে। ইসাবেল, লক্ষ্মী মেয়েটি, তুমি গিয়ে দ্যাখ দেখি ভদ্রলোক কী বলতে চান। তোমাকেই যেতে হবে, কেননা আমার যাওয়া চলবে না। আমাদের এখানে এই নিয়ম যে একবার সন্ন্যাসিনীর ব্রতে দীক্ষা নেওয়া হয়ে গেলে প্রায়োরেসের সাক্ষাতে ব্যতীত কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলা চলবে না—পরন্তু কথাবলার সময় তাকে মুখ দেখানো যাবে না, আর যদি মুখ দেখাতেই হয় তবে কিন্তু কথা বলা চলবে না। ইসাবেল জানতে চাইল—এ ছাড়া আর কী কী সুবিধা পেতে পাবে একজন সন্ন্যাসিনী? সন্ন্যাসিনী বললেন—এটাই কি যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া হল না? ইসাবেল বলল—অবশ্যই। আমি কখনই বলব না এর বেশি কিছু আশা করা উচিত, বরং বলব সন্ন্যাসিনীদের নিয়ম শৃঙ্খলা আরো কঠোর হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেন্ট ক্লারার যারা পূজারী তাদের পক্ষে সেটাই শোভা পায়। এমন সময় আবার বাইরে লুসিওর গলা শুনতে পাওয়া গেল। সন্ন্যাসিনী বললেন—দ্যাখ ভদ্রলোক আবার ডাকছেন, যাও লক্ষ্মীটি! গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বল। ইসাবেল বাইরে যাওয়ামাত্র লুসিও তাকে অভিবাদন করল—উত্তরে ইসাবেল বলল—শান্তি হোক, মঙ্গল হোক। কি বলবেন বলুন। লুসিও খুব নম্রভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল—আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন কুমারী সন্ন্যাসিনী, আপনার পবিত্র মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আপনি কুমারী, আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাকে ইসাবেলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন—সেই মেয়েটি এখানে আজই এসেছে দীক্ষার জন্যে— আর তার পরিচয়—সে হতভাগ্য ক্লডিওর বোন। ইসাবেল বলল—হতভাগ্য বলছেন কেন? আমাকেই বলুন, আমিই ইসাবেল, তার বোন ইসাবেল। লুসিও বলল—দেখুন আপনার ভাই এখন জেলে আটক আছে। সে-ই আমাকে পাঠিয়েছে আপনার কাছে। ইসাবেল বলল—হায় হায় সে কি, কিসের জন্যে তাকে জেলে ধরে রেখেছে? লুসিও বলল—একটি মেয়েকে সে ভুলিয়ে তার মা-বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসেছে বলে। ইসাবেল বলল—ও বুঝেছি, ও নিশ্চয়ই জুলিয়েট হবে, আমরা ওকে বরাবর 'বোন' বলেই সম্বোধন করি। আসলে জুলিয়েট ও ইসাবেল কেউ কারো বোন নয়, ওরা পরস্পরকে 'বোন' বলে সম্বোধন করত, কেননা ওরা ছিল একসময়ে একই স্কুলের বন্ধু। ইসাবেল জানত যে জুলিয়েট ক্লডিওকে ভালবাসত। তাই সে বলল—বোধ করি জুলিয়েটের

ভালবাসার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই ক্লডিও এমন একটা গর্হিত কাজ করে বসে আছে।

লুসিও বলল—হ্যাঁ, মেয়েটির নাম জুলিয়েটই বটে।

ইসাবেল বলল—তাহলে জুলিয়েটকে বিয়ে করে নিক ক্লডিও। লুসিও বলল—ক্লডিও তো খুশিই হবে জুলিয়েটকে বিয়ে করতে পেলে। কিন্তু তার সে উপায় কোথায়? লর্ড অ্যাঞ্জেলো তো তার মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়ে বসে আছেন। আর আমারও আপনার কাছে সেইজন্যে আসা। ক্লডিও আমাকে বলে দিয়েছে আপনাকে অনুরোধ করে বলতে যে আপনি যদি গিয়ে কোনরকমে লর্ড অ্যাঞ্জেলোকে ঠাণ্ডা করে মৃত্যুদণ্ডের আদেশটি রোধ করতে পারেন। ইসাবেল বলল—কিন্তু আমার সে ক্ষমতা কোথায়? আমার মত একটা সাধারণ মেয়ের কথায় লর্ড অ্যাঞ্জেলোর মত মানুষ কান দেবেন এ আমি ভাবতেও পারি না।

লুসিও বলল—আমাদের এই আত্মবিশ্বাসের অভাবটাই আসলে আমাদের বড় ক্ষতি করে। এর ফলে আমরা সাহস করে এগোতে পারি না এবং যা লাভ করার কথা তা লোকসান করে ফেলি। আপনি একবার গিয়েই দেখুন না লর্ড অ্যাঞ্জেলোর কাছে। আপনাদের মত মেয়েরা কোথাও গিয়ে হাত পাতলে কিংবা চোখের জল ফেললে মানুষের মধ্যে বদান্যতা দেখানোর জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। ইসাবেল বলল—ঠিক আছে, দেখি কী করতে পারি। তবে আমাকে এখানে প্রায়োরেসের কাছে আগে জানিয়ে তবেই যেতে হবে। তারপরই আমি লর্ড অ্যাঞ্জেলোর কাছে গিয়ে দেখা করব। আপনি আমার ভাইকে গিয়ে বলুন। তাকে বলবেন, ভয় নেই, আজ সন্ধ্যাব মধ্যেই আমি তার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করছি।

ইসাবেল যত সত্বর সম্ভব গিয়ে উপস্থিত হল ডিউকের প্রাসাদে। সেখানে গিয়ে সে নতজানু হয়ে ডিউকের প্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলোর কাছে বলল—মহামান্য প্রতিনিধি, আমি এক অতি হতভাগিনী আপনাব কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি। অ্যাঞ্জেলো বললেন—বল, কী তোমার আবেদন? ইসাবেল তখন অতি কাতর অনুনয় বিনয় করে তার ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা করল। উত্তরে অ্যাঞ্জেলো বললেন—তা তো হবার নয়, তোমার ভাই-এর অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়, তার মৃত্যু অনিবার্য। ইসাবেল বলল— এ আইন যথার্থ বটে তবে বড়ই কঠোর। কী আর করতে পারি আমি, জানবো আমার একটিমাত্র ভাই ছিল সে নেই—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। লুসিও এতক্ষণ ইসাবেলের সঙ্গেই ছিল। সে ইসাবেলকে বলল—এত সহজে হার মানলে চলবে না। যান, আবার গিয়ে ওঁকে ধরুন, হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করুন, যতক্ষণ না ওঁর মর্জি হয় কিছুতেই ওর কাছ ছাড়বেন না। আপনার কথা বলার মধ্যে তেমন আগ্রহের প্রকাশ নেই—এত বড় একটা ব্যাপারে অমন ঠাণ্ডা গলায় প্রার্থনা জানালে চলে না। ইসাবেল তখন আরো কাতরভাবে অ্যাঞ্জেলোর কাছে

অনুনয় করতে লাগল—সে নতজানু হয়ে বসে রইল, বলল—দোহাই আপনার একটু দয়া করুন। অ্যাঞ্জেলো বললেন—সে আর সম্ভব নয়, তার দণ্ডাদেশ জারী হয়ে গেছে। বড় দেরী করে ফেলেছ। ইসাবেল বলল—দেরী হয়েছে তো তাকে আর কি ফেরানো যায়না? কেন, আমি তো একটা কথা বলে ফেললে আবার তা ঘুরিয়ে নিতে পারি। অনুগ্রহ করে শুনুন মহামান্যবর—যারা প্রকৃতই মহৎ বা ক্ষমতাসীন তাঁদের যা কিছু শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন, রাজার রাজমুকুট, সেনাধ্যক্ষের তরবারি, মার্শালের দণ্ড, বিচারকের পোশাক—এর কোন কিছুই তাঁদের করুনার মহত্বের চেয়ে কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ নয়। অ্যাঞ্জেলো বললেন—হয়েছে, হয়েছে, আমি বলছি তুমি এখন যেতে পার। ইসাবেল তবুও অনড়—সে কিছুতেই যাবে না—সে বলল—মান্যবর, আপনি যদি আমার ভাইয়ের পরিস্থিতিতে পড়তেন তবে আপনার হয়তো ওরই মতন স্খলন ঘটতে পারতো, কিন্তু আমার ভাই আপনার অবস্থায় বসে কখনই আপনার মত কঠিন হতে পারত না। আপনি যদি আমার মতই তার বোন হতেন তবে কি আপনি এত কঠিন হতে পারতেন? কিছুতেই পারতেন না। বিচারক কখনই বুঝতে চায়না কারাবন্দীর মর্মবেদনার কথা। অ্যাঞ্জেলো বললেন—একটু শান্ত হয়ে বুঝতে চেষ্টা কর। তোমার ভাই-এর এই দণ্ডাদেশ হয়েছে আইনের বলেই, আমার এতে কোন হাত ছিল না। তোমার ভাই-এর পরিবর্তে যদি আমার কোন নিকটজন, আমার নিজের ভাই, এমন কি আমার পুত্রও যদি এই অপরাধ করত তবে তারও এই একই শাস্তি পেতে হত। অতএব, আগামী কালই তাকে প্রাণদণ্ড পেতে হবে। ইসাবেল বলল—কালই? এ বড় আকস্মিক, তাকে একটু সময় দিন, একটু সময়—সে যে এখনও মৃত্যুর জন্যে একটুও প্রস্তুত হতে পারে নি। আমরা উদরপূরণের জন্যে যে অতি সামান্য মোরগটিকে জবাই করি সেটিকেও দিনক্ষণ বিচার না করে করি না, আর আইনের জন্য এত বড় একটা পবিত্র বলিদান হতে চলেছে সাধারণ ক্ষুন্নিবৃত্তির চেয়েও হীনভাবে? হে মহামান্য প্রতিনিধি, একটু ভাল করে ভেবে দেখুন—আমার ভাই যে অপরাধের ফলে আজ প্রাণ দিতে চলেছে এর আগে অন্য কাউকেই সেই অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়নি। কত মানুষই তো আজ অবধি এই একই অপরাধ করে আসছে। আপনিই আজ প্রথম এই শাস্তি দিতে চলেছেন, আমার ভাই-ই প্রথম এই শাস্তির বলি হতে চলেছে। একবার আপনার নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখুন, মান্যবর, একবার অনুভব করতে চেষ্টা করুন, সেখানে কি একটুও কিছু উঁকি দেয়না যার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে আমার ভাই-এর অপরাধের? যদি সেই অপরাধটুকু মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বলে আপনার মনে হয় তবে নিশ্চয়ই আপনি আমার ভাইকেও মুক্তি দেবেন। ইসাবেলের এই শেষ কথাগুলির ফলে অ্যাঞ্জেলোর মনে কোথায় যেন দোলা লাগল—তাইত। ইসাবেলের রূপ তাঁর রক্তকে কেমন যেন উদ্দাম করে

তুলেছে—অ্যাঞ্জেলো মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করলেন—কেমন করে ইসাবেলকে পাওয়া যায়—তাঁর মনেও ঢুকে পড়েছে সেই বীজ যে বীজের ফলে আজ ক্লডিও অপরাধী। অ্যাঞ্জেলো তাঁর এই মানসিক দ্বন্দ্বে পীড়িত বোধ করলেন, তিনি ইসাবেলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ইসাবেল কিন্তু একাকাট্টা হয়ে বলে চলেছে। সে বলল—মান্যবর, আমার দিকে মুখ ফেরান, দেখুন আমি কি উৎকোচ এনেছি আপনার জন্যে। অ্যাঞ্জেলো বললেন—এত বড় কথা, আমার জন্যে উৎকোচ—তুমি ভেবেছ কি, আমাকে তুমি ঘুষ দিয়ে বশ করবে? ইসাবেল বলল—হ্যাঁ, প্রভু, আমি তাই দেব, জানেন সে উৎকোচ কেমন? স্বয়ং ঈশ্বর সেই উপহার আপনার সঙ্গে সমান ভাবে গ্রহণ করতে উৎসুক—সে উপহার সোনা দানা নয়, চাকচিক্যময় হীরে পান্নাও নয়, কেননা সেগুলি তো শুধু তাদেরই কাছে মূল্যবান যারা সেগুলিকে মূল্যবান মনে করে—আমি যে উপহার দেব তা প্রকৃত স্তবগান যা সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্তে স্বর্গের দিকে উত্থিত হয়—তা পবিত্র চিত্তের স্তবগান, তা উপবাসপবিত্র শুদ্ধ কুমারীর হৃদয়মথিত, তার মধ্যে পার্থিব কোন গ্লানির স্পর্শ নেই। অ্যাঞ্জেলো বললেন—ঠিক আছে, আগামীকাল তুমি এসো।

এই সামান্য সময়টুকু পাওয়ার অনুমতিতে ইসাবেলের মনে আনন্দ হল, সে ভাবল হয়তো কাল এসে সে তার ভাইকে মুক্ত করে নিতে পারবে। অ্যাঞ্জেলোর রূঢ় মনোভাব অনেকটা নমনীয় হয়েছে। যাওয়ার সময় ইসাবেল তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে গেল—ঈশ্বর আপনার সহায় হোন, ঈশ্বর আপনার মান রক্ষা করুন। ইসাবেলের এই কথা শোনামাত্রই অ্যাঞ্জেলোর কেমন যেন নিজের কাছে নিজেকে অসহায় বোধ হল। তিনি ভীত হয়ে পড়লেন—শুরু হল বিবেকদংশন। তাঁর মনে হল—তবে কি আমি মনে মনে এই মেয়েটিকে ভালবাসতে শুরু করেছি। কেন ওকে আবার আসতে বললাম? নিশ্চয়ই ওর পবিত্র রূপ আমার মনে লালসা জাগিয়েছে? এ কী হল? এ নিশ্চয়ই শয়তানের কারসাজি—এক পবিত্রতা মোহ হয়ে দেখা দিয়েছে আর এক পবিত্রতাকে কলুসিত করবে বলে। কই, এর আগে কোনদিনই তো কোন অসৎ নারীর ছলনায় আমি ভুলিনি, আজ এই পবিত্র নারীর মোহেই আমি আত্মবিস্মৃত হলাম? মানুষের দুর্বলতা দেখে এতকাল যে আমি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছি, আজ সেই আমিই দুর্বল হয়ে পড়লাম?

দিন গেল, রাত হল। সেদিনের রাতটি অ্যাঞ্জেলোর কাছে বড় নিদারুণ। যে বন্দীকে তিনি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন তার মর্মযন্ত্রণার চেয়েও অধিক মর্মযন্ত্রণায় তাঁর ঘুম এল না—তিনি বিবেকের দংশনে বড় অসহায় বোধ করলেন। তাঁর কারাগারে বন্দী ক্লডিও বরং তখন অনেক পরিমাণে শান্ত, কেননা প্রকৃত ভালোমানুষ ডিউক তখন সন্ন্যাসীর বেশে কারাকক্ষে প্রবেশ করে তাকে নানা ধরণের সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন।

কিন্তু অ্যাঞ্জেলোর মনে সেই পাপচিন্তা আর তার জন্যে অনুশোচনা। তিনি বারবার ভয়ে কেঁপে উঠছেন তাঁর এই অপরাধ চিন্তার জন্যে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের উপর তাঁর আর কোন জোর রইল না—অপরাধ চিন্তাই তাঁকে সম্পূর্ণ গ্রাস করল। ইসাবেলের কাছে উৎকোচের কথা শুনে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন, আর এখন তাঁর মন ঝুঁকে পড়ল ইসাবেলকে কী ভাবে জয় করা যায় তারই চিন্তায়। তিনিই এখন তাকে সবরকম উৎকোচ দিতে প্রস্তুত, এমন কি, সবচেয়ে বড় যে উৎকোচ পেলে সে আর না বলতে পারবে না সেই উৎকোচ, অর্থাৎ তার ভাইয়ের প্রাণরক্ষা।

পরদিন সকালে ইসাবেল এল। অ্যাঞ্জেলো চাইলেন তিনি তার সঙ্গে কথা বলবেন সকলের অসাক্ষাতে, অর্থাৎ একান্তে। ইসাবেলকে একান্তে পেয়ে তিনি বললেন—তোমার ভাই-এর প্রাণরক্ষা হতে পারে মাত্র একটি শর্তে, আমার ভালবাসার সাধ তোমাকে মেটাতে হবে। তিনি আরো বললেন—ইসাবেল, আমি যে তোমাকে ভালবাসি। একথা শোনামাত্রই ইসাবেল বলল—আমার ভাইও তো জুলিয়েটকে ভালইবাসে—তবে সেই অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড দিলেন কেন? অ্যাঞ্জেলো বললেন—তোমার ভাই এর কোনো ক্ষতি হবে না যদি তুমি শুধুমাত্র রাজী হও রাত্রে গোপণে আমার কাছে আসতে, ঠিক যেমন তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল জুলিয়েট ক্লডিওর কাছে। ইসাবেল তো অবাক। এমন হীন প্রস্তাব আসতে পারে একথা সে ভাবতেও পারে না। যে অপরাধে তার ভাই-এর প্রাণদণ্ড হতে চলেছে সেই একই অপরাধের প্রস্তাব এবং বিচারক নিজে? সে বলল—দোহাই আপনার, আমাকে নিষ্কৃতি দিন, আমাকে যদি আমার ভাই-এর মত মৃতুদণ্ডও পেতে হয়, যদি তীব্র চাবুকের কশাঘাতে কশাঘাতে আমার সমস্ত দেহ জর্জরিত হয়ে যায় তবে সেই আঘাতকে আমার মনে হবে চুনী পান্নার মত, আর সেই মৃত্যুকে আমার মনে হবে কোমল শয্যার মত, কিন্তু আপনার ঐ জঘন্য প্রস্তাবের চেয়ে লজ্জার আর কিছুই হতে পারে না।

অতঃপর ইসাবেল বলল—ও বুঝেছি, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে চান, তাই এই প্রলোভন।

অ্যাঞ্জেলো উত্তরে বললেন—না, তোমাকে পরীক্ষা নয়, বিশ্বাস কর ইসাবেল আমি সত্যের নামে শপথ করে বলছি, এ আমার অন্তরের কথা।

রাগে ইসাবেলের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। সে বলল—সত্যের নামে শপথ? এই অধর্মের আচরণে আপনি সত্যের নামে শপথ করছেন? এই হীন ও জঘন্য প্রস্তাব আপনি করছেন সত্যের দোহাই দিয়ে? শুনুন অ্যাঞ্জেলো, আমি আপনাকে ছাড়ছি না। এখুনি আপনাকে আমার ভাইয়ের মুক্তির জন্যে আদেশ দিতে হবে, নতুবা আমি সর্বসমক্ষে আপনার এই হীন প্রস্তাবের কথা বলে দেব—বলে দেব কত জঘন্য মানুষ আপনি।

অ্যাঞ্জেলো বললেন—কে তোমার কথা বিশ্বাস করবে ইসাবেল? সকলেই আমাকে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ বলে জানে, সকলেই জানে আমি কত কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা নিজেকে সংযত করেছি, কাজেই তোমার ঐ অপবাদ সম্পূর্ণই চাপা পড়ে যাবে আমার সুনামের নীচে। তার চেয়ে লক্ষ্মী মেয়েটির মত আমার কথা শোনো, নচেৎ তোমার ভাইকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আর যদি তাতে তোমার আপত্তি থাকে তবে বাইরে গিয়ে যা খুশি বলতে পারো, তোমার সব সত্যিকথা তখন আমার একটি মিথ্যা কথার নীচে চাপা পড়ে যাবে—যাও, ভেবে দেখ। কাল এসে দেখা কোরো।

ইসাবেলের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল—সত্যিই তো কে আমার কথায় বিশ্বাস করবে, কার কাছেই বা আমি নালিশ জানাব? রক্ষকই যেখানে ভক্ষক সেখানে কে আমাকে রক্ষা করবে? এই কথা বলতে বলতে ইসাবেল চলল সেই অন্ধকার কারাকক্ষের দিকে যেখানে তার ভাই বন্দী। কারাকক্ষে গিয়ে ইসাবেল দেখল তার ভাই সেখানে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে ধর্মালোচনায় ব্যস্ত। ঐ সন্ন্যাসীটিই সাধুবেশধারী ডিউক। ডিউক ওদিকে জুলিয়েটের সঙ্গেও গিয়ে সাক্ষাৎ করেছেন সাধুর বেশে। তিনি জুলিয়েটকে ক্লডিওর কাছে নিয়ে এসেছেন এবং দুজনকেই বুঝিয়ে দিতে চাইছেন তাদের অপরাধের প্রকৃত গুরুত্বের কথা। জুলিয়েট কিন্তু বারবারই বলছে ক্লডিওর কোন দোষ নেই, সব দোষ তারই, কেননা সে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই ক্লডিওর প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে।

ইসাবেল তার ভাই-এর কারাকক্ষে প্রবেশ করে বলল—শান্তি হোক, সাধু সঙ্গ হোক। ছদ্মবেশী ডিউক বললেন—কে ওখানে? এস, তোমার কথাগুলি তো ভারী সুন্দর। ইসাবেল বলল—আজ্ঞে, আমার অতি সামান্যই প্রার্থনা—আমি ক্লডিওর সঙ্গে দুটি-একটি কথা বলে চলে যেতে চাই। ডিউক তখন ওদের দুই ভাইবোনকে এক জায়গায় রেখে চলে গেলেন এবং কারার ভারপ্রাপ্ত প্রোভোস্তকে বললেন—আমাকে এমন একটি জায়গা দেখিয়ে দাওতো যেখানে থেকে আমি গোপণে ওদের ভাইবোনের কথাবার্তা শুনতে পারি।

ক্লডিওই প্রথম কথা বলল—সে ইসাবেলকে জিজ্ঞাসা করল—কিছু সুখবর আনতে পারলে কি দিদি?

ইসাবেল উত্তরে বলল—আগামীকাল তোমার মৃত্যু—তুমি প্রস্তুত হও। ক্লডিও বলল—কেন, কোন প্রতিকারই কি নেই?

হ্যাঁ আছে, ইসাবেল বলল—সে প্রতিকারে সম্মত হলে তোমার মান সম্মান জলাঞ্জলি যাবে, অতি হীন হয়ে তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। ক্লডিও বলল—তার মানে?

ইসাবেল বলল—বড় ভয় করছে তোমাকে বলতে, ক্লডিও। ভয়ে আমার বুক

শুকিয়ে যাচ্ছে, ভাবছি যদি সারাজীবনের মানসম্মানের চেয়ে তোমার কাছে বড় হয়ে ওঠে মাত্র অল্প কটি বছর সুখ ও আরামে বেঁচে থাকার আকাঙ্খা। ঠিক করে বলতো—মরতে ভয় পাও? জানো, মরতে হবে এই চিন্তাটাই আসলে মানুষকে বেশী করে কষ্ট দেয়—মৃত্যুর স্বাদ অথবা যন্ত্রণা একটি সামান্য কীট যাকে আমরা প্রতিদিন পায়ের তলায় পিষে হত্যা করি এবং একটি বিশালকায় দৈত্য—এই দুই-এরই এক।

ক্লডিও বলল—তুমি কেন আমাকে এমন করে লজ্জা দিচ্ছ? তুমি কি মনে করো আমি সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে জীবনের এই গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব? যদি মরতেই হয় মরব, মৃত্যুর অন্ধকারকে তখন আমি আমার প্রিয়তমার মত জড়িয়ে ধরব, তাকে আদর করব।

তুমি আমার ভাই-এর মত কথাই বলেছ—ইসাবেল বলল—ঠিক যেন আমাদের স্বর্গত পিতার কণ্ঠ শুনতে পেলাম তার কবরের থেকে এলো। হ্যাঁ ভাই, তোমাকে মরতেই হবে। তবে ভাবতে পারো কি, আমাদের এই পবিত্রতার মুখোশপরা ডেপুটি অ্যাঞ্জেলো আমাকে যে হীন প্রস্তাব দিয়েছিল আমি যদি তাতে সম্মত হতাম তবে তোমার জীবন রক্ষা হত? আমার কুমারীত্ব নাশের কথা না বলে ও যদি আমাকে বলতো মরতে হবে, তবে তোমাকে বাঁচানোর জন্যে আমি জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হতাম না।

ক্লডিও বলল—ঠিক বলেছ, তোমাকে ধন্যবাদ।

ইসাবেল বলল—কালই তোমার মৃত্যুর দিন, প্রস্তুত হও।

ক্লডিও বলল—বড় ভয় লাগে মরতে।

ইসাবেল বলল—কিন্তু কলঙ্কিত জীবন যে বড় ঘৃণ্য। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

এবার মৃত্যুর ভয় ধীরে ধীরে ক্লডিওর শিরা উপশিরার মধ্যে প্রবেশ করে ক্লডিওর সমস্ত মনোবলকে আচ্ছন্ন করে দিল। মৃত্যুর মুহূর্তে পাপী ও অপরাধীরা যেমন আতঙ্কে শিহরিত হয় তেমনি আতঙ্কে ক্লডিও ইসাবেলকে বলল—দিদি তুই আমাকে বাঁচতে দে। তোর ভাই-এর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোর যদি পাপ হয় তবে কেউ তোকে পাপী বলবে না, সকলে বলবে তুই পুণ্যবতী।

ইসাবেল ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বলল—এমন কাপুরুষ তুই! এমন ইতরের মত তোর অধঃপতন! তুই কীনা আমার মান সম্মানের বিনিময়ে তোর জীবনটাকে ভোগ করতে চাস—ছিঃ। আমি কী মনে ভেবেছিলাম জানিস—ভেবেছিলাম, তোর মধ্যে এখনও একটা মানুষ লুকিয়ে আছে যে কীনা বিশটা ফাঁসিকাঠে মাথা দিতেও প্রস্তুত যদি তার অতগুলি মাথা থাকে, তবু সে কিছুতেই তার বোনের সম্মান ক্ষুন্ন হতে দেবে না।

ক্লডিও বলল—শোনো, শোনো। কিন্তু তার দুর্বলতা ঢাকার জন্যে আত্মপক্ষ

সমর্থনের কথা শুরু হওয়ার আগেই তার কথায় ছেদ পড়ল—অকস্মাৎ সেই স্থানে ডিউকের প্রবেশের ফলে।

সাধুবেশী ডিউক বললেন—ক্লডিও, আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। অ্যাঞ্জেলোকে আমি জানি। তোমার বোনের প্রতি তার কোন অসৎ অভিপ্রায় নেই। সে যা বলেছে সে শুধু তোমার বোনের আত্মসম্মানবোধ বিচার করে দেখার জন্যেই। আর যেহেতু তোমার বোন সত্যিই পবিত্র চরিত্রের তাই সে-ও অ্যাঞ্জেলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তার প্রত্যাখ্যান করাতে অ্যাঞ্জেলো খুবই খুশি হয়েছে। কাজেই, এখন তোমার মনকে প্রস্তুত কর। তোমার প্রাণদণ্ড নিশ্চিত। ক্লডিও একথা শুনে একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল—কেন সে এমন করে তার বোনের কাছে নিজের হীনতা প্রকাশ করতে গেল—সে বলল—দোহাই, আমাকে আমার বোনের কাছে মাপ চাইতে দিন। আমি আমার তুচ্ছ প্রাণের প্রতি এতই আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম যে তাকে আমি বুঝতে পারিনি। এই কথা বলতে বলতে অপমানে লজ্জায় আর দুঃখে ক্লডিও সেখান থেকে চলে গেল।

ক্লডিও চলে যাওয়ার পর ডিউক ইসাবেলকে একা পেয়ে বললেন—আমি ভারি খুশি হয়েছি, সত্যিই ঈশ্বর তোমাকে যেমন রূপ দিয়েছেন ঠিক তেমনিই গুণ দিয়েছেন। ইসাবেল একথা শুনে বলল—হায়, আমাদের সেই সাধুপ্রকৃতির ডিউক আজ অ্যাঞ্জেলোকে বিশ্বাস করে এমন প্রতারিত হলেন! যদি আবার তিনি ফিরে আসেন তবে আমি নিশ্চয়ই তাঁর কাছে সব কথা খুলে বলব, বলব তাঁর শাসনব্যবস্থার আজ কেমন দুর্গতি। ইসাবেল ঘৃণাক্ষরেও অনুমান করতে পারেনি যে সে যাঁর সঙ্গে এই সব কথা বলে চলেছে তিনি নিজেই ডিউক। ডিউক ইসাবেলের কথার উত্তরে বললেন, তোমার সেজন্যে কোন ভাবনা করতে হবে না, ডিউকের সঙ্গে দেখা করার সে সুযোগ তুমি পাবে। তবে এখন সমস্ত ব্যাপারটা এমন হয়ে আছে যে তুমি যদি অ্যাঞ্জেলোর নামে কিছু বলতে যাও তবে অ্যাঞ্জেলো তোমার কথা উড়িয়ে দেবে। কাজেই, আমি যা বলছি শোন। আমার পরামর্শ মত চলতে হবে। আমার ধারণা আমার পরামর্শ অনুসারে চললে তুমি একজন অতি দুঃখী ও লাঞ্ছিতা নারীকে রক্ষা করতে পারবে, আর তার সঙ্গে আরো পারবে এই কঠোর আইনের শৃঙ্খল থেকে তোমার ভাইকে মুক্ত করে আনতে—আর এর জন্যে তোমার মান সম্মানের গায়ে একটুও আঁচড় লাগবে না, বরং ডিউক আজ এখানে না থাকলেও, যদি কখনো তিনি ফিরে আসেন তবে তিনি তোমার উপর খুবই প্রসন্ন হবেন। ইসাবেল বলল—আমি সব কিছুই করতে প্রস্তুত আছি, শুধু এমন কিছু বলবেন না যা আমার পক্ষে অসম্মানকর। ডিউক বললেন—যা সদ্‌গুণ তা সর্বদাই মাথা উঁচু করে রাখে, কিছুতেই ভয় পায় না। তার পর তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কখনো মেরিয়ানার কথা শুনেছে কী না, যে কীনা ছিল ফ্রেডরিকের বোন—ফ্রেডরিক—সেই

মস্ত বড় যোদ্ধা যার মৃত্যু হয়েছিল জাহাজডুবিতে। ইসাবেল বলল—হ্যাঁ, আমি শুনেছি মেরিয়ানার কথা, তার সুখ্যাতিও অনেক শুনেছি। ডিউক বললেন—জানো, ঐ মেরিয়ানাই অ্যাঞ্জেলোর স্ত্রী। বেচারার বিয়েতে যে যৌতুক দেওয়ার কথা ছিল তা তার দাদার সঙ্গে ছিল এবং ঐ জাহাজডুবির ফলে সব কিছু ডুবে যায়। তার দাদারও মৃত্যু হয়। এবাব বুঝতে চেষ্টা কর ঐ জাহাজডুবিতে কী সর্বনাশ হল মেয়েটির। সে যে শুধু তার দাদাকেই হারালো তাই নয়—অমন বীরের মত ভাই যে কীনা তার বোনকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসত—ঐ মেয়েটি আরো হারালো তার সঙ্গে ঐ অ্যাঞ্জেলোকে স্বামীরূপে পাওয়ার আশা। কেননা, জাহাজডুবির ফলে ধনরত্ন ডুবে যাওয়ায় যেহেতু যৌতুকের আর আশা রইল না অমনি ঐ অর্থলোভী অ্যাঞ্জেলো তার স্ত্রীর নামে অপবাদ দিয়ে তাকে ত্যাগ করে দিল, আর তারপর থেকে মেরিয়ানা শুধু চোখের জলই ফেলেছে, কেউ তাকে ডেকে কথা বলেনি। অ্যাঞ্জেলোর এই অন্যায় নির্দয়তার জন্যে তার প্রতি মেরিয়ানার আর বিন্দুমাত্র ভালবাসা না থাকারই কথা, কিন্তু কোন স্বাভাবিক স্রেতধারা বাধা পেলে যেমন আরও দুর্বার হয়ে ওঠে মেরিয়ানার ভালবাসাও তেমনি অ্যাঞ্জেলোর জন্যেই আরো বেশি ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং আজ অবধি সে মনেপ্রাণে তাকেই পাওয়ার জন্যে হাহুতাশ করে। ডিউক অতঃপর আরও পরিস্কার করে তাঁর কৌশলটি ইসাবেলকে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, ইসাবেলকে অ্যাঞ্জেলোর কাছে গিয়ে বলতে হবে যে সে তার প্রস্তাবে রাজী আছে, অর্থাৎ রাত্রে সে গিয়ে অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এবং তার বিনিময়ে সে তার ভাইয়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ মুকুব করাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাকে অ্যাঞ্জেলোর কাছে যেতে হবে না, তার পরিবর্তে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মেরিয়ানাই যাবে ইসাবেল সেজে। সাধুবেশী ডিউক বললেন—লক্ষ্মীটি, এতে তুমি ভয় পেও না। তোমার এই কাজের জন্যে কোন পাপ নেই, কেননা মেরিয়ানা অ্যাঞ্জেলোরই বিবাহিতা স্ত্রী। অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে মিলনে তার কোন বাধা নেই। ডিউকের কথায় খুশী হয়ে ইসাবেল চলে গেল মেরিয়ানাকে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলতে। এর আগে ডিউক নিজে তার সন্ন্যাসীর বেশে ঐ দুঃখী মেয়েটির কাছে গিয়েছিলেন এবং নানা উপদেশ ও সান্ত্বনাবাক্যের সাহায্যে তার নিজের মুখ থেকেই তার সমস্ত দুঃখের কাহিনী শুনেছিলেন। কাজেই মেরিয়ানার কাছে গিয়ে ইসাবেলের কিছুমাত্র অসুবিধা হল না, কেননা সে গিয়ে ঐ সন্ন্যাসীর নাম করেই মেরিয়ানাকে এ-কাজ করতে অনুরোধ করেছিল। সন্ন্যাসীর প্রভি, অর্থাৎ ছদ্মবেশী ডিউকের প্রতি মেরিয়ানার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।

ব্যবস্থা অনুসারে সব যথাযথ প্রস্তুত হল। ইসাবেল গিয়ে অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে এসেছে সে রাত্রে যথাসময়ে তার কাছে আসছে। এইবার ইসাবেল ফিরে এল মেরিয়ানার বাড়িতে। সেখানে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী তার জন্যে অপেক্ষায়

ছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন অ্যাঞ্জেলো কী বলল। ইসাবেল বলল—অ্যাঞ্জেলোর একটি প্রাচীরঘেরা উদ্যান আছে এবং তার পশ্চিম প্রান্তে আছে একটি দ্রাক্ষাকুঞ্জ। আর সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জের ভিতরেই একটি দরজা আছে। এরপর সে ডিউক এবং মেরিয়ানাকে দুটি চাবি দেখাল, চাবি দুটি অ্যাঞ্জেলো তাকে দিয়েছে। সে বলল—বড় চাবিটি দিয়ে দ্রাক্ষাকুঞ্জের ঐ দরজাটি খোলা যাবে এবং ছোট চাবিটি দিয়ে খোলা যাবে অপর একটি ছোট দরজা যেটা দ্রাক্ষাকুঞ্জের ভিতর থেকে গিয়ে মিশেছে অ্যাঞ্জেলোর উদ্যানে। আমি অ্যাঞ্জেলোকে কথা দিয়েছি সেই উদ্যানে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হব গভীর রাতে এবং সেই ভাবেই তার কাছ থেকে আমার ভাই-এর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ রেয়াত করিয়ে নেব। আমি ওর কাছ থেকে খুব সাবধানে সঠিক জায়গাটা বুঝে নিয়েছি এবং ও খুব চাপা গলায় ঠিক অপরাধীর মত ধীরে ধীরে রীতিমত পরিশ্রম করে আমাকে দু-দুবার পথটা চিনিয়ে দিয়েছে। ডিউক জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের মধ্যে আর কোন সংকেতের নিদর্শনের কথা যদি হয়ে থাকে তবে মেরিয়নাকে বুঝিয়ে বল। ইসাবেল বলল—না, আর কোন সংকেতের দরকার হবে না, শুধু তখনই যেতে হবে যখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমি তাকে বলেছি যে আমি খুব বেশীক্ষণ ওখানে থাকতে পারবনা, কেননা, আমার সঙ্গে একটি ভৃত্য এসে বাইরে অপেক্ষা করবে। তাকে আমি আমার ভাইয়ের কাছে যাওয়ার নাম করে নিয়ে আসব।

ডিউক বললেন—খুব খুশী হলাম। তুমি সব ব্যবস্থাই নিখুঁতভাবে করেছ। মেরিয়ানার দিকে ফিরে ইসাবেল বলল— তোমাকে বেশী কিছু কথা বলার দরকার হবে না অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে, শুধুমাত্র ফিরে আসার সময় ব'লো—"যেন আমার ভাই-এর কথা তুমি ভুলে যেওনা।"

সেই রাতেই ইসাবেল পথ দেখিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেল মেরিয়ানাকে এবং যথাস্থানে তাকে পৌঁছে দিল। আজ তার মনে আনন্দ আর ধরে না—সে আজ এক ঢিলে দুটি পাখী মারতে পেরেছে—তার ভাই-এর যেমন প্রাণরক্ষা করা গেল তেমনি তার পবিত্রতাও নিষ্কলুষ রইল। তবে ডিউক কিন্তু তার ভাই-এর প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারেন নি। তার সন্দেহ হয়েছিল আজ রাতেই হয়তো অ্যাঞ্জেলো তাকে হত্যা করবে। তাই তিনি সবার অগোচরে রাতের অন্ধকারে কার কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলেন। ক্লডিওর মহাভাগ্য যে ডিউক ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলেন, কেননা ঠিক সেই সময়েই অ্যাঞ্জেলোর কাছ থেকে এক আদেশ এসে উপস্থিত হল যে অবিলম্বে ক্লডিওর শিরশ্ছেদ করে তার মুণ্ডটি হাজির করতে হবে অ্যাঞ্জেলোর কাছে ভোর পাঁচটার আগেই। ডিউক কারার ভারপ্রাপ্ত প্রোভোস্তকে বললেন যেন ক্লডিওকে হত্যা করা না হয় এবং তার পরিবর্তে সেদিনই সকালে যে ব্যাক্তিটি কারাগারে মারা গিয়েছে তার মুণ্ডটি ছেদন করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়

অ্যাঞ্জেলোর কাছে। প্রোভোস্তকে এই কাজে রাজী করানোর জন্যে ছদ্মবেশী ডিউক তাকে একখানি চিঠি দেখালেন—চিঠিখানা যেন স্বয়ং ভিয়েনার ডিউকের হাতে লেখা এবং তার সীলমোহর অঙ্কিত। প্রোভোস্ত চিঠিখানি দেখে মনে করল বোধ করি এই সন্ন্যাসীর ডিউকের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে এবং তাঁর কাছ থেকে এই আদেশ সংগ্রহ করে এনেছেন। কাজেই সে ক্লডিওকে আর হত্যা করল না এবং তার পরিবর্তে সেই মৃত মানুষটির মুণ্ড ছেদন করে নিয়ে চলল ক্লডিওর কাছে।

এরপর ডিউক আর একটি কাজ করলেন। তিনি তাঁর নিজের স্বাক্ষরে অ্যাঞ্জেলোর কাছে একখানি চিঠি লিখে পাঠালেন। ঐ চিঠিতে লেখা ছিল যে বিশেষ বাধা পড়ায় আপাতত তাঁর ভ্রমণসূচী অনুসারে আর কোথাও যাওয়া হয়ে উঠছে না। কাজেই, আগামী দিন সকালেই তিনি ভিয়েনা এসে পৌঁছবেন। অ্যাঞ্জেলো যেন নগরীর প্রবেশপথে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কর্তৃত্বভার তাঁকে প্রত্যর্পন করেন। ডিউক আরো জানিয়েছেন যে চারিদিকে যেন ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে যদি কোন প্রজার কোনো প্রার্থনা বা নালিশ থাকে তবে যেন ডিউক নগরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পথের উপরই তাঁর কাছে সেই আবেদন পেশ করা হয়।

সকাল হতে না হতেই ইসাবেল এসে হাজির হল কারাগৃহে। ডিউক তার আসার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তার কাছে ক্লডিওর বিষয়ে আসল ব্যাপারটা গোপন রেখে তাকে বললেন—কিছুই তো আর করা গেলনা, তোমার ভাই-এর ফাঁসি হয়ে গেছে। ইসাবেল জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলো তার ভাই-এর মুক্তির আদেশ পাঠিয়েছেন কীনা। ডিউক উত্তরে বললেন—হ্যাঁ, সে তোমার ভাইকে চিরদিনের জন্যেই মুক্তি দিয়ে দিয়েছে। আজ এই মুহূর্তেই তার গর্দানটি চলে গিয়েছে অ্যাঞ্জেলোর কাছে। ইসাবেল আর আত্মসম্বরণ করতে পারল না, সে হাহুতাশ করতে লাগল—হায় হতভাগ্য ক্লডিও, হতভাগিনী ইসাবেল, কী নিষ্ঠুর এই পৃথিবী, কী সর্বনাশা ঐ অ্যাঞ্জেলো! সন্ন্যাসীবেশী ডিউক তাকে সান্ত্বনার কথা শোনালেন। তারপর সে যখন একটু শান্ত হল তখন তিনি তাকে বললেন—একটা কাজ কর। আজই সম্ভবত ডিউক দেশে ফিরে আসছেন, তুমি গিয়ে সব ঠিকঠিক করে গুছিয়ে তাঁর কাছে তোমার অভিযোগ জানাও। হয়তো প্রথমটাতে তোমার কথায় কোন কাজ হবে না, এমনকি ব্যাপারটা সাময়িকভাবে তোমার বিপক্ষেও যেতে পারে, তবে তার জন্যে মুষড়ে পড়বে না, শেষ পর্যন্ত তোমার নালিশের ফলে অ্যাঞ্জেলোর শাস্তি হবেই। ইসাবেলকে ঠিকমত বুঝিয়ে সুঝিয়ে ডিউক চললেন মেরিয়ানার কাছে। তার কাছে গিয়ে তিনি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে বললেন তাকে কী কী করতে হবে।

সব দিক গোছানো হয়ে গেল। এবার ডিউক তাঁর গোপন আবাসে গিয়ে সন্ন্যাসীর পোশাকটি ত্যাগ করলেন এবং তাঁর রাজকীয় পোশাকটি পরে নিলেন। এখন তিনি

প্রবেশ করবেন নগরে—চারিদিকে অভ্যর্থনা—উৎসুক প্রজাপুঞ্জ—তাদের প্রিয় ডিউকের প্রবেশের অপেক্ষায় আনন্দে উদ্বেল। ডিউক প্রবেশ করলেন, জনতা জয়ধ্বনি করল আর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাঞ্জেলো এগিয়ে এসে নতজানু হয়ে তার হাতে অর্পণ করল দেশের কর্তৃত্বভার। এবার দেখা গেল সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে ইসাবেল — সে তার প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার চায় তারই আবেদন নিয়ে। সে প্রার্থনায় বলল—হে রাজন—আমি সুবিচারপ্রার্থী। আমি আপনারই এক প্রজা ক্লডিওর ভগ্নী। ক্লডিও একটি মেয়েকে ভুলিয়ে তার মা-বাবার কাছ থেকে নিয়ে আসে এবং সেই অপরাধে তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়েছে। ভাইয়ের জন্যে আমি লর্ড অ্যাঞ্জেলোর কাছে আবেদন করেছিলাম—কত অনুনয় বিনয় করে আমি আমার প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। কেমন করে নতজানু হয়ে আমি তার প্রাণ-ভিক্ষা করেছিলাম অথবা আমার প্রার্থনার উত্তরে লর্ড অ্যাঞ্জেলো কী কী বলেছেন সেই সব কথা বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়—শুধু এটুকুই বলতে পারি যে সে বড় লজ্জার ও দুঃখের। কেননা, অ্যাঞ্জেলো চেয়েছিলেন তাঁর জঘন্য লালসা নিবৃত্তি করার বিনিময়েই শুধু আমার ভাইকে তিনি মুক্তি দেবেন। হুজুর, নিজের সঙ্গে আমি অনেক বোঝাপড়া করতে চেষ্টা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে আমি আমার ভাইয়ের প্রতি মমতায় অ্যাঞ্জেলোর সেই লালসায় আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তবুও আমার ভাইকে বাঁচাতে পারিনি, পরের দিন সকালেই গিয়ে শুনি অ্যাঞ্জেলো আমাকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমার ভাইকে শিরশ্ছেদের দণ্ড দিয়েছেন। ডিউক সব কথা শুনলেন। কিন্তু তিনি সর্বসমক্ষে এমনই একটা ভাণ করলেন যে ইসাবেলের কথা তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। অ্যাঞ্জেলো নিজের অপরাধ ঢাকা দেওয়ার জন্যে বলল—নিজের ভাই-এর মৃত্যুতে মেয়েটির মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে, তাই ও আবোল-তাবোল বকছে। আইনের বিধান অনুসারেই ওর ভাইয়ের বিচার হয়েছে। ঠিক এই সময়েই অপর একজন অভিযোগকারিনী এসে উপস্থিত হল—সে মেরিয়ানা। সে নতজানু হয়ে বলল—হে রাজাধিরাজ, ঈশ্বর যেমন এই পৃথিবীকে আলোক দান করেন, জীবন থেকে যেমন সত্য স্বতোৎসারিত হয়, আর সত্যের মধ্যে যেমন লুকিয়ে থাকে বোধশক্তি এবং যা সত্য তা লুকিয়ে থাকে পবিত্রতায়—ঠিক তেমনিই আমিই ঐ লর্ড অ্যাঞ্জেলোর স্ত্রী। ইসাবেল তাঁর নামে যে অপবাদ দিয়েছে তা সম্পূর্ণ অসত্য। কেননা, ঐ রাত্রে বাগান বাড়িতে আমার স্বামী আমার সঙ্গেই রাত্রিযাপন করেছেন। আমার এ কথা যদি সত্য না হয় তবে যেন আমার এই দেহ এখানেই চিরদিনের জন্য পাথর হয়ে স্থির হয়ে যায়। ইসাবেল আবার এগিয়ে এল। সে এসে বলল—হুজুর, আমার অভিযোগ সত্য কী না তা প্রমাণিত হবে যদি আপনি লোডোউইক নামে যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং কথা হয়েছিল তাঁকে ডেকে পাঠান।

সন্ন্যাসী লোডোউইক আর কেউই নয়—সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ডিউক ঐ নামই নিয়েছিলেন।

ইসাবেল ও মেরিয়ানা ডিউকের পরামর্শ অনুসারে যে যার মত অভিনয় করে গেল এবং ডিউকের এ সব কিছুর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েনা নগরে সর্বসমক্ষে ইসাবেলের পবিত্রতা ও সততা প্রতিপন্ন করা। অ্যাঞ্জেলো ঘৃণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি কী কারণে কী হতে চলেছে। সে ভাবল তাকে আর মারে কে—কেননা এই দুই মহিলার পরস্পরবিরোধী অভিযোগের ফলে তার বাঁচার পথ পরিস্কার হয়ে গেল। সে তখন এমনই একটা ভাব দেখাল যেন তার মত একজন নিষ্পাপ মানুষের পক্ষে এই ধরণের অপবাদ বড়ই বিরক্তিকর। সে বলল—এতক্ষণ আমি এই সব আজেবাজে কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু এবার আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে—আমার যেন বোধ হচ্ছে এই দুটি বিকৃতমস্তিষ্ক মহিলার এখানে আসার পিছনে মস্ত বড় একটা চক্রান্ত কাজ করছে—কেউ একজন এদের খেলাচ্ছে। আমাকে একটু খোঁজ করে দেখতে দিন, হুজুর, আমি ঠিকই খুঁজে বের করব এ কার কারসাজি। ডিউক বললেন—অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। আর খুঁজে বের করে সেই শয়তানটাকে তুমি যত খুশী শাস্তি দাও তোমার মর্জিমত। হ্যাঁ, লর্ড এসকেলাস, আপনি বরং লর্ড অ্যাঞ্জেলোকে এ ব্যাপারে একটু সহায়তা করুন যাতে চক্রান্তটা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলা যায়। আর, আমি সেই সন্ন্যাসীকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি—তিনিই তো যত নষ্টের গোড়া। তিনি এলে কী ভাবে তাকে কড়কাবেন সে আপনারাই স্থির করুন। আমি আপাতত একটু ঘুরে আসছি। তবে হ্যাঁ, লর্ড অ্যাঞ্জেলো, এখুনি কিছু সোরগোল তুলবেন না। যতক্ষন না সঠিকভাবে ব্যাপারটা ফয়সালা হয় ততক্ষণ একটু স্থির হয়ে থাকুন।

ডিউক উঠে গেলেন। অ্যাঞ্জেলোর মন খুশীতে টলমল। এখন সেই বিচারক আবার সে-ই আম্পায়ার তার অপরাধের সে-ই জুরী। তার কথাই শেষ কথা। ডিউক কিন্তু গিয়েছেন তার পোশাকটিকে বদল করে সেই সন্ন্যাসীর পোশাকটি পরে নিতে। এবং অল্প কিছুক্ষণ পরেই তিনি আবার এসে হাজির হলেন সন্ন্যাসীর বেশে, অ্যাঞ্জেলো এবং এসকেলাসের সামনে। এসকেলাস ভেবে নিয়েছিলেন ঐ সন্ন্যাসীই সব চক্রান্তের মূল এবং অ্যাঞ্জেলো প্রকৃতই নিরপরাধ। তাই সন্ন্যাসীকে দেখামাত্রই তিনি রূঢ়ভাবে বললেন—এই যে স্যার, এদিকে আসুন, আপনিই তো ঐ মেয়েদুটিকে এখানে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছেন লড অ্যাঞ্জেলোর গায়ে কাদা ছিটানোর জন্যে? সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন—ডিউক কোথায় গেলেন? আমি তাঁর কাছেই আমার যা বলার আছে বলব। এসকেলাস বললেন—এখানে আমরাই ডিউক—যা বলার আছে বলুন—কিছু ঢাকতে চেষ্টা করবেন না। সন্ন্যাসী বললেন, না, ঢাকার কথা উঠছে না, আমি নির্ভয়েই বলব। এর পর সন্ন্যাসী বলতে শুরু করলেন—ডিউক

কত বড় অন্যায় কাজ করেছেন এই অ্যাঞ্জেলোর মত একটা অসৎ লোকের হাতে তাঁর ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে। কতই না অন্যায় আর অনাচার ঘটে গেল তাঁর এই অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে—আমি নিজেই সে সব জানি ও দেখেছি। সন্ন্যাসীর কথা শুনে এসকেলাস প্রচণ্ড রেগে গেলেন—আপনার দুঃসাহস তো কম নয়, এই ভিয়েনাতে দাঁড়িয়েই আপনি দেশদ্রোহীর মত কথাবার্তা বলছেন, জানেন আপনার শাস্তি কী হতে পারে। আপনি কীনা ডিউকের কাজের সমালোচনা করতে সাহস করেন! প্রহরীদের ডেকে এসকেলাস বললেন—যাও, একে কারাগারে নিক্ষেপ কর।

সকলের চোখের সামনে যেন এক জাদুর খেলার মত তখন ডিউক তাঁর সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশটি খুলে ফেললেন—হাঁ করে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল অ্যাঞ্জেলো—এও কী সম্ভব।

ডিউক সর্বপ্রথম ইসাবেলকে ডেকেই কথা বললেন। তাকে বললেন—এদিকে এসো, ইসাবেল, তোমার সেই সন্ন্যাসীই তোমাদের ডিউক, তবে আমার পোশাক পালটেছি বলে কিন্তু আমার প্রকৃতির পরিবর্তন হয়নি। আমি তখন যা ছিলাম এখনও তাই আছি এবং তোমায় যে সাহায্য তখন করেছিলাম এখনও তাই করব। ইসাবেল লজ্জায় সংকুচিত হয়ে বলল—আমার অপরাধ মার্জনা করুন, আপনার অতি নগণ্য প্রজা হয়ে আমি না জেনে আপনাকে কত বিরক্ত করেছি। ডিউক বললেন—আরে না না, তোমার কাছেই আমার মার্জনা চাওয়াব আছে, আমি তো তোমার ভাই-এর জীবন রক্ষা করতে পারিনি। ডিউকের একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে তিনি এখনও ইসাবেলকে জানাতে চাননা যে তার ভাই জীবিত আছে—এর কারণ তিনি ইসাবেলের সততাকে আরও একটু পরীক্ষা করতে চান। অ্যাঞ্জেলো এখন উপলব্ধি করল যে ডিউক তার অপরাধজনক যাবতীয় কাজের দিকে গোপণে লক্ষ্য রেখেছিলেন, তাই সে প্রার্থনা করে বলল—হে প্রভু, আমার চেয়ে বড় অপরাধী আর কেউ হতে পারে না। কেননা, সৎ ও মহৎ, এই পরিচয় নিয়ে আমি লুকিয়ে এমন অপরাধ করেছি। এখন বুঝেছি ঈশ্বরের কাছে যেমন কিছুই অগোচর নয় তেমনি আপনিও আমার সব কথা জেনেছেন। দোহাই আপনার, আর আমাকে লজ্জা দেবেন না, আমিই আমার অপরাধ স্বীকার করে বলছি আমার বিচার করুন—এই মুহূর্তেই আপনি আমার মৃত্যুর আদেশ দান করুন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা। ডিউক বললেন—অ্যাঞ্জেলো, তোমার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, আমি ডিউক হিসাবে তোমাকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিলাম এবং যে ফাঁসির মঞ্চে ক্লডিওকে হত্যা করা হয়েছে সেখানেই তোমার ফাঁসী হবে। এই বলে তিনি প্রহরীদের আদেশ দিলেন—যাও, ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। এরপর ডিউক মেরিয়ানার দিকে ফিরলেন এবং বললেন—মেরিয়ানা; তোমার বৈধব্য মেনে নাও, তবে আঞ্জেলোর যা কিছু

বিষয় সম্পত্তি তার সবই তোমার হল। ঐ অর্থ সম্পদের সাহায্যে তুমি অপর কোন উপযুক্ত স্বামী পেতে পারবে।

মেরিয়ানা নতজানু হয়ে ডিউকের পদপ্রান্তে বসে পড়ল। সে করজোড়ে বলল—দোহাই প্রভু, আমি অপর কোন স্বামী চাই না, আমার এই স্বামীই আমার প্রিয়, এর চেয়ে বেশী কিছু আমি কামনা করি না। সে ইসাবেলকে বলল—এস ভাই, তুমি আমার হয়ে রাজাধিরাজের কাছে একটু বলে দাও, তুমি যেমন কাতর প্রার্থনা করেছিলে আমার অকৃতজ্ঞ স্বামীর কাছে, আজ তেমনি করেই, আমি তোমাদের সকলের কাছে প্রার্থনা করছি তার জীবন রক্ষা কর। ইসাবেল, আমি চিরকাল তোমার কেনা হয়ে থাকব। ডিউক বললেন—মেরিয়ানা, তুমি বৃথাই ইসাবেলের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করছ—তোমার বিন্দুমাত্র বিবেচনা নেই। ইসাবেল এখন যদি অ্যাঞ্জেলোর হয়ে করুণা ভিক্ষা করে তবে তার ভাই-এর মৃত আত্মা এখনই এই বাঁধানো চত্বর ভেদ করে মাথা তুলবে এবং সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি এখুনি তাকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যাবে। মেরিয়ানা তবুও কেঁদে আকুল হয়ে বলল—এস, ইসাবেল, তোমাকে কিছু বলতে হবে না, তুমি শুধু নতজানু হয়ে আমার পাশে ব'স, আমার প্রার্থনার কথা আমিই মুখে বলব। লোকে বলে অন্যায় ও অপরাধের পথ দিয়েই মানুষ দিনে দিনে বড় হয়ে ওঠে। তার যাবতীয় গুণের বিকাশ হয় স্খলন ও পতনের মধ্যে দিয়ে। আমার স্বামীরও এই অপরাধ তাকে ভবিষ্যতে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করবে। এস, ইসাবেল, তুমি আমার পাশে এসে ব'স। ডিউক বললেন—না, না, তোমার স্বামীকে মরতেই হবে, সে ক্লডিওকে হত্যা করেছে নিজে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও।

এবার ইসাবেলের পরীক্ষা সম্পূর্ণ হল—সে এসে নতজানু হয়ে বসল মেরিয়ানার পাশে এবং ডিউককে বলল—প্রভু, এই অপরাধীকে মার্জনা করুন। আমার ভাই-এর জীবন বড় নয়। অ্যাঞ্জেলোর অপরাধ মার্জনীয়, কেননা, সে প্রকৃত সৎই ছিল, তার এই অধঃপতন ঘটত না যদি না আমার প্রতি তার চোখ পড়ত—আমাকে দেখেই রূপের মোহে সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে নি। আমার ভাই-এর দণ্ডাদেশ যথার্থই হয়েছে। তার অপরাধের ঐ শাস্তি।

ডিউকের বিচার সম্পূর্ণ হল। ইসাবেলের এই প্রার্থনার সমুচিত উত্তর দেওয়ার জন্যে তিনি কারাগার থেকে ক্লডিওকে আনতে পাঠালেন। ক্লডিও এখনও জানে না তার ভাগ্যে কী আছে। ডিউক তাকে আনিয়ে তার স্নেহকাতর বোনের কাছে উপহার দিলেন। যে বোন নিজের শত্রুর জন্যেও এমন করুণভাবে প্রার্থনা করতে পারে এই তার সমুচিত উপহার। ডিউক এর পর ইসাবেলকে বললেন—এস ইসাবেল, আমাকে তোমার হাতখানি দাও, তোমার গুণে মুগ্ধ হয়েই আমি ক্লডিওকে ক্ষমা করলাম। এবার বল, তুমি কি আমাকে গ্রহণ করতে পারবে? তোমার ভাই হবে

আমারও ভাই। অ্যাঞ্জেলো এতক্ষণে অনুমান করতে পেরেছে যে তার জীবন রক্ষা হল। তার চোখে এক ঝলক আশার দীপ্তি দেখা গেল। ডিউক তাকে ডেকে বললেন—এসো, অ্যাঞ্জেলো, তোমার স্ত্রীর প্রতি এখন থেকে সুবিচার কোরো। তার নিষ্ঠার গুণেই আজ তোমার প্রাণ রক্ষা পেল। তিনি মেরিয়ানাকে বললেন, এবার তুমি খুশী তো মেরিয়ানা। অ্যাঞ্জেলোকে আবার বললেন—যাও তোমার মেরিয়ানাকে নিয়ে সুখে ঘর কর আমি তাকে ভাল করে চিনেছি, জেনেছি সে কত পুণ্যবতী। অ্যাঞ্জেলোর এবার প্রকৃত জ্ঞানোদয় হল—সে বুঝল অতি অল্প দিনের জন্যে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে সে কেমন মানুষের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ে বসেছিল, আর প্রকৃত ক্ষমাগুণ তার চেয়ে কত বড়—কত মধুর।

ডিউক ক্লডিওর প্রতি জুলিয়েটকে বিবাহের আদেশ জারী করলেন, এবং নিজে আরও একবার ইসাবেলের কর প্রার্থনা করলেন। ইসাবেলের সৎ ও মহৎ অন্তর তাঁর হৃদয়কে জয় করে নিয়েছিল। ইসাবেল এখনও পুরোপুরি সন্ন্যাসিনীর ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেনি, তাই তার এ বিবাহে কোন বাধা রইল না। সন্ন্যাসীবেশে ডিউকের সেই প্রিয় ব্যবহার ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের কথা সে ভোলেনি, তাই সে সর্বান্তঃকরণেই ডিউকের প্রস্তাবে সাড়া দিল। ইসাবেল হল ডাচেস অব ভিয়েনা, আর তার মত এমন পবিত্র ও নিষ্ঠাবতী নারীর উদাহরণে এর পর থেকে ভিয়েনাতে আর কেউ ক্লডিও এবং জুলিয়েটের মত ব্যাভিচারে লিপ্ত হত না। ইসাবেলকে স্ত্রীরূপে লাভ করে ডিউক এক ভাগ্যবান স্বামীর মত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন পেলেন।

ট্যোএলফ্‌থ্‌ নাইট, অর, হোয়াট ইউ উইল

দেশটির নাম মেসালিন। সে দেশেরই এক অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় একটি তরুণ যুবা—নাম সেবাসতিয়ান। সেবাসতিয়ানের বোন ভায়লা। ওরা যমজ ভাইবোন। আর ওদের দুটির মধ্যে চেহারার সাদৃশ্য ওদের জন্মকাল থেকেই ভারী অদ্ভুত রকমের। দু'জনের পোশাকের ব্যবধান না থাকলে কারো বোঝার সাধ্য নেই কোনটি ওদের মধ্যে ছেলে আর কোনটিই বা মেয়ে। আরো একটি ভারী অদ্ভুত ব্যাপার— ওদের জন্মও যেমন হয়েছিল ঠিক একই লগ্নে, ঠিক তেমনি একই সময়ে ওরা দু'জনেই এমন এক সঙ্কটে পড়েছিল যার ফলে উভয়েরই মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। ব্যাপারটা ঘটেছিল এক জাহাজডুবিতে—ওরা দু'জনেই ছিল একই জাহাজে, এবং সেই জাহাজটিই হঠাৎ ডুবে যায় ইলিরিয়ার কাছাকাছি এসে সমুদ্রের জলে। সমুদ্রের বুকে সেদিন তুমুল ঝড় ওঠে—আর ওদের জাহাজখানা এসে মুখ থুবড়ে পড়ে একটা ডুবন্ত শিলার উপর এবং চোখের নিমেষে খানখান হয়ে যায় সেই বিশাল জলযান। প্রায় সব যাত্রীই আর ফিরতে পারে নি, মাত্র অল্পকয়েকটি প্রাণীই সেদিন উদ্ধার পেয়েছিল। একটি ছোট নৌকোয় ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং অন্য কয়েকজন নাবিক ডাঙ্গায় এসে নিরাপদে আশ্রয় নিয়েছিল এবং তারাই সঙ্গে করে আনতে পেরেছিল ভায়লাকে। ভায়লার নিজের জীবন রক্ষা হলেও সে তবু কিছুতেই শান্ত হতে পারছিল না। আনন্দের পরিবর্তে তার দুঃখই তাকে ক্রমশ অস্থির করে তুলছিল, কেননা তাব ভাইকে সে হারিয়েছে। ক্যাপ্টেন তাকে বারবার সান্ত্বনা দিয়ে বলল, লক্ষ্মী মেয়েটি, তুমি মন খারাপ কোর না। তোমার দাদা নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। যখন জাহাজটা ভেঙ্গে পরে তখন তাকে আমি দেখেছি সে একটা খুব শক্ত মাস্তুলের সঙ্গে কাছি দিয়ে নিজেকে ভাল করে বেঁধে নিয়েছে এবং জাহাজটা যখন ডুবে গেল তখনও তাকে আমি দেখতে পেয়েছি সেই মাস্তুলটাকে আশ্রয় করে ঢেউ-এর ওপরে যে ভেসে আছে এবং যখন অনেকটা দূরে গিয়ে পড়ল তখনও সে তেমনি করেই ভেসে চলেছে। ক্যাপ্টেনের সান্ত্বনাবাক্যে ভায়লা অনেকটা আশ্বস্ত হল বটে—কিন্তু অন্য আর এক চিন্তা তার মাথায় এসে গেল—এই আজানা দেশে কেমন করে সে একটা বাঁচার মত পথ খুঁজে পেতে পারে—তার নিজের দেশ মেসালিন তো এখান থেকে অনেক দূরে। ক্যাপ্টেনকে সে জিজ্ঞাসা করল সে এই ইলিরিয়া দেশটার বিষয় কোনো কিছু বলতে পারে কিনা। ক্যাপ্টেন বলল—জানি বৈকি। আমার নিজের দেশ তো এখান থেকে মাত্র তিন দিনের পথ, জাহাজে যদি যাওয়া যায়। ভায়লা জানতে চাইল—তা এখানকার রাজার নাম কি? ক্যাপ্টেন উত্তরে বলল—এখানকার রাজা ডিউক অরসিনো। স্বভাবচরিত্রের দিক থেকেও তিনি যেমন মহৎ, মানমর্যাদায়ও তেমনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ভায়লা বলল, বাবার কাছে

ঐ নামটা শুনেছি বটে। হ্যাঁ, তখনও তিনি বিয়ে-থা করেন নি। ক্যাপ্টেন বলল—হ্যাঁ, এখনও তিনি অকৃতদারই বটে, তবে এ খবর মাসখানেক আগেকার। আমি এখান থেকে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। তবে এইসব বড় মানুষদের নিয়ে লোকে তো নানা কানাঘুষো করে। তাই তখনও সবাই বলাবলি করত যে ডিউক অরসিনো নাকি অলিভিয়া নামে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ের ভালবাসা পেতে উৎসুক। অলিভিয়া মেয়ে হিসাবে খুব সুশীলাও বটে। তবে এই সবে বছর ঘুরতে যাচ্ছে মেয়েটি তার বাবাকে হারিয়েছে। আর এমনই তার দুভার্গ্য যে মৃত্যুর সময় তার বাবা মেয়েটিকে তার এক মাত্র ভাই-এর হাতে রেখে গিয়েছিলেন। সেই ভাইটিও অল্পদিন না যেতেই মারা গেল। এখন তো শুনি ভাই মারা যাওয়ার পর সেই শোকে মেয়েটি আর ঘর থেকে বের হয় না, কারো সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, কারো কাছে মুখই দেখায় না। ভায়লাও নিজের ভাইকে হারানোর পর থেকে নোঙরছেঁড়া নৌকার মত দিশেহারা হয়ে পড়েছিল—এবার সে যেন একটা কূল দেখতে পেল—তারই মত দুঃখী অলিভিয়ার কাছে তাকে যেতে হবে। অলিভিয়ার মধ্যেই সে দেখতে পেল ভাইকে হারানোর মর্মবেদনা। ভায়লা ক্যাপ্টেনকে বলল—আপনি কি দয়াকরে আমাকে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন? আমি তার দাসী হয়েই তার কাছে থাকব। ক্যাপ্টেন বলল—না, ভাই, সে তো সম্ভব নয়, ঐ অলিভিয়া তো তার ভাইকে হারানোর পর থেকে তার বাড়িতে কারো সঙ্গেই আর দেখা সাক্ষাৎ করে না, এমন কি, স্বয়ং ডিউকও গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না।

ভায়লা এবার অন্য একটি ফন্দির কথা ভাবল। আচ্ছা, যদি পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে ডিউক অরসিনোর কাছে গিয়ে বালকভৃত্যের কাজ নেওয়া যায়—তাহলে কেমন হয়? তার মত এক তরুণীর পক্ষে এমন পুরুষের ছদ্মবেশ নেওয়া বড় অস্বাভাবিক বলেই ভায়লার কাছে প্রথমটায় বোধ হল। কিন্তু একে বিদেশ বিভুঁই, তার উপর আবার তার যেমন যৌবন ও রূপের ছটা—তার সে আবার সহায়সম্বলহীন একা—তার উপায়ই বা কী।

ক্যাপ্টেন মানুষটিকে ভায়লার মনে হয়েছে অতি সজ্জন। তার উপর নির্ভর করা যায়। তাছাড়া সে ভায়লার প্রতি খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন, কাজেই ভায়লা ক্যাপ্টেনের কাছে তার মনের কথা খুলে বলল। ক্যাপ্টেন মানুষটি সত্যিই সদাশয়, সে ভায়লার কথায় তার সঙ্গে যেতে রাজী হয়ে গেল। ভায়লা তখন ক্যাপ্টেনকে কিছু টাকাকড়ি দিয়ে বলল—আপনি দয়া করে আমার জন্যে দরকার মত পুরুষের পোশাক-আশাক কিনে দিন। পোশাক বানানোর ব্যাপারে ভায়লা বেছে বেছে ঠিক এমন পোশাকই তৈরী করে নিল যেমনটি ব্যবহার করে তার ভাই সেবাসতিয়ান। এরপর যখন সেই পোশাকে সে পুরুষ সেজে এল তখন তাকে দেখে কে বলবে সে-ই সেবাসতিয়ান

নয়। ঠিক সেবাসতিয়ানের মতই তার সব কিছু, এমন কি তাদের ভাইবোনের সঙ্গে পরস্পরের যদি এমন অবস্থায় দেখা হয়ে যায় তবে ওরা নিজেরাই ধন্দে পড়ে যাবে—একে অন্যের সঙ্গে কোন পার্থক্যই বুঝতে পারবে না। এর ফলে, প্রকৃত ধন্দটা বেধেছিল কিছুকাল পরে, কেননা সেবাসতিয়ান জীবিতই ছিল।

প্রকৃত বন্ধুর মতই ভায়লাকে নিয়ে ক্যাপ্টেন হাজির হল ডিউকের রাজদরবারে। সেখানে তার কিছু চেনা পরিচয় ছিল। অরসিনোর কাছে ভায়লাকে হাজির করে সে তার পরিচয় দিল একটি যুবা বলে—নাম সিজারিও। ডিউক সিজারিওকে দেখা মাত্রই তার কথাবার্তা শুনে এবং ভদ্র আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ নিজের একান্ত ভৃত্যের একজন হিসাবে বহাল করে নিলেন। ভায়লা যা আশা করেছিল তা সঙ্গে সঙ্গেই সে পেয়ে গেল। অতএব সে তার এই নতুন চাকরীটি যৎপরোনাস্তি মন দিয়েই করতে শুরু করল। তার কোন কাজেই বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই, গাফিলতি নেই। সে হাতে হাতে ডিউকের যাবতীয় ফাই-ফরমাসগুলি করে দেয়, এবং এর ফলে সে অতি অল্প দিনের মধ্যেই হয়ে উঠল ডিউকের সবচেয়ে প্রিয় পরিচারক। ক্রমে ক্রমে সিজারিও ডিউকের এতই কাছের মানুষ হয়ে গেল যে ডিউক তার কাছে তাঁর প্রাণের কথা বলে নিজেকে হালকা বোধ করতেন। অলিভিয়ার প্রতি তাঁর ভালবাসার কথাও সিজারিওকে তিনি সবটুকুই খুলে বললেন। বললেন কেমন ব্যর্থভাবে দিনের পর দিন তিনি অলিভিয়ার কাছে ভালবাসা জানিয়েছেন এবং নিষ্ঠুরভাবে অলিভিয়া তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে—এমনকি অবজ্ঞায় সে ডিউককে তার বাড়িতেও প্রবেশ করতে দেয় নি। আর এই ব্যর্থতা ও হতাশার ফলে ডিউকের জীবনের সব আনন্দ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁর মত বয়সের পুরুষের যে খেলাধূলা ও বাইরে মেলামেশা, তার সবই তিনি ত্যাগ করে দিনরাত ঘরের কোণে বসে নিরানন্দ আলস্যে সময় অতিবাহিত করেন। তাঁর সময় কাটে নির্জীব সংগীতের ক্লান্তিকর সুরের নেশায় প্যানপ্যানানী প্রেমের গানে। পূর্বে যেমন তিনি জ্ঞানীগুণী পার্ষদদের সংগে সময় কাটাতেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আনন্দ পেতেন, এখন আর সে সব কিছুই নেই—এখন কেবল তাঁর একমাত্র কাজ সিজারিওর কাছে বসে নিজের দুঃখের কথা বলা। এর ফলে ডিউকের এককালের সভাসদবৃন্দ ভাবতে লাগল ডিউকের এ কী দুর্দশা—সিজারিওর মত এমন একটা অতি সাধারণ ছেলের সঙ্গে আজ ইলিরিয়ার ডিউক অরসিনোর মত মানুষ সময় কাটান।

এদিকে আর এক সমস্যাও ধীরে ধীরে ভায়লার এই নতুন জীবনকে ঘিরে দেখা দিতে লাগল। অনূঢ়া কোন সুন্দরী নারীকে যদি ডিউকের মত রূপবান এক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের প্রতিমুহূর্তের অন্তরঙ্গ কথা শোনার দোসর হতে হয় তবে সে বড় সহজ নয়। ভায়লা সিজারিও, কিন্তু সে তো নারীই বটে। অরসিনো সারাদিন তার কানে অলিভিয়া সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেন, তার দুঃখের যত ইতিহাস, ব্যর্থতার যত

মনোবেদনা—সেই সবই যেন ভায়লার নিজের হৃদয়কে উন্মনা করে। সে মনে মনে ডিউকের জন্যে ব্যথিত না হয়ে পারে না, আর ভাবে এমন একজন উন্নতমনা সুপুরুষ যুবাকে অলিভিয়া কত অবহেলাই না করছে। কত নিষ্ঠুর সেই মেয়েটি—কত কঠিন তার হৃদয়। সে কথায় কথায় অরসিনোর কাছে না বলে পারল না যে এমন এক হৃদয়হীন নারীর প্রতি কেন তাঁর এই দুর্বলতা। সে একদিন বলেই ফেলল—আচ্ছা, প্রভু, যদি এমন হত যে আপনি অলিভিয়াকে যেমন করে ভালবাসেন কোনো রমণী আপনাকে ঠিক তেমন করে ভালবাসত (ধরুন, কেউ একজন তেমন করে আপনাকে ভালবাসে) এবং যদি এমন হত যে আপনি সেই রমণীর ভালবাসায় সাড়া দিতে পারছেন না, এবং আপনি তাকে জানিয়েও দিয়েছেন যে আপনার পক্ষে তাকে ভালবাসা সম্ভব নয়, তবে সেই মেয়েটির কি আর অগ্রসর হওয়া উচিত? অরসিনো কিন্তু এই যুক্তি একেবারেই মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর ধারণা কোনো মেয়েই তাঁর মত গভীরভাবে ভালবাসতে জানে না। তিনি ভায়লাকে বললেন—এত ভালবাসা ধরে এমন উদার মন মেয়েদের থাকতে পারে না, কাজেই আমি বিশ্বাসই করতে পারি না যে কোন মেয়ে আমাকে তেমন করে ভালবাসতে পারে যেমনটি আমি ভালবাসি অলিভিয়াকে—তোমার এ তুলনা অবান্তর। ডিউকের কথার প্রতি ভায়লার যত শ্রদ্ধাই থাক সে কিছুতেই তাঁর এই কথাটি মনে মনে মেনে নিতে পারল না, কেননা সে তার অন্তরে অনুভব করেছে সে অরসিনোকে যত গভীরভাবে ভালবাসে, তা কিছুতেই কারো ভালবাসার চেয়ে কম নয়। ভায়লা বলল—হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন তা বুঝলাম, তবে....

ডিউক বললেন—তবে? তবে আবার কি, সিজারিও? ভায়লা বলল—আমি খুব ভাল করেই জানি মেয়েরা কত গভীরভাবে ভালবাসতে পারে। তাদের হৃদয়েও পুরুষের মত গভীর ভালবাসা লুকিয়ে থাকতে পারে। আমার বাবার একটি মেয়ে ছিল এবং সে একজনকে ভালবাসত—আর আমিও যদি নারী হতাম তবে আমিও তেমন করেই আপনাকে ভালবাসতাম। অরসিনো বললেন—তা, সেই মেয়েটির কী হল শেষ পর্যন্ত? ভায়লা বলল—কী আবার হবে, শুধুই হাহুতাশ। সেই ভালবাসার কথা তো সে কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি। তার লুকোনো ভালবাসা লুকিয়ে ছিল একটি কীট যেমন থাকে দামাস্কাসের গোলাপের কুঁড়ির ভিতর, আর তেমনি করেই ধীরে ধীরে ম্লান করে দিয়েছিল তার মুখের রক্তিম আভাটুকু। আর সে মনে মনে গুমরে গুমরে মরত, বিষাদই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী, তাই নিয়েই সে চুপ করে বসে থাকত ঠিক যেমন করে মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা বসে থাকে স্মৃতিসৌধের চূড়ায় আর হাসিমুখে তাকায় মর্মযন্ত্রণার দিকে। ডিউক জানতে চাইলেন সেই মেয়েটি ভালবাসার যন্ত্রণায় শেষ অবধি জীবনপাত করেছে কি না। একথার উত্তর একটু এড়িয়ে গেল ভায়লা—কী করেই বা সে স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে? সে তো তার

নিজের গোপন ও অস্ফুট ভালবাসার কথাই এতক্ষণ বলেছে।

অরসিনোর সঙ্গে ভায়লার এই কথোপকথন চলাকালীন ভদ্রবেশী এক ব্যক্তি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ঐ ব্যক্তিকে ডিউক অলিভিয়ার কাছেই পাঠিয়েছিলেন। তিনি প্রবেশ করেই বললেন—আজ্ঞে, হুজুর, তিনি তো আমাকে তাঁর কাছে যেতেই দিলেন না। তাঁর দাসী এসে খবর দিল আপনাকে যেন জানিয়ে দিই যে আগামী সাতবছরের জন্যে শুধু মানুষ কেন বাইরের আলো হাওয়ার সামনেও তিনি বের হবেন না। আশ্রমবাসী সন্ন্যাসিনীর মত তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে শুধু অশ্রুপাত করবেন আর সেই অশ্রুজলে তিনি ধুয়ে দেবেন তার নিভৃত কক্ষ—এ তাঁর মৃত ভাইয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ। এ কথা শুনে ডিউক মুগ্ধ বিস্ময়ে বললেন—হায়! যে নারীর হৃদয় এমন অপার্থিব প্রেমের মহার্ঘ দিয়ে গড়া—যে কি না তার ভাইয়ের প্রতি ভালবাসায় এমন করে আত্মনিবেদন করতে পারে, যদি কখনও তার সেই হৃদয়ে আমার প্রতি ভালবাসার জোয়ার আসে....। এর পর তিনি ভায়লাকে বললেন—সিজারিও, আমি তো আমার সব কথাই তোমাকে বলেছি। দেখতো, লক্ষ্মী ছেলেটি, তুমি যদি একবার অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পার। তোমাকে তার লোকজনেরা ঢুকতে দিতে চাইবে না, কিন্তু তুমি কিছুতেই ফিরে আসতে রাজী হয়ো না, দরজায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে—আর অলিভিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলবে—আমি যতক্ষণ না দেখা পাই এখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাথর হয়ে যাব সে-ও ভাল।

ভায়লা বলল—কিন্তু হুজুর, বলে দিলেন না তো কী কথা বলতে হবে তাঁর কাছে যদি তাঁর দেখা পাই। অরসিনো বললেন—তাকে ব'লো আমার এই মরণ-পণ ভালবাসার কথা—ব'লো আমি কেমন একনিষ্ঠ হয়ে তাকে কামনা করছি—ভালো করে অনেকক্ষণ ধরে সব কথা বুঝিয়ে বলবে। আর ঠিক যেমন করে, যে সুরে ভালবাসার কথা বলতে হয় আমার হয়ে তুমি সেই অভিনয় কোরো। তোমার মত বয়সের নবীন ছেলের মুখে সেই কথা তার কানে ভাল লাগবে—গুরুগম্ভীর বয়স্ক মানুষেরা সে কাজ পারে না।

গত্যন্তর নেই, ভায়লাকে যেতেই হল। কিন্তু তার পক্ষে এ বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাকে গিয়ে একটি মেয়ের কাছে প্রণয়ের ভান করতে হবে এবং এমন এক পুরুষের জবানীতে যাকে সে নিজেই ভালবেসে ফেলেছে। ডিউককে সে গোপনে ভালবাসে, আর সেই ডিউকের প্রেমের কথাগুলি তাকে গিয়ে বলতে হবে অলিভিয়ার কাছে—অদৃষ্টের এমনিই পরিহাস। কিন্তু কীই বা করার আছে? তাই সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজের সঙ্গে লড়াই করে ডিউকের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গেই করতে চাইল। অলিভিয়ার বাড়ির দরজায় গিয়ে সে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অলিভিয়া যখন শুনল যে একটি তরুণ যুবক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়

এবং নাছোড়বান্দার মত দরজায় অপেক্ষা করছে তখন সে তার পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করল—ব্যাপারটা কি ? পরিচারিকা বলল—আজ্ঞে, আমি তাকে বললাম যে আপনি অসুস্থ আর তার উত্তরে সে বলল সে না-কি জানে আপনি অসুস্থ এবং সেইজন্যেই সে দেখা করতে চায়। তারপর আমি তাকে বললাম যে আপনি ঘুমিয়ে আছেন। তার উত্তরেও সে বলল যে আপনার ঘুমনোর কথাও সে জানে এবং সেইজন্যেই কথা বলতে চায়। আজ্ঞে, কী করি বলুন তো ? এই লোকটিকে কী বলব ? যা দেখছি তাকে কোনরকমেই হঠানো যাবে না, যা-ই বলি সে তা কাটিয়ে দিচ্ছে—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে সে এক পা-ও নড়বে না। অলিভিয়ার ভারী কৌতুহল হল—কে এই নাছোড়বান্দা ব্যক্তিটি এল ডিউকের কাছ থেকে। সে বলল—যাও, তাকে আসতে বল। সে নিজের মুখ বোরখাজাতীয় আবরণটি দিয়ে ঢেকে নিল এবং পুনরায় বলল—একে আসতে দাও। তবে দেখো, এরপর যেন ডিউকের কাছ থেকে আবার কেউ দেখা করতে এলে তাকে ঢুকতে দিওনা। অলিভিয়া স্থির জানত ডিউকের হয়ে পীড়াপীড়ির উদ্দেশ্যেই নিশ্চয়ই কেউ এসে থাকবে।

ভায়লা এসে প্রবেশ করল। তার হাবভাব রীতিমত পৌরুষব্যঞ্জক, আর তার কথাবার্তার ধরণধারণও রীতিমত মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন, যেমনটা সাধারণত সম্ভ্রান্ত পরিবারের পরিচারকদের হয়ে থাকে। বোরখাঢাকা মহিলার দিকে ফিরে সে বলল—ভারী সুন্দর তো আপনি, অপূর্ব সুন্দরী, অতুলনীয়—তা দয়া করে যদি বলেন—আপনিই কি এই গৃহের কর্ত্রী ? আমি তাঁর কাছে ছাড়া আর কারো কাছে আমার কথা বলতে রাজী নই। আমার কথাগুলি যার তার কাছে ছড়িয়ে ফেলার মত তেমন হালকা কথা নয়, তাছাড়া অনেক যত্নে আমাকে সেই ভাষা আয়ত্ব করতে হয়েছে, তার মাধুর্য সবার জন্যে নয়। অলিভিয়া জানতে চাইল—তা কোথা থেকে আসা হচ্ছে ? ভায়লা বলল—আমার বলার কথা সবকটিই অতি যত্ন করে গুছিয়ে এনেছি—আপনার ঐ প্রশ্নের উত্তর তার মধ্যে নেই। অলিভিয়া বলল—তা তুমি কি বিদূষক ? ভায়লা উত্তরে বলল—না, তবে আমি এখানে যে ভূমিকায় এসেছি আমি তা-ও নই। অর্থাৎ, সে বলতে চাইল যে সে যদিও পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সে আসলে নারী। সে আবার অলিভিয়াকে প্রশ্ন করল সে-ই গৃহকর্ত্রী কি না। অলিভিয়া বলল—হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কী ? ভায়লার মাথায় এখন অন্য চিন্তা, তার মন বড় উৎসুক হয়েছে সে একবার ঐ রমণীর রূপ কেমন তা দেখতে চায়, কেননা সে-ই তো ডিউকের প্রণয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। ডিউকের দৌত্য আপাতত শিকেয় উঠে গেল। কাজেই সে বলল—আজ্ঞে, ম্যাডাম, যদি একবার আপনার মুখখানা দেখতে পেতাম। অনুরোধটা বড় হঠকারীর মত সন্দেহ নেই, তবে যে দুর্ধর্ষ সুন্দরী অলিভিয়ার একটু প্রসন্ন দৃষ্টির আশায় ইলিরিয়ার ডিউক এতকাল

হা-হুতাশ করে চলেছেন সেই রমণীরই অন্তরের গোপন কন্দরে কোথায় যেন ভালবাসার ছায়া দেখা দিল—আর সে ঐ ভৃত্য সেজে আসা সামান্য সিজারিওর জন্যে।

ভায়লা যখন এমন স্পষ্ট ভাষায় অলিভিয়াকে বলল সে তার রূপ দেখতে চায় তখন অলিভিয়া ব্যঙ্গ করে বলল—কেন তোমার প্রভু মশাই কি তোমাকে পাঠিয়েছেন আমার রূপের সঙ্গে কথা বলতে? কিন্তু পরক্ষণেই সে ভুলে গেল তার সাত বছরের জন্যে মুখ ঢেকে রাখার প্রতিজ্ঞা এবং আপনা থেকেই যেন তার হাত-দুখানা নিজের মুখের আচ্ছাদন খুলে দিল। সে বলল—হ্যাঁ, আমি পর্দাটা টেনে দিয়ে ছবিখানা দেখাব—ঠিক কি না বল? ভায়লা বলল—কী অপরূপ রূপ তোমার—যেন সব ই সমানভাবে মিশিয়ে গড়া এক মূর্তি—তোমার চিবুকে সাদায় লালে যে অপূর্ব ঙের আভা তা যেন প্রকৃতি অতি যত্নে আপন হাতে মিলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তুমি তো এই দুনিয়ায় সব সেরা নিষ্ঠুর মেয়ে—তোমার এই রূপের শোভা কী শুধুই একদিন মাটির নীচে চাপা পড়ার জন্যে—একে ধরে রাখার জন্যে তুমি কি কিছুই রেখে যেতে চাওনা? অলিভিয়া বলল—তা কেন? দুনিয়ায় আমার রূপের বর্ণনা সহজেই পাওয়া যেতে পারবে—এর একটা বর্ণণাত্মক তালিকা রেখে দিলেই হল—যেমন, নং এক—দুটি ঠোঁট, লাল মতন। নং দুই—এক জোড়া ধূসর চোখ, চোখে পাতা আছে। এর পর একে একে গলা, চিবুক ইত্যাদি। তা বাপু, তোমার কি এখানে আসার উদ্দেশ্য আমার প্রশস্তি করবার জন্যেই? ভায়লা বলল—না, আমি দেখছি তুমি কেমন—তুমি বড় অহংকারী, তবে তুমি অতি সুন্দরীও বটে। আমার প্রভু লর্ড অরসিনো তোমাকে ভালবাসেন এবং তার সেই ভালবাসা এত গভীর যে তুমি যদি দুনিয়ার সেরা সুন্দরীও হতে তবু তা তোমার যোগ্যই হত। ডিউক অরসিনোর ভালবাসা অশ্রুর অর্ঘে সাজানো, আর তার কাতর প্রার্থনার মধ্যে শোনা যায় ভালবাসার মেঘমন্দ্র, তার দীর্ঘশ্বাসে অগ্নির উত্তাপ। অলিভিয়া বলল—দ্যাখো, তোমার প্রভু তো আমার মনোভাবের কথা ভাল করেই জানেন, আমি তাকে ভালবাসতে পারি নি। আমি ভালকরেই জানি তিনি অতি মহৎ চরিত্রের মানুষ—তাঁর মানমর্যাদা, রূপ ও ঐশ্বর্যের কথাও আমি জানি—তাঁর চরিত্রের পবিত্রতার কথাও জানি—সে সব বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র কিছু বলার নেই। চারিদিকে সকলেই তাকে জানে জ্ঞানী বলে, ভদ্র বলে এবং সাহসী বলে—কিন্তু সে সব সত্ত্বেও আমি তাঁকে ভালবাসতে পারি নি—অনেক আগেই আমার এই অনিচ্ছার কথা তাঁর জানা ও মেনে নেওয়া উচিত ছিল।

ভায়লা বলল—হ্যাঁ, আমি যদি তোমাকে অমন করে ভালবাসতাম যেমন ভালবাসেন আমার প্রভু অরসিনো, তবে আমি কী করতাম জানো—? আমি উইলোর কোমল ডালগুলি দিয়ে একখানি ছোট ঘর বানাতাম তোমার গৃহের প্রবেশপথে,

আর বারবার ডাকতাম তোমার নাম ধরে, আমি সনেট লিখতাম তোমার এই নিষ্ঠুরতার কথা নিয়ে এবং রাত যখন গভীর হত তখন গাইতাম সেই সনেটের গান। পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে ধ্বনিত হত তোমার নাম, আর আমার কণ্ঠে জাগত তারই প্রতিধ্বনি—অস্পষ্ট ধ্বনিতে আকাশে শোনা যেত তোমার নাম—'অলিভিয়া'। না, তুমি জল মাটি আকাশের সঙ্গে এক হয়ে কিছুতেই স্থির থাকতে পারতে না, তোমাকে নেমে আসতে হত, আমার জন্যে তোমার বুকে করুণার উদ্রেক হত।

অলিভিয়া বলল—হয়তো আরও কতকিছু তুমি করতে, কিন্তু বল দেখি, তোমার পিতৃ পরিচয়টা কি? ভায়লা একটু এড়িয়ে উত্তর দিল। সে বলল—আমার যেমন অবস্থা তার চেয়ে অধিক সম্মানীয় বটে, তবে আমি আছি ভালই। আমার পরিচয়, আমি ভদ্রবংশীয় একজন। অলিভিয়া মনে মনে ভায়লাকে ধরে রাখতে চাইলেও মুখে বলল—যাও, তোমার প্রভুকে গিয়ে বল তাকে ভালবাসা আমার দ্বারা হবে না। তিনি যেন তোমাকে আর এখানে না পাঠান। হ্যাঁ, তবে আসতে পার বটে—তিনি কী ভাবে আমার এই প্রত্যাখ্যান নিলেন তাই বলতে।

ভায়লা তখনকার মত বিদায় নিল। বিদায় নেওয়ার সময় সে অলিভিয়াকে সম্বোধন করে গেল 'নির্দয় সুন্দরী' বলে। ভায়লা চলে যাওয়ার পরই অলিভিয়া ভায়লার সেই কথাগুলি নিজের মনে মনে উচ্চারণ করতে লাগল—'আমার যেমন অবস্থা তার চেয়ে অধিক সম্মানীয় বটে, তবে আমি আছি ভালই। আমার পরিচয়—আমি ভদ্রবংশীয় একজন'। সে উচ্চারণ করে জোরে জোরে বলল—আমি শপথ করে বলতে পারি ও নিশ্চয়ই ভদ্রবংশীয়। ওর কথাবার্তা, মুখের চেহারা, হাত পা, ওঠা বসা এবং সর্বোপরি ওর মনের চেহারায়—আমি জোর করে বলতে পারি ও অবশ্যই ভদ্রবংশীয়। অলিভিযার মনে হল হায়, সিজারিও যদি ডিউক হত। কিন্তু একটু পরেই যখন সে উপলব্ধি করল যে সে বড় দুর্বল হয়ে পড়ছে তখন নিজেকেই সে দোষারোপ করতে লাগল। কিন্তু মানুষ তার ভালবাসার এই ভুলকে যতই 'লক্ষ্মীছাড়া' বলে গালাগাল দিক না কেন সে শুধু তার সোহাগের গালাগালি, বেশীক্ষণ সে কথা তার মনে থাকে না। আত্মসম্মানসচেতন ও আত্মসম্বরণে সুস্থির রমণী অলিভিয়ারও সেই অবস্থা। সে আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারল না। নিজের কুলমান বংশগৌরব সব কিছু বিস্মৃত হয়ে, এমন কি তার কুমারীসুলভ বোধটুকুও জলাঞ্জলি দিয়ে সে ঐ সিজারিওকে প্রেম নিবেদন করবে স্থির করল। সিজারিও তখন অনেকটা পথ চলে গেছে। অলিভিয়া তার একজন ভৃত্যকে ডেকে তার কাছে একটি হীরকের অঙ্গুরীয় দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিল সেটা সিজারিওকে গিয়ে দেওয়ার জন্যে। সে যেন তাকে গিয়ে বলে যে ডিউককের পাঠানো ঐ আংটিটি সে ভুল করে ফেলে এসেছে অলিভিয়ার ঘরে। অলিভিয়া ভাবল এই ইঙ্গিতপূর্ণ কৌশলে হয়তো সিজারিও তার মনের কথা বুঝতে পারবে—বুঝতে পারবে এটা আসলে একটা উপহার যা

সে সিজারিওকে দিতে চায়। তাই-ই হল। সিজারিও আংটিটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিল অলিভিয়ার মনোভাব। সে ভালমতই জানত অরসিনো তার হাত দিয়ে অলিভিয়াকে কোনো আংটি পাঠান নি। এখন তার কাছে অলিভিয়ার কথাবার্তা এবং অর্থপূর্ণ দৃষ্টি—সব কিছুই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল—সে স্পষ্টই বুঝল তার প্রভুর প্রেমিকা পড়েছে তারই প্রেমে। সে মনে মনে বলে উঠল—হায় হায়! এই হতভাগিনী অলিভিয়া এর চেয়ে একটা স্বপ্নকেই ভালবাসলে পারত। ছদ্মবেশ বড় বেয়াড়া বস্তু—এর ফলেই আজ অলিভিয়া আমার জন্যে মিথ্যেই মনস্তাপে ভুগছে যেমন ভুগছি আমি ডিউক অরসিনোর জন্যে।

ভায়লা ফিরে এল ডিউকের প্রাসাদে। সে তাঁকে তার ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা সবিস্তারে বলল, ভাল করেই ডিউকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিল যে অলিভিয়া বলে দিয়েছে তার কাছে যেন আর কখনও কেউ ডিউকের হয়ে বিরক্ত করতে না যায়। অরসিনো কিন্তু কিছুতেই শান্ত হতে পারছেন না—তার শেষ আশাটুকু এখনও যায়নি। তাই তিনি পরদিনই আবার পাঠাতে চাইলেন সিজারিওকে অলিভিয়ার বাড়িতে। আর, সিজারিও সেখান থেকে ফিরে আসতে যে সময়টুকু লাগবে সেই কষ্টকর অবকাশটুকু অতিবাহিত করার জন্যে তিনি একটি গান রচনা করলেন নিজে শুনবেন বলে। সিজারিওকে বললেন—সিজারিও লক্ষ্মী ছেলেটি, দ্যাখ, কাল রাত্রে আমি যখন এই গানটি শুনি তখন যেন আমার মনে হয়েছিল আমার মনের সব ব্যথা জুড়িয়ে গেছে। একটু মন দিয়ে শোনো—এ খুবই মামুলি ধরণের আর সহজ। অবিবাহিত মেয়েরা যাদের বয়স হয়েছে তারা রোদে বসে এই গান গায়। আর অল্পবয়সী কুমারীরাও গায়। খুবই সাধারণ ধরণের গানটি, তবু আমার বেশ ভালই লাগে—তার কারণ, সেকালের মানুষেরা ভালবাসাকে কেমন নিরপরাধ ভাবত এ গানে তাই-ই আছে।

গান

আয়রে মরণ, আয় আয়রে আয়,
সাই প্রেমের দুঃখী পাতায় শুইয়ে দে তুই ভাই;
যা উড়ে যা যা উড়ে যা প্রাণ,
সে এক ভারী সুন্দরী সে খুন করেছে আমায়।
সাদা রঙের শবের ঢাকা ইউ পাতাতে বানা, ওরে বানা!
মরতে যত ব্যথা পেলাম কেউ তা জানে না। ওরে কেউ তা জানে না।

গন্ধেভরা পুষ্প কোন, মিষ্টি কোন ফুল
কালো আমার কফিন এলে কেউ যেন না ছড়ায়:

সখা কোন বন্ধু কোন যেন না শোক জানায়
আমার দেহ ঘিরে—অস্থিগুলো, এ হাড় আমার ছড়ায় চুপি চুপি
সেই করবে কেউ যেন না আসে, সত্যিকারের সোহাগী কেউ
চোখের জলে কিংবা দীর্ঘশ্বাসে।

পুরোনো দিনের এই গানটির কথাগুলি খুব মন দিয়েই শুনলো ভায়লা, আর এর সহজ আবেদনের মধ্যে যে লুকোনো আছে ব্যর্থ ভালবাসার তীব্র আর্তি তা বুঝতে তার অসুবিধা হল না—তাছাড়া তার নিজের চোখেমুখেই তো ফুটে উঠছিল এ গানের সবটুকু ব্যথা। ভায়লার মুখে এই বিষণ্ণতার ছায়া অরসিনোর চোখে ধরা পড়ল। অরসিনো বললেন—সিজারিও, আমি জোর করে বলতে পারি তুমি যদিও বয়সে এখনও নবীন তবু তোমার মন নিশ্চয়ই কারো জন্যে ভালবাসায় উতলা হয়েছে—ঠিক কি না, সত্যি করে বল। ভায়লা বলল—যদি অপরাধ না নেন তবে বলব আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। অরসিনো বললেন—তা সে নারী কেমন. কত বয়স তার ? ভায়লা বলল—আজ্ঞে, আপনারই সমবয়সী, আপনারই মত গায়ের রং। ভায়লার কথা শুনে ডিউকের হাসি পেল। তিনি ভাবলেন এইটুকু একটা বালক ভালবাসে এমন এক নারীকে যে ওর চেয়ে বয়সে বড় আর যার গায়ের রং পুরুষদের মত কালো। ভায়লা আসলে যা ইঙ্গিত করেছিল তার অর্থ ভালবাসার পাত্রটি ডিউকের মত কোন স্ত্রীলোক নয়—ডিউক নিজেই।

ভায়লা যখন পুনরায় অলিভিয়ার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল তখন আর সেখানে প্রবেশের জন্যে তাকে কোন মেহনৎ করতে হল না। খুব সহজেই দরজা খুলে গেল। অলিভিয়ার মত ধনীর দুহিতাদের বাড়িতে ভৃত্যকুল বেশ ভালই বুঝতে পারে গল্পগুজব রঙ্গতামাসার জন্যে অন্দরে ঢোকার অবাধ অধিকার কার আছে বা নেই। অতএব সিজারিও আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেলাম জানিয়ে অলিভিয়ার খাসমহলে নিয়ে গেল একজন পরিচারক। সিজারিও, অর্থাৎ ভায়লা বলল যে সে তার প্রভুর আবেদন জানানোর উদ্দেশ্যেই আবার এসেছে। অলিভিয়া বলল—ডিউকের কথা রাখো, তার বিষয়ে আমি আর কোন কথাই শুনতে চাইনা, বরং অপর কারো ভালবাসার কথা যদি আমাকে শোনাতে পারো তবে আমি শুনতে রাজী আছি। আর শুধু রাজীই নই, সেই ভালবাসার কথা আমার কানে এমনই মধুর মনে হবে যেন আমি মহাকাশে নক্ষত্রের সংগীত শুনছি। অলিভিয়ার কথাগুলির অর্থ খুবই স্পষ্ট, কিন্তু তবুও সে আরো স্পষ্ট করে তার মনের কথাটি বলল সিজারিওকে। সে বলল—সিজারিও তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। কথাটা শোনার পরে স্বভাবতই ভায়লার মুখে যুগপৎ বিরক্তি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব ফুটে উঠল, কিন্তু সেই মুখশ্রীও যেন অলিভিয়াকে আরো মুগ্ধ করল। সে বলল—আহা কী সুন্দর লাগছে তোমার মুখে ঐ রাগ ও অবজ্ঞার ছবি। সিজারিও, তোমাকে আমি সত্যের

নামে শপথ করে বলছি আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি অহংকারে যদিও মুখ ফিরিয়ে নাও, তবুও আমি ভালবাসব। আমার সাধ্য নেই নিজেকে আমি গোপণ রাখি, এমন বুদ্ধি নেই যে নিজেকে সংযত করি। কিন্তু অলিভিয়া বৃথাই এতক্ষণ ধরে ভায়লার কাছে তার মনের গোপন কথাগুলি বলে গেল। ভায়লা কোনরকমে নিজেকে গোপণ করে দ্রুত পায়ে সেখান থেকে উঠে পড়ল এবং যাওয়ার সময় বলতে বলতে গেল যে আর কোনদিনই সে অরসিনোর হয়ে অলিভিয়ার বাড়িতে আসবে না। এছাড়া আরো বলে গেল অলিভিয়া যতই কাতর প্রার্থনা করুক না কেন সে 'কোনদিনই কোনো নারীকে ভলবাসবে না'।

অলিভিয়ার বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে না বাডাতেই এক মহা বিপদের মধ্যে পড়তে হল ভায়লাকে। কথা নেই বার্তা নেই একটি যুবক এসে তাকে আহবান করল অসিযুদ্ধে। আসলে সেই যুবকটি অলিভিয়াকে ভালবাসতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল এবং সে শুনতে পেয়েছে যে অলিভিয়া এই সিজারিওকে ভালবাসে। কাজেই সিজারিওকে তার প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে সে এগিয়ে এসেছে। ভায়লা পড়ল মহা মুস্কিলে. সে পুরুষের বেশ পরেছে বটে, কিন্তু অস্ত্র ধরতে গেলে তো তার হাত কাঁপতে থাকে, বুকও দুরু দুরু করতে থাকে।

সেই ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বীটি তো ক্রমশ এগিয়ে আসছে আর ভায়লার হাত পা ক্রমশই শিথিল হয়ে আসছে। সে কোনো কূলকিনারা না পেয়ে অবশেষে ভাবল যে লোকটির কাছে নিজের প্রকৃত অবস্থাটা খুলেই বলে দেবে—তার ছদ্মবেশের রহস্যটা আর চাপা রাখবে না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়েই সেখান থেকে যাচ্ছিল অপরিচিত এক ব্যক্তি। সে এসে ভায়লাব পাশে দাঁড়ানোতে আপাতত তার মান বাঁচল, ছদ্মবেশের রহস্যটা আর প্রকাশ করতে হল না। অপরিচিত ব্যক্তিটি যেন সিজারিওর খুবই পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ—সে সিজারিওর প্র্রি ডেকে বলল যদি তোমার কিছু বোঝাপড়া করার কথা তবে তা আমার সঙ্গেই করো। তোমার যদি কোন অভিযোগ থাকে এর বিরুদ্ধে তবে তার জবাব আমিই দিতে প্রস্তুত। ওর গায়ে হাত দিলে আমি তোমাকে ছাড়ব না। ভায়লা কোনো কিছু বোঝার আগেই এবং ব্যাপারটা আর বেশীদূর গড়ানোর আগেই সেখানে এসে হাজির হল ডিউকের দুজন পুলিশের লোক এবং তারা এসেই ঐ অপরিচিত ব্যক্তিকে হাতকড়া পরিয়ে দিল। সে না-কি কয়েকবছর আগে কী একটা অপরাধ করেছিল যার জন্যে পুলিশ তাকে এযাবৎ অনুসন্ধান করে আসছে। সেই লোকটি তখন ভায়লাকে বলল—তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েই এই ঝঞ্ঝাট, তা এখন দাও দেখি তোমার কাছে যা টাকাকড়ি আছে। আমার খুবই খারাপ লাগছে টাকাটা চেয়ে নিতে। আরও খরাপ লাগছে এই ভেবে যে আমার যা-ই হোক তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু তোমার কোন উপকার করতে পারলাম না। তোমার বড় অবাক লাগছে, তাই না? তবে মন খারাপ কোর

না। ভায়লা তো আকাশ থেকে পড়ল। লোকটি কে হতে পারে তার কিছুই সে জানে না, তাকে সে কখনো দেখেছে বলে মনে করতেই পারে না। অথচ সে বলছে তার টাকার থলি সে তাকে না-কি দিয়েছে। ভায়লার ভারী অদ্ভুত লাগছে লোকটাকে, তবে একথাও ঠিক যে লোকটি তাকে সাহায্য করার জন্যে লড়াই করতে এগিয়ে এসেছিল, অতএব তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় সে তার নিজের কাছে যে সামান্য টাকাকড়ি ছিল তার প্রায় সবটাই দিয়ে দিল। টাকাটা এত অল্প দেখে লোকটি ভারী রেগে গেল। সে যা তা বলে দোষ দিতে শুরু করল ভায়লাকে। সে বলল—বড় অকৃতজ্ঞ ও নির্দয় এই ছেলেটি (অর্থাৎ সিজারিও, অর্থাৎ ভায়লা)! এই যে ছেলেটিকে আপনারা এখানে দেখছেন ওকে আমি মৃত্যুর হাত থেকে একদিন বাঁচিয়ে ছিলাম, আর শুধু ওর জন্যেই আজ আমাকে ইলিরিয়াতে আসতে হয়েছে, আর সেই কারণেই আজ এই বিপদে পড়তে হল। পুলিশ অফিসাররা এত কথা শুনতে চায় না। তারা বলল—তোমার সঙ্গে কার কী হয়েছে না হয়েছে সে কথায় আমাদের কাজ নেই। তোমার ছাড় নেই, চলো। লোকটিকে এই বলতে বলতে পুলিশ অফিসাররা যখন টানতে টানতে নিয়ে চলেছে তখন সে ভায়লার দিকে তাকিয়ে তাকে সেবাসতিয়ান সেবাসতিয়ান বলে ডাকতে শুরু করল, এবং বলল সেবাসতিয়ান, তুমিই বললে আমাকে তুমি চেন না? সেবাসতিয়ান নামটি শোনামাত্র ভায়লার যেন সম্বিত ফিরে এলো—লোকটির কাছে কোন কথা শোনার আগেই তাকে পুলিশ টেনে নিয়ে গেছে—কিন্তু ভায়লা ভাবতে লাগল নিশ্চয়ই তার ভাই আজও জীবিত আছে এবং এই লোকটিই হয়তো একদিন তার জীবন রক্ষা করেছিল। ভায়লার অনুমানে কিছু ভুল ছিল না।

যে অপরিচিত লোকটি ভায়লার হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মারামারি করতে এসেছিল তার নাম অ্যান্টোনিও। অ্যান্টোনিও ছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন। সেই যে ঝড়ে জাহাজডুবির পর সেবাসতিয়ান একটা মাস্তুলে নিজেকে বেঁধে সমুদ্রে ভেসে চলেছিল আর ভাসতে ভাসতে ঢেউএর আঘাতে ক্রমশ তার দেহের শক্তি একেবারেই ফুরিয়ে আসছিল, সেই বিপদের মুহূর্তেই তাকে রক্ষা করেছিল অ্যান্টোনিও। তাকে সে তুলে নিয়েছিল নিজের জাহাজে এবং তার পর থেকেই সেবাসতিয়ান ও অ্যান্টোনিওর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারা পরস্পরকে এতই ভালবাসতো যে কেউ কাউকে কাছছাড়া করত না। তাই বহুদিন পরে যখন সেবাসতিয়ান ইলিরিয়াতে ডিউকের দরবারে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করল তখন নিজের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অ্যান্টোনিও তার সঙ্গে ইলিরিয়াতে আসে। ইলিরিয়াতে আসাতে তার বাধা এই যে কোন এক সময়ে এক জলযুদ্ধে সে ডিউকের ভাইপোকে মারাত্মক রকম জখম করেছিল—আর সেইটিই ছিল তার অপরাধ। যে অপরাধের জন্যে আজ তাকে পুলিশের হাতে পড়তে হল।

সেবাসতিয়ান এবং অ্যান্টোনিও ইলিরিয়াতে এসে পৌঁছেছিল সেদিনই। যখন ভায়লার সঙ্গে অ্যান্টোনিওর এই হঠাৎ দেখা হল তার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে। ইলিরিয়াতে পৌঁছে সে তার টাকাকড়ি রাখতে দিয়েছিল সেবাসতিয়ানের কাছে। তাকে সে বলেছিল শহরটা ঘুরে দেখতে আর যদি কিছু কেনাকাটা করতে ইচ্ছে হয় তবে ঐ টাকার থলি থেকে যেমন খুশী খরচ করতে। বেড়ানো হয়ে গেলে যেন সে সরাইখানায় ফিরে এসে আবার অ্যান্টোনিওর সঙ্গে দেখা করে। অ্যান্টোনিও বেচারার ঐ শহরে বেরুবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কেননা তার ধরা পড়ার ভয় ছিল। কিন্তু সেবাসতিয়ানের ফিরতে অনেক দেরী হচ্ছে দেখে সে আর চুপ করে বসে থাকতে পারে নি---তাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিল। আর সেই বেরিয়ে পড়ার জন্যেই পথের মধ্যে সিজারিওকে সে দেখতে পায়। তাকে সে সেবাসতিয়ান মনে করে এগিয়ে এসেছিল তার হয়ে মারামারি করতে, আর তখনই বাধল এই বিভ্রাট। অ্যান্টোনিও পুরুষবেশী ভায়লাকে বন্ধু সেবাসতিয়ানই মনে করেছিল এবং ভায়লা যখন তাকে চেনা বলে স্বীকার করল না তখন স্বাভাবিকভাবেই সে তার বিরুদ্ধে অভিমানে তাকে দোষারোপ করতে করতে চলে যায়।

পুলিশ অ্যান্টোনিওকে নিয়ে যাওয়ার পর ভায়লা আর সেখানে থাকা নিরাপদ বোধ করল না---পাছে আবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে লড়াই করতে আহবান করে। তাই সে পড়ি কী মরি করে দৌড়ে সেই স্থান ত্যাগ করল। আর ঠিক একটু পরেই সেখানে এসে উপস্থিত হল তার ভাই সেবাসতিয়ান, যাকে দেখে ভায়লার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবল সিজারিওই বুঝি আবার ফিরে এসেছে। সে সেবাসতিয়ানকে বলল--- আবার এসেছ, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি। এই বলে যেই সে তার তরোয়াল বের করে আঘাত করতে এগিয়েছে অমনি সেবাসতিয়ানও তার তরোয়াল হাতে রুখতে গেল। আর ঠিক এই সময় সেখানে এসে পড়ল অলিভিয়া।

অলিভিয়া আসাতে লড়াইটা আর এগোতে পারল না। সে সেবাসতিয়ানকে দেখে ভাবল বুঝি সিজারিওই মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছে। তাই সে সেবাসতিয়ানকে সিজারিও ভেবে তার বাড়ির ভেতর ডেকে নিয়ে গেল এবং তার ব্যথা লেগেছে ভেবে আহা উহু করতে শুরু করল। সেবাসতিয়ান তো অবাক। ঐ অপরিচিত লোকটিই বা কেন তাকে মারতে এসেছিল, আর এই অপরিচিতা মহিলাই বা তার প্রতি এত সদয় কিসের জন্যে। অবাক হয়ে থাকলেও অলিভিয়ার মধুর ব্যবহারটি তার কাছে বেশ ভালই লাগছিল কেননা অলিভিয়ারও খুব স্ফূর্তি হয়েছিল সিজারিওকে এমন আকস্মিক পেয়ে গিয়ে। তাই সে সেবাসতিয়ানকে নিজের হাতেই যত্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অলিভিয়ার স্ফূর্তি আরও বেশী হওয়ার কারণ সিজারিও যেন এখন আর এক মানুষ হয়ে গেছে। এখন আর তার মুখে বিরক্তি বা রাগের কোন চিহ্ন নেই। সে বুঝতেই পারেনি সেবাসতিয়ান কেন খুশী এবং সিজারিও কেন

বিরক্ত ছিল।

মেয়েটির এই বিগলিত ভাবটি সেবাসতিয়ান বেশ উপভোগই করছিল। সে ঠিক ঠাওর করতে পারছিল না হঠাৎ একটি মেয়ে কেন তাকে নিয়ে পড়ল এবং প্রথম সাক্ষাতেই এমন মনপ্রাণ সঁপে দিতে ব্যস্ত হয়ে পডল। তার একবার মনে হল হয়তো মেয়েটির মাথায় কিছু গোলমাল থেকে থাকবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মনে হল—তাই বা কী করে হয়? এত বড আর এত সুন্দর বাড়ির কর্ত্রী এই মেয়েটি, এতগুলি লোকজন নিয়ে নিখুঁতভাবে বৈষয়িক সব কিছু দেখাশোনা করে। তা হয়তো এমনও হতে পারে যে হঠাৎ একটা ভালোলাগায় সে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে নি। তা যাই হোক, ভলবাসা যখন পাওয়া গেছে তখন আর তা ফিরিয়ে কাজ নেই। অতএব সে-ও অলিভিয়াকে প্রশ্রয় দিতে আর দ্বিধা করল না এবং অপরপক্ষে অলিভিয়াও দেখল এই তো মওকা পাওয়া গেছে—কে জানে পরে আবার সিজারিওর মতিগতির পরিবর্তন ঘটতে পারে, কাজেই এই বেলা বিয়েটা করে নেওয়া যাক। তার আর দেরী সয় না। বাড়িতেই একজন পুরোহিত ছিল, তাকে নিয়েই মন্ত্রটা পডিযে নেওয়া যাক। সেবাসতিয়ানও দেখল মন্দ নয়—অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা। অতএব বিয়ে সারা হল এবং সেবাসতিয়ান তড়িঘড়ি বেরিযে পড়ল তার বন্ধু অ্যান্টোনিওকে এই সুখবরটা জানাতে।

আর ঠিক এই সময়েই আবার ডিউক অরসিনো এসে উপস্থিত অলিভিয়ার বাড়িতে। অরসিনো এসে পৌছতে না পৌছতেই এদিকে পুলিসের সেই অফিসার দুটি সেখানে এনে হাজির করল অ্যান্টোনিওকে, ডিউকের সামনে। ডিউকের সঙ্গে সিজারিও অর্থাৎ ভায়লাও ছিল। তাকে দেখামাত্র অ্যান্টোনিও মনে করল সেই সেবাসতিয়ান। অ্যান্টোনিও তখন ডিউকের কাছে বলতে শুরু করল কেমন করে বিপদের মুখ থেকে সে উদ্ধার করেছিল এই যুবকটিকে যখন সে সমুদ্রে ডুবে যেতে বসেছিল- সে বলে চলল কেমন করে এতদিন ধরে সে ঐ যুবকটিকে সমানে দেখা শোনা করে এসেছে—আর এই গত তিন মাস যাবৎ কেমন করে ঐ অকৃতজ্ঞ যুবকটিকে সে আগলে নিয়ে বেড়িয়েছে। এমন সময় অলভিয়া ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এলো। ডিউক তখন আর অ্যান্টোনিওর বাজে কথায় কান দিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইলেন না—তিনি বললেন, দ্যাখ ঐ কাউন্টেস এসে পড়েছেন—যেন স্বর্গের দেবী নেমে এলেন মর্তে। ওহে বাতুল। তোমার ঐ বাজে কথা রাখ দেখি, তুমি বলছ তিন মাস যাবৎ তুমি ওকে দেখাশোনা করেছ। তা জান কি, এই ছেলেটি আমার কাছেই রয়েছে গত তিন মাস যাবৎ? এই বলে তিনি অ্যান্টোনিওকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে পুলিশকে বললেন। কিন্তু অরসিনো যাকে স্বর্গের দেবী বলে তুষ্ট করছিলেন সেই অলিভিয়াই স্বয়ং সিজারিওকে এমনভাবে প্রেম নিবেদন করতে আরম্ভ করল যে ডিউক তা শুনে সিজারিওর উপর রেগে আগুন। তিনি ভাবলেন

কত বড় বিশ্বাসঘাতক এই সিজারিও। সে কি-না তাঁর দূত হয়ে অলিভিয়ার কাছে এসে নিজেই তার সঙ্গে ভালবাসায় জড়িয়ে পড়েছে। তিনি সিজারিওকে বললেন—দাঁড়া তোকে আমি মজা দেখাচ্ছি—সামান্য চাকর হয়ে এত বড় সাহস! চল্, আজ তোর একদিন কী আমার একদিন। ভায়লার প্রতি এই কঠোর আচরণে মনে হল সত্যিই বুঝি ভায়লাকে ডিউক এখুনি গিয়ে মেরেই ফেলবেন, কিন্তু ভায়লা সেজন্যে বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। ডিউকের প্রতি তার যে ভীরু প্রণয় তা তার মনে তখনও জাগরুক—তাই সে বলল—আপনি আমার প্রভু, আপনার হাতে মৃত্যুও আমার পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু অলিভিয়া তার স্বামীকে এত সহজে মরতে দেবে কেন? সে বলল—আমার সিজারিওকে নিয়ে যাবে কার সাধ্য? সিজারিও, কোথায় চললে তুমি? উত্তরে সিজারিও বলল—তারই সঙ্গে চলেছি যাকে আমি আমার প্রাণের অধিক ভালবাসি। অলিভিয়া সঙ্গে সঙ্গে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বলল সে সিজারিওকে কিছুতেই যেতে দেবে না, কেননা সিজারিও তার স্বামী। সে তৎক্ষণাৎ পুরোহিতকে ডেকে পাঠাল এবং পুরোহিত এসে সাক্ষ্য দিয়ে বলল যে এই মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে অলিভিয়ার সঙ্গে সে সিজারিওর বিয়ের অনুষ্ঠান করেছে। সিজারিও বারবার আপত্তি জানিয়ে বলতে লাগল, না সে বিয়ে করেনি। কিন্তু কে তার কথা শুনবে? পুরোহিত ও অলিভিয়ার কথাতেই সকলে বিশ্বাস করল এবং ডিউক ধরে নিলেন তাঁর ভৃত্য সিজারিও তাঁকে প্রবঞ্চনা করে চুরি করে নিয়েছে সেই বস্তুটি যা কি না পৃথিবীতে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন, এমনকি তাঁর জীবনের চেয়েও বেশী। কিন্তু যা চলে গিয়েছে তা তো আর ফিরে পাওয়ার নয়। তাই তিনি ঘরে যেতে যেতে বিদায় নিলেন তাঁর অবিশ্বাসী প্রেমিকা ও প্রবঞ্চক তার ভৃত্যের কাছে, আর ভৃত্যকে বলে গেলেন যেন আর কোনদিন সে তাঁর কাছে মুখ না দেখায়।

ঠিক এই সময়েই এমন একটি ঘটনা ঘটল যা দেখে সকলের মনে হল যেন এক অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য রহস্য—কেননা সবার চোখের সামনে এসে উপস্থিত হল অপর একজন সিজারিও এবং সে অলিভিয়াকে সম্বোধন করল নিজের স্ত্রী বলে। এই অভিনব সিজারিও আসলে সেবাসতিয়ান, এবং সে প্রকৃতই অলিভিয়ার স্বামী। দুটি সিজারিওরই একই রকম চেহারা, একই গলার স্বর, একই পোশাক—তাই এই ভাইবোন দুটিও কম অবাক হয়নি। তারা পরস্পরকে প্রশ্ন করতে শুরু করল। ভায়লা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে তার ভাই সেবাসতিয়ান বেঁচে আছে, আর সেবাসতিয়ানও বুঝতে পারছে না তার যে বোন জলে ডুবে গিয়েছিল সে-ই আবার কেমন করে একটা পুরুষ হয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু অনতিবিলম্বেই রহস্য উন্মোচন করে সিজারিও বলল সে-ই ভায়লা, সে-ই সেবাসতিয়ানের বোন—সিজারিও তার ছদ্মবেশী নাম আর পুরুষের পোশাক তার ছদ্মবেশ।

অতএব এক মুহূর্তেই যাবতীয় ভ্রান্তির অবসান ঘটল। ভাই ও বোনের চেহারায় এই অভূতপূর্ব সাদৃশ্যই যত কিছু গোলযোগের কারণ—সকলেই এ নিয়ে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল, কেননা অলিভিয়া ভুল করে পুরুষ ভেবে একটি মেয়েকে বিয়ে করে বসে আছে। এ সংকট অবশ্য সমাধান হতে কোন অসুবিধা হল না, কেননা অলিভিয়া ভায়লার বদলে তার ভাই সেবাসতিয়ানকেই স্বামী বলে পেয়ে গেল।

অরসিনোর সব আশাই চলে গিয়েছিল অলিভিয়া ও সিজারিওর বিবাহ বন্ধনে—এবার তাঁর মনে নতুন করে আবার একটু আশার আলো দেখা দিল। সিজারিও যে এমন সুন্দরী একটি মেয়ে হতে পারে তা তো তাঁর আগে মনে হয়নি? তিনি অতি মনযোগসহকারে সিজারিওর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন—এবার তার মনে হল, হ্যাঁ সত্যিই তো তাঁর সিজারিও ভারী সুন্দর, ওকে নারীর পোশাকে সত্যিই তো অপরূপ লাগবে। এখন তাঁর মনে পড়তে লাগল সিজারিও কেন অনেক সময় তাঁকে বলত—'আমি আপনাকে ভালবাসি'। তখন তার সেই কথাকে তিনি মনে করতেন ভৃত্যের প্রভুভক্তির উক্তি মাত্র কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—সেই কথাকটির আরো গভীর তাৎপর্য ছিল। আরো কত কী বলত সিজারিও। তখন সেগুলোকে অনেকটা ধাঁধার মত মনে হত। সবই যেন এখন স্পষ্ট পরিষ্কার মনে হচ্ছে—ডিউক মনস্থির করে ফেললেন—ভায়লাকেই তিনি বিয়ে করবেন। ভায়লাকে ডেকে তিনি বললেন—ওহে ছোকরা, (ডিউক মাঝে মাঝে সিজারিও এবং মাঝে মাঝে ছোকরা বলেই ডাকতেন ভায়লাকে) অজস্রবার তোমার মুখে শুনেছি তুমি কোন মেয়েকে বিয়ে করবে না যাকে কি না আমার মত দেখতে—এখন বুঝেছি কী তুমি বলতে চেয়েছিলে। বেশ, তোমার কথাই থাক, তুমি যে আনুগত্য নিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখে আমাকে প্রতিদিন সেবা করেছ আজ তারই প্রতিদানে তুমি যাকে প্রভু বলে ডাকতে তোমার সেই প্রভুই আজ তোমার প্রভুত্বের কাছে ধরা দিল—তুমিই হবে অরসিনোর পত্নী—ডিউকের ডাচেস।

অলিভিয়া দেখল ডিউক ভায়লার প্রতি ভালবাসায় ধরা দিলেন—এতকাল ডিউককে সে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। আজ সে ডিউক এবং অন্যান্যদের তার বাড়ির ভিতর আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল এবং তার সেই পুরোহিতকে ডেকে ডিউক অরসিনোর সঙ্গে ভায়লার বিবাহের ব্যবস্থা করে দিল। একই দিনে সম্পন্ন হল ভাই ও বোনের বিয়ে এবং একই পুরোহিতের দ্বারা একই বাড়িতে। ভাই আর বোন একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সমুদ্রের ঝড়ের আঘাতে—আজ সেই আঘাতই আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল তাদের দুটির জীবনে। ভায়লা আজ থেকে ডিউক অরসিনোর পত্নী—ইলিরিয়ার ডাচেস এবং সেবাসতিয়ান এক অতি বিত্তশালী অভিজাত কাউন্টেসের স্বামী—অলিভিয়া যার নাম।

ওথেলো

ভেনিস নগরীর সেনেটর ব্রাবনশিও, ধনী ও বিত্তবান। ব্রাবনশিওর এক অপরূপ কন্যা ছিল, নম্র ও শান্তস্বভাবা ডেসডেমনা। রূপে ও গুণে এমন একটি কন্যার পাণিপ্রার্থীর আনাগোনার বিরাম নেই, তদুপরি তার পিতার বিশাল বৈভব—সে প্রত্যাশাও বড় কম নয়। ডেসডেমনা কিন্তু অন্য প্রকৃতির। তার নিজের দেশের কোন যুবক অথবা তারই মত শ্বেতাঙ্গ কোন পাত্রকে সে আজ অবধি ভালো লাগার মত ভাবতে পারেনি। তার মনটা ছিল উঁচু মানের, তাই সেখানে রূপের আবেদন যতটুকু তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্য মানুষের মন অথবা হৃদয়ের। এমন মন নিয়ে যে অসাধারণ পথে পা বাড়াল ডেসডেমনা তা যদিও মহৎ ও প্রশংসনীয় তবু দুরূহ ও অবাঞ্ছিত। কেননা, ডেসডেমনা ভালবেসে ফেলেছিল এক কৃষ্ণকায় মূর অথবা নিগ্রোকে যে ছিল তার বাবার অত্যন্ত প্রিয় এবং সেই কারণে তাব বাবা প্রায়ই তাকে নিমন্ত্রণ কবে ডেকে পাঠাতেন তাঁর বাড়িতে।

ডেসডেমনাব এই পাত্রনির্বাচন দেশ ও কালসম্মত না হলেও তাকে এ জন্যে খুব একটা দোষ দেওযা যায় না। ওথেলোর যদি কোন অযোগ্যতা থেকে থাকে তা শুধু তার গায়ের রং—সে কৃষ্ণকায়। কিন্তু পাত্র হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে সে যে কোন শ্রেষ্ঠ রমণীর কাছেই বরণীয়—সে যোদ্ধা ও বীর সৈনিক—দুর্ধর্ষ তুর্কীদেব বিরুদ্ধে সৈন্যচালনায় দক্ষতার ফলে সে অর্জন করেছে ভেনিসের সেনাধ্যক্ষেব পদ—সে আজ দেশের রাজসম্মানে সম্মানিত ও একজন বিশেষ নির্ভরযোগ্য সেনানায়ক।

যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিতে ওথেলোকে পাড়ি দিতে হয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। তার স্মৃতিব ঝুলিতে তাই বিচিত্র গল্প ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। গল্পের প্রতি মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবণতার কথা কে না জানে—আর ডেসডেমনাও তাই মুগ্ধ হযে যেত ওথেলোর মুখে তার বীরত্বেব নানা কাহিনী শুনে। কত রোমাঞ্চকর সেই উপাখ্যানগুলি—কখনো বা যুদ্ধেব হানাহানি, কখনো বা দুর্গ অবরোধের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা, কখনো বা সম্মুখ যুদ্ধের নিদারুণ সংকট—এই সব অবস্থার মধ্যেই বারবার ওথেলোকে পড়তে হযেছে, কখনো জলে, কখনো স্থলে। আবার কেমন অতি অল্পের জন্যে নিদারুণ বিপদের মুখে সে বেঁচে ফিরে এসেছে, কেমন বীরের মত কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে গেছে কা...নের মুখে—আবার কখনো যুদ্ধবন্দী হয়ে শত্রুর হাতে পশুর মত লাঞ্ছিত হয়েছে—এবং কেমন সাহস সঞ্চয় করে শত্রুশিবির থেকে পালিয়ে ফিরে এসেছে—এই সব গল্প শুনেছে ডেসডেমনা ওথেলোর কাছে দিনের পর দিন। আবও শুনেছে নানা দেশের বিচিত্র সব বস্তুর কথা—দূর-দূরান্তে কত বিশাল অরণ্য, রোমহর্ষক পার্বত্য গুহা, গভীব খাদ নেমে গেছে পাহাড়ের

ধার বেয়ে, বিশাল বিশাল সেই পাহাড় পর্বত—যাদের চূড়া গিয়ে মিশেছে মেঘলোকে। আবার কত বর্বর জাতি, নরখাদক ক্যানিবাল, আফ্রিকার সেই বিচিত্র নর যাদের মাথা উঠেছে কাঁধের নিচের দিকে। ওথেলোর অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে যখন সে একে একে ঢেলে দিত এই সব কাহিনী তখন জাদুমুগ্ধ ডেসডেমনা তার সব কাজ ভুলে বসে থাকতো তার পাশে—যদি কখনো বাড়ির অন্দর থেকে কোন কারণে তার ডাক পড়তো তবে কোনরকমে যত দ্রুত সম্ভব সে ভিতর থেকে আবার ফিরে আসতো এবং সব কিছু ভুলে গিয়ে ঐ গল্পের জগতেই ঘুমিয়ে পড়তো।

গল্পের দিনগুলো এমনি করেই কাটছিল। এরই মধ্যে একদিন সরলমনা ডেসডেমনার মুগ্ধ মুহূর্তে ওথেলো তাকে বলল—আমার জীবনের যা কিছু ঘটনা সবই তোমাকে বলব, যত দুঃখ কষ্টের পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে তার সবই। ওথেলোর দুঃখ কষ্টের কথা অলক্ষ্যে ডেসডেমনার মনে তার উপর যে সহানুভূতির উদ্রেক করেছিল তার মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল ওথেলোর প্রতি তার গভীর ভালবাসা।

গল্পের শেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ডেসডেমনা বলেছিলো এত দুঃখের গল্প না শুনলেই ভালো ছিল, তবু ঈশ্বরই হয়তো তাকে সন্ধান দিয়েছেন এমন একজন দুঃখী মানুষের, আর যদি ওথেলোর এমন কোন বন্ধু থাকে যে তাকে শিখিয়ে দেবে এমন দুঃখের কথা কেমন করে বলা যায় তাহলে সে সেই বন্ধুকে তার ভালবাসা উজাড় করে দেবে। ডেসডেমনার এই ইঙ্গিতটুকু সহজেই ধরা পড়ল ওথেলোর কাছে, তাই সে ও সম্পূর্ণ ধরা দিল তার ভালবাসায়। পরস্পরকে দেওয়া দুজনের এই ভালবাসার অঙ্গীকারকে তারা চিহ্নিত করল গোপণ বিবাহবন্ধনে।

ওথেলো কৃষ্ণকায়—জামাতারূপে তাকে গ্রহণ করা ব্রাবনশিওর মত অভিজাত শ্বেতাঙ্গের পক্ষে অসম্ভব, তাছাড়া ওথেলোর বিষয় বৈভবের আভিজাত্যই বা কোথায়? ব্রাবনশিও তার একমাত্র কন্যাকে চলাফেরার স্বাধীনতা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার ধারণা ছিল মেয়ে তার ভাবী বর পছন্দের ব্যাপারে পারিবারিক সম্মানের কথা মনে রেখে কোনো অভিজাত পাত্রকেই বেছে নেবে—সেনেটের কোন সদস্য অথবা সমতুল কোনো উচ্চাকাঙ্খী পাত্র। ব্রাবনশিও ভেবেছিল ভেনিসের সব অভিজাত মেয়েদের মতই তার মেয়েও তেমনটি করবে। ডেসডেমনা কিন্তু তার বাবার ইচ্ছা পূরণ করতে পারল না—সে ঐ মূরের প্রেমেই মুগ্ধ হল—সে হলই বা কালো—কিন্তু তার মত সাহসী ও বীর কজন আছে? ডেসডেমনা তার সারা মন প্রাণ, তার ধন দৌলত সব কিছুই উজাড় করে দিতে চাইল ওথেলোকে। তার হৃদয়ের এই ঐকান্তিক ভালবাসা ও নিষ্ঠা ছিল এতই গভীর যে যেখানে তার সমকক্ষ অপর যে কোনো মেয়ের কাছে ওথেলোর 'কালো' ব্যাপারটাই পাত্র হিসাবে তার পক্ষে হতে পারতো সব চেয়ে দুর্লংঘ্য বাধা ডেসডেমনার কাছে তা কোন বাধা হয়েই দেখা দেয়নি, বরং তার চোখে ওথেলোকে মনে হয়েছিল ভেনিসের যাবতীয় শ্বেতাঙ্গ

অভিজাত বর্গের তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

এদিকে ওথেলো ও ডেসডেমনার গোপণ বিবাহ আর গোপণ রইল না, অচিরেই সেনাধ্যক্ষের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অধস্তন এক কর্মচারী ইয়াগোব প্ররোচনায় এই বিবাহের সংবাদ পৌঁছে গেল প্রবীণ ব্রাবনশিওর কানে। ব্রাবনশিও তো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল রাগ ও আক্রোশে--সে বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করে হাজির হল ডিউকের দরবারে---ওথেলোর বিরুদ্ধে তার আর্জি নিয়ে, বিচারের আশায়। ডিউকের কাছে নালিশে ব্রাবনশিও বলল কালো ওথেলো তার মেয়েকে ডাকিনী বিদ্যায় তুক্ করেছে এবং বশীকরণের ফলেই তার মেয়ে এমনভাবে বাবাকে না জানিয়ে তার অমতেই ওথেলোকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। সৌজন্য ও আতিথেযতার সুযোগ নিয়ে ওথেলো তার এই সর্বনাশ করেছে।

ডিউকের দরবারে ব্রাবনশিওর নালিশ যখন সারা ভেনিসকে তোলপাড় করতে চলেছে ঠিক সেই সময়েই এমন এক সংকট দেখা দিল যার ফলে ওথেলোর সাহায্য প্রয়োজন হল ভেনিসের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যে। ভেনিসের ডিউকের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছেছে এক বিশাল নৌবহব সাজিয়ে তুর্কী সৈন্যরা এগিয়ে আসছে সাইপ্রাস দ্বীপের দিকে---তাদের লক্ষ্য তারা সাইপ্রাস পুনরুদ্ধার করবে ভেনিসের হাত থেকে, কেননা এই জরুরী বন্দরটি তখন ছিল ভেনিসেবই শাসনাধীন। অতএব, এই আপৎকালিন অবস্থায় সমগ্র সেনেটের চোখ পড়ল ওথেলোর দিকে, কেননা ওথেলোই একমাত্র সেনাধ্যক্ষ যার উপর নিশ্চিন্তে দেশরক্ষার এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়। স্বভাবতই ওথেলোর ডাক পডল ভেনিসেব দববাবে ---এবং সে এসে যখন সেনেটের সদস্যদের সামনে দাঁড়াল তখন সে একাধারে যেমন দেশের এক জরুরী কাজে সর্বসম্মত নির্বাচিত পাত্র, অন্যদিকে তেমনি আসামীর কাঠগডায উপস্থিত এক অপরাধী, ভেনিসের আইন মোতাবেক যে অপরাধেব শাস্তি প্রাণদণ্ড।

ব্রাবনশিও বয়সে প্রবীণ, তাছাড়া সেনেটের একজন সম্মানিত সদস্য---তার মত ব্যক্তির আনীত অভিযোগ যে ভেনিসের দরবার যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে শুনবে এটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু ব্রাবনশিও নিজের মান সম্মান বিপন্ন হওয়ায় এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে তার অভিযোগ সংযমের সীমা ছাড়িয়ে প্রমাণের পরিবর্তে শুধু ওথেলোর বিরুদ্ধে দোষারোপেই পর্যবসিত হল। ওথেলোর বিরুদ্ধে সঠিকভাবে কিছু বলার চেয়ে তাকে গালিগালাজ করাটাই যেন বড হয়ে উঠল। ফলে, ওথেলোর যখন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে ডাক পড়ল তখন তার আর বেশি কিছু বলারই দরকার হল না। সে শুধু সহজ ভাষায় বলল তার ভালবাসার কাহিনী---তার সেই বর্ণনার ভাষায় ছিল ছলাকলাহীন এক শান্ত আবেগ---অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ, অথচ উপলব্ধির সত্যতায় মহৎ ও সুন্দর এবং তারই ফলে ডিউক নিজেই, যিনি প্রধান বিচারকের আসনে আসীন ছিলেন, বলে উঠলেন---এমন সুন্দর বর্ণনা শুনলে

আমার মেয়েও ঘর ছাড়ত। ওথেলো তার প্রেমের ব্যাপারে যে বশীকরণ জাতীয় শক্তির সাহায্য নিয়েছে তা তার ঐ প্রকৃত ভালবাসার স্বাভাবিক রীতিনীতি, যদি তার কোন ভোজবাজি থাকে তা ঐ সুন্দর করে বলা গল্পের স্বাভাবিক মাধুর্য যা সহজেই দোলা দেয় নারীহৃদয়ে।

দরবারে ডেসডেমনার ডাক পড়ল। সে তার কথার মধ্যে দিয়ে ওথেলোর বক্তব্যকেই সত্যি বলে সমর্থন করল। সে জানাল তার বাবার প্রতি তার কৃতজ্ঞতা ও কর্তব্যবোধ অবশ্যই আছে, তিনিই তাকে বড় করে তুলেছেন, তাঁরই যত্নে তার শিক্ষাদীক্ষা, কিন্তু অপরপক্ষে তার স্বামীর প্রতি তার কর্তব্যবোধ অবশ্যই আরো বড়, কেননা সেই তার জীবনদেবতা এবং তার মা যেমন সবার উপরে স্থান দিয়েছেন তার বাবাকেই, তেমনি সে-ও তার স্বামী ওথেলোকে স্থান দিতে চায় সবার উপরে।

বৃদ্ধ ব্রাবনশিওকে হতাশা নিয়েই ফিরতে হল। ফিরে যাওয়ার আগে বহু দুঃখেই তাকে ওথেলোর হাতে সমর্পন করতে হল কন্যা ডেসডেমনাকে। ওথেলোকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না, তাকে ডেকে বলে গেল—বাধ্য হয়েই আমাকে এই হার মেনে নিতে হল, যদি সম্ভব হত তবে কিছুতেই আমি তোমার হাতে আমার মেয়েকে দিতাম না। আর, এটুকু ভেবেই আমি তৃপ্ত বোধ করছি যে আমার দ্বিতীয় কোন সন্তান নেই, যদি থাকতো তাহলে এই ডেসডেমনার ব্যবহারের ফলে হয়তো আমাকে বাধ্য হয়েই নিষ্ঠুর হতে হত তাদের প্রতি এবং তাদের সবার পায়ে বেড়ি পরিয়ে তাদের শায়েস্তা করতে হ'ত।

ওথেলোর দিক থেকে আপাতত আর কোন ঝঞ্ঝাট রইল না। তার মতো জাত সৈনিকের জীবনে সৈনিক জীবনের দুঃখকষ্ট একেবারেই গা-সওয়া, সাধারণ মানুষের জীবনে যেমন খাদ্য ও বিশ্রাম বা আরামই প্রধান তেমনি তার জীবনে ঝড়-ঝঞ্ঝাট। কাজেই বিয়ের গোলমালটি মিটে যাওয়ার পরই সে সাইপ্রাসের যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল; আর ডেসডেমনাও তার স্বামীর এই সৈনিক জীবনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের ফলে তার অকুণ্ঠ সম্মতি জানাল ওথেলোর সাইপ্রাসে যাওয়া সম্পর্কে—সাধারণ মেয়েদের মত নব বিবাহিত জীবনের সুখ ও আরামের স্বপ্ন তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল না।

সাইপ্রাস যাত্রার প্রস্তুতি সারা হলে ডেসডেমনাও চাইল নগরজীবনের সাধারণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে স্বামীর সঙ্গে সাইপ্রাসের শিবির জীবনের অংশীদার হতে। এদিকে সাইপ্রাসে পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গেই ওথেলোর কাছে সংবাদ এল যে তুর্কীদের যে নৌবাহিনী সাইপ্রাসের অভিমুখে আসছিল তা তুমুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়ে গতি পরিবর্তন করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। অতএব, আপাতত সাইপ্রাস দ্বীপে তুর্কী আক্রমণের কোনো সম্ভাবনাই আর রইল না। কিন্তু অন্য এক যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে অন্য এক দিক থেকে এবং সেই যুদ্ধে মহাবল ওথেলো সম্পূর্ণ অসহায়ের

মত শত্রুর চক্রান্তের বলি হতে চলল। আর শত্রুর ঈর্ষার আগুনে যে ভাবে পুড়তে হল নিষ্পাপ ডেসডেমনাকে তার তুল্য যন্ত্রণা ভালবাসার ইতিহাসে বিরল।

এই ইতিহাস প্রসঙ্গে যে নামটি সবার আগে মনে পড়ে তা ওথেলোরই এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশেষ নির্ভরযোগ্য বন্ধু ক্যাসিও। ক্যাসিও ছিল ওথেলোর অধস্তন এক নবীন যুবা। ফ্লোরেন্সের অধিবাসী ক্যাসিও সৈনিক হিসাবে যোগ দিয়েছিল ভেনিসের সেনা বিভাগে। সে ছিল ফূর্তিবাজ, হাসিখুশি আর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে খুবই খোলামেলা। ফলে মেয়েরাও তাকে পছন্দ করত খুবই। তাকে দেখতেও যেমন সুন্দর তেমনি তার কথাবার্তার চমকপ্রদ গুন। এমন একজন কমবয়সী যুবা খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঈর্ষার পাত্র হতে পারে। ওথেলোর মত একটু বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে, বিশেষতঃ যাদের ভার্যা তরুণী। তবে ওথেলোর মানসিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সে স্বভাবতই উদার ও সরল, ঈর্ষা তাকে স্পর্শ করে না। ক্যাসিও বরং ডেসডেমনার সঙ্গে তার প্রণয় ব্যাপারে মধ্যস্থতার কাজই করে দিত। তাছাড়া ওথেলো ছিল মূলত যোদ্ধা এবং সে জানতো ভালবাসা সংক্রান্ত ভাল ভাল শব্দ তার তেমন আয়ত্তে নেই, কাজেই ক্যাসিও যেহেতু প্রেমালাপে দক্ষ ও সুনিপুণ, ওথেলো কখনও কখনও তাকে তার হয়ে ডেসডেমনাকে ভালবাসার কথা শোনাতে পাঠাত। এমন সরলতা ও বিশ্বাস শুধু ওথেলোর মত মহৎহৃদয় বীরের পক্ষেই সম্ভব, এ শুধু তাকেই মানায়। আর ঠিক এই কারণেই ডেসডেমনার মত সরল ও নিষ্পাপ মেয়ের পক্ষেও তার স্বামীর পরেই ক্যাসিওর প্রতি বন্ধুত্বসুলভ ভালবাসা খুবই স্বাভাবিক। এই ভালবাসা তার চরিত্রকে আরও মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে, কলঙ্কের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। বিবাহপূর্ব জীবনে যেমন বিবাহোত্তর জীবনেও তেমনি ওথেলো ও ডেসডেমনার কাছে ক্যাসিওর যাওয়া আসা সমানভাবেই অবাধ ও স্বচ্ছন্দ, নবদম্পতির এই নতুন সম্পর্ক ক্যাসিওর প্রতি তাদের ব্যবহারে কোন ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেনি। ক্যাসিও ঠিক তেমনি হৈ চৈ করতে করতেই উপস্থিত হয় ডেসডেমনার কাছে, ঠিক তেমনি হাসি ঠাট্টায় মাতিয়ে রাখে বন্ধু পত্নীকে। ওথেলোর রাশভারী প্রকৃতির ফলে স্বামী স্ত্রীর জীবনে যেটুকু গুমোট আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পারে তা বরং ক্যাসিওর রঙ্গ তামাশার হাওয়ায় স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে তাদের দাম্পত্য জীবন। বেশ কেটে যায় তাদের দিন।

ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে হাসে, কেননা এই নিষ্পাপ আনন্দমুখর দিনগুলো কত সহজেই বিষাক্ত হবে ঈর্ষার বিষবাষ্পে, আর সেই ঈর্ষার মূলে আছে ক্যাসিওর পদোন্নতি। সর্বাধিনায়ক ওথেলো তার একান্ত নিকট সেনাপতিরূপে বেছে নিয়েছিল ক্যাসিওকে। এই নির্বাচনের ফলে ওথেলোর অধীনস্থ অপর এক পদস্থ সৈনিক ইয়াগো নিজেকে অপমানিত বোধ করে। তার ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ সে ছিল অভিজ্ঞতায় ক্যাসিওর চেয়ে প্রবীণ এবং তার ধারণা যোগ্যতায়ও সে ক্যাসিওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ইয়াগো প্রায়ই ক্যাসিওকে বিদ্রূপ করে হীন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করত। সে বলত ক্যাসিওকে মহিলামহলেই মানায় ভাল, যুদ্ধের কৌশল অথবা সৈন্যসজ্জার ব্যাপারে সে একেবারেই আনাড়ি—একটা ছোট মেয়ের তুল্যই তার যোগ্যতা। এ পর্যন্ত গড়িয়েই যদি ব্যাপারটা থেমে যেত তবে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ক্যাসিও হয়ে দাঁড়াল ইয়াগোর শুধু ঈর্ষার পাত্রই নয়—সে এখন নিদারুণ ঘৃণার পাত্র, আর এই ঘৃণা গিয়ে পড়ল ওথেলোর প্রতিও কেননা ক্যাসিওর উন্নতির কারণ ওথেলো। ওথেলোর প্রতি এই ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত ছিল অন্য এক উপাদান, তার নাম সন্দেহ। অর্থাৎ, খুব স্পষ্ট না হলেও ইয়াগোর মনে এক সন্দেহের প্রশ্ন উঁকি দিয়ে দিয়েছিল তার স্ত্রী এমিলিয়ার প্রতি ওথেলোর মনোভাব নিয়ে। ইয়াগোর মনে হয়েছিল ওথেলোর বুঝি দুর্বলতা আছে তার স্ত্রীর প্রতি। এই সব কাল্পনিক সূত্রগুলিই ধীরে ধীরে ইয়াগোর কুটিল মনকে ইন্ধন জোগাল—সে ছকে নিল এক ভয়াবহ প্রতিহিংসার চক্রান্ত, আর সেই চক্রান্তের শিকার হতে চলল ক্যাসিও, ওথেলো এবং ডেসডেমনা—একই জালে আবদ্ধ হয়ে তিনটি নিষ্পাপ প্রাণী।

ওথেলো সুচতুর—সুনিপুণ ও দক্ষ তার প্রতিটি পদক্ষেপ। মানবচরিত্রে তার অসাধারণ গুণের ফলে সে জানতো একটি মানুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন তারও আছে একটি অতি দুর্বল স্থান—সে তার হৃদয়—আর সেই দুর্বলতম স্থানে সবচেয়ে যা যন্ত্রণা দিতে পারে তা ঈর্ষাকাতরতা। দৈহিক যে কোন যন্ত্রণার চেয়ে তা বহুগুণে বেশি এবং মানসিক যে কোন বেদনার চেয়ে তা অনেক যন্ত্রণাদায়ক। ইয়াগোর অভিসন্ধি হল যেমন করেই হোক ঐ ক্যাসিওর প্রতি ওথেলোর ঈর্ষার উদ্রেক করতে হবে—আর সেটিই হবে তার প্রতিহিংসা গ্রহণের সর্বোত্তম চক্রান্ত, এবং এর ফলে যদি ক্যাসিওকে মরতে হয় অথবা ওথেলোকে, অথবা ক্যাসিও এবং ওথেলো এই উভয়কেই—কুছ পরোয়া নেই, তার তাতে কিছুই আসে যায় না।

সুযোগ আসতেও দেরী হল না। সাইপ্রাসের দায়িত্ব নিয়ে ওথেলো দ্বীপে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে তুর্কী নৌবহরের দিক পরিবর্তনের। তারা আর সাইপ্রাসে আসছে না। কাজেই, এখন আর যুদ্ধের রুদ্ধশ্বাস ব্যস্ততা নেই। ডেসডেমনাও স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে সাইপ্রাসে। চারিদিকে এখন ছুটি ছুটি রব। আমোদ-প্রমোদ ও ভোজের আনন্দে সৈনিকেরা মাতোয়ারা। ওথেলো ও ডেসডেমনার প্রশস্তিতে সুরাপান ও সুরার বন্যা।

আনন্দোৎসবের সেই রাত্রিতে ক্যাসিওর ভূমিকা ছিল প্রহরীর। তার উপর দায়িত্ব শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার। সৈনিকরা সুরাপান ও আনন্দের আতিশয্যে না বাড়াবাড়ি করে এবং তাদের গোলমাল যেন মারদাঙ্গায় না পৌঁছায়, কেননা দ্বীপের সাধারণ নাগরিক তার ফলে সন্ত্রস্ত হতে পারে এবং এই সৈন্যদলের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন

হয়ে উঠতে পারে। ইয়াগো তার গভীর চক্রান্তের প্রথম চালটি শুরু করল এই উৎসবের রাতকে আশ্রয় করে। ক্যাসিওর কাছে সে এমনই অভিনয় করতে থাকল যেন সে নিজেও ওথেলোর অত্যন্ত অনুগত এবং তার প্রতি তার অকুণ্ঠ ভালবাসা, আর সেই ভালবাসার আবেগেই সে যেন ক্যাসিওকে একের পর এক সুরার পাত্র এগিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ দিশেহারা করে দিতে চাইল। এই ধরনের অতিরিক্ত সুরাপান প্রহরারত কোন সৈনিকের পক্ষে নিতান্তই অনুচিত, এবং ক্যাসিও নিজেও অনেকক্ষণ যাবৎ নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইয়াগোর ছলাকলায় সে বেশীক্ষণ আর স্থির থাকতে পারেনি—ইয়াগোর এগিয়ে দেওয়া একের পর এক সুরার পাত্র আর মনমাতানো গানে সে কিছুক্ষণ পরে একেবারেই আত্মহারা হয়ে গেল। নেশার ঝোঁকে সে মন খুলে শুরু করল ডেসডেমনা প্রশস্তি—তার রূপ ও গুণের ব্যাখ্যান। যে সুরা শুধুমাত্র তার জিহ্বাকে এতক্ষণ আচ্ছন্ন করে ছিল এবার তা সম্পূর্ণই গ্রাস করল তার বোধ ও বুদ্ধি এবং ইয়াগোর নিযুক্ত এবং তার দ্বারা সাজিয়ে পাঠানো এক ব্যক্তির সামান্য একটু উস্কানির ফলে সে তরোয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ব্যক্তির উপর। এদিকে এক অতি সৎ ও যোগ্য অফিসার মনটেনো যখন বিবাদের মীমাংসার জন্যে কলহরত দুজনকে সরিয়ে দিতে এলো তারই গায়ে গিয়ে পড়ল ক্যাসিওর তরোয়ালের আঘাত। সামান্য এই কলহকে কেন্দ্র করে এবার দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে, আর এই হৈ হট্টগোলের সুযোগ নিল ইয়াগো—তার সর্বনাশের ইন্ধন হিসাবে। সে চোখের নিমেষে সর্বত্র বিপদের সংকেত ছড়িয়ে দিল, দুর্গের ঘন্টায় বেজে উঠল বিপদসংকেত—মনে হল যেন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে সেনাশিবিরে—মাতলামির তুচ্ছ এক মারামারিকে সে এমনি করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলকালাম কাণ্ডের মত বানিয়ে তুলল। বিপদ সংকেতের ঘন্টায় ঘুম থেকে জেগে উঠলো ওথেলো—ঘুমভাঙ্গা চোখে কোনরকমে পোশাক গায়ে জড়িয়ে সে বেরিয়ে এল—ঘটনাস্থলে পৌঁছে সে প্রথমেই ক্যাসিওর কাছে জানতে চাইলো কী হয়েছে। এতক্ষণে ক্যাসিওর নেশার ঝোঁক অনেকখানিই কেটে গেছে, তার সম্বিত ফিরে এসেছে অনেক পরিমাণে। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত অধোবদন হয়ে রইল লজ্জায়—ওথেলোর কথার কোন জবাব তার মুখে এল না। এই অবসরে ইয়াগো শুরু করল তার সুচতুর খেলা। সে এমনই ভাণ করল যেন ক্যাসিওর বিরুদ্ধে সে ওথেলোর কাছে কিছু বলতে নারাজ। তার এই কৃত্রিম ইতস্তত করা দেখে ওথেলো বারবার তাকে যা সত্যি তা বলার জন্যে পীড়ন করতে লাগল এবং সে-ও এবার ইনিয়ে বিনিয়ে যাবতীয় ঘটনাটি নিজের মতো করে বলে গেল—এ ব্যাপারে তার নিজের দোষটুকু সে সম্পূর্ণই চেপে গেল এবং বাহ্যত দেখাতে চাইল যেন ক্যাসিওর দোষও তেমন গুরুতর নয়, যদিও বস্তুত সে ক্যাসিওর যেটুকু অপরাধ তার চেয়ে শতগুণে তাকে দোষী বলে প্রতিপন্ন করল। বেচারা ক্যাসিওর নেশা

তখনও সম্পূর্ণ কার্টোনি, কাজেই ঘটনাটার শুরু ও শেষ সে সঠিকভাবে তখনও স্মরণ করতে পারছিল না। কাজেই, ইয়াগো যা চেয়েছিল ঠিক তেমনটিই ঘটল। নীতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ওথেলোর কাছে কারোরই ক্ষমা নেই—ইয়াগোর ঈর্ষার বলি হল ক্যাসিও—সেনাপতির যে সম্মানিত পদে তার উন্নতি হয়েছিল তা থেকে ওথেলো তাকে পদচ্যুত করল।

ইয়াগোর দক্ষ দাবার চালের প্রথম চালটিতেই কিস্তি মাত করে সে তার প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করল—ক্যাসিও তার উন্নতির আশায় বাধ সেধেছে, সে-ও ক্যাসিওকে উপযুক্ত শিক্ষা দিল। ইয়াগো কিন্তু এখানেই থামতে চাইল না, তার ঈর্ষার বিষ এখনও তাকে প্ররোচিত করছে এবং এবার তার দ্বিতীয় চালটি সে চালবে—এবং আজ রাতেই। ভয়ঙ্কর তার উপসংহার।

সরল ক্যাসিও। তার বিন্দুমাত্রও কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি ইয়াগোর কার্যকলাপের সম্বন্ধে। বরং নিজের দুর্ভাগ্যের ফলে সে অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এবং ঐ ইয়াগোকেই তার প্রকৃত শুভাকাঙ্খী মনে করে নিজের দুঃখের কথা বলার জন্যে উপস্থিত হয়েছে ইয়াগোর কাছে। দুঃখ করে সে বলল—ভাই এমন আহাম্মকের মত কাজটা করে ফেললাম নেশার ঘোরে—আমি একটা আস্ত জানোয়ার। এখন কী করা যায় বল দেখি ভাই—কেমন করে ফিরে পেতে পারি যে পদটি খুইয়ে বসে আছি? ওথেলোর কাছে গিয়ে নেশার কথাটা বলা কি সম্ভব? হায়! হায়! এমন কাজ আমি কেন করলাম! ইয়াগোর মুখে শোনা গেল শয়তানের সান্ত্বনা। সে বলল—আরে এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? এ আর এমন একটা সমস্যা কিসের—মদ তো আমিও খাই, মানুষমাত্রেই খায়, আর মাঝে মধ্যে আমরা সবাই তো ওরকম একটু বেশি চড়িয়ে ফেলি—ওতে এত ভাববার কি আছে? তোমাকে একটা পথ বাতলে দিতে পারি। যা হওয়ার তা তো হয়ে গিয়েছে, এখন ওটাকে শোধরাতে গেলে শরণাপন্ন হতে হবে ওথেলোর স্ত্রী ডেসডেমনার, কেননা সেনাধ্যক্ষের স্ত্রীই এখন প্রকৃতপক্ষে সেনাধ্যক্ষ—তারই কথায় ওঠে বসে ওথেলো। তাকে গিয়ে ধরো, কাজ হাসিল হয়ে যাবে—সে-ই যা বলা কওয়ার তা সব ওথেলোকে বলবে, তোমার কিছু করতে হবে না। আর তাছাড়া, মেয়েটি বড় সরল, পরোপকারীও বটে। তোমার হয়ে সে ওথেলোকে ঠিকই রাজী করাবে এবং তুমি আবার তোমার পদটি ফিরে পাবে, ওথেলোরও আর তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না, বরং তোমাদের পুরোনো বন্ধুত্ব এর ফলে আরও মজবুত হবে।

প্রকৃত বন্ধুর মত পরামর্শই বটে। সৎ পরামর্শের ফল অচিরেই ফলতে শুরু করল। ইয়াগোর যেমনটি অভিপ্রেত।

অতঃপর ক্যাসিও আর দেরী না করে সরাসরি গিয়ে উপস্থিত হল ডেসমেনার কাছে। স্বভাবকোমল ডেসডেমনা অতি সহজেই পরের দুঃখে কাতর হয়, তার

কাছে সহানুভূতি লাভ করতে ক্যাসিওর কোনো অসুবিধাই হল না। ডেসডেমনা প্রতিশ্রুতি দিল সে যেমন করেই হোক ওথেলোকে রাজী করিয়ে ক্যাসিওকে আবার তার পদে পুনর্বহাল করার ব্যবস্থা করবে। এর জন্যে সে প্রাণপাত করতেও প্রস্তুত। কাজেই সে তার আবদার নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হল ওথেলোর কাছে এবং এমন আদর আবদারের সুরে তার স্বামীকে চেপে ধরল যে ওথেলো আর তাকে ফিরিয়ে দিতে পারল না। তবে, একটু সময় তো দিতে হবে, কেননা হাজার হোক ক্যাসিও অপরাধ করেছে এবং সেই অপরাধের জন্য তার অন্তত কিছুটা শাস্তি হওয়া দরকার—ক্ষমা পেতে হলে সেটুকু অপেক্ষা তার করতেই হবে। ডেসডেমনা কিন্তু নাছোড়বান্দা, তার ইচ্ছা আগামী কাল সন্ধ্যার মধ্যেই ওথেলো ক্যাসিওব অপরাধের শাস্তি মকুব করে দিক, বড় জোর তার পরদিন সকাল, কিংবা খুব বেশি হলে আর একটা দিন—এর চেয়ে দেরী করা কিছুতেই চলবে না। ডেসডেমনা বলল—দেখতো বেচারা ক্যাসিও কী পরিমাণ অনুতপ্ত হয়েছে তার অপরাধের জন্যে, তার মাথাটা একেবারেই হেট হয়ে গেছে, যতটুকু তার অপরাধ, শাস্তি তার তুলনায় অনেক বেশিই হয়েছে। এতটা না করলেই পারতে। ওথেলো চুপ করে আছে দেখে ডেসডেমনা আবার বলল—এ তোমার আমার প্রতি কেমনধারা ভালবাসা, আমি এত করে বলছি ক্যাসিওর জন্যে তা-ও তুমি চুপ করে আছ। তুমি কি ভুলে গেলে মাইকেল ক্যাসিওর কথা—সে কত সাহায্য করেছিল আমাদের? তুমি কতদিন তাকে পাঠিয়েছ আমার কাছে তোমার হয়ে ভালবাসার কথা বলতে, এমন কি আমি যদি কখনও তোমার প্রতি কোনো কটূক্তি করে থাকি তবে ক্যাসিও তোমার পক্ষ নিয়ে আমার সঙ্গে কত ঝগড়া করেছে। আর আজ এই সামান্য অনুরোধটুকু রাখতে তোমার এত দ্বিধা? তাহলে ভবিষ্যতে যেদিন তোমার কাছে আরো বড় কিছু দাবী করব তখন তুমি কি করবে? ওথেলো আর বেশিক্ষণ ডেসডেমনার অনুরোধ এড়িয়ে যেতে পারল না। সে শুধু বলল—লক্ষ্মীটি, তোমার কথা নিশ্চয়ই রাখব, তুমি শুধু কয়েকটা দিনের জন্যে আমাকে একটু সময় দাও, তারপর আমি নিজেই আবার মাইকেল ক্যাসিওকে তার পদে বহাল করে নেব। শুধু এই কটা দিন অপেক্ষা কর।

ওথেলোর এই অন্যমনস্কতা ও চুপ করে থাকার পর ঘটনা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল—সমস্ত ব্যাপারটা এবার ইয়াগোর হাতের মুঠোয়। ব্যাপারটা এই যে ওথেলো এবং ইয়াগো যখন একসঙ্গে এসে ডেসডেমনার ঘরে উপস্থিত হয় তখন সেই ঘরের বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে যাচ্ছিল ক্যাসিও। সে এতক্ষণ ডেসডেমনার কাছে তার হয়ে ওথেলোকে বলার জন্যে অনুরোধ করছিল এবং ডেসডেমনার কাছে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর স্বভাবতই সে ঘর ছেড়ে বাইরে যাচ্ছিল। ধূর্ত ইয়াগোর কাছে এই সাধারণ ব্যাপারটি একটি সুযোগ হয়ে দেখা দিল। সে

খুবই নীচু গলায় যেন নিজের মনে মনে বলার মত করে বলে উঠল—এ তো বড় সুবিধের ঠেকছে না! ইয়াগোর নিম্নস্বরের কথাগুলি ওয়েলোর কানে গেলেও সে তেমন মন দিয়ে সেই কথা শুনল না, বরং এরপর যখন ডেসডেমনার সঙ্গে তার ক্যাসিও সম্পর্কে কথাবার্তা হল তখন সে ঐ প্রসঙ্গ একেবারেই আর খেয়াল করল না। কিন্তু তখনকার মত খেয়াল না করলেও ইয়াগোর ঐ উক্তিটুকু আরো কিছুক্ষন বাদে বিষক্রিয়া শুরু করল তার মনে এবং তার মূলে ইয়াগোর ভালমানুষীর অভিনয়। সে অভিনয় শুরু হল ওথেলোর সঙ্গে কথা সারা করে ডেসডেমনা যে মুহূর্তে সেখান থেকে চলে গেল। ডেসডেমনা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াগো নিপাট ভালমানুষটি সেজে ওথেলোকে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, বিয়ের আগে যখন ডেসডেমনার সঙ্গে তোমার মেলামেশা চলছিল তখন তোমার ঐ বন্ধু ক্যাসিও কি তোমাদের সেই ভালবাসার কথা জানতো? ওথেলো উত্তরে বলল—তা না জানার কী আছে, ওই তো সেই সময়ে কতবার আমাদের দুজনের মধ্যে দৌত্যের কাজ করেছে। ওথেলোর কথাটা শোনামাত্র একবার ভ্রূ কুঁচকে গেল ইয়াগোর—যেন কত বড একটা সমস্যা সমাধানের একটা নিশ্চিত সূত্র এসে গেছে তার হাতে, যেন এক সত্যসন্ধানীর এক গভীর রহস্যোদ্ঘাটনে অকস্মাৎ আলোকপাত। সে দক্ষ অভিনেতার ভঙ্গিতে বলে উঠল—বটে! তাই বল! কথাটা শোনামাত্র ওথেলোর যেন ঘুম ভাঙ্গল, তৎক্ষনাৎ তার মনে পড়ল ঘরে ঢোকার সময় ডেসডেমনা ও ক্যাসিওকে দেখে ইয়াগো যে কথাটি ছুঁড়ে দিয়েছিল—এ তো বড সুবিধের ঠেকছে না! ওথেলোর মনে সংশয় দেখা দিল—সে ভাবতে লাগল। তার মনে হল, এ সবের যেন গূঢ় কোন অর্থ আছে। ইয়াগোকে তার মনে হল অত্যন্ত সদাশয় বলে, ইয়াগোর ঐ টুকরো কথাগুলো যেন খুব স্বাভাবিকভাবেই তার মনে উঁকি দিয়েছে। ওথেলোর প্রতি তার মমতাবোধ আছে বলেই সে শুভানুধ্যায়ীর মত ভাবছে। আসলে কপট এক শয়তানের কাছে যেটা শুধু চাতুরী ওথেলোর মত সরল মানুষের কাছে তা শুভানুধ্যায়ীর সতর্কবাণী। ওথেলো ভাবল ইয়াগোর মত সৎবুদ্ধি মানুষের কাছে আরও না জানি কত রহস্য লুকিয়ে আছে। সে পীড়াপীড়ি শুরু করল ইয়াগোকে—বল কী তোমার মনে হয়—যত নিদারুণই হোক আমার কাছে সব খুলে বল। কিছু লুকিও না। ইয়াগো কৃত্রিম ভালমানুষের মত বলল—বড ফ্যাসাদেই ফেললে দেখছি, আমি তো এসব কথা মনে কখনও স্থান দিই না, কিন্তু চোখ বুঁজে তো আর থাকতে পারি না—যা চোখে দেখি, কানে শুনি, তারই ফলে যত সব নষ্টামির কথা মনে এসে পড়ে। তবে, বড় কষ্ট হয় এ সব কথা তোমাকে বলতে, ভাবি কী জানি যদি আমার দেখাশোনায় কিছু গলতি থেকে থাকে, আর সেই ভুলের ফলে যদি এমন কিছু বলে বসি যার ফলে তোমার মনের শান্তিটুকু চলে যায়। না থাক, সামান্য সন্দেহের বশে কোন মানুষের সুনামের ক্ষতি হোক এটা ঠিক হবে না।

তার ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তায় উত্তরোত্তর ওথেলোর মন উন্মাদের মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে দেখে ইয়াগো বুঝল তার অভিসন্ধি সার্থক হতে চলেছে। সে তার শয়তানির মুখোশটা আর একটু ভাল করে এঁটে নিয়ে এবার বলল—দ্যাখ, তুমি সুখে শান্তিতে থাক এটাই আমার কাম্য, তোমার সেই শান্তি অটুট রাখতে হলে আমার একটাই পরামর্শ তোমাকে পালন করে চলতে হবে, যেন কোনমতেই তোমার মনে কখনও সন্দেহকে স্থান দিও না। একবার সন্দেহগ্রস্ত হলে আর কিছুতেই শান্তি খুঁজে পাবে না। অর্থাৎ ওথেলোর শান্তির জন্যে যে সন্দেহের বিরুদ্ধে ইয়াগো তাকে সাবধান হতে পরামর্শ দিল প্রকারান্তরে সেই সন্দেহের বীজটিই সে ভাল করে প্রবেশ করাল ওথেলোর মনে। এমন সুন্দরভাবে সে তার অভিনয়টুকু করল যে সরল বিশ্বাসী ও মানবচরিত্রে অনভিজ্ঞ ওথেলো এখন থেকে সন্দেহের আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ছারখার করতে উদ্যত হল। ওথেলো বলল—দ্যাখ, আমি জানি আমার স্ত্রী সুন্দরী, এ-ও জানি যে সে লোকজন, হৈ হুল্লোড় ভালবাসে, দিল খুলে কথা বলতে পেলে খুশি হয়—গান গাইতেও ভালবাসে, অভিনয়দক্ষতাও তার আছে, ভাল নাচতেও জানে। কিন্তু কোন মেয়ে যদি সৎ বা ভাল হয় তবে এইসব তো তার গুণ বলেই ধরতে হবে। আমি তো তাকে ভাল বলেই জানি, কোন প্রমাণ না পেলে তাকে কেমন করে খারাপ বলে ভাবব। ইয়াগো এমন একটা ভাব দেখাল যেন সে ওথেলোর এই প্রতিবাদে খুশিই হয়েছে। সে বলল—তা বটে, আমিও জোর করে কিছু বলতে পারি না, আমার হাতেও এমন কোন প্রমাণ নেই যে তোমার স্ত্রী কুলটা। তবে একটা বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখতে বলি—ক্যাসিও যখন তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আসে তখন তোমার স্ত্রীর হাবভাবের দিকে একটু নজর দিয়ে দেখো। হ্যাঁ, এখুনি সন্দেহের চোখ নিয়ে কিছু দেখো না, তবে একেবারে নিঃসন্দেহেও কিছু বিশ্বাস কোর না। আমি তো আমার দেশের মেয়েদের ভাল করেই জানি, ইটালির মেয়েদের তুমি আর কতটুকুই বা জান। ভেনিসে মেয়েরা ঈশ্বরকেও ধার ধারে না, তাকে কলা দেখিয়ে এমন সব আচরণ করে যা তারা কদাপি স্বামীকে জানাতে ভরসা করে না। তুমি তো সহজেই বুঝতে পার তোমার স্ত্রী কেমন তার বাবাকে কলা দেখিয়েছে, বুড়ো মানুষটা ঘূণাক্ষরেও টের পায়নি যে তার মেয়ে তারই বাড়িতে বসে তোমার সঙ্গে প্রেম করছে, ফলে যখন সে জানতে পারল তখন ভাবল বুঝি এর মধ্যে কোন ডাকিনীবিদ্যার খেলা আছে। ইয়াগোর বাগ্মীতায় ওথেলো একেবারেই অভিভূত হয়ে পড়ল—তার মনে হল—তাইত বটে, যে মেয়ে তার বাবাকে এমন করে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে পারে সে তার স্বামীকে যে চিরকাল পুজো করবে তার প্রমাণ কি?

ইয়াগো লক্ষ্য করল কী পরিমান মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছে ওথেলো। সে ভালমানুষটির মত ভেক ধরে তাকে আর একটু তাতিয়ে দেওয়ার জন্যে

বলল—আমাকে মাপ কর, তুমি যে এতটা উত্তেজিত হবে তা জানলে এ সব কথা আমি তুলতাম না। ওথেলো একটু ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে বলল—আরে না না, তুমি যা বলছ বলে যাও, আমার ওতে কিছুই এসে যায় না, আমি ঠিকই আছি। আসলে কিন্তু সে মনে মনে একেবারেই অশান্ত হয়ে পড়েছিল—ইয়াগো তার অবস্থা বুঝে আবারও অতি বিনয়ের ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল, আসলে এসব বলতে চাই না। ক্যাসিও আমার বন্ধুও বটে, তার কোন ক্ষতি হোক এটা আমি চাই না, তবে না বলেও পারি না—আসলে, তুমি নিজেই একটু ভাবলে সব বুঝতে পারবে। ব্যাপারটা তো খুবই পরিষ্কার। তোমার স্ত্রী ডেসডেমেনা সত্যিই বড় ভাল মেয়ে, তবে তোমার মত একজনকে যে সে ভালবেসে বিয়ে করল এর দ্বারা এটাই কি বোঝা যায় না যে তার মতিগতি ঠিক স্বাভাবিক মেয়েদের মত নয়? তুমি তো ভাল করেই জান, সে তার নিজের দেশের কত ভাল ভাল পাত্রকে হটিয়ে দিয়েছে, তার পক্ষে তো স্বাভাবিক ছিল নিজের দেশের কোন তারই মত শ্বেতকায় পাত্রকে পছন্দ করা, কিন্তু তার পরিবর্তে সে কি করল—সে কী না তোমার মত একজন কালো নিগ্রোকে পছন্দ করে বসল—এটাতে কি এই প্রমাণ হয় না যে সে একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে, খেয়ালের বশেই সে একটা কিছু করে বসে। এর পর যখন তার খেয়ালের নেশা ছুটে যাবে তখন স্বভাবতই সে তোমার ঐ চেহারাটা মিলিয়ে দেখতে শুরু করবে তার নিজের দেশের সব সুন্দর সুন্দর সাদা চামড়ার মানুষগুলোর সঙ্গে, তাদের সুন্দর চেহারার পাশে তোমাকে তার ভাল লাগবে কি? এখন সে কথা থাক, তোমাকে বরং একটা পরামর্শ দিই, তুমি আপাতত ঐ ক্যাসিওর চাকরি ফিরিয়ে দেওয়াটা মুলতুবী রাখ, আর লক্ষ্য কর তোমার স্ত্রী কতটা আগ্রহ নিয়ে ক্যাসিওর জন্যে তোমার কাছে আবেদন নিবেদন করে—তার মধ্যে থেকেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে। পাকা শয়তান ইয়াগো এমনি সুচতুরভাবে মেলে দিল তার ষড়যন্ত্রের জাল—ডেসডেমেনার পক্ষে যে গুনটি তার চরিত্রের মস্ত সম্পদ—সরল ও সুন্দর তার পরোপকারপ্রচেষ্টা—সেটিই হতে চলল তার সর্বনাশের কারণ, তার ভাল স্বভাবই হয়ে দাঁড়াল তার মৃত্যুর জাল। ইয়াগো একদিকে যেমন ক্যাসিওকে পরামর্শ দিয়েছে ডেসডেমেনার কাছে গিয়ে তার জন্যে ওথেলোকে অনুরোধ করতে, তেমনি অন্যদিকে ওথেলোকেও স্ত্রীর প্রতি ক্যাসিওকে নিয়ে সন্দেহপ্রবণ করে জড়িয়ে দিল সেই একই জালে। দুটি নিরপরাধ প্রাণী তাদের নিজেদের অগোচরে শিকার হল একই চক্রান্তের।

ওথেলো ও ইয়াগোর কথোপকথন এখনকার মত শেষ হল, কিন্তু যাওয়ার আগে ইয়াগো বারবার ওথেলোকে বলতে লাগল—শোনো, আমার এই কথায় যেন তুমি খামকা তোমার বউকে সন্দেহ করতে শুরু কোর না—আগে ভাল করে ব্যাপারটা বুঝে নাও, হাতে নাতে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে সন্দেহ করাটা তোমার উচিত

হবে না। ওথেলো বলল—না না আমি এখনই অধৈর্য হচ্ছি না, আমি ঠিকই আছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই মুহূর্ত থেকেই তার মনের সবটুকু শান্তি হারিয়ে গেল, আর কোনদিনই এই সবল বিশ্বাসী মানুষটি প্রতারণার জাল থেকে মুক্তি পেয়ে তার সেই শান্তি আবার ফিরে পেল না। এই সবে গতকাল পর্যন্তও যে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় সে মধুর শান্তির স্বাদ পেয়েছে আর কোনকালেই পপিফুলের সুরভি, অথবা ম্যানড্রাগোরার নির্যাস, কিংবা সারা দুনিয়ার সেরা যত ঘুমের ওষুধ তার সেই শান্তির স্বাদ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কোথায় গেল তার সেই সেনানায়কের বীরত্বের প্রতি আকর্ষণ---আজ যেন তা-ও বিস্বাদ-- যুদ্ধ আর অস্ত্রের ঝনাৎকার আজ আর তার মনে উদ্দীপনা আনে না। একদিন তার যে হৃদয় উদ্দীপিত হয়ে উঠত সৈন্যদলের দিকে চোখ পড়া মাত্র, অথবা যখন তার পতাকা উড়ত আকাশের হাওয়ায়, রণসজ্জায় সারি সারি অপেক্ষা করত সৈন্যেরা---যখন সে দামামার বাদ্য কিংবা ভেরির নিনাদ কানে যাওয়ামাত্র উৎসাহে লাফিয়ে উঠত, অথবা তার প্রাণ সঞ্জীবিত হত অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে -- আজ তার সবই শেষ হয়ে গেছে। বীরত্বের গৌরববোধ ও উচ্চাশা যা সৈনিকজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যুদ্ধের ডাকে চিরদিনের উল্লাস চিরকালের জন্যে তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে---ওথেলো আজ নিঃস্ব। মাঝে মাঝে তার মনে হয় ডেসডেমনা নিষ্পাপ, নিরপরাধ, পরমুহূর্তে আবার মনে হয়, না, সে নিশ্চয়ই তাকে প্রতারণা করেছে। কখনও বা তার মনে হয় ইয়াগো নিশ্চয়ই সব ঠিক কথাই বলেছে, আবার একটু পরেই সে ভাবে, না, বোধ হয় ইয়াগো লোকটা তেমন সুবিধের নয়। তার মনে হয় ক্যাসিও তার কাছে যখন প্রিয় ছিল তখন বেশ তো দিন কাটছিল, যদি এ সব গোপণ কথা তার কানে না ই আসতো, যতক্ষণ ক্যাসিওর প্রতি ডেসডেমনার গোপণ প্রণয়ের কথা তার কানে আসেনি---বেশ তো ছিল সে, তার শান্তি তো একটুমাত্র নষ্ট হয়নি। এই সব ছন্নছাড়া চিন্তা যখন প্রতিটি মুহূর্তে ওথেলোকে বিক্ষত করছিল তখন সে একদিন অস্থির হয়ে ইয়াগোর গলার টুঁটি চেপে ধরল--- তাকে বলল ---আমাকে প্রমাণ দিতে হবে----দেখাতে হবে ডেসডেমনাকে কেন তুমি এমন দোষারোপ করেছ---যদি প্রমাণ দিতে না পার তবে এই মুহূর্তে তোমাকে আমি খুন করে ফেলব। ওথেলোর এই ক্রুদ্ধ অবস্থা দেখে ইয়াগো মনে মনে খুশিই হল, যদিও বাইরে সে এমন ভাণ করল যেন সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করছে নিজেকে, কেননা পরের ভাল করতে গিয়েই তার এই অপবাদ। সে বলল ---ঠিক আছে, প্রমাণ নিশ্চয়ই দেব। আচ্ছা, বল দেখি, তুমি কি তোমার স্ত্রীর হাতে এমন কোনো রুমাল লক্ষ্য করেছ যার গায়ে বেগুনী স্ট্রবেরীর ছাপ ছাপ নক্সা কাটা আছে? ওথেলো বলল---তা দেখব না কেন? আমিই তো সেই রুমালখানা ওকে দিয়েছিলাম আমার দেওয়া প্রথম উপহার। ইয়াগো বলল—তাইত বলি, সেই রুমালখানাই তো যেন আজ দেখছিলাম—ক্যাসিও মুখ

মুছছিলো সেটা দিয়ে। ওথেলো বলে উঠল—বটে, যদি তুমি যা বলছ তা সত্যি হয় তবে ওদের আমি দেখে নেব, ঐ দুটোকে জাহান্নমে না পাঠানো পর্যন্ত আমি জলস্পর্শ করব না। আর, তোমার বিশ্বস্ততার নিদর্শন হিসাবে দেখবে আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে ক্যাসিওর মৃত্যু অনিবার্য। এ ছাড়া, ঐ যে পরমাসুন্দরী শয়তানটি—যার নাম ডেসডেমনা—তাকেও কী করে জলদি শেষ করতে হয় তা আমি দেখে নিচ্ছি।

মনে যখন সন্দেহের বীজ একবার প্রবেশ করে তখন অতি তুচ্ছ বস্তুর সূত্রকেও যেন মনে হয় ধর্মীয় গ্রন্থের দুর্লঙ্ঘ বিধান। স্ত্রীর সামান্য একটি রুমাল যদি বা ক্যাসিওর হাতে থেকেই থাকে—মাত্র সেই নিদর্শনটুকুর ভিত্তিতেই ইয়াগোর প্ররোচনায় প্রতারিত ওথেলো কীনা মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা জারি করল দুটি নির্দোষ প্রাণীর উপর! সে একবারও ভেবে দেখল না সেই রুমালখানা কেমন করে পেতে পারে ক্যাসিও। কই, এমন কোন উপহার তো ডেসডেমনা কোনদিনই দেয়নি ক্যাসিওকে, তাছাড়া, তার মত এমনি স্বামীপ্রাণা রমণীর পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয় যে তার স্বামীর দেওয়া উপহার নিয়ে সে এমন হীন কাজ করবে অপর কোন ব্যক্তিকে আবার সেই বস্তুটিই উপহার দেবে। ক্যাসিও এবং ডেসডেমনা—এদের কারো পক্ষেই এমন কিছু করা সম্ভব নয় যা ওথেলোর গায়ে লাগতে পারে—ডেসডেমনা যেমন একনিষ্ঠ হয়ে ওথেলোকে ভালবাসে, ক্যাসিও তেমনি ওথেলোর একান্ত অনুগত। যত নষ্টের গোড়া আসলে ঐ ইয়াগো, তার মাথায় সর্বদাই শয়তানের দুরভিসন্ধি এবং সে-ই সুকৌশলে তার সরলবুদ্ধি স্ত্রী এমিলিয়াকে নিয়োজিত করেছে তার কাজ হাসিল করতে। এমিলিয়াকে দিয়ে সে এ রুমালখানা চুরি করে আনিয়েছে ডেসডেমনার কাছ থেকে, এই অছিলায় যে ঐ রুমালের কারুকাজটুকু সে তুলে নিতে চায়। নমুনা হিসাবে তাই ঐ রুমালখানার দরকার। এবার ইয়াগো সেটি নিয়ে এমন জায়গায় রেখেছে যে ক্যাসিওর চলার পথে সেটা পড়বে—এবং সে সেটা নেবে ব্যাস, ইয়াগোর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল—রুমালের জালে পড়ল ক্যাসিও, তার সঙ্গে ডেসডেমনা।

এর পর। ডেসডেমনার পাশে ওথেলো—স্বামী-স্ত্রীর একটি একান্ত মুহূর্ত। ওথেলো অতি সহজ অভিনয়ের ভঙ্গীতে ডেসডেমনাকে বলল, সর্দি লেগে তার মাথাটা বড় ধরেছে—যেন খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। সে বলল—তোমার রুমালখানা নিয়ে এসো তো—আমার নাকে বড় জল ঝরছে। রুমাল নিয়ে এল ডেসডেমনা। ওথেলো বলল—না, না। এ রুমালখানা নয়, আমি যে রুমালখানা তোমাকে দিয়েছিলাম সে খানা নিয়ে এস। ডেসডেমনা কোথায় পাবে সে রুমাল? সে তো আগেই চুরি হয়ে গিয়েছে। ওথেলো বলল—কোথায় গেল সে রুমাল? কোথায় ফেলেছ? এ তোমার মস্ত অপরাধ। জানো, ঐ রুমালখানা আমার মাকে

দিয়েছিল ইজিপ্টের এক রমণী। সে রমণীটি ছিল এক ডাইনি, আর সে বলে দিতে পারতো মানুষের মনের সব গোপণ কথা। মাকে রুমালখানা দিয়ে সে বলেছিল রুমালখানার অনেক গুণ---যতক্ষণ ওটা কাছে থাকবে ততক্ষণ বাবা কিছুতেই তাকে ভুলবে না এবং সব সময়েই তাকে ভাল ভাবে নেবে---ভালবাসবে। আর যদি কখনও রুমালখানা কোনরকমে কারো কাছে হাতছাড়া হয়ে যায়, অথবা হারিয়ে যায় তবে ঠিক বিপরীতটি ঘটবে, অর্থাৎ বাবা মাকে যেমন গভীরভাবে ভালবাসতো ঠিক তেমনই ভীষণভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে শুরু করবে---বাবার মনটা সম্পূর্ণই মার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে। মা যখন মারা যান তখন ঐ রুমালখানা তিনি আমাকে দিয়ে যান, এবং নির্দেশ দেন যে যদি আমি কখনও বিয়ে করি তবে আমি যেন আমার স্ত্রীকে ঐ রুমালটি উপহার দিই। তার কথামতই তোমাকে ঐ রুমাল আমি দিয়েছিলাম---আর তখন কি বলেছিলাম মনে আছে? বলেছিলাম, যত্ন করে এটা রেখো, এটাকে নিজের প্রাণের মত প্রিয় মনে কোর। ডেসডেমনা ভয় পেয়ে বলে উঠল---এও কি সম্ভব নাকি? ওথেলো বলল---যা বলছি তার সবটুকুই সত্যি। রুমালখানার জাদুগুন আছে--ওটা বানিয়েছিল এক ডাইনি বুড়ি--সে দুশো বছর আগেকার কথা---সেই বুড়ির ছিল ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা--একদিন যখন তার ভর হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে সে ঐ রুমালখানা বানায়---যে গুটি পোকার থেকে ওর রেশম নেওয়া হয়েছে সেই গুটিপোকাগুলো ছিল মন্ত্রপুত, আর ওর রং পাওয়া গিয়েছে মমি করে রক্ষা করা কুমারীদের হৃদপিণ্ড থেকে। রুমালের এই বীভৎস গুণাগুণ শোনামাত্র ডেসডেমনা আতঙ্কে মৃতপ্রায়, সে ভাবল হায়, এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল---সে রুমাল তো আর পাব না, আর হারিয়ে যাওয়া রুমালের সঙ্গে আমি হারিয়ে ফেললাম চিরকালের জন্যে স্বামীর ভালবাসা। হঠাৎ ওথেলোর চোখে মুখে কেমন একটা নিষ্ঠুরতার ছায়া পড়ল--মনে হল এই মুহূর্তে সে যেন ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলবে---কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করে আবারও ডেসডেমনার কাছে সেই রুমালখানির জন্যে বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ডেসডেমনা যখন দেখল কিছুতেই আর তার স্বামীকে বোঝানো যাবে না তখন সে তাকে অন্যমনস্ক করার জন্যে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করল এবং অতি লঘু ও রহস্যছলে বলল---ও তাই বল, এতক্ষণে বুঝতে পারছি তুমি কেন সেই রুমালটার জন্যে এমন নাছোড়বান্দার মত করছ---ক্যাসিওর জন্যে আমি তোমাকে যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম সেটাকে যেমন করেই হোক ঠেকিয়ে রাখাটাই তোমার উদ্দেশ্য---তাই তুমি অন্য কথা তুলে আমার কথাটা চাপা দিতে চাইছ। এ কথা বলার পর ডেসডেমনা নিতান্তই সরল মনে পুনরায় ক্যাসিওর গুণগান করতে লাগল---তার মনে একটি বারের জন্যেও উদয় হল না যে তার ঐ প্রশস্তি ওথেলোর কানে বিষ ঢেলে দিচ্ছে। ওথেলোর মনে হল ইয়াগো যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে---সে আর নিজেকে

একেবারেই স্থির রাখতে পারল না—উদ্‌ভ্রান্তের মত ছটফট করতে করতে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ওথেলোর এই অস্বাভাবিকতা ডেসডেমনার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল—সে তার স্বামীকে ভালবাসে—সে জানে তার স্বামী কখনই তাকে অবিশ্বাস করতে পারে না, তবু তার মনে হল তার স্বামী বুঝি তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। তার স্বামী ক্যাসিওর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ।

কিন্তু হাজার ভেবেও কোনো কুল কিনারা পাচ্ছিল না ডেসডেমনা, ওথেলোকে ঈর্ষাপরায়ণ মনে করে সে তাকে ছোট করেছে এই ভেবে সে মনেমনে নিজের উপর দোষারোপ করতে লাগল। তারপর ভাবল হয়তো ভেনিস থেকে কোন দুঃসংবাদ এসেছে, হয়তো সেখানে কোন রাষ্ট্রীয় গোলযোগ দেখা দিয়েছে, তারই জন্যে ওথেলো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং সেই কারণেই তার মধ্যে আগেকার সেই উৎসাহ হারিয়ে গেছে। তারপর নিজের মনেই সে বলতে লাগল—মানুষ তো আর দেবতা নয়, কাজেই বিয়ের দিনে তাদের মধ্যে যে আগ্রহ ও আবেগ দেখা যায় ঠিক তেমন ভাবটি বিবাহিত জীবনে পরবর্তী কালেও থাকবে এমন আশা করা ঠিক নয়। এই সব ভাবতে ভাবতে সে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগল তার স্বামীকে সে এমন হীন মনে করেছে বলে।

এর পর আবার যখন ওথেলো ও ডেসডেমনার দেখা হল তখন সেই একই ভাবে ওথেলো দোষারোপ শুরু করল ডেসডেমনাকে—সে তার বিশ্বাসে আঘাত করেছে, এই তার অভিযোগ। এবার বরং আরও স্পষ্ট করে সে বলল ডেসডেমনা বিশ্বাস নষ্ট করেছে অপর একজন পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে—যদিও সেই পুরুষটিকে একথা ওথেলো স্পষ্ট করে বলল না। সে এমনই আঘাত পেয়েছিল যে অঝোরে তার চোখের জল ঝরছিল, কিছুতেই সে নিজেকে সংযত রাখতে পারছিল না। ডেসডেমনা অসহায়ের মত বলে উঠল—হায়, এ কি দুর্দিন, আজ তোমার চোখে জল। কি জন্যে তুমি কাঁদছ? উত্তরে ওথেলো বলল—আমি কাঁদছি, জানো কেন কাঁদছি? অটুট ধৈর্য নিয়ে আমি সব দুঃখের বোঝাই বইতে পারি—দারিদ্র্য, রোগযন্ত্রণা, যত কিছু অপমানের বোঝা সবই—কিন্তু তোমার বিশ্বাসঘাতকতা আমার হৃদয়কে একেবারে চুরমার করে দিয়েছে। তুমি তো এক বিষাক্ত চারাগাছ—তোমার রূপে তুমি মানুষের মন ভোলাও, তোমার গন্ধে তুমি মাতোয়ারা কর, তোমার সান্নিধ্যে শিরা উপশিরা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ওঠে—হায় কেন এই পৃথিবীতে তোমার জন্ম হল? কথার শেষে ওথেলো যখন স্থানত্যাগ করে চলে গেল ডেসডেমনা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে শুধু ভাবতে লাগল কেন তার স্বামী এমন অকারণে তার প্রতি সন্দেহপ্রবণ হল—সে কিছুই বুঝতে পারছিল না—শুধু এক মানসিক দুঃখ ও বেদনার ভারে যেন ক্রমশ তার চোখ দুটি অচেতন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল—সে তার দাসীকে বলল শয্যা প্রস্তুত করে দিতে, আর তার শয্যার সেই বাসর রাত্রের

চাদরখানি বিছিয়ে দিতে। সে বলল, নিজের মনে মনেই বলল—কেউ যখন তার ছোট্ট শিশুকে শাসন করে শিক্ষা দিয়ে চায় তখন তো সে কত যত্নের সঙ্গে ও হালকা কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে মানুষ করে তোলে—ওথেলোও তো তেমনি করে তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করতে পারত—আমি তো তার কাছে ছোট্ট শিশুর মত বকুনি খেতেই চেয়েছি। এর বেশি আর কোন নালিশ তার ওথেলোর বিরুদ্ধে ছিল না—সে আর কিছু বলতে জানে না।

এই বেদনাক্রান্ত মন নিয়ে ডেসডেমনা তার শয্যায় শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে ওথেলো তার কাছে আসবে। কিন্তু তার সারা দেহ মনের ক্লান্তির ভারে সে একটু পরেই আচ্ছন্ন হয়ে গেল গভীর নিদ্রায়। ওথেলো প্রবেশ করল শয্যাকক্ষে—তার চোখে মুখে আসন্ন সর্বনাশের সংকেত—সে সংকল্প নিয়ে এসেছে তার স্ত্রীকে হত্যা করবে। ঘুমন্ত ডেসডেমনার নিষ্কলঙ্ক নির্মল মুখ তাকে কেমন যেন উন্মনা করে দিল—না, ওর রক্ত ঝরুক তা আমি চাই না, ওর ঐ শুভ্র দেহত্বকে একটুও আঁচড় লাগুক তা ও চাই না—অ্যালাবেস্টরের মত মসৃণ ঐ ত্বক। কিন্তু মরতে ওকে হবেই। যদি ওকে হত্যা না করি তবে আজ ও যেমন আমাকে প্রতারণা করেছে, ভবিষ্যতে আরও কত মানুষকে তেমনি প্রতারণা করবে। একথা বলার পর শেষবারের মত ওথেলো চুম্বন করলো তার স্ত্রীকে—কী মধুর সে চুম্বন—সে আরও একবার চুমু খেতে গেল তাকে। কান্নায় ভেসে গেল ওথেলোর বুক—কিন্তু তবু সে ক্ষমা করবে না ডেসডেমনাকে—সে বলল, আমার এ কান্না কত নিষ্ঠুর—আমার এ বেদনা যেন ঈশ্বরের বুকের বেদনার মত—স্নেহে দুর্বল তবু সে নির্মম।

ওথেলোর চুমার স্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে গেল ডেসডেমনার। চোখ মেলে সে দেখতে পেল ওথেলোকে। সে আরও দেখল ওথেলো আজ কত ভয়ঙ্কর, সে যেন ক্রোধের বশে তার নীচের ওষ্ঠ কামড়াচ্ছে—যেন তার চোখ দুটি চর্কির মত ঘুরছে—ডেসডেমনা জানতো ওথেলোর এই ভয়ঙ্কর মূর্তির অর্থ—জানতো এই মূর্তি নিয়ে কেমন করে সে শত্রুকে নাশ করে। ডেসডেমনাকে ওথেলো বলল—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা সেরে নাও, আমি তোমার আত্মাকে হত্যা করতে চাই না। ডেসডেমনা অসহায়ের মত দয়া ভিক্ষা করল ওথেলোর কাছে, জানতে চাইল কী তার অপরাধ। এবার ওথেলো স্পষ্ট করে নাম করল ক্যাসিওর—ডেসডেমনাকে বলল—আমার রুমাল তুমি ক্যাসিওকে উপহার দিয়েছ। ডেসডেমনার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সে তার কথা বুঝিয়ে বলতে চাইল ওথেলোকে, কিন্তু ওথেলোর এখন সে কথা শোনার মত মানসিক ধৈর্য নেই—সে ডেসডেমনাকে ঢেকে দিল তার বিছানার চাদরে—আর নির্মমভাবে তাকে হত্যা করল কণ্ঠরোধ করে।

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল কারা যেন ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে আসছে

ক্যাসিওকে—সে নিদারুণভাবে আহত এবং অনর্গল তার রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ইয়াগোর নিযুক্ত করা এক হত্যাকারী তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। ক্যাসিওর আঘাত খুবই মারাত্মক, তবু নিশ্চিত মৃত্যু থেকে সে বেঁচে গিয়েছে। এদিকে ইয়াগো যখন বুঝতে পেরেছে যে ঐ হত্যাকারীর দ্বারা তার অপরাধ ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তখন সে নিজেই ঐ হত্যাকারীকে মেরে ফেলেছে। ইয়াগো তবুও কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারল না, কেননা যে হত্যাকারীকে সে মেরে ফেলেছে তার পকেট থেকে পাওয়া গেল কিছু চিঠিপত্র। সেই চিঠিপত্রের মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়ল ইয়াগোর চক্রান্ত এবং এ-ও স্পষ্ট হল যে সন্দেহাতীতভাবে ক্যাসিও সম্পূর্ণ নিরপরাধ। ক্যাসিও এবার ওথেলোর কাছে এগিয়ে এল—সে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানতে চাইল কী তার অপরাধ যে সে ইযাগোকে নিয়োগ করেছে তাকে হত্যা করার জন্যে।

ওথেলোর মাথায় যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হল—সে স্পষ্ট বুঝতে পারল কত বড় তার ভুল, নিজেকে তার মনে হল হত্যাকারী খুনী বলে—সে উপলব্ধি করল কত নিষ্পাপ ও পবিত্র ছিল তার স্ত্রী ডেসডেমনা। নিদারুণ মর্মযন্ত্রণায় জীবনের ভার যেন তার কাছে দুঃসহ বলে মনে হল—সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার নিজের তরবারির উপর এবং তার লাঞ্ছিতা স্ত্রী ডেসডেমনার দেহের উপর ঢলে পড়ে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়ল।

ওথেলোর হঠকারিতা অবশ্যই নিন্দনীয়, কিন্তু সে ও তার স্ত্রী— এই দুটি অমূল্য জীবনের এমন পরিণতির ফলে উপস্থিত সকলের মনে সঞ্চার হল এক অভূতপূর্ব বিস্ময় ও বিভীষিকা—কারণ ওথেলো ছিল সকলের চোখে সৎ ও আদর্শবান এবং যতদিন না ইয়াগোর চক্রান্ত তার সরল মনকে বিষাক্ত করে দিয়েছে ততদিন পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরাগী—একটি দিনের জন্যও স্ত্রীর প্রতি কোন সন্দেহ তার মনে স্থান পায়নি। তার ভালবাসায় বিচারবুদ্ধির অভাব ছিল ঠিকই, কিন্তু তার নিষ্ঠায় কোন ফাঁকি ছিল না। তাই যে মুহূর্তে সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল সেই মুহূর্তে তার বড় বড় দুটো চোখ বেয়ে অঝোরে ঝরেছিল অশ্রু—পৌরুষদৃপ্ত সেই চোখে অপর কোন আঘাতে এমন করে জল ঝরতে কেউ কখনো দ্যাখেনি। তার মৃত্যু হল, কিন্তু তার সদগুণ ও বীরত্বের কথা মানুষ তার মৃত্যুর বহুকাল পরেও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছিল। ওথেলোর উত্তরসূরীর প্রথম কাজ হল আইনের নির্মম বিচারে ইয়াগোর যথোপযুক্ত সাজা ও মৃত্যুদণ্ড। তারপর এই করুণ কাহিনীর বিবরণ যথাসময়ে পাঠানো হল ভেনিসে—ভেনিসের সেই খ্যাতিমান সেনাধ্যক্ষের মর্মান্তিক করুণ কাহিনী।

হ্যামলেট—প্রিন্স অব ডেনমার্ক

ডেনমার্কের রাণী গারট্রুড। স্বামীর মৃত্যুর পর দুটি মাসও অতিবাহিত হয়নি-বিধবা রাণী বিয়ে করলেন তাঁর স্বামী রাজা হ্যামলেটেরই সহোদর ক্লডিয়াসকে। বিচারবুদ্ধি জলাঞ্জলি দেওয়া এই খামকা বিয়েটা প্রজাসাধারণের কাছে কেমন যেন লাগল-- রাণীর কি হৃদয় বলে কিছু নেই'? নাকী আরও কিছু'? সকলের এমনটা মনে হওয়ার কারণও ছিল। কেননা, রাণীর পূর্বতন স্বামী রাজা হ্যামলেটের তুলনায় তার ভাই ক্লডিয়াসের না আছে রূপ, না আছে গুণ। ক্লডিয়াসকে দেখতে যেমন কুৎসিৎ তেমনি তার স্বভাবচরিত্র—দুই ভাইয়েব মধ্যে সর্ব বিষয়েই আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ক্লডিয়াসের এবম্বিধ স্বভাব চরিত্রের জন্যে স্বভাবতই অনেকের ধারণা জন্মাল সম্ভবত তারই চক্রান্তে রাজার মৃত্যু ঘটেছে—তার লোভ ভ্রাতৃবধূ গারট্রুডের প্রতি আর তৎসহ ডেনমার্কের রাজসিংহাসন। তার উদ্দেশ্য যেমন করেই হোক ঐ সিংহাসন থেকে যুবক রাজপুত্র হ্যামলেটকে বঞ্চিত করা। রাজপুত্র হ্যামলেটই ছিল রাজার অবর্তমানে ডেনমার্কের রাজসিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী।

রাণীর এই বিবেকবুদ্ধিবর্জিত বিবাহটি সবার কাছেই বেখাপ্পা ঠেকেছিল বটে কিন্তু এমত ঘটনাটি যাকে আমূল নাড়া দিয়েছিল সে ঐ যুবা রাজপুত্র হ্যামলেট। হ্যামলেট তার বাবাকে গভীরভাবে ভালবাসত এবং শ্রদ্ধাও করত তার দেবোপম চরিত্রকে, কাজেই এহেন মৃত পিতার স্মৃতি যে তাকে সমূলে আন্দোলিত করবে এতো খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া হ্যামলেটের চরিত্রের মধ্যেও ছিল দৃঢ় আত্মমর্যাদাবোধ, তার জীবনযাপনে ছিল সূক্ষ্ম সুষমতাবোধ। কাজেই, নিজের জননীর এই অসঙ্গত আচরণ যেমন একদিকে তাকে বিচলিত করেছিল, অপরদিকে তেমনি তার মৃত পিতার জন্যে নিদারুণ বেদনা তার সম্পূর্ণ মনপ্রাণকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল এক অনির্ণেয় গভীর বিষণ্ণতায়। সে আর একটুও স্বাভাবিক থাকতে পারে নি, তার দৈনন্দিন জীবনযাপনের সব কিছুই যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল- --সেখানে না আছে বিন্দুমাত্র আনন্দের রেশ, না আছে যুবজনোচিত খেলাধূলায় আসক্তি, এমন কি তার অতি প্রিয় যে বইগুলি তাকে নিত্য নিয়ত সঙ্গ দিত তারাও যেন এখন সব বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। হ্যামলেট যেন তার পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে একেবারেই খাপ খাওয়াতে পারে না—সে বড় ক্লান্ত, বড় একা। পৃথিবী এখন তার কাছে শুধু মরুভূমি—সেখানে একটিও গাছ নেই, লতা নেই—তার সব কটি ফুল শুকিয়ে ঝরে গিয়েছে—যদিবা সেখানে কিছু জন্মায় তা শুধু কন্টকিত আগাছার ঝাড়।

সিংহাসন হারানোর শোকে যে হ্যামলেট এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল তা কিন্তু নয়, যদিও সে-সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকার তারই এবং তার মত আত্মমর্যাদা

সম্পন্ন রাজপুত্রের কাছে এই বঞ্চনা ও অপমান যদিও সমূহ আত্মগ্লানির কারণ হতে পারে—কিন্তু এই বোধগুলি তাকে তেমন আহত করেনি যেমনটা তাকে নিষ্প্রাণ করে দিয়েছিল তার মায়ের আচরণ—তার বাবাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া, তার স্মৃতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা, তার সেই বাবা ! যে কীনা এমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো তার মাকে—এমন স্নিগ্ধ ও কোমল, এমন স্নেহপরায়ণ স্বামী ! আর, এই তো সেদিনও হ্যামলেট দেখেছে তার মা কেমন যত্ন ও আদর করত তার বাবাকে—কেমন স্নেহময়ী ও অনুগত স্ত্রী ছিল সে—যেন বাবাকে ঘিরেই তার সব কিছু, তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব—অথচ মাত্র দুটি মাসের মধ্যেই—না, বোধহয় এখনও দুমাসও কাটেনি—হ্যামলেট ভাবতে লাগলো। আবার বিয়ে করেছে মা—বিয়ে করেছে তার কাকাকে, যে কাকা তার মার এত প্রিয় স্বামীরই ভাই— সম্পর্কের দিক থেকেও গর্হিত এই বিবাহ, অবৈধ। আর শুধু তাই নয়—এমন অল্প সময়ে—শোকের বেশ না কাটতেই। তার খারাপ লাগে যখন সে ভাবে কেমন করে তার মা এমন জঘন্য এক মানুষকে বসিয়েছে রাজসিংহাসনে তার পাশে, আর আরও খারাপ লাগে যখন তার মনে হয় ঐ ব্যক্তিটিকে তার মা বেছে নিয়েছে নতুন শয্যাসঙ্গী রূপে। হ্যামলেট ভাবে, আর ভাবে। তার জীবনের অরুণোদয়ে সুন্দরের যে আদর্শ তাকে এক স্বপ্নের সন্ধান দিয়েছিলো তার সবটুকুই ঢেকে গেল ঘনকালো একখণ্ড বিষাদের মেঘে—সিংহাসন হারানো তার কাছে তুচ্ছ—একটি নয়, দশটি সিংহাসনের মূল্যেও তার ক্ষতির পরিমাপ করা যায় না।

মা গারট্রুড ও তার নতুন স্বামী ক্লডিয়াসের এ বড় সমস্যা। তাই তাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই—কী করে হ্যামলেটকে একটু অন্যমনস্ক করা যায়—কেমন করে তাকে সহজ করা যায়। কিন্তু তা হবার নয়। হ্যামলেট হ্যামলেটই। সেই যে বাবার মৃত্যুর দিন থেকে সে কালো পোশাক পরেছে শোকের চিহ্ন হিসাবে আজও তা একই ভাবে সে পরে রয়েছে, অন্য পোশাক সে গায়ে তুলবে না। এমনকি তার মা যেদিন আবার বিয়ের কনে সেজেছে সেদিনেও তার গায়ে ঐ কালো পোশাক। সে দূরে থেকেছে ঐ উৎসব থেকে, তার কাছে ঐ বিবাহোৎসব পাঁকের মতো নোংরা—ঘৃণ্য ও জঘন্য।

হ্যামলেট বড় বিভ্রান্ত—বড় বিচলিত। যে প্রশ্নটি প্রতিনিয়ত তাকে অস্থির করে তোলে তা তার পিতার মৃত্যুর রহস্য—সে কিছুতেই সঠিক উত্তর খুঁজে পায় না। তার কাকা ক্লডিয়াস রটনা করেছেন যে রাজার মৃত্যু হয়েছে সর্পাঘাতে। হ্যামলেটের বিচারবুদ্ধি কিন্তু এই উত্তরে সায় দেয় না, বরং এর ফলে সন্দেহ জাগে তার মনে—তার মনে হয় ঐ ক্লডিয়াসই সেই সাপ। সিংহাসনের লোভেই সে দংশন করেছে রাজাকে—আর সেই সাপই আজ রাজসিংহাসনের রাজা।

তবু স্থির হতে পারে না হ্যামলেট। বারবার তার মন বিক্ষিপ্ত হয় নানা প্রশ্নে—সে

ঠিক বুঝতে পারে না তার কাকাকে সন্দেহ করাটা যুক্তিযুক্ত কী না, বুঝে উঠতে পারে না কী চোখে দেখবে সে তার মাকে, সত্যিই কি তার মা এই চক্রান্তের অংশীদার, অথবা সবটুকুই ঘটেছে তার অজ্ঞাতে, না কী তার জ্ঞাতসারেই ঘটেছে কিন্তু সে নিজে লিপ্ত নয়?

ইতোমধ্যে হ্যামলেটের কানে এল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। রাজপ্রাসাদে যে সৈন্যরা নৈশ প্রহরায় থাকে তারা পর পর দু-তিন রাত্রিতে না কী দেখেছে এক প্রেতাত্মা। যেন মৃত রাজা তাঁর স্বাভাবিক চেহারায় দাঁড়িয়ে আছেন রাজপ্রাসাদের বাইরে পাটাতনের উপর। এবং প্রতিদিনই সেই একই পোশাকে-পা থেকে মাথা পর্যন্ত অস্ত্র সজ্জায়—যেমনটি জীবৎকালে তাকে দেখা যেত। আর যারা এ দৃশ্য দেখেছে তাদের মধ্যে আবার ছিল হ্যামলেটের এক অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু হোরাশিও—তারা সকলেই একই কথা বলেছে—ঠিক কোন সময়ে এবং কোন ভঙ্গিতে রাজাকে দেখা যায়—ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে ঘোষণা করে রাতের দ্বিপ্রহর, ঠিক সেই সময়ে—তাঁকে দেখায় যেন মলিনমুখ, সে মুখে যেটুকু ক্রোধ তার চেয়ে অনেক বেশি বিষাদ। তাঁব মুখের দাড়িও কেমন যেন ভয়াবহ—কালচে রূপালি—যেমনটা তাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় দেখা যেত। কিন্তু তাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একেবারেই নির্বাক, হ্যাঁ তবে একবার যেন মনে হয়েছিল তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি মুখ উঁচু করেছিলেন—একটু যেন মাথাটা দুলে উঠেছিল কিছু বলার জন্যে—কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ডেকে উঠেছিল ভোবের মোরগ। আর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গুটিয়ে নিলেন নিজেকে এবং একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন দৃষ্টির বাইরে।

হ্যামলেট মন দিয়ে শুনলো। না, এরা সকলেই তো একই কথা বলছে-কোথাও কোন অমিল নেই—এদের কথায় তো অবিশ্বাস্য কিছু আছে বলে বোধ হয় না। তার মনে হল ঐ প্রেতাত্মা অবশ্যই তার বাবার-তবে তো দেখতেই হবে নিজের চোখে এবং আজই রাতে। সে বলল ওদের সঙ্গে সে আজ পাহারায় থাকবে যাতে কীনা সে-ও দেখতে পায়—নিজের মনের যুক্তি দিয়ে সে বুঝল প্রেতাত্মার ঐ উপস্থিতির নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে, নিশ্চয়ই সে কিছু জানাতে চায়—হয়তো এ যাবৎ সে ওদের কাছে কিছু বলেনি, কিন্তু তার কাছে সে নিশ্চয়ই মুখ খুলবে। হ্যামলেট অসহিষ্ণুর মত পল গুণতে লাগল—কখন রাত হয়....

রাত আসতে দেরি হল না। হোরাশিও ও অপর এক প্রহরী মারসেলাস-এব সঙ্গে একসাথে হ্যামলেট অপেক্ষায় রইল সেই পাটাতনের উপর—ঠিক যেখানটায় এসে পায়চারি করে প্রেতাত্মা। ভারী ঠাণ্ডা ছিল সেই রাতটা—গায়ে যেন ছুঁচ ফুটছে—কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারিদিক—হ্যামলেট ও হোরাশিও ওদের সঙ্গীটির সঙ্গে সেই কথাই বলাবলি করছিল—বলছিল কী ঠাণ্ডারে বাবা, হাত পা সব যেন জমে গেল—আর ঠিক সেই সময়ে হোরাশিও বলে উঠল—চুপ—ঐ যে সে আসছে,

এগিয়ে।

হ্যামলেট চমকে উঠল—ভয়ে ও বিস্ময়ে। হ্যাঁ, তার বাবারই তো প্রেতাত্মা। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না এই প্রেতাত্মা শুভ অথবা অশুভ—সে ঈশ্বরের নাম জপ করতে লাগল, যেন তারা রক্ষা পায়—কী জানি কী উদ্দেশ্য নিয়ে হাজির হয়েছে এই প্রেতাত্মা। কিন্তু ধীরে ধীরে তার মনে সাহস ফিরে এল—আর তার বাবার ছায়াটিও তাকিয়ে রইল তার দিকে—যেন কত করুণ সে মুখ, যেন সে কথা বলতে চায় তার সঙ্গে—হ্যাঁ। ঠিকই তো, বাবাকে যেমন দেখতে লাগতো যখন তিনি বেঁচে ছিলেন। হ্যামলেট আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না—সে ডাকতে লাগল তার বাবাকে—নানা নামে। বলল, রাজা—বাবা—হ্যামলেট! জানতে চাইল, কেন সে এসেছে তার সমাধির বাইরে—তাকে তো তারা সেখানে শান্তিতে শায়িত করে এসেছিল—কেন সে আবার এই পৃথিবীতে—এই চাঁদের আলোয় আজ রাতে উঠে এল-কিছু কি তার বলার আছে—মনের গোপণে এমন কিং কোন কথা আছে যা জানতে পেলে তারা তার প্রতিবিধান করতে পারে—যাতে শান্তি লাভ করে তাঁর আত্মা ?

ছায়ামূর্তিটি এবার হাতছানি দিয়ে ইসারা করল হ্যামলেটকে তার সঙ্গে একা একা যেতে। হোরাশিও ও মারসেলাস নিষেধ করল হ্যামলেটকে-তারা বলল, ওকে অনুসরণ করলে বিপদ হতে পারে। হয়তো হ্যামলেটকে ও নিয়ে যাবে সমুদ্রের ধারে, নতুবা পাহাড়ের নির্জন চূড়ায় এবং সেখানে পৌঁছে ও ভয়াবহ মূর্তি ধরে ভয় দেখাবে যার ফলে হ্যামলেট বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে উন্মাদ হয়ে যাবে। কিন্তু হ্যামলেট মরীয়া—সে যাবেই। কী মূল্য আছে তার প্রাণের, কী হবে তার বেঁচে থেকে ? আর তার আত্মিক কোন সর্বনাশ হতে পারে না, কেননা, প্রেতাত্মার দ্বারা তা সম্ভব নয়। সঙ্গীদের কাকুতি মিনতিতে কোন ফল হল না। হ্যামলেট আর কোন কিছুকেই ভয় পায় না, সিংহের মতো তার সাহস—সে ওদের হাত ছাড়িয়ে জোর করেই এগিয়ে চলল ছায়ামূর্তির পিছনে।

কিছুদূর যাওয়ার পর যখন চারিধারে ফাঁকা একটা জনমানবশূন্য স্থানে এসে পৌঁছল হ্যামলেট—যখন তার সঙ্গীদের কাছ থেকে সে অনেকটা দূরে সরে এসেছে তখন তার কাছে এগিয়ে এলো ছায়ামূর্তি। মূর্তিটি এবার নিজের পরিচয় দিয়ে বলল সে হ্যামলেটের বাবা এবং ধীরে ধীরে বর্ণনা করতে লাগল কী কারণে এবং কী অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়েছে। সে হ্যামলেটকে বলল যে তার কাকা ক্লডিয়াসই এই হত্যা করেছে। হ্যামলেট এবার বুঝল তার অনুমান তাহলে সত্যিই। প্রেতাত্মাটি আরও বলল ক্লডিয়াস খুন করেছে সিংহাসনের লোভে এবং হ্যামলেটের মা গ্রারট্রুডেকে বিয়ে করার লোভে। প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যায় যখন রাজা তার বিলাসকুঞ্জে নিদ্রামগ্ন ছিলেন ক্লডিয়াস তখন একদিন সেই সুযোগে বিষাক্ত তরল পদার্থ ঢেলে

দিয়েছে তার কানে। ঐ পদার্থটির মানব দেহে প্রক্রিয়া বড় ভয়ঙ্কর—প্রতি শিরা উপশিরায় রক্তপ্রবাহ মুহূর্তে এর ফলে নিশ্চল হয়ে যায় এবং দেহের ত্বকে ফুটে ওঠে জটিল কুষ্ঠ রোগের মত ক্ষত। এমনি করেই খুন করা হয়েছিল তাকে। ক্লডিয়াস খুন করেছিল তার দাদাকে এবং এক মুহূর্তে তার দাদার জীবনের সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছিল—তার সিংহাসন—প্রিয়তমা স্ত্রী—তার জীবন।

অতঃপর তার পিতার প্রেতাত্মা হ্যামলেটকে বলল—তোমার বাবাকে যদি তুমি সত্যিই ভালবেসে থাক, যদি তার উপর তোমার প্রকৃতই ভক্তিশ্রদ্ধা থেকে থাকে তবে এই নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিহিংসাই হবে তোমার লক্ষ্য। প্রেতাত্মারও যেন দুঃখ ও বেদনায় চোখে অশ্রু ঝরল অবিরল যখন সে করুণ সুরে হ্যামলেটকে বলল তার জননীর কথা—কেমন স্বচ্ছন্দে সে তার স্বামীকে ভুলে অপর এক পুরুষকে স্বামী বলে এমন অনাচারে লিপ্ত হল, তার একটুও কষ্ট হল না তাকে ভুলে যেতে। সে অনুরোধ করল হ্যামলেটকে যেন সে তার কাকার উপরেই শুধু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে এবং কোনক্রমেই তার মাকে আঘাত না করে, কেননা, তার উপযুক্ত শাস্তির জন্যে ঈশ্বর আছেন, তার বিবেকের দংশনেই তাকে ক্ষতবিক্ষত হতে হবে। সব কথা শোনার পর হ্যামলেট প্রেতাত্মাকে কথা দিল সে তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আর হ্যামলেটের অঙ্গীকার শেষ হতে না হতেই মিলিয়ে গেল ছায়ামূর্তি।

সেই নির্জন প্রান্তরে হ্যামলেট এখন একা। সে মনে মনে তার সঙ্কল্প স্থির করে নিল। না, আর কোন ভাবনা নয়, কোনো স্মৃতিই আর সে মনে রাখবে না, জীবনে এ পর্যন্ত সে যা কিছু শিখেছে তার বইকেতাবে, যা কিছু দেখেছে তার জগতে—সবই সে এখন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলবে মন থেকে—তার মনে বেঁচে থাকবে শুধু প্রেতাত্মার স্মৃতি আর তার প্রতি মুহূর্তের ভাবনা হবে কেমন করে সে কার্যকরী করবে প্রেতাত্মার দেওয়া নির্দেশ। হ্যামলেট এই ঘটনার কথা আর কারো কাছেই জানাবে না স্থির করল, শুধুমাত্র তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হোরাশিওকে সে সব কথা খুলে বলল এবং হোরাশিও ও মারসেলাসকে অনুরোধ করল যেন তারা আজ রাতের অভিজ্ঞতার কথা নিশ্ছিদ্রভাবে গোপণ রাখে।

প্রেতাত্মার আবির্ভাব যে হ্যামলেটের মনে নতুন করে এক ঝড় নিয়ে এল একথা বলাই বাহুল্য। এমনিতেই সে মনমরা হয়ে থাকতো, তার প্রকৃতিও ছিল অন্তর্মুখী, তার উপর এই আকস্মিক ঘটনায় সে যেন অনেক পরিমানেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। হ্যামলেট বড় বিপন্ন বোধ করল নিজেকে নিয়ে। একটা নতুন ভয় তার মনে ঢুকল। তার এই দিনরাত একলা থাকা, চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ও গভীর চিন্তানিমগ্নতা যদি তার কাকার চোখে পড়ে তবে সে হ্যামলেটকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করবে, সে ভাববে হয়তো বা হ্যামলেট তার বাবার মৃত্যুরহস্যের

কোন সন্ধান পেয়েছে এবং প্রতিকারের কথা ভাবছে। অতএব কাকার কাছে আত্মগোপণের জন্যে হ্যামলেট এক অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করল। সে স্থির করল এখন থেকে সে অভিনয় করে যাবে যেন সত্যিই তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে—সে এক ধরনের উন্মাদ। এর ফলে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথমত, তার কাকা ভাববে এমন উন্মাদের দ্বারা তার কোন ক্ষতি হতে পারে না, কেননা উন্মাদ কখনো তার সঙ্কল্পে স্থির থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, হ্যামলেটের নিজের মনের যে স্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে তা-ও ঢাকা পড়ে যাবে এই কৃত্রিম পাগলামির আতিশয্যে।

কাজেই হ্যামলেট এখন আস্ত পাগল। কিম্ভুতকিমাকার তার সাজ পোশাক, এলোমেলো তার কথাবার্তা এবং অসংলগ্ন তার চালচলন। হ্যামলেটের অভিনয় দক্ষতার গুণে তার কাকা ক্লডিয়াস ও তার মা গারট্রুড সহজেই ধারণা করে নিল সে অবশ্যই উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। তারা অনুমান করতে চেষ্টা করল হ্যামলেটের এই মাথার গোলমালের প্রকৃত কারণটা কী। বাবার মৃত্যুজনিত শোকে যে এতটা বৈকল্য ঘটবে তা তাদের মনে হল না, তাছাড়া প্রেতাত্মার সঙ্গে হ্যামলেটের সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের ব্যাপারটিও তারা অনুমান করতে পারে নি, অতএব তারা নিজেদের বিবেচনায় সিদ্ধান্ত করে নিল যে ব্যাপারটি প্রণয়ঘটিত, অর্থাৎ প্রেমই পাগল করেছে হ্যামলেটকে—সিদ্ধান্তটি আরো খাঁটি মনে হল কেননা সেই প্রেমের পাত্রীটি কে হতে পারে তা-ও তারা শনাক্ত করে ফেলল।

খুবই প্রাঞ্জল এই সিদ্ধান্ত, কেননা পিতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে বিষণ্নতার রাহু সহসা গ্রাস করেছিল হ্যামলেটকে তার পূর্ব পর্যন্ত সে ছিল প্রেমের পূজারী—সে ভালবাসতো ওফেলিয়া নামে একটি মেয়েকে। ওফেলিয়া আর কেউ নয়, সে ছিল রাজা ক্লডিয়াসেরই প্রধান অমাত্য পোলোনিয়াসের কন্যা। হ্যামলেট তাকে অনেক চিঠি লিখেছে তার মনের কথা জানিয়ে। হ্যামলেটের প্রেম নিবেদনে ছিল এক অভিজাত মার্জিত রুচির পরিচয় এবং ওফেলিয়াও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো হ্যামলেটকে। এই ভালবাসায় বিপত্তি দেখা দিয়েছিল যেদিন থেকে হ্যামলেট তার পিতার মৃত্যুর পর বিষণ্নতার ভারে নিজেকে আর সুস্থ রাখতে পারে নি এবং তার ফলে ওফেলিয়ার প্রতি তার আসক্তিও হ্রাস পায় এবং তারও পরে যখন সে সম্পূর্ণ উন্মাদের মুখোশ নিয়ে চলতে শুরু করল তখন থেকে ওফেলিয়ার প্রতি তার আচরণে দেখা দিয়েছিল এক ধরনের নির্দয় আচরণ ও অসৌজন্য। ওফেলিয়া কিন্তু সরল ও নম্র—সে হ্যামলেটের ঐ আচরণের জন্যে কখনই তাকে দোষ দেয়নি, বরং সহানুভূতি নিয়ে ভেবেছিল তার বাবার মৃত্যুর শোকে হ্যামলেট স্বভাবতই নিদারুণ ভাবে পীড়িত হয়ে পড়েছে এবং তারই ফলে সাময়িকভাবে তার এমন দশা। সে মনে মনে হ্যামলেটের বিষাদজনিত এই অশোভন আচরণকে তুলনা করল মন্দিরের কাঁসর ঘন্টার সঙ্গে—সেই ঘন্টা যখন পূজার আরতিতে বাজে তখন কত মধুর তার

ধ্বনি, আর যখন আনাড়ির হাতে পড়ে সে এলোপাথাড়ি বাজতে থাকে তখন কী বিশ্রী তার শব্দ।

এদিকে হ্যামলেটের মনেও তখন বিপরীত অনুভূতির আসা যাওয়া। একথা ঠিক যে তার মনের ভিতর যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল তার উত্তাপে ভালবাসার সরসতা সহজেই শুকিয়ে গিয়েছিল। প্রেমের বিদগ্ধ রীতিনীতির আপাতত কোন স্থানই ছিল না তার মনে। প্রেম যেন তখন তার কাছে অকর্মণ্যের এক বিলাসিতা, কিন্তু এই বিরুদ্ধ মনোভাবের গতি কখনো কখনো ব্যাহত হত-যখন ওফেলিয়াকে তার মনে পড়ত সেই আগেকার মত এবং দুঃখ হত তার প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা ভেবে। সেই মুহূর্তে সে উতলা হয়ে উঠত ওফেলিয়ার জন্যে। এমনি এক মুহূর্তে সে একদিন একখানি দীর্ঘ প্রেমলিপি রচনা করে পাঠিয়েও দিয়েছিল ওফেলিয়াকে। ঐ পত্রে হৃদয়াবেগের এমনই আতিশয্য ছিল যে ঐ অসম্ভব সব আবেগের প্রকাশ বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল তার বাহ্যিক উন্মাদ হাবভাবের সঙ্গে। হ্যামলেট লিখেছিল যদি কখনও এমন মনে হয় যে আকাশের তারারা আগুনে উদ্দীপ্ত নয়, অথবা এমন মনে হয় যে সূর্য্যই আবর্তিত হয় পৃথিবীকে কেন্দ্র করে, অথবা মনে হয় যা কিছু সত্য তা-ই মিথ্যা—তবুও যেন সে কখনও না মনে করে হ্যামলেটের ভালবাসা সত্য নয়। এমন সব বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও হ্যামলেটের চিঠিগুলির মধ্যে কোথাও যেন লুকিয়ে ছিল কোমলতা— ওফেলিয়ার জন্যে তার স্নিগ্ধ কোমল ভালবাসা। হ্যামলেটের ঐ চিঠিগুলি কর্তব্যপরায়ণা ওফেলিয়া তার বাবাকে দেখিয়েছিল এবং পোলোনিয়াসও তার কর্তব্য পালন করেছিল তার মনিব রাজা ক্লডিয়াস ও রাণীর কাছে ঐ চিঠিগুলি হাজির করে। ক্লডিয়াসের কিংবা রাণীরও আর সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিলম্ব হল না; তারা বুঝে নিল হ্যামলেটের উন্মাদ দশার মূলে নিশ্চয়ই তার প্রেম। রাণী ভাবল ওফেলিয়ার এত রূপ, তাই হ্যামলেট সেই রূপের মোহে এমন উন্মাদ হয়ে গিয়েছে—এ তো খুবই মঙ্গলের, কেননা হ্যামলেটকে নিয়ে অপর কোন সন্দেহ বা ভয়ের কারণ রইল না। ওফেলিয়ার রূপে ও গুণে ভুলিয়ে অতি সহজেই তাকে আবার স্বাভাবিক করে নেওয়া যাবে। আর তাতে সবারই মুখরক্ষা হবে।

কিন্তু হ্যামলেটের যে ব্যাধি তার মূলতো আরও গভীরে এবং গারট্রুডের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া শক্ত—নিরাময় তো দূরের কথা। তার মনে প্রতিনিয়তই উঁকি দেয় তার বাবার ছায়ামূর্তি আর তার মাথায় সর্বক্ষণই সেই ছায়ামূর্তির অনুশাসন—প্রতিহিংসা চাই—অতএব হ্যামলেট অস্থির, অশান্ত। দিন ও রাতের প্রতিটি ঘন্টা অতিবাহিত হয়, আর তার এক পাপবোধ তার মনকে আকুল করে তোলে—এখনও সে পালন করতে পারে নি তার পিতার পবিত্র আদেশ। কর্তব্য পালনে বাধা দুটি। প্রথমত ক্লডিয়াস সর্বক্ষণই তার নিরাপত্তার জন্যে চারিদিকে

প্রহরী বেষ্টিত, দ্বিতীয়ত, মা গারট্রুডও সর্বদাই রয়েছে রাজার পাশে। এই প্রহরার বুহ্যভেদ করে রাজাকে স্পর্শ করা অত্যন্ত দুরূহ। এ ছাড়া আরও একটি নৈতিক সমস্যা তাঁকে দ্বিধায় ফেলেছে—যে ক্লডিয়াস তার বাবার সিংহাসনে চোরের মত বসেছে সেই ক্লডিয়াসই আবার তার মায়ের স্বামী—এর ফলে প্রতিহিংসা গ্রহণের তীব্র ইচ্ছা যেন অনেক পরিমাণে প্রতিহত হয়ে যায়। আর, মানুষ হয়ে অপর একজন মানুষকে খুন করার চিন্তাটা যেন বড় জঘন্য ও ভয়াবহ মনে হয় হ্যামলেটের চরিত্রে নিহিত মানবতাবোধের কাছে। আবার দিনের পর দিন বিষণ্নতা ও মানসিক অবসাদের ফলে তার মধ্যে জন্মেছিল এক ধরনের শৈথিল্য ও দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব—লক্ষ্যভেদ করার একাগ্রতা যেন তার ফলে ক্রমশই ঝিমিয়ে পড়ছিল। আরও একটা বিবেচনার দিকও উঁকি দিয়েছিল সেই সঙ্গে—যে প্রেতাত্মাটি উপস্থিত হয়েছিল তার সামনে, সেই প্রেতাত্মা কি সত্যিই তার বাবার অথবা কোন শয়তান তার বাবার মূর্তি ধরে হাজির হয়েছিল তার বিষাদগ্রস্ত মনের দুর্বল মুহূর্তে এবং সেই শয়তানই কি তাকে ক্রমশ ঠেলে নিয়ে চলেছিল খুনের মত ভয়ঙ্কর কাজ করাতে ? কাজেই হ্যামলেট স্থির করল—না, শুধুমাত্র প্রেতাত্মার ঐ প্ররোচনাতেই মানুষ খুন করার মত ভয়ঙ্কর কাজ করা উচিত হবে না, আরো কিছু নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া এ পথে পা বাড়ানো চলে না—প্রেতাত্মা তো একটা ছলনাও হতে পারে।

এমনই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে যখন হ্যামলেট দিশাহারা ও বিপর্যস্ত ঠিক তখনই রাজসভায় এসে উপস্থিত হল একটি নাটুকে দল। অভিনয়ের প্রতি বরাবরই অনুরাগ ছিল হ্যামলেটের। তদুপরি ঐ নাট্যগোষ্ঠীর একজন অভিনেতার বিয়োগান্ত একটি সংলাপ ছিল তার বিশেষ প্রিয়। ঐ সংলাপের বিষয়বস্তু ছিল ট্রয়ের বৃদ্ধ রাজা প্রায়ামের মৃত্যুতে তার রাণী হেকুবার অতি মর্মস্পর্শী বিলাপ ও ক্রন্দন। হ্যামলেট তার ঐ পূর্বপরিচিত অভিনেতা বন্ধুদের সাদরে অভ্যর্থনা করে বলল—ভাই তোমাদের অভিনয় আমার বড় ভালো লাগতো, আমার অনুরোধ নাটকের ঐ অংশটুকু তোমরা আমাকে একবার শোনাও। হ্যামলেটের অনুরোধে পূর্বোক্ত অভিনেতা শুরু করল তার সংলাপ—সে তার অনবদ্য ভঙ্গীতে পরপর বলে গেল বৃদ্ধ ও অশক্ত রাজার প্রতি নিষ্ঠুর আক্রমণ ও তার মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা—বীভৎস আগুনে তার প্রজাসাধারণ ও দেশের সর্বনাশের কথা আর বয়স্ক বৃদ্ধা রাণী শোকে ও দুঃখে নগ্ন পায়ে কেমন রাজপ্রাসাদের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে উন্মাদের মত ছুটে চলেছেন, তার মাথায় জড়ানো রাজমুকুটের পরিবর্তে এক ফালি ছিন্ন বস্ত্র, কোথায় তার রাণীর বেশ—কোমরে জড়ানো শুধু কোনরকমে পরে নেওয়া এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়। এই সংলাপ যে শুধু উপস্থিত দর্শকের মন আকুল করে তুলত তাই নয়—তারা যেন মানসনেত্রে চাক্ষুষ কবত এই করুণ দৃশ্য আর অভিনেতার নিজেরও কান্নায় গলা ধরে আসতো, চোখ জলে ভিজে যেত। এক চমকে হ্যামলেটের যেন ঘুম

ভাঙ্গলো। তার মনে হল ঐ অভিনেতার কথা—সে কখনো যে হেকুবাকে চোখে দেখেনি, বহুকালের পুরাতন এক কাহিনীর নায়িকা বহুদিন আগে মৃতা সেই হেকুবার অনুকরণে ঐ অভিনেতা কেমন অপরের বেদনায় কেঁদে ফেলল, আর সে কীনা তার প্রকৃত বেদনাতেও এমন চুপ করে বসে আছে—তার পিতা নিহত হয়েছেন নির্মমভাবে অথচ সে কীনা এখনও পর্যন্ত প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠতে পারে নি—নিজেকে ধিক্কার দিল হ্যামলেট। হ্যামলেটের ভাবনাটা এটুকুতেই শেষ হল না—সে ভাবতে লাগল জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে নাটকের কী দুরন্ত প্রতিক্রিয়া হতে পারে দর্শকের মনের উপর—তার মনে পড়ল একজন খুনী কেমন নাটকের এক খুনের দৃশ্যে নিজের খুন করার সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিল এবং তার প্রভাবে স্বীকার করে ফেলেছিল নিজের অপরাধের কথা। আর কথা নয়। হ্যামলেট স্থির করে ফেলল তার পিতার খুনের যে ঘটনাপরম্পরা সে জেনেছে তারই আদলে প্রস্তুত একটি নাটকের পালা অভিনয় করাতে হবে তার কাকার চোখের সামনে এবং সে কাছে থেকে লক্ষ্য করবে ঐ নাটকের কী প্রতিক্রিয়া হয় তার কাকার উপর—আর সেই অনুসারেই সে আবো সঠিক কিনারা করতে পারবে তার বাবার খুনের। অতঃপর এই নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক একটি নাটক প্রস্তুতির ব্যবস্থা করল হ্যামলেট এবং সেটি মঞ্চস্থ হবার দিনে যাতে তার মা ও কাকা দর্শকের আসনে উপস্থিত থাকে তারও ব্যবস্থা করল পূর্বাহ্নে তাদের কিছু বুঝতে না দিয়ে।

হ্যামলেটের এই নতুন নাটকখানির বিষয়বস্তু ছিল ভেনিসের পটভূমিতে। কাহিনীতে ছিল ভেনিসের ডিউক গনজ্যাগো আর তার মহিষী ব্যাপতিস্তার কথা। লুসিয়ানাস নামে ডিউকের এক অতি নিকট আত্মীয় একদিন ডিউককে হত্যা করল তার কানের ভিতর বিষ ঢেলে দিয়ে যখন ডিউক ঘুমিয়ে ছিল তার উদ্যানে। ডিউকের জমিদারী আত্মসাৎ করাই ছিল লুসিয়ানাসের উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখা গেল ডিউককে হত্যার অল্প দিনের মধ্যেই সে সম্পত্তি ছাড়াও লাভ করল ডিউকের স্ত্রী ব্যাপতিস্তার প্রণয়।

হ্যামলেটের ছক অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে পালাটি মঞ্চস্থ হল। দর্শকের আসনে উপস্থিত সপার্ষদ রাজা ক্লডিয়াস ও তার রাণী। রাজা ঘূনাক্ষরেও জানে না নাটকের কাহিনীতে কী আছে। পালার শুরুতে দেখা গেল গনজ্যাগো ও তার স্ত্রী বিশ্রম্ভালাপে ব্যাপৃত। স্ত্রী ব্যাপতিস্তা তার নানা প্রণয় সম্ভাষণের মধ্যে রাজাকে বলছে যদি গনজ্যাগোর মৃত্যু হয় তার মৃত্যুর আগে তবে সে আর কোনকালেই দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণের কথা ভাবতে পারে না। তার জীবনে গনজ্যাগো ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের কোন স্থান নেই। যদি এমন দুর্মতি তার হয় তবে যেন তার নরকেও স্থান না হয়। আর তাছাড়া এমন দুর্মতি শুধু সেই নষ্ট মেয়েছেলেরই হতে পারে যে নিজে তার স্বামীকে হত্যা করে। হ্যামলেট লক্ষ্য করল তার কাকার ও তার মার চোখমুখের চেহারা ধীরে ধীরে পালটে যাচ্ছে এবং ক্রমে তাদের মুখ শুকিয়ে আমসির মত

হয়ে গেল। এর ঠিক পরের দৃশ্যেই দেখা গেল গনজ্যাগো ঘুমিয়ে আছে তার প্রাসাদের সংলগ্ন উদ্যানে এবং সেখানে উপস্থিত হয়েছে লুসিয়ানাস—সে বিষ ঢালতে যাচ্ছে গনজ্যাগোর কানে। হ্যামলেট লক্ষ্য করল তার কাকা এবার ছটফট করতে শুরু করেছে নাটকের দৃশ্যে তার নিজের কীর্তির ছায়া দেখতে পেয়ে। শুরু হয়েছে তার বিবেক দংশন-সে আর বসে থাকতে পারছে না নাটকের সবটুকু দেখার জন্যে। হ্যামলেট দেখলো তার কাকা অস্থির হয়ে উঠেছে, সে হাঁক দিয়ে বললো—বাতি জ্বালিয়ে দাও আমার ঘরে—বললো ভারী শরীর খারাপ লাগছে আমার—এবং অবশেষে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে সে উঠে চলে গেল। রাজা চলে গেছেন, কাজেই মাঝ পথেই নাটকের দৃশ্যে যবনিকা টানতে হল। হ্যামলেট এটুকুই চাইছিল। সে এবার তার সংশয় থেকে মুক্তি পেল—তাহলে তার বাবার প্রেতাত্মা মিথ্যা নয়—ভুল নয়। হ্যামলেটকে খুব খুশী মনে হল—সে এখন অনেকটা চাঙ্গা হয়েছে, কেননা, এখন তার মন বেশ হালকা, সে তার ধাঁধাঁর সঠিক উত্তরটি পেয়ে গেছে। হোরাশিওকে সে বলল তার এই দৃঢ় বিশ্বাসের কথা। এবার তার প্রতিহিংসার আর কোন বাধা নেই—সেই ছকটিই এখন তাকে ভাবতে হবে—কেননা, তার কাকাই তার দুশমন। কিন্তু ঠিক এই সময়েই তার কাছে সংবাদ এলো, তার মা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁর ঘরে, একান্তে কিছু কথা বলার জন্যে।

আসলে হ্যামলেটকে এই ডেকে পাঠানোটা ঘটেছিল ক্লডিয়াসের ইচ্ছা অনুসারে। ক্লাডিয়াস রাণীকে নির্দেশ দিয়েছিল হ্যামলেটকে বলতে যে তার সাম্প্রতিক রকম-সকম খুবই বিরক্তিকর বলে বোধ হচ্ছে রাজা ও রাণী উভয়ের কাছেই। ক্লাডিয়াসের উদ্দেশ্য ছিল মা ও ছেলের ঐ প্রস্তাবিত কথোপকথনের সম্পূর্ণ বিবরণের মধ্যে থেকে হ্যামলেটকে বুঝে নেওয়া। কিন্তু হাজার হলেও রাণী হ্যামলেটের মা, কাজেই সে কি পারবে হ্যামলেটের সব কথাগুলো পরে সঠিকভাবে তার কাছে বলতে? হয়তো মাতৃস্নেহের দুর্বলতায় সে কিছু কথা না বলতেও পারে—এবং সেই চেপে যাওয়া কথাগুলোর মধ্যেই হয়তো অনেক কিছু লুকিয়ে থাকতে পারে যার তাৎপর্য অনেক। অতএব রাজা এ ব্যাপারে আড়ি পাতার জন্যে নিযুক্ত করল তারই একান্ত সচিব পোলোনিয়াসকে। পোলোনিয়াসকে নির্দেশ দেওয়া হল সে যেন রাণীর ঘরের পর্দার আড়ালে কান পেতে সব কথোপথন ভাল করে শুনে নেয়। পোলোনিয়াসের স্বভাবের সঙ্গে এই ধরনের যাবতীয় কপটতা এক সূত্রে বাঁধা—রাজ্য ও রাজনীতির যত কূট চালে সে আজীবন হাত পাকিয়েছে—কোন গোপণ রহস্যের গন্ধ পেলে তার মনে পুলক সঞ্চার হয়— সে তার মনমতো কাজ পায়।

হ্যামলেট হাজির হল তার মায়ের বিশ্রামকক্ষে। এখন সেখানে শুধু মা আর ছেলে। সরাসরি কোন কথা—না বলে গারট্রুড নানাভাবে হ্যামলেটকে জেরা করতে শুরু করল তার ভাবান্তর ও অস্বাভাবিক চলফেরা নিয়ে। সে বলল—হ্যামলেট,

তুমি তোমার আচরণের ফলে খুবই অসম্মান দেখিয়েছ 'তোমার বাবা'র প্রতি। 'বাবা' বলতে সে বোঝাতে চাইল হ্যামলেটের কাকা ক্লডিয়াসকেই, কেননা হ্যামলেটের মাকে বিয়ে কবার সুবাদে এখন সে বাবা হয়েছে হ্যামলেটের। কথাটা শোনামাত্রই হ্যামলেটের মাথায় রক্ত চড়ে গেল---'বাবা' এই অতি প্রিয় ও পবিত্র শব্দটি ব্যবহার করা হল এ জঘন্য মানুষটির জন্যে যে কীনা খুন করেছে তার প্রকৃত যে পিতা তাকে। তীক্ষ্ণ কটাক্ষে হ্যামলেট বলে উঠল--মা, তুমি প্রচণ্ড অন্যায় করেছ আমার বাবার উপর। উত্তরে তার মা বলল-- আমার কথার প্রকৃত উত্তর এটা নয়। হ্যামলেট বলল---তোমার কথাটার ওটাই যথার্থ উত্তর। রাণী বলল --হ্যামলেট, তুমি হয়তো ভুলে যাচ্ছ কার সঙ্গে তুমি কথা বলছ। হ্যামলেটের জবাবে দেরী হল না --সে বলল---আমি হতভাগা, ভুলে যেতে পারলেই ভাল হত কার সঙ্গে কথা বলছি। হ্যাঁ, ঠিকই তো বটে --তুমি রাণী, এবং তুমি তোমার স্বামীর ভাই-এর স্ত্রী -- এবং -- তুমি আমার মা---হে ঈশ্বর, তুমি যা হয়েছ যদি তুমি তা না হতে তবেই ছিল ভালো। হ্যামলেটের কথায় রাণী বিরক্ত হয়ে বলল--ঠিক আছে, আমাকে যদি তুমি এমনি তাচ্ছিল্য দেখাও, তবে দেখছি তাদেরই ডাকা যাক যাদের কাছে তুমি সিধে উত্তর দিতে পথ পাবে না। এই বলে রাণী উঠলো রাজা অথবা পোলোনিয়াসকে খবর পাঠানোর জন্যে। কিন্তু হ্যামলেট এখন মরীয়া সে একা পেয়েছে তার মাকে--তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না করে সে তাকে ছাড়বেনা--তাকে সে বুঝিয়ে ছাড়বে কত বড় অপরাধ সে করেছে। অতএব সে তার মার হাত চেপে ধরল সজোরে এবং তাকে বাধ্য করল সেখানে বসতে। হ্যামলেটের এই বেপরোয়া ভাব দেখে রাণী তো ভয়ে অস্থির, তার আতঙ্ক হল পাছে এই উন্মাদ তার গলা টিপে ধরে, তাই সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল। রাণীর চীৎকারের উত্তরে পর্দার আড়াল থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল --বাঁচাও বাঁচাও, রাণীকে বাঁচাও। আড়াল থেকে ভেসে আসা ঐ আর্তরব শুনে হ্যামলেট মনে ভাবল নিশ্চয়ই পর্দার আড়ালে স্বয়ং রাজাই লুকিয়ে আছে--অতএব আর দেরী নয়, সে এক টানে বের করল কোষবদ্ধ তরবারি এবং যেখান থেকে শব্দটি আসছিল সেই স্থান লক্ষ্য করে বিদ্ধ করল পর্দার আড়ালের সেই প্রাণীকে---ভাবখানা যেন একটা ইঁদুর পালিয়ে যাচ্ছিল আর সে তাকে মেরে ফেলল -- আর শব্দটি যখন সম্পূর্ণ থেমে গেল তখন হ্যামলেট বুঝল-- কাজ হাসিল হয়েছে।

কিন্তু লাসটাকে যখন হ্যামলেট পর্দার আড়াল থেকে টেনে সামনে নিয়ে এলো তখন সে তো অবাক----আরে এ যে সেই ধাড়ি কুচক্রীটা---পোলোনিয়াস----মুখ্য অমাত্য যে কীনা সর্বদাই রাজার সেবা করতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে। হ্যামলেট বুঝলো পোলোনিয়াস আসলে আড়ি পাততে গিয়েই আখেরে প্রাণটা দিল। এদিকে শশব্যস্ত গ্রারট্রুড এগিয়ে এসে বললো--এ কী সর্বনাশ করেছ তুমি হ্যামলেট। কত বড়

অন্যায় অপরাধ। হ্যামলেট ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দিল—বড় জঘন্য কাজই বটে, তা বোধ করি তুমি যে কাজ করেছ তার চেয়ে জঘন্য নয়—তুমি তো রাজাকে খুন করেছ আর বিয়ে করে নিয়েছ সেই রাজার ভাইকে। আজ আর হ্যামলেটের জিভে কোন জড়তা নেই, সে তার অভিযোগের কথা সবটুকুই খুলে বলতে চাইল। এ কথা হয়তো সত্যি যে পিতামাতার আচরণের সমালোচনা করা সন্তানের মুখে ভাল লাগে না, কিন্তু এমনও অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যেখানে সন্তানের সাবধান বাণী তার পিতামাতাকে ভুল পথ থেকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে সমালোচনা করা মানে শুধুমাত্র দোষারোপ কিংবা নিন্দা করা নয়, বরং অন্যায় কাজে বিরত হতে তাদের সাহায্য করা। ঠিক সেইভাবেই হ্যামলেট একের পর এক বলে গেল যে অন্যায়গুলি তার মা করে চলেছে। সে বলল তার বাবাকে কী ভাবে মেরে ফেলা হয়েছে আর সেই হত্যাকারীকেই বিয়ে করেছে তার মা। হ্যামলেট বলতে লাগল—যে মা একদিন তার বাবাকে সারা মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে বলে বলত, সেই মা-ই কীনা এমনভাবে ভালবাসার অমর্যাদা করতে পারল—আর যদি এমনটিই সম্ভব হয়ে থাকে তবে তো নারীর ভালবাসাকে কোনো মূল্যই দেওয়া যায় না, মনে হয় সবটাই বুঝি কৃত্রিম— ন্যায়, নীতি, ধর্ম এর সবই শুধু বাগাড়ম্বর, আর কিছুই নয়। সে তার মাকে আরও বলল- এমনই কাজ করেছ তুমি যার লজ্জায় স্বর্গের দেবতাদেরও মাথাকাটা যায়, আর এই অপরাধের ভার বইতে পৃথিবীরও নাভিশ্বাস ওঠে। এরপর সে তার মাকে দেখাল দুখানি ছবি- একখানি তার বাবার অর্থাৎ তার মার প্রথম স্বামীর এবং অপরখানি তার কাকা অর্থাৎ তার মার বর্তমান স্বামীর। সে বলল, তুলনা করে দেখ দেখি—বাবার মুখে কেমন সৌন্দর্যের দীপ্তি—কেমন দেবোপম তার রূপ! যেন অ্যাপোলোর মত কুঞ্চিত তার কেশ, জুপিটারের মত প্রশস্ত তার ললাট, রণদেবতা মার্সের মত তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি এবং তার মূর্তি যেন দাঁড়িয়ে আছে এমন ভঙ্গিতে যে স্বর্গীয় দূত মারকারি বুঝি এই মুহূর্তে অবতরণ করল উত্তুঙ্গ কোন পর্বতশৃঙ্গে—এই মানুষটিই ছিল সেদিন তোমার স্বামী। এবার সে তার মার সামনে তুলে ধরল ক্লডিয়াসের ছবি—এবং বলল—দেখ দেখি একে কেমন দেখতে, ঠিক যেন মূর্তিমান এক ক্ষয় যা ধীরে ধীরে নাশ করে যা কিছু সুন্দর—আর তেমনি করেই নাশ করেছে তার নিজের এমন সুন্দর সহোদরকে। হ্যামলেটের কথাগুলি বড় নিদারুণভাবে বিঁধল রাণীর প্রাণে, সে লজ্জায় অধোমুখ হয়ে রইল, তার নিজেকে মনে হল বড় হীন, বড় পাপী। অনুতপ্ত রাণীর কাছে হ্যামলেট এবার জানতে চাইল এখন কী করবে সে, কেমন করেই বা ক্লডিয়াসের মত এমন অপরাধীকে আবার তার স্বামী বলে মেনে নেবে। হ্যামলেটের কথা শেষ হতে না হতেই তার সামনে উপস্থিত হল তার পিতার মূর্তি—ঠিক সেই জীবিত মানুষটির মত, এবং ঠিক সেই একই মূর্তি যা সে কিছুদিন আগে প্রেতাত্মারূপে

দেখেছে। হ্যামলেট ভয় পেয়ে গেল। সে প্রশ্ন করে পিতার মূর্তির কাছে জানতে চাইল কী চায় সে। মূর্তিটি বলল—হ্যামলেট, তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ তোমার অঙ্গীকারের কথা, প্রতিহিংসার কথা—তোমাকে তাই স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি। আর, তোমার মাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা কর, দুঃখে এবং ভয়ে তার জীবন নাশ হতে চলেছে। কথা কটি বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেতাত্মাটি আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। সে শুধু হ্যামলেটের চোখের সামনেই নিজেকে প্রকাশ করেছিল—তার মা কিছুই দেখতে পায়নি। কাজেই হ্যামলেট কোনভাবেই তার মাকে বোঝাতে পারলনা কোনদিকে অথবা কেমনভাবে মূর্তিটি দেখা দিয়েছিল। তার মা কিছুই বুঝতে পারল না, ফলে, তার মনে হল হ্যামলেট এতক্ষণ শুধু নিজের মনেই কথা বলছিল শূন্যে তাকিয়ে, লক্ষ্যহীনভাবে উন্মাদের মতো—হ্যামলেটকে তার উন্মাদ বলেই মনে হল। কিন্তু হ্যামলেট আজ যেমন করেই হোক তার মাকে বুঝিয়ে বলবে তার মনের কথা। সে বলল—ভুল কোর না মা, আমি পাগল নই মোটেই, আমার কথাগুলোকে উন্মাদের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিও না, বুঝতে চেষ্টা কর—এ প্রেতাত্মা সত্যিই এসেছিল এবং তোমার পাপ মোচন করতেই এসেছিল। আমি যে পাগল নই তা সহজেই বুঝতে পারবে—এই দ্যাখনা আমার হাত ধরে, আমার নাড়ির স্পন্দন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মতই। সে তার মার কাছে চোখের জলে অনুনয় করে বলল—তুমি তোমার কৃত পাপের জন্যে ঈশ্বরের কাছে অপরাধ স্বীকার করে মার্জনা ভিক্ষা কর আর তোমার স্বামীর হত্যাকারীর সংসর্গ এখন থেকে ত্যাগ কর, নিজেকে আর তার স্ত্রী বলে ভেব না, ভুলে যাও তুমি ক্লডিয়াসের স্ত্রী। যদি সত্যিই তুমি আমার বাবার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাতে পারো তবেই তুমি হবে প্রকৃত আমার মা, আমি সন্তান হিসাবে তখনই তোমার স্নেহ ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করব। গ্রারট্রুড অভিভূত হল হ্যামলেটের এই আন্তরিক কথায়। সে হ্যামলেটের কাছে প্রতিশ্রুতি দিল যে তার সব কথা সে গোপন রাখবে। সেদিনের মত এখানেই শেষ হল মা ও ছেলের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা।

হ্যামলেটের এবার চোখ পড়ল মৃতদেহটির দিকে, এতক্ষণ সে ঠিক যেন বুঝতে পারেনি যাকে সে হত্যা করেছে সে পোলোনিয়াস—সে আর কেউ নয়, ওফেলিয়ারই বাবা। বড় অনুশোচনা হল হ্যামলেটের মনে। সে পোলোনিয়াসের দেহটিকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল এবং ওফেলিয়ার দুঃখের কথা ভেবে তার চোখে জল এল।

পোলোনিয়াসের এই হত্যাকাণ্ড কিন্তু সুযোগসন্ধানী রাজা ক্লডিয়াসের হাতে হ্যামলেটকে শায়েস্তা করার জন্যে একটা নতুন অস্ত্র তুলে দিল। রাজা সুযোগ খুঁজছিল কী উপায়ে হ্যামলেটকে শেষ করা যায়। তাকে হত্যা করতে পারলে সে সব চেয়ে খুশি হত, কিন্তু দেশের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে তাহলে অসন্তোষ দেখা দেওয়ার ভয়, কেননা হ্যামলেট তাদের সবার প্রিয়। তাছাড়া গারট্রুডের পুত্রস্নেহ তো একটা বাধা

বটেই। পোলোনিয়াসের মৃত্যুর অছিলায় রাজা বললো আপাতত হ্যামলেটের নিরাপত্তার জন্যে তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার এবং সেই অজুহাতেই ইংল্যাণ্ডগামী এক জাহাজে ইংল্যাণ্ডে পাঠানোর ব্যবস্থা হল হ্যামলেটকে। হ্যামলেটের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে রাজা তার দুজন সভাসদও নিযুক্ত করে দিল। ইংল্যাণ্ড ছিল সেই সময়ে ডেনমার্কের অধীনস্থ প্রজা। ডেনমার্কের রাজাকে রাজস্ব পাঠাতে হত বৃটেনের রাজাকে। কাজেই ক্লডিয়াস বৃটেনের রাজসভায় তার সভাসদদের মারফৎ জানিয়ে দিল যে জাহাজটি ইংল্যাণ্ডে পৌঁছোনোমাত্রই যেন সেখানে হ্যামলেটকে হত্যা করা হয়। জরুরী রাজনৈতিক প্রয়োজনেই এটা দরকার।

ক্লডিয়াসের এই নতুন চালটি কিন্তু হ্যামলেটের কাছে গোপন রইল না। সে ও গোপণে ক্লডিয়াসের চিঠিখানি হস্তগত করে তার যে অংশ হ্যামলেটকে বধ করার কথা লেখা ছিল সেই অংশটি সাবধানে একটু পরিবর্তন করে দিল। অর্থাৎ ঐ স্থান থেকে হ্যামলেটের নামটি মুছে সেখানে তার দুই সঙ্গীর নাম বসিয়ে দিল। তারপর চিঠিখানি আবার মুড়ে সীলমোহর করে সেটিকে যথাস্থানে রেখে দিল। এর ঠিক অল্পকাল পরেই ইংল্যাণ্ডগামী হ্যামলেটদের জাহাজে একদিন হানা দিল জলদস্যুর দল। দুইপক্ষে শুরু হল প্রচণ্ড মারামারি এবং এরই মধ্যে সুযোগ বুঝে হ্যামলেট তার তরবারি নিয়ে নিজের বীরত্ব প্রকাশের আশায় একাই উঠে পড়ল জলদস্যুদের জাহাজে। এদিকে যে জাহাজে সে আরোহী ছিল সেই জাহাজের মাঝিমাল্লারা ভয় পেয়ে সেই স্থান ত্যাগ করে দ্রুত পালিয়ে গেল। হ্যামলেটের ভাগ্যে কী ঘটল তার জন্যে তার দুই সঙ্গীর মাথাব্যাথা নেই---তারা গিয়ে পৌঁছল ইংল্যাণ্ডে তাদের হেপাজতে সেই জরুরী চিঠি, হ্যামলেট বধের নির্দেশ যে চিঠির মধ্যে ছিল এবং হ্যামলেট নিজেই যা বদল করে রেখেছিল।

এদিকে রাজপুত্রকে তাদের জাহাজে বন্দী করতে পেরে তো জলদস্যুরা ভারী উল্লসিত। তারা মনে করল একটা বড় শিকার পাওয়া গেছে, অতএব তারা হ্যামলেটের প্রতি যৎপরনাস্তি ভাল ব্যবহার করে তাকে খুশী করতে সচেষ্ট হল। তারা ভাবল রাজপুত্রের বিনিময়ে তারা ভালরকম ধনদৌলত লাভ করতে পারবে। কাজেই তারা হ্যামলেটকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিল ডেনমার্কের বন্দরের কাছাকাছি সমুদ্র উপকূলে একটা সুবিধামত জায়গায়। হ্যামলেট জাহাজ থেকে নেমে প্রথমেই একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিল ক্লডিয়াসের রাজসভায়। সেই চিঠিতে সে জানালো অদৃষ্টের ফেরে ইংল্যাণ্ডে তার আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি এবং আগামী কালই সে ফিরে আসছে রাজসভায় ক্লডিয়াসের সাক্ষাতে। যথাসময়ে পরের দিনে হ্যামলেট যখন রাজসভায় পৌঁছল তখন সেখানে তার জন্যে অপেক্ষায় ছিল এক অতি করুণ ও মর্মস্পর্শী দৃশ্য।

দৃশ্যটি আর কিছুই নয়—হ্যামলেটের অতি প্রিয় ছিল যে সুন্দরী ও সরল ওফেলিয়া

তারই অন্ত্যেষ্টির আয়োজন সেদিন বেদনাবিধুর করে তুলেছিল ডেনমার্কের রাজসভার আকাশ বাতাস। তার পিতার মৃত্যুর বেদনা বড় উতলা করে তুলেছিল ওফেলিয়াকে, আর সেই বেদনা আরও গভীরভাবে তার বুকে বেজেছিল কেননা হ্যামলেটের আঘাতেই মৃত্যু ঘটেছে পোলোনিয়াসের। এই দুঃখ ওফেলিয়াকে উন্মাদ করে দিয়েছিল — সে আর কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে নি। পাগলের মত সে রাজপ্রাসাদে রমণীদের কাছে ফুল নিয়ে বলে এ ফুল তার বাবার মৃত্যুর কবরে দেওয়ার জন্যেই নিয়ে এসেছে। পাগলের মত সে শুধু গান গেয়ে বেড়ায়— —ভালবাসার গান —মৃত্যুর গান—আবার কখনও বা তার গানের কোনো অর্থই থাকেনা. মনে হয় যেন সে সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলেছে তার স্মৃতিশক্তি—সে জানে না কী তার ঘটেছে। সে একা একা যায় একটা ছোট নদীর ধারে—সেখানে একটা উইলো গাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছে জলের দিকে, তার ছায়া পড়েছে জলের মুকুরে। সেই উইলোর ডালটিই তাকে একদিন টেনে নিল মৃত্যুর দিকে—সবার অলক্ষ্যে সে গিয়ে পড়েছিল সেখানে—তার হাতে নানা ফুল ও পাতায় গাঁথা মালা—সেই মালা সে ঝুলিয়ে দেবে উইলোর ডালে—সে পা দিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়লো ডালখানি—ফুলের মালা হাতে ডুবে গেল সে—কিছুক্ষণ জলের উপরে দেখা গেল তার বস্ত্রের অংশবিশেষ—তার কণ্ঠের গানও শোনা গিয়েছিল কিছুক্ষণ— যেন সে কিছুই জানে না তার পরিণতির কথা—যেন সে সেই জল স্থল আকাশেরই অভিন্ন এক অংশ— আর তার পরই নিষ্ঠুরভাবে তাকে টেনে নিয়েছিল নিয়তি। আর সে ওঠেনি।

অতএব হ্যামলেট যখন ডেনমার্কে ফিরে আসে তখন ওফেলিয়ার কবরের দৃশ্যটির সম্মুখেই সে উপস্থিত হয়েছিল। সে কিন্তু শুধুমাত্র দর্শকই— তখনও পর্যন্ত সে জানে না এ অনুষ্ঠান কার জন্যে—কাজেই ধীর গম্ভীর সেই পরিবেশে কোন ব্যাঘাত যাতে সৃষ্টি না হয় সেই ভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল একান্তে, একধারে। সে লক্ষ্য করল কবরের উপরে শুধু ফুল আর ফুল ছড়ানো রয়েছে যেমনটি কোন কুমারী মেয়ের মৃত্যু উপলক্ষে ছড়ানোর রীতি, আর সেই ফুল ছড়ানোর ভার নিয়েছেন রাণী নিজেই। ফুল ছড়াতে ছড়াতে রাণী বলেছেন—সুন্দর তুমি, তোমার গায়ে ছড়িয়ে দিলাম এই সুন্দর কুসুমগুলি! আমার স্বপ্ন ছিল তোমার ফুলশয্যা সাজিয়ে দেব এমনি করে ফুল দিয়ে যেদিন তুমি বধূ হয়ে আসবে আমার হ্যামলেটের ঘরে.....। হ্যামলেট আরও শুনতে পেল ঐ কবরের ধারে দাঁড়িয়ে বিলাপ করছে ওফেলিয়ার ভাই লারটেস। সে বলছে—ভায়োলেট ফুটুক তোর কবরের উপর। হ্যামলেট দেখল একথা বলতে বলতে লারটেস ঝাঁপিয়ে পড়ল কবরের ভিতরে—দুঃখে ও বিষাদে সে উন্মাদের মত আত্মহারা হয়ে বলছে—ওরে তোরা যারা কবর ঘিরে দাঁড়িয়ে আছিস, মাটির পাহাড় চাপিয়ে দে আমার উপর, আমাকেও তোরা ওর সঙ্গে কবর

দে। হ্যামলেটের ভিতর ঘুমিয়ে-পড়া ভালবাসা আবার জেগে উঠলো—ওফেলিয়া তো তারই, সে-ই তো সবচেয়ে বেশি ভালবাসে ওফেলিয়াকে—চল্লিশ হাজার ভাই একসাথে মিলেও যদি ভালবাসে তবুও তা সেই ভালবাসার কাছে কিছু নয়। সে আর শান্ত হয়ে থাকতে পারল না, আত্মপ্রকাশ করে সবার সামনে সে-ও ঝাঁপিয়ে পড়ল কবরের ভিতর যেখানে ছিল লারটেস এবং বোধকরি লারটেসের অপেক্ষাও তার সেই মুহূর্তের আবেগ ছিল অধিকতর উম্মাদের মত। লারটেস হ্যামলেটকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার গলার টুঁটি চেপে ধরল, কেননা হ্যামলেটই তার পিতার হত্যাকারী ও তার বোনের মৃত্যুর কারণ, সে হ্যামলেটকে এবার বাগে পেয়েছে—কিন্তু আক্রমণ বেশিদূর না গড়াতেই যারা পাশে ছিল তারা পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে সরিয়ে দিল। শেষকৃত্য সারা হওয়ার পর হ্যামলেট দুঃখ প্রকাশ করল লারটেসের কাছে তাকে এইভাবে উত্তেজিত করার জন্যে—সে স্বীকার করল যে ওফেলিয়ার প্রতি অন্য কেউ তার চেয়ে বেশি ভালবাসা প্রকাশ করে তা সে সহ্য করতে পারে না বলেই লারটেসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এরপর লারটেস তাকে মার্জনা করল এবং দুজনের মধ্যে তখনকার মত আর কোন ভুল বোঝাবুঝি রইল না।

হ্যামলেটের কাকা ক্লডিয়াস কিন্তু শয়তানের মত এবার তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কাজে লাগাতে চাইল লারটেসকে। সে জানতো লারটেসের মনে তার বাবা ও বোনের মৃত্যুতে কী ভীষন দুঃখ ছিল এবং যেহেতু হ্যমলেটই তাদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী তাই সহজেই লারটেসকে তার বিরুদ্ধে উসকানো সম্ভব হবে। কাজেই, হ্যামলেট ও লারটেসের মধ্যে সম্প্রতি যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা হয়েছে তারই আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তির জন্যে রাজা ব্যবস্থা করল এই দুই জনের মধ্যে এক অসিযুদ্ধের প্রদর্শনী। এদিকে গোপণে লারটেসের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজা ব্যবস্থা করল তার তরোয়ালের মুখে মারাত্মক বিষ মাখানোর, অর্থাৎ অসিযুদ্ধে ঐ বিষমাখানো তরবারিতেই হ্যামলেটের মৃত্যু অনিবার্য। অতএব নির্দিষ্ট দিনে মহাসমারোহে রাজসভা সভাসদবর্গের উপস্থিতিতে শুরু হতে চলল হ্যামলেট ও লারটেসের অসিযুদ্ধ। উভয়েই সমান বীর ও অসিযুদ্ধে সমান দক্ষ। রাজার সভাসদগণেরা এই খেলায় যার যার প্রিয় যোদ্ধার হারজিতের উপর বাজিও ধরল। হ্যামলেট ক্রীড়াভূমিতে নেমে কোন কিছু লক্ষ্য না-করেই তুলে নিল তরোয়াল—অসিযুদ্ধের নিয়ম অনুসারে তার তরোয়ালখানির শীর্ষ ছিল আচ্ছাদিত ও ভোঁতা—সে কিন্তু লক্ষ্য করেনি যে লারটেস যে তরোয়ালখানি বেছে নিল তা খোলা ও তীক্ষ্ণ এবং তার মুখে ছিল বিষমাখানো। লারটেসকে সে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি। খেলার শুরুতে লারটেস কিছুক্ষণ এমন ভাণ করল যেন সে হ্যামলেটের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না—হ্যামলেটের সমর্থকদের মধ্যে উল্লাস দেখা দিল, তবে সবচেয়ে বেশি উল্লাস দেখা দিল কৃত্রিম সমর্থক

রাজা ক্লডিয়াসের হর্ষধ্বনিতে—ক্লডিয়াস যেন হ্যামলেটকে পুরস্কার দেওয়ার জন্যে আনন্দে আত্মহারা—আর ঠিক সেই সময়েই লারটেসের বিষাক্ত তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ আঘাত করল হ্যামলেটকে—এবং সে আঘাতের অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। আঘাতের এই তাৎপর্য যদিও হ্যামলেট আদৌ বুঝতে পারে নি তবু তীব্র আঘাতের ফলে সে মরীয়া হয়ে সে প্রতি আক্রমণ করল লারটেসকে এবং দ্রুতগতি লড়াই-এর মধ্যে একসময়ে তার নির্দোষ অস্ত্রের পরিবর্তে তার হাতে এসে গেল লারটেসের বিষাক্ত তরোয়াল আর সেই তরোয়াল দিয়েই সে না-জেনে মুহূর্তের মধ্যে বিদ্ধ করল লারটেসকে—লারটেস বন্দী হল তার নিজেরই পাতা জালে। আবার ঠিক এই সময়েই ওদিকে রাণীর কাতর চীৎকার শোনা গেল তাঁকে বিষ দেওয়া হয়েছে। এই বিষের ব্যবস্থাটিও ক্লডিয়াসের আর এক চক্রান্ত।. একটি পাত্রে পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে সে রেখে দিয়েছিল এই পরিকল্পনা করে যে লারটেসের সঙ্গে অসিক্রীড়ায় ক্লান্ত হয়ে হ্যমলেট যখন তৃষ্ণা মেটাতে আসবে তখন ঐ পানীয় গ্রহণের ফলে তার মৃত্যু হবে অবশ্যম্ভাবী—অর্থাৎ, যদি কোন কারণে লারটেসের তরোয়াল হ্যামলেটকে আঘাত করতে ব্যর্থ হয় তবে এই দ্বিতীয় চক্রান্তে হবে তার অব্যর্থ মৃত্যু। শুধু একটুখানি ভুল হয়ে গিয়েছিল ক্লডিয়াসের—পূর্বাহ্নে তার এ বিষয়ে রাণীকে সাবধান করে দেওয়া হয়নি—এবং তারই ফলে রাণীর এই অপঘাত। রাণীর এই চীৎকার ও আকস্মিক মৃত্যু হ্যামলেটের মনে চকিতে সন্দেহের উদ্রেক করল—সে বুঝল একটা বড় রকমের চক্রান্ত কাজ করছে, তাই সে আদেশ করল তৎক্ষণাৎ সব দরজা বন্ধ করে দিতে। সে দেখতে চায় অনুসন্ধান করে। লারটেস এগিয়ে এল—সে বলল—অনুসন্ধানের কী দরকার—আমিই সেই চক্রান্তকারী—আমার আর সময় নেই—মৃত্যুর আগে তোমাকে সবই বলে যাই কেন আমি মরতে বসেছি, কোন অস্ত্রের বিষে—আর, সেই অস্ত্রের আঘাতে তুমিও আহত, কোন বৈদ্যেরই সাধ্য নেই তোমাকে বাঁচাবে। সে হ্যামলেটের কাছে মার্জনা ভিক্ষা, ক্লডিয়াসের শয়তানির জন্যে তার প্রতি শাপশাপান্ত করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। হ্যামলেট বুঝল তারও সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে, সে দেখল এখনও কিছু বিষ অবশিষ্ট আছে তার অস্ত্রের মুখে—আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না-করে সে ফিরে দাঁড়াল ক্লডিয়াসের দিকে এবং সজোরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে বিদ্ধ করল সেই বিষাক্ত তরবারি। হ্যামলেট এমনি করেই তার মৃত পিতার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল—পিতার আদেশ অনুযায়ী সে তার হত্যাকারীর প্রতি প্রতিহিংসার কর্তব্য পালন করল। নিহত হল ক্লডিয়াস।

হ্যামলেটের শরীর ক্রমশ অবসন্ন হয়ে আসছে—সে বুঝতে পারছে তার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসছে। সে কাছে ডেকে নিল তার প্রিয় বন্ধু হোরাশিওকে—হোরাশিও এই সর্বক্ষইই উপস্থিত ছিল এখানে এবং এই মর্মান্তিক

পরিণতির সবটুকুই ঘটেছে তার চোখের সামনে। সে-ও মনে মনে ভাবছিল তার নিজের জীবনও সে বিসর্জন দেবে হ্যামলেটের সঙ্গে—কিন্তু মরণোন্মুখ হ্যামলেট তাকে ডেকে বলল—বন্ধু, এই সব ঘটনার তুমিই সাক্ষী, তাই তুমিই দুনিয়ার মানুষের কাছে এই কাহিনী জানাবার জন্যে রইলে। হোরাশিও প্রতিশ্রুতি দিল সে হ্যামলেটের অনুরোধ রাখবে। পিতার প্রতি কর্তব্য পালনে তৃপ্ত হ্যামলেটের মহৎ আত্মা এই চক্রান্তজর্জর মর্ত্যভূমি ছেড়ে চলে গেল—হোরাশিও ও উপস্থিত জনসমষ্টি চোখের জলে কামনা করল তার আত্মার অখণ্ড স্বর্গবাস—হ্যামলেট ছিল তাদের সকলের প্রিয় এক নিষ্কলুষ রাজপুত্র—যাবতীয় রাজগুণের সে ছিল মূর্তিমান প্রতীক, যদি তার জীবন এইভাবে খণ্ডিত না-হত তবে সে-ই হতে পারত ডেনমার্কের সবার সেরা ও সর্বগুণসম্পন্ন এক প্রজাপালক নরপতি।

টিমন অব এথেন্স

এথেন্স নগরীতে কোন এক সময়ে ছিলেন এক প্রভূত বিত্তশালী ও স্বনামধন্য লর্ড, নাম তাঁর টিমন। টিমনের ধনরত্নও যেমন অফুরন্ত তাঁর দানশীলতাও তেমনই সীমাহীন। দানধ্যানের ব্যাপারে টিমনের কোন বড় ছোট ভেদাভেদ বা চেনাঅচেনার বিচার একেবারেই ছিল না। তাঁর ধনভাণ্ডার সর্বক্ষণই উন্মুক্ত এবং ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই তাঁর দান গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করত না।

আর তেমনি ছিল টিমনের গৃহে প্রতিদিন রাজকীয় ভোজের আয়োজন। এথেন্স-এর যে যেখানে থাক তারা নিয়মিতভাবে এসে যোগ দিত সেই পানভোজনের উৎসবে। এমন দান দাক্ষিণ্যের ফলে তার সুনামও যেমন সবার মুখে মুখে আবার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভালবাসাও তেমনি সব মানুষের অন্তরে। এমন দানছত্রে যারা আসে তাদের মধ্যে চাটুকারদের সংখ্যাও প্রচুর। নির্লজ্জের মত তারা গৃহস্বামীর স্তবস্তুতি কবতে সর্বদাই উদ্‌গ্রীব, আবার এমনও মানুষ আসত যারা স্বভাবতই নিন্দুক প্রকৃতির বা জগতজীবন সম্পর্কে ঘোর অবিশ্বাসী - কিন্তু টিমনের অর্থানুকূল্য লাভ কবাব বেলায় সকলেই হাত বাড়িয়ে আছে।

কোন কবি যদি কখনও ধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ এই বসুন্ধবাকে নিয়ে কয়েকটি কবিতা রচনা করে তা টিমনের নামে উৎসর্গ করত তবে সেই কবিতাব বইটি কেনার জন্য বইয়ের বাজারে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। এবং অধিকন্তু সেই কবির ভাগ্যে মিলত টিমনের দেওয়া বড় রকমের আর্থিক পুরস্কার। আর তাছাড়া টিমনের গৃহে তো তার নিত্য নিমন্ত্রণ। আবার কোন চিত্রশিল্পী যদি তার আঁকা একখানি ছবি নিয়ে টিমনের বাড়িতে হাজির হয় এবং গৃহস্বামীর সঙ্গে ছবিটির গুণাগুণ নিয়ে কথা বলতে চায়, তবে তার ছবিটি গৃহস্বামীর কাছে বিক্রী হয়ে যেতে বেশ চড়া দামে। হয়তো কোন জহুরী একটা মূল্যবান পাথর নিয়ে হাজির হল টিমনের বাড়িতে অথবা কোন বস্ত্রব্যবসায়ী নিয়ে এল কিছু দামী রেশমী কাপড়, টিমন সঙ্গে সঙ্গে যৎপরোনাস্তি বেশি দাম দিয়ে কিনে নিলেন ঐ সব সামগ্রী এবং কেনার পর বিনয়সহকারে বিক্রেতাদের ধন্যবাদ জানালেন ঐ বস্তুগুলি এমন অল্পদামে তাঁকে কেনার সুযোগ দেওয়ার জন্যে। এমন কেনাকাটার ফল সহজেই অনুমান করা যায়। কেননা খুব অল্পদিনের মধ্যেই টিমনের বাড়ি হয়ে উঠল সর্ববিধ দ্রব্যসম্ভারের আস্তাকুঁড়ের মত— তাতে মূল্যবান জিনিসের চেয়ে চোখঝলসানো অপ্রয়োজনীয় বাজে জিনিসেরই ছড়াছড়ি। একদিকে যেমন বস্তুসম্ভারে বাড়িতে আর তিলধারণের জায়গা রইল না ঠিক তেমনি দিনরাত বহুজনের আনাগোনায় বাড়িটা হয়ে দাঁড়াল একটা বড় বাজার। সেখানে দিনরাত ভিড় করছে, কবিশিল্পীরা, ব্যবসায়ীর দল, মান্যগণ্য নাগরিক সম্প্রদায় এবং নানা ধরনের প্রার্থীরা। আর এই মহাসম্মিলনে

দিনরাতই উঠছে টিমনের স্তবগান, অর্থাৎ চাটুবাক্য— যেন যে ঘোড়াটিতে টিমন দেবতা চাপেন তার পাদানীটি পর্যন্ত পবিত্র। টিমনই যেন অদের ইহকাল পরকাল।

এই যে সব পরভৃতের দল। এদের মধ্যে আবার ছিল কিন্তু ধনীর দুলাল। সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্যে দেনার দায়ে হয়তো তাদের শ্রীঘর বাসের উপক্রম— আর তখন লর্ড টিমনই তাদের বাঁচালেন ঋণমুক্ত করে। এরপর থেকে ঐ অপোগণ্ডের দল এসে জুটল তার বাড়িতে—তারা হয়ে উঠল তাঁর পরম ভক্ত। টিমনের পথই হল তাদের পথ— তাঁর মত অর্থের সংস্থান না থাকলেও তাঁর মত ব্যয়ের স্বভাবটি তারা ভাল করে আয়ত্ব করে নিল। কেননা এই ব্যয়প্রবণতা তাদের মজ্জাগত। এইসব বসন্তের কোকিলদের মধ্যে ছিল ভেনটিডিয়াস নামে একটি যুবক। যার ঋণ শোধ করতে টিমন নির্দ্বিধায় দিয়ে দিলেন পাঁচ ট্যালেন্ট পরিমাণ মুদ্রা।

কিন্তু টিমনের গৃহে এই বিশাল অতিথি অভ্যাগতের মহামিলনে যাদের সবচেয়ে বেশী আনাগোনা তারা উপহারদাতার দল। কেউবা একটা কুকুর, কেউবা একটা ঘোড়া, আবার কেউবা কোন একটা আসবাব নিয়ে হাজির হল— টিমনের মুখ থেকে যদি একটিবার সেই বস্তুর প্রশংসাসূচক কোন উক্তি বের হয় তবে পরদিন সকালেই অতি আগ্রহসহকারে সেটি পাঠিয়ে দেওয়া হল টিমনকে উপহারস্বরূপ এবং সেই উপহারের পাদটীকাস্বরূপ বলা হল যে প্রেরকের মহাসৌভাগ্য লর্ড টিমনের মত মানুষের এই তুচ্ছ জিনিষটি ভাল লেগেছে। উপহারের প্রতিদানে হাতে হাতে যা পাওয়া গেল তার মূল্য হয়তো আসল বস্তুটির দশগুণ এবং উপহারদাতার এটিই ছিল উদ্দেশ্য। ঠিক এইভাবেই কিছুদিন আগে লর্ড লুসিয়াস টিমনকে ভেট দিয়েছিলেন চারটি ধবধবে সাদা ঘোড়া— যে গুলি রূপালী পোশাকে ছিল সাজানো। লুসিয়াসের এই ঘোড়া পাঠানোর মূলে ছিল চতুর উদ্দেশ্য। তিনি একদিন টিমনের মুখে ঐ জাতীয় ঘোড়ার প্রশংসা শুনতে পান। আর একদিন অনুরূপভাবেই লর্ড লুকুলাস পাঠিয়ে দিলেন একজোড়া গ্রেহাউণ্ড কুকুর, কেননা টিমন নাকী একদিন ঐ জাতীয় কুকুরের চেহারা ও ক্ষিপ্রতার প্রশংসা করেছিলেন। ব্যাস, আর কথা নেই— লুসিয়াস ও লুকুলাসের কাছে পৌঁছে গেল হীরে মুক্তোর উপহার যার মূল্য ঐ ঘোড়া আর কুকুর দিয়ে মেপে শেষ করা যায় না। টিমনের একটিবারের জন্যেও মনে উদয় হয়নি যে ঐ উপহারগুলি পাঠানোর পিছনে ছিল প্রচ্ছন্ন অর্থলোভ।

কখনও কখনও আবার টিমনকে দোহন করার আরও সহজ ও নির্ভেজাল পদ্ধতি দেখা যেত। সেই সব স্তাবকেরা বেশী ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি টিমনের বাড়িতে এসে কোন মূল্যবান বস্তুটি চোখে পড়ামাত্র হয়তো বলল— বাঃ এমন সুন্দর জিনিস তো আগে কখনও দেখিনি, কিংবা কেউ হয়তো একটি জিনিস দেখে বলল— বাঃ রে, এটা তো আপনি খুবই সস্তায় কিনেছেন। ব্যাস্, আর দেখতে হবে না। উদারচেতা টিমন অমনি প্রশংসাকারীদের পাঠিয়ে দিলেন তাদের

ভাল-লাগা দ্রব্যগুলি এবং তার জন্যে প্রাপকের যে মূল্যটুকু লাগল তা মাত্র সামান্য দু'একটি কথার সস্তা চাটুকারিতা। ঠিক এমনিভাবে কিছুদিন আগে টিমন একজন লর্ডকে দিয়েছিলেন তাঁর তাজা পিঙ্গলবর্ণ ঘোড়াটি, যেটিতে তিনি নিজেই চাপতেন। ঘোড়াটি দান করার হেতু ঐ লর্ড একদিন বলেছিলেন— বাঃ ঘোড়াটিতো দেখতে বেশ খাসা, আর ছোটেও তেমন। টিমন ভাবলেন সত্যিই বুঝি প্রশংসাটি আন্তরিক, তাই তিনি সরল বিশ্বাসে ঘোড়াটি তার ঐ বন্ধুকে দিয়ে দিলেন। আসলে, টিমন কখনই ভাবতে পারতেন না মানুষের মনের কথা ও মুখের কথা সবক্ষেত্রে এক নয়— তিনি তাঁর নিজের মন দিয়েই সবাইকে বিচার করতেন। আর তাঁর বন্ধুদের জন্যে তিনি সবই দিয়ে দিতে পারতেন, যদি তা একটি গোটা রাজত্বও হয়।

তবে শুধু যে অপাত্রেই টিমন তাঁর এই অফুরন্ত ধনদৌলত দান করতেন তাই নয়, প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তিও তাঁর প্রয়োজনে টিমনের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল একসময় তাঁর এক ভৃত্যকে নিয়ে। বেচারা নিজে গরীব, কিন্তু সে মন দিয়ে ফেলেছিল এথেন্স-এর এক ধনীর দুহিতাকে। বড় ঘরের মেয়ে— তার কাছে তো আকাশের চাঁদ। সহায় সম্বলহীন ঐ ভৃত্যকে কে তার মেয়েকে দেবে? টিমন তাঁর ভৃত্যটির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে উজাড় করে দিলেন ধনরত্ন— তিন ট্যালেন্ট মূল্যের অর্থরাশি। মেয়েটির বাবা ঐ পরিমাণ যৌতুকই দাবী করেছিলেন। টিমনের টাকায় বিয়ের আর কোন বাধা রইল না।

তবে টিমনের গ্রহীতার বেশীর ভাগই ছিল শঠ ও প্রতারক। তারা তাঁকে যেন তেন প্রকারে খুশী করে তাঁর টাকাকড়ি হস্তগত করার জন্যই দিনরাত তাঁর পিছনে স্তাবকের মত ঘুরত ও তাঁকে ঘিরে রাখত। আর এই সব চাটুকারের দলের আমোদপ্রমোদ স্ফূর্তির মধ্যে বসে টিমন ভাবতেন বুঝি এরা সকলে তার শুভাকাঙ্খী ও বন্ধু-এরা সকলেই তাঁর কাছে আসে, তার আনন্দবিধানের উদ্দেশ্যে।

এই ভাবে দানখয়রাতের মহোৎসবে টিমন নিজেকে প্রায় সর্বস্বান্ত করার সীমায় এনে ফেললেন— স্বর্ণদেবতা প্লুটাসই যেন তার অর্থের ভাণ্ডারী— শুধু দান আর দান — দানের আর শেষ নেই। টিমন কোন খবরই রাখেন না তাঁর অর্থভাণ্ডারে কী রইল আর না রইল। আর কেই বা তাঁকে এবিষয়ে সচেতন করে দেবে। সবাই তো তাঁর কাছে পেতেই আগ্রহী— সবাই তার চাটুকার। এমন অবস্থায় তাঁর দেওয়ান ফ্লেবিয়াস একদিন তাঁকে হিসাবপত্র দেখাতে চাইল এবং ব্যয়ের বহর সম্পর্কে একটু সাবধান হতে অনুরোধ করল। অন্য কোন পরিস্থিতিতে একজন সামান্য দেওয়ানের পক্ষে প্রভুর মুখের উপর তাঁর ব্যয়ের সম্পর্কে এমন কথা বলা অশোভন হলেও এক্ষেত্রে ফ্লেবিয়াস আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি। সে অনুনয় বিনয় করে অশ্রুপাত করে তাঁকে প্রকৃত অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করল। কিন্তু টিমন তাঁর কথায় কান দিলেন না, তিনি অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন।

বোধ হয় এমনটিই হয়ে থাকে— মানুষ যখন তার ধনসম্পদ ও ভাগ্যকে নিয়ে ছেলেখেলা করে তখন কোন সৎপরামর্শই তার কানে প্রবেশ করে না। অতএব ফ্লেবিয়াসের মত শুভাকাঙ্খীকে নীরবেই অশ্রু বিসর্জন করতে হয়। যখন টিমনের বাড়ি অতিথি অভ্যাগতের খানাপিনায় গমগম করত তখন এই দুঃখী দেওয়াণী সেখান থেকে দূরে সরে গিয়ে একা একা চোখের জল ফেলত। আর ওদিকে মহাসমারোহে আলোর রোশনাই নিয়ে সেই বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে বয়ে যেত আনন্দের জোয়ার— সুরার স্রোত। কিন্তু ফ্লেবিয়াসের অশ্রুর জোয়ার হয়তো ছাপিয়ে যেত সেই সুরাস্রোতকে। কিন্তু এই উৎসব আনন্দ আর কতকালই বা স্থায়ী হয়। মৌচাকে যতক্ষণ মধু থাকে মৌমাছিরা ততক্ষণই গুনগুন করে। তারপর আর তাদের টিকিটি দেখা যায় না।

অতএব টিমনের অর্থভাণ্ডারেও এবার টান পড়ল। চারিদিকে ধার দেনা। এখন আর ফ্লেবিয়াসের কথা অগ্রাহ্য করা চলে না। কিন্তু টাকা কোথায়? টিমন ফ্লেবিয়াসকে ডেকে বললেন তাঁর কিছু জমিজমা বিক্রী করে দেনা শোধের ব্যবস্থা করতে। ফ্লেবিয়াস বলল— আপনাকে কতবার সাবধান করেছি, আপনি আমার কথায় কোন গুরুত্ব দেওয়ার দরকার বোধ করেন নি। এখন আপনার জমিজমার বেশীর ভাগই হয় বিক্রী হয়ে গেছে, না হয় বন্ধক দেওয়া আছে— আর যেটুকু যা এখনও পর্যন্ত আছে তা বিক্রী করে আপনার এই প্রভূত দেনার কিছুই শোধ করা যাবে না। টিমন তো আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি বললেন— বলো কি এই এথেন্স থেকে ল্যাসিডিমোন পর্যন্ত সব জমিদারী আমার। এর সবই বিক্রী হয়ে গেছে? ফ্লেবিয়াস বলল— হুজুর পৃথিবীটা খুবই বিশাল সন্দেহ নেই, তবু তারও সীমা আছে— এর সবটুকুই যদি আপনি ফুঁকে দিতে চান তবে তা ফুরতে কতক্ষণ লাগে?

টিমন অবশ্য এই অবস্থার মধ্যেও নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার যুক্তি খুঁজে পেলেন। তাঁর অর্থ ব্যয় হয়ে গিয়েছে বটে তবে কোন অসৎ কাজে তো তিনি অর্থের অপব্যয় করেন নি, কিংবা নিজের কোন কুমতলবের ফলেও তাঁর অর্থহানি ঘটে নি। তাঁর অর্থ তিনি বন্ধুবান্ধবের জন্যেই খরচ করেছেন। আর সেইজন্যেই তাঁর মনে হল সহায় সম্বলের অভাবও তাঁর হবে না। তাঁর এতসব শুভাকাঙ্খী সুহৃদ আছে, তাদের কাছে লোক পাঠালেই টাকা এসে পড়বে, তাঁর এই সংকটে তারা তাঁকে সাহায্য করতে দ্বিধা করবে না। একদিন তাদের জন্যেই তো তিনি দুহাতে টাকা খরচ করেছেন। কাজেই বেশ খোসমেজাজ নিয়েই তিনি একে একে লোক পাঠাতে শুরু করলেন বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবের কাছে। লুসিয়াস, লুকুলাস, সেমপ্রোনিয়াস ইত্যাদি যারা একদিন তাঁর কাছে রাশি রাশি টাকা পেয়েছে তাদের সবার কাছেই লোক পাঠিয়ে টাকার কথা জানালেন। ভেনটিডিয়াস নামে আরো একজনকে তিনি টাকা দিয়ে জেল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন— এখন সেই ভেনটিডিয়াস তার পিতার মৃত্যুর পর পিতার

যাবতীয় ধনসম্পত্তির মালিক, কাজেই টিমনের অনেকটা দায় সে একাই মেটাতে পারে। টিমন ভেনটিডিয়াসের কাছে পাঁচ ট্যালেন্ট মুদ্রা চেয়ে পাঠালেন যা তিনি এককালে তাকে দিয়েছিলেন। এছাড়া অন্যান্যদের কাছে চেয়ে পাঠালেন পঞ্চাশ ট্যালেন্ট। তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে একদিন যাদের জন্যে তিনি এত ব্যয় করেছেন তাদের কাছে হাত পাতলে পঞ্চাশ তো অতি সামান্য পাঁচশত ট্যালেন্ট পরিমাণ মুদ্রা পাওয়াও তাঁর পক্ষে খুবই সহজ।

প্রথম যার কাছে টিমনের লোক গেল সে লুকুলাস। টিমনের লোককে দেখে লুকুলাস মনে করল একটা বড রমের দাঁও মারা যাবে। কিন্তু টিমনের ভৃত্যের কাছে যখন সে শুনল প্রাপ্তির কোন আশা নেই বরং টিমনই টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন তখন তার বন্ধুত্বের মুখোশটি আপনা থেকেই খসে পড়ল। সে তখন ভালমানুষের ভাণ দেখাতে শুরু করে বলল— দ্যাখ, অনেকবারই তো তোমার কর্তাকে সাবধান হতে বলেছি। তা তিনি তো আমার কোন পরামর্শই শুনতে চাননি, আমি আগেই জানতাম তাঁর সর্বনাশ হতে আর দেরী নেই— দুপুরে তাঁর বাড়িতে খেতে খেতে বলেছি। রাতের ভোজনের সময়েও বলেছি যে, একটু বুঝেসুজে খরচ করুন। কথাটা আংশিক সত্যি সন্দেহ নেই, কেননা লুকুলাসের দু'বেলা খেতে যাওয়াটা ঠিকই বটে কিন্তু বন্ধুর মত পরামর্শ সে কখনও দেয়নি। বরং কী পাওয়া যায় প্রতিদিন তারই হিসাব করেছে। এই মিথ্যাবাদী বন্ধুটি তাই তার মিথ্যার মুখোশটি রক্ষা করার জন্য টিমনের ভৃত্যের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বলল— যাও তোমার কর্তাকে গিয়ে বল লুকুলাস বাড়িতে নেই।

যেমন লুকুলাস তেমনি লুসিয়াস। তার কাছে লোক যাওয়ামাত্র সে তো অবাক। এককালে টিমনের টাকায় সে অনেক স্ফূর্তি করেছে। টিমনের কাছে অনেক মূল্যবান উপহার সংগ্রহ করেছে। কিন্তু আজ যে মুহূর্তে সে শুনল যে টিমনের ধনভাণ্ডার শূন্য এবং দেখল টিমনই তার কাছে ঋণ চেয়ে লোক পাঠিয়েছেন তখন সে মাথা চুলকাতে লাগল। একটা মিথ্যা কথা তার মাথায় আসতে দেরী হল না। সে টিমনের ভৃত্যের কাছে বলল— তাইত ভারী মুস্কিলে ফেললে। আমি এই গতকালই একটা বড় রকমের কেনাকাটা করে হাতের টাকা সবই খরচ করে ফেলেছি। বড় খারাপ লাগছে, নিজেকে বড় হীন মনে হচ্ছে যে টিমনের মত এমন একজন মানুষের বিপদের সময় তার জন্যে কিছু করে উঠতে পারলাম না।

অথচ একদিন এই লুসিয়াসের জন্যে টিমন কী না করেছেন? তার যা কিছু ধনসম্পদ, দাসদাসী, বাড়িঘর, মানসম্মান সবকিছুরই মূলে টিমনের দান। আর আজ সেই লুসিয়াসই এমন অকৃতজ্ঞের মত আচরণ করল। যে সামান্য টাকা টিমন তার কাছে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন তার চেয়ে কতগুণ বেশী যে সে তাঁর কাছে লাভ করেছে তার পরিমাপ করা শক্ত—যা সে পেয়েছে তার তুলনায় আজ যেটুকু তাকে দিতে

হত তা একটা ভিখারীকে দেওয়ার মতই যৎসামান্য ভিক্ষার দান। তাও সে দিল না।

ঠিক এমনি করে সেমপ্রোনিয়াস এবং অন্যান্য যাবতীয় বন্ধুবান্ধব টিমনের অনুরোধ এড়িয়ে গেল নানা অছিলায়—কেউবা পাশ কাটানোর জন্যে মিথ্যার আশ্রয় নিল। কেউবা সরাসরি টাকা দিতে অস্বীকার করল। এমনকি যে ভেনটিডিয়াসকে একদিন টিমন জেলখাটা থেকে বাঁচিয়েছিলেন আজ তার প্রভূত অর্থ থাকা সত্ত্বেও সে মাত্র পাঁচটি ট্যালেন্ট দিতে অস্বীকার করল, অথচ ঐ টাকাটাই টিমন একদিন তাকে দিয়েছিলেন, ধার নয়— নিছক দান।

এতদিনে টিমনের চোখ খুলল— তিনি বুঝলেন সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়, কিন্তু অসময়ে শুধু হায় হায়ই করতে হয় — কেউ এসে পাশে দাঁড়ায় না। বন্ধুরা একে একে সকলেই গা ঢাকা দিল— কেউ আর তার বাড়িতে আসে না। একদিন যারা দিনরাত তাকে ঘিরে থাকত, তাঁর প্রশংসায় সর্বদাই পঞ্চমুখ ছিল তাঁকে ভূষিত করেছিল নানা বিশেষণে— দরাজ, মুক্তহস্ত, দানবীর ইত্যাদি — আজ তারাই উলটো সুরে গাইতে আরম্ভ করল। বলল— লোকটা একেবারেই আহাম্মক। টাকা নিয়ে অমন ছিনিমিনি খেললে তাকে নিরেট ছাড়া আর কীই বা বলা যায়, লোকটা নেহাৎই বোকা ইত্যাদি। কিন্তু তাদের একবারও মনে হল না যে টিমনের সব অর্থই ব্যয় হয়েছিল তাদের মত অকৃতজ্ঞদের জন্যেই। টিমনের বাড়ি এখন পরিণত হল পোড়ো বাড়িতে, কেউ আর সে বাড়ির পথ মাড়ায় না। কী বা আছে সেখানে? না আছে খাদ্যের ছড়াছড়ি, না আছে মদের ফোয়ারা। এখন শুধু সেখানে দিনরাত পাওনাদারের আনাগোনা— সুদখোরের চোখরাঙানী—মামলা মোকদ্দমা, বন্ধক, মালক্রোক ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি। টিমনের নিজের বাড়িই এখন তাঁর কাছে জেলখানার চেয়েও ভয়ঙ্কর। তাঁর দেহের সবটুকু রক্তও যদি বিন্দু বিন্দু করে দেনাশোধের জন্যে দেওয়া যায় তবুও সেই পাহাড়প্রমাণ ধার সারাজীবনে শোধ হবে না।

আর ঠিক এই আশাভরসাহীন অপার দৈন্যদশার মধ্যে হঠাৎ একদিন সবার কাছে অদ্ভুত লাগল যখন দেখা গেল আবার টিমনের বাড়িতে উৎসবের আলো জ্বলে উঠেছে—সূর্যাস্তের মুহূর্তে আবার যেন নতুন করে সূর্যোদয় দেখা দিয়েছে। টিমন আরো একবার তাঁর বাড়িতে যাবতীয় পুরনো বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ জানালেন পানভোজনের উৎসবে যোগ দিতে —এথেন্স-এর যত অভিজাত ও সৌখীন নাগরিক তাদের সবাই সেখানে নিমন্ত্রিত। লর্ড লুসিযাস, লুকুলাস, ভেনটিডিয়াস, সেমপ্রোনিয়াস ইত্যাদি সকলেই এসে জড়ো হল। মনে মনে তারা বড় আফশোষ করতে লাগল, টিমন তাদের পরীক্ষা করার জন্যেই নিশ্চয়ই গরীব সেজে তাদের কাছে টাকা ধার চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তখন বোঝা উচিত ছিল টিমনের ঐশ্বর্য ফুরিয়ে

যাওয়ার নয়— ঐ সামান্য টাকাটা তখন পাঠিয়ে দিলেই আজ মুখ রক্ষা হত এবং আরো বেশি করে টিমনের দাক্ষিণ্য পাওয়া যেত। তা যা হয়ে গেছে তার জন্যে আর আফশোষ করে লাভ নেই— এখনকার মত নগদ যা পাও হাত পেতে সেটুকুই নিয়ে নেওয়া যাক। তাবা টিমনকে দেখে একটু লজ্জার ভাব দেখিযে বলল— কী বিপদেই যে পড়েছিলাম। তাই আপনার মান রাখতে পারিনি— একেবারেই কপর্দকশূন্য অবস্থা যাচ্ছিল ইত্যাদি। টিমন বললেন, আরে ওসব সামান্য কথা এখন থাক। আমি কিছুই মনে করিনি। নির্লজ্জ বন্ধুবান্ধবের দল মনের আনন্দে ভাবতে লাগল আবার বুঝি সুদিন ফিরে এল। এরা সবাই বসন্তের কোকিল, শীতে এদের ডাক শোনা যায় না —এরা সুখের পায়রা, দুঃখের দিনে এরা আর আসে না।

ভোজের জন্য সব কিছু প্রস্তুত। টেবিলের উপর রাশি রাশি পেয়ালা এনে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে— গরম গরম খানা-চাপা দেওয়া ঢাকনার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখা যাচ্ছে—সবাই ভাবল— এ সেই একই টিমন, যার ঐশ্বর্য অফুরন্ত।

একটু পরেই টিমনের সংকেত অনুসারে ভৃত্যেরা খাবারের ঢাকা খুলে দিল— সকলের জিভে জল এসে গিয়েছিল বুঝি কত না মুখরোচক খানা — খানার পরিবর্তে দেখা গেল পাত্রের মধ্যে শুধু গরম করা বিশুদ্ধ জল এবং তারই থেকে উঠছিল ঐ ধোঁয়া। এই খানাই অবশ্য টিমনের বর্তমান অবস্থার মত প্রকৃত ব্যবস্থা — আর তাছাড়া যে অতিথিরা সেখানে উপস্থিত হয়েছিল তাদের হৃদয়ের তারল্যের সঙ্গেও এর সঠিক মিল ছিল। টিমন এর পর ঐ উষ্ণজলসমেত পাত্রগুলি ছুঁড়ে দিলেন ঐ অভ্যাগতদের চোখেমুখে— আর দূর দূর করে গালাগালি করতে করতে তাদের তাড়া করলেন। তারা এ ওর ঘাড়ে পড়তে পড়তে পালাতে পথ পায় না— কারো বা পায়ের চটি খসে পড়ে রইল, কারো বা গাউন, আবার কারো বা এই তাড়াহুড়োতে খোয়া গেল কানের দুল, গলার হার। আগে তো প্রাণ— তারপর অন্য সব— টিমনের এমন ভয়ঙ্কর মারমুখী মূর্তি তারা আগে কখনো দ্যাখেনি। আর এহেন ভোজের প্রহসনের কথাও তারা অনুমান করতে পারেনি।

টিমনের বাড়িতে তাঁর দেওয়া এইটিই সর্বশেষ ভোজোৎসব। এর পর তিনি এথেন্সনগরী ও তার জনমানবের যাবতীয় সংসর্গ ত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন অরণ্যে— শুধু এথেন্স বা তার মনুষ্য নয়, তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন সমগ্র মানবসমাজ থেকে— ঘৃণায় ও বীতরাগে। তিনি মনে মনে কামনা করতে লাগলেন কবে এই ঘৃণ্য নগর পরিণত হবে ধ্বংসস্তূপে— কবে এর অট্টালিকাসমূহ চুরমার হয়ে ধ্বসে পড়বে একে একে— কবে এর মানুষেরা রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য অথবা যুদ্ধের বিভীষিকায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে। করুণাময় ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা করলেন—হে ঈশ্বর, ঐ নগরীতে যত মানুষ—হোক তারা অসহায় বৃদ্ধ বা শিশু, ধনী বা দরিদ্র তাদের সকলেরই যেন সর্বনাশ হয় মহাপ্রলয়ে। এই অভিসম্পাত

করে টিমন চলে গেলেন বনের গভীরে— মনে মনে বললেন হিংস্র পশুরাও এই মানুষের চেয়ে সহস্রগুণে ভাল। তিনি নিজের পরিধানের পোশাক পরিচ্ছদ সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন— নগ্নতার মূর্তিতে সভ্যতার সংস্পর্শ থাকে না। নিজের জন্যে মাটি খুঁড়ে তার নীচে একটি গুহা বানিয়ে শুরু করলেন তার নতুন জীবন— বনের ফলমূল হল তার আহার্য। শীর্ণ তটিনীর জল তাঁর পানীয়— পশুরা তাঁর সঙ্গী—মানুষের চেয়ে তারা বিশ্বাসী, নিরাপদ।

কী বিস্ময়কর এই পালাবদল। একদিন যে টিমন লর্ড টিমন নামে সবার কাছে আদরণীয় আজ সেই টিমনই নিরাবরণ নগ্ন—নরবিদ্বেষী। আজ কোথায় তাঁর স্তাবকের দল? কোথায় গেল তাঁর দাসদাসী আজ্ঞাবহ কর্মচারীবৃন্দ? আজ বুঝি কেবল শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে বয়ে এসে অপেক্ষা করছে তাঁর আজ্ঞাপালনের জন্যে? বুঝি ঐ খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বৃক্ষগুলি তাদের শ্যামল পাতাগুলি হাওয়ায় দুলিয়ে তাঁর সামনে তুলে ধরছে তাঁর আদেশলিপি লেখার জন্যে। বুঝি শীতের দাপটে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে জমে যাওয়া নদীর জল তাঁর সামনে নিয়ে আসছে উষ্ণ পানীয়? না কী ঐ অরণ্যের বন্য প্রাণীগুলি তাঁর কাছে এসে হাত পা চেটে দিয়ে তাঁর স্তাবকতায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে?

একদিন ভারী একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। নিত্যকার মত আহারের খোঁজে টিমন ঐ বনের মধ্যে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিলেন। গাছের ফলমূলই তাঁর আহার্য। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ তাঁর কোদালের মাথায় যেন ভারী একটা কিছুর চোট লাগল। টিমন আস্তে আস্তে মাটি সরিয়ে দেখলেন রাশি রাশি সোনার তাল অতি যত্নে সেখানে রক্ষিত আছে। আসলে এই স্বর্ণরাশি ঐ বনে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল এক কৃপণ ধনীব্যক্তি। তার পরিকল্পনা ছিল যথাসময়ে ঐ নিরাপদ স্থান থেকে সে তার সম্পদ তুলে নিয়ে আসবে। কিন্তু তার ভাগ্যে আর সে অবকাশ আসেনি. কেননা ইত্যবসরেই তার মৃত্যু ঘটে। কৃপণ লোকটি চুরি যাওয়ার আশঙ্কায় তার ঐ গুপ্তধনের কথা কারো কাছেই জানায়নি। অতএব তার মৃত্যুর পর ঐ বিশাল সম্পদ মাটির নীচেই রয়ে গিয়েছিল— জননী ধরিত্রীর গর্ভে—পৃথিবীর কোন মঙ্গল অথবা অমঙ্গল এ পর্যন্ত তার দ্বারা সাধিত হয়নি। টিমনই যেন তার ঘুম ভাঙ্গালেন, একেবারেই অকস্মাৎ এবং ঐ ঐশ্বর্য এখন টিমনের নিজস্ব।

এই ঐশ্বর্য টিমনের একার। তিনি যদি চান তবে এখন আবার নিজের দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর সেই পুরনো জীবন ফিরে পেতে পারেন। সমস্ত ঋণ শোধ করে আবার সেই বন্ধু-বান্ধবের সমাগমে উৎসবমুখর সেই গৃহ ও বিলাসের সেই জীবনযাত্রা। কিন্তু সেই জীবনযাত্রার প্রতি আসক্তি তাঁর চিরদিনের জন্যে শেষ হয়ে গেছে। প্রপঞ্চময় পৃথিবীর প্রতি তাঁর আর বিন্দুমাত্র মোহ নেই— আর ঐশ্বর্য এখন তাঁর কাছে বিষের মত ভয়ঙ্কর। তিনি ভাবলেন এই অনর্থের মূল যেখানে ছিল

সেখানেই সে আবার চাপা দিয়ে রেখে দেবেন। এই সম্পদ টেনে বের করে (প্রথমে তাঁর তাই মনে হয়েছিল) আনার ফলে তো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে চুরি, ডাকাতি, অন্যায়, অবিচার, উৎকোচ ও হাজার রকমের দুর্নীতি।

টিমন যখন এইসব কথা ভাবছেন তখন তিনি দেখতে পেলেন ঐ জঙ্গলের পথ দিয়ে এথেন্স-এর একদল সৈন্য কুচকাওয়াজ করে চলেছে, আর তাদের নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে চলেছেন বিখ্যাত সেনাপতি অ্যালকিবিয়াডেস। এথেন্স-এর যারা সেনেটর বা শাসকগোষ্ঠী তাদের বড় দুর্নাম ছিল যে তারা সেনাধ্যক্ষ কিংবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের প্রতি প্রায়ই অপমানজনক আচরণ করতেন। অ্যালকিবিয়াডেসের মত সেনাপতিকেও তারা ঐ রকম অসম্মান দেখান। অ্যালকিবিয়াডেসের সৈন্যদল বরাবরই যুদ্ধক্ষেত্রে এথেন্স-এর মুখ রক্ষা করেছে। তাই অপমানিত অ্যালকিবিয়াডেস প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তার সেই বিজয়ী সৈন্যদল নিয়ে চলেছিলেন সেনেটরদের সমুচিত শিক্ষা দিতে।

টিমন দেখলেন এই তাঁর উপযুক্ত অবকাশ। ভূমিতলে প্রোথিত ঐ সমগ্র স্বর্ণভাণ্ডার তিনি তুলে দিলেন অ্যালকিবিয়াডেসের হাতে। তাঁকে অনুরোধ করলেন ঐ সম্পদ তিনি যেন তাঁর সৈন্যদের বেতনে ব্যয় করেন এবং তাঁর সেনাবাহিনী দ্বারা যেন এথেন্স নগরীকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করেন। একটি মানুষও যেন রক্ষা না পায়—যেন নির্বিচারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় শহরের পথে পথে, হত্যা করা হয় নারী শিশু বৃদ্ধ নির্বিচারে। তিনি বৃদ্ধদেরও রেহাই দিতে চান না। কেননা তারা তো সবাই পরস্বাপহরণকারী; শিশুদের জীবন রক্ষা করতে চান না, কেননা তারাই তো একদিন বড় হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। মানুষকে প্রতারণা করবে। যেন কোন কান্না, কোন হাহাকারের ফলে অ্যালকিবিয়াডেসের মনে করুণার উদ্রেক না হয়—যেন সমস্ত নগরী একটা শ্মশানের ভস্মস্তূপে পরিণত হয় কেউই থাকবে না বিজেতা অ্যালকিবিয়াডেসেরও শেষ পরিণতি হবে সেই ভস্মে। টিমনের অন্তরে এমনিই বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত ছিল তার দেশ এথেন্স-এর বিরুদ্ধে।

মনুষ্যসমাজ থেকে দূরে গভীর অরণ্যের মধ্যে বন্যপশু পরিবৃত হয়ে এমনই পশুর মত জীবন যাপন করছিলেন টিমন। এমন সময় একদিন হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন কে যেন অত্যন্ত বিনয় ও আনুগত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর দেখা পাওয়ার আশায়। টিমনের চিনতে অসুবিধা হল না এ সেই প্রভুভক্ত দেওয়ান ফ্লেবিয়াস। সে তার প্রভুর সন্ধানে পথের সব কষ্ট ও দুঃখ বরণ করে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে— সে চায় আজও সে সেবা করবে তার প্রভুকে। কিন্তু তাঁকে দেখামাত্র তাঁর মনে হল— এই কী সেই টিমন একদিন যাঁর মহানুভবতার জন্যে মানুষ তাঁকে মাথায় তুলে রেখেছিল— আর আজ এ কী অবর্ণনীয় দুরবস্থা সেই টিমনের— ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যে নগ্নতা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন আজও

আবার তেমনি নগ্ন, বন্য পশুদের মধ্যে বাস করছেন যেন একটি পশুর মত—তাকে দেখলে মনে হয় একদিনের সেই শ্রেষ্ঠ মানুষটির এ এক ভয়াবহ ধ্বংসাবশেষ—এক অতি করুণ স্মৃতিসৌধ। ফ্লেবিয়াস চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই দৃশ্য তাকে যুগপৎ দুঃখ ও ভয়ে বাক্‌হারা করে দিল। অবশেষে যখন সে কথা বলতে সক্ষম হল তখন তার চোখের জলে ও কান্নায় সব কথাই যেন কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেল। টিমন তার কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর সন্দেহ হল বুঝি বিশ্বাসঘাতক মানুষদের কেউ আবার এসেছে তার সর্বনাশের জন্যে। তার চোখের জল ছলনামাত্র। ফ্লেবিয়াস তার সাধ্যমত যত প্রকারে সম্ভব প্রভুর কাছে নিজের পরিচয় দিতে লাগল—টিমন কিছুতেই তাকে চিনতে পারেন না। মানুষের প্রতি এমনই তাঁর বীতরাগ। অবশেষে বহু অনুনয় বিনয় ও বহু কষ্টে ফ্লেবিয়াস টিমনকে বোঝাতে সক্ষম হল সে ফ্লেবিয়াস—তাঁর বিশ্বস্ত দেওয়ান। টিমন তাকে চিনলেন। কিন্তু তার সংস্পর্শে তিনি থাকতে চাইলেন না—কারণ, তার আকৃতি মানুষের এবং তার কণ্ঠস্বর মানুষের। মানুষের ছায়ামাত্র এখন আর টিমনের ভাল লাগে না—তাঁর মনে ঘৃণার উদ্রেক করে।

দীন ও নগণ্য ফ্লেবিয়াস ফিরিয়ে দিলেন টিমন। তাঁর এই বন্য জীবনের একাকীত্ব তিনি ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন। কিন্তু ফ্লেবিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ না হতেই সেই অরণ্যের নীরবতা ভঙ্গ করে সেখানে এসে দলে দলে উপস্থিত হল এথেন্স নগরীর যত অভিজাত নরনারী। তারা আজ অনুতপ্ত হয়ে শরণাপন্ন হয়েছে টিমনের কাছে তাদের মহা দুর্দিন থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায়। অ্যালকিবিয়াডেস তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে হানা দিয়েছেন নগর প্রাকারের বাইরে—যে কোন মুহূর্তে তিনি তার দুর্ধর্ষ সেনাদল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন নগরের অভ্যন্তরে এবং ভেঙ্গে চুরমার করে দেবেন যাবতীয় হর্ম্যরাশি, হত্যালীলায় রক্তাক্ত হবে নগরের পথ প্রান্তর। টিমনই ছিলেন একদিন এথেন্স এর সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং একমাত্র তাঁরই পক্ষে সম্ভব ঐ দুর্ধর্ষ অ্যালকিবিয়াডেসকে প্রতিরোধ করা। অতীত দিনের সেই টিমনের স্মৃতি আজও এথেন্সবাসীর মনে আছে। তাই তারা আজ টিমনের শরণাপন্ন।

অথচ একদিন টিমনের দুর্দিনে এরা অকৃতজ্ঞের মত সকলেই তাকে ত্যাগ করে গিয়েছিল। এথেন্স-এর বাছাই করা সেনেটরদের এক প্রতিনিধি দল এসেছেন দেশের দুর্দিনে টিমনের সাহায্যের আশায়। একদিন টিমনের প্রতি তাঁরা যে দুর্ব্যবহার করেছিল বোধ করি সেই অধিকারেই তারা আজ তাঁর সাহায্যপ্রার্থী।

অনুনয় বিনয় কিংবা কাতর প্রার্থনার আর শেষ নেই। তাঁরা আজ টিমনকে সব দিতে প্রস্তুত—ধনরত্ন, মানসম্মান এবং ক্ষমতা। আজ টিমন তাঁদের যা করতে বলবেন তাঁরা তাই করতে প্রস্তুত—শুধু একটিবারের জন্যে যদি টিমন এথেন্সে ফিরে গিয়ে তাঁদের প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু কী লাভ? শত অনুনয়েও আজ আর

টিমনের অন্তর দ্রবীভূত হয় না। সেই মহানহৃদয় টিমন আজ হারিয়ে গেছে। তার পরিবর্তে যে টিমন এথেন্স-এর সেই প্রতিনিধিদলের সামনে দাঁড়িয়ে সে টিমন বস্ত্রহীন নগ্ন, সে এক নরবিদ্বেষী— আজ আর তার মধ্যে অতীত দিনের সেই সাহসী ও বীর দেশপ্রেমিককে খুঁজে পাওয়া যায় না। অ্যালকিবিয়াডেস যদি তার দেশের মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাতে কিছুই এসে যায় না টিমনের, যদি গোটা এথেন্সনগরী ধূলিসাৎ হয় টিমনের তাতে দুঃখ নেই, যদি শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে অ্যালকিবিয়াডেস ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে তাতেও টিমনের মহা আনন্দ। এথেন্স এর মূল্য তার কাছে আজ কানাকড়িও নয়।

প্রতিনিধিবর্গের কাতর প্রার্থনা ও অনর্গল ক্রন্দনের উত্তরে টিমনের কাছে তাঁরা এই কথাগুলিই শুনতে পেলেন। টিমন তাঁদের বললেন ফিরে যেতে। তবে ফিরে যাওয়ার মুখে তাদের ডেকে বললেন— আমার এই কথাগুলি গিয়ে দেশের মানুষের কাছে বলুন। তবে হ্যাঁ, এই ঘোর সংকট মোচনের আংশিক উপায় থাকলেও থাকতে পারে। এবং অ্যালকিবিয়াডেসের রোষ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটা পথ পাওয়া যেতে পারে। আমি সেই পন্থাটি বলে দেব, কেননা, আজও আমার দেশের মানুষের জন্যে যে সামান্য মায়ামমতাটুকু অবশিষ্ট আছে তার ফলে মৃত্যুর আগে আমি তাদের জন্যে সেই উপকারটুকু করে যেতে চাই। একথা শোনার ফলে প্রতিনিধিদলের নাগরিকদের মনে আর একবার নতুন করে আশার সঞ্চার হল। তাঁরা মনে করলেন হয়তো টিমনের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছে। এর পর টিমন তাঁদের বললেন, তাঁর গুহার মুখে একটি বড় গাছ আছে এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এ গাছটিকে তিনি কেটে ফেলবেন মনস্থ করেছেন। প্রতিনিধিদের ডেকে তিনি বললেন— সকলে আসুন, এথেন্স থেকে যে সেখানে আছেন সকলে এসে ঐ গাছটিকে কেটে ফেলতে সাহায্য করুন। তাহলে অ্যালকিবিয়াডেসের হাত থেকে আপনারা নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেন। টিমনের একথা বলার আসল উদ্দেশ্য ঐ গাছটিতে উদ্বন্ধন দ্বারা মৃত্যুই তাদের বাঁচাতে পারে অ্যালকিবিয়াডেসের হাতে মৃত্যু থেকে।

এইটিই দেশবাসীর প্রতি অথবা মানবজাতির প্রতি আজীবন টিমনের যে উদার দাক্ষিণ্য তার সর্বশেষ উপহার এবং এদিনের সাক্ষাৎই দেশবাসীর কাছে তাঁর শেষ সাক্ষাৎ। কেননা, এই ঘটনার বহুদিন পরে টিমনের সেই অরণ্য থেকে কিছু দূরে সমুদ্রোপকূলে চলতে চলতে অকস্মাৎ একদিন অতি নগণ্য এক সৈনিকের চোখে পড়ে ঐ সাগরের জলের ধার ঘেঁষে একটি সমাধি যার উপর খোদিত আছে টিমনের নাম— আর লেখা আছে: নরবিদ্বেষী টিমন যতদিন বেঁচে ছিল সে ঘৃণা করত যাবতীয় জীবিত মানুষকে, আর যখন সে মারা যায় তখন এই কামনা নিয়ে সে মরেছিল যেন জঘন্য ও নীচ মানুষের উপর নেমে আসে সর্বনাশ।

টিমনের মৃত্যু কবে অথবা কেমন করে হয়েছিল সেকথা কেউই জানে না।

কেউই বলতে পারে না সে আত্মঘাতী হয়েছিল কী না অথবা দিনের পর দিনের মানুষের প্রতি ঘৃণা ও বিমুখতার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই তার দেহ শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল কী না। তবে তার এই সমাধি ফলকের প্রতি যাদেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তারা সকলেই উপলব্ধি করেছে ঐ করুণ পরিণতিই টিমনের জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি— মানুষের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত ঘৃণার এটাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কারো কাছে বা আবার ঐ সমুদ্রের জলের কাছাকাছি সমাধিটির নির্মাণ হওয়াতে মনে হয়েছে সীমাহীন সমুদ্র চিরকাল তার বারিরাশি নিয়ে অশ্রুপাত করবে ঐ ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষটির সমাধির উপর। সমুদ্রের সেই অশ্রু যেন জাগতিক মানুষের শঠ ও কৃত্রিম অশ্রুবিসর্জনের প্রতি অবজ্ঞার প্রকাশ।

পেরিক্লিস, প্রিন্স অব টাইয়ার

টাইয়ারের অধিপতি পেরিক্লিস। তাঁর নিজের দেশ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিতে হয়েছিল পেরিক্লিসকে। তাঁর অপরাধ তিনি জেনে ফেলেছিলেন দুশ্চরিত্র গ্রীক সম্রাট অ্যান্টিয়োকাসের এক অতি গোপণ কৃতকর্মের কথা। অতি জঘন্য ও হীন সে কাজ। এর ফলে গ্রীক সম্রাটের রোষ পড়ে সমগ্র টাইয়ার নগরীর উপর। প্রতিহিংসার ফলে ঐ নগরীর যাবতীয় প্রজাপুঞ্জকে ধ্বংস করতে তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন। খ্যাতি ও সম্মানের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের গোপণ অপরাধের সন্ধান পাওয়া এমনি করেই সর্বত্র বিপদ ডেকে আনে। কাজেই পেরিক্লিসের আর গত্যন্তর রইল না। গ্রীক সম্রাট অ্যান্টিয়োকাসের রোষ থেকে তাঁর দেশকে রক্ষা করার জন্যে তিনি রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে গেলেন তাঁর অতি সৎ ও দক্ষ সচিব হেলিকেনাসের উপর। টাইয়ারের সমুদ্র-উপকূল থেকে জাহাজ ভাসল পেরিক্লিসের —যতদিন না গ্রীক সম্রাটের রোষ প্রশমিত হয় ততদিন তাঁর নির্বাসন দেশান্তরে।

সমুদ্রযাত্রার প্রথম পর্যায়ে পেরিক্লিসের পৌছানোর লক্ষ্য হল টারসাস নগরী। টারসাসে ঐ সময়ে চলছিল খাদ্যাভাবে এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। অতএব পেরিক্লিস স্থির করলেন ঐ নগরীর দুর্দশা মোচনের জন্যে তিনি তাঁর জাহাজে নিয়ে যাবেন প্রভূত খাদ্যসম্ভার। জাহাজ গিয়ে টারসাসের ঘাটে পৌঁছল। পেরিক্লিসের চোখে পড়ল শহরের পথে ঘাটে সর্বত্র জীর্ণ শীর্ণ মানুষের দল, খাদ্যের অভাবে তাদের অসহায় রূপ। নগরীর শাসনকর্তা ক্লিয়ন জাহাজঘাটে এসে মহাসমাদরে পেরিক্লিসকে অভ্যর্থনা জানালেন — সবার মনে হল পেরিক্লিস যেন ঈশ্বরপ্রেরিত দূতের মতই তাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরই ভাণ্ডারে আছে প্রাণরক্ষার উপযোগী খাদ্য। টারসাসে কিন্তু পেরিক্লিসের বেশি দিন থাকা হয়ে উঠল না। তাঁর বিশ্বস্ত সচিব গোপণে তাঁকে সংবাদ পাঠালেন যে গ্রীক সম্রাট জেনে গিয়েছেন পেরিক্লিসের টারসাসে থাকার সংবাদ এবং তিনি গুপ্তচর পাঠিয়েছেন গোপণে তাঁর জীবননাশের উদ্দেশ্যে। অতএব টারসাসের দিন শেষ হল — পেরিক্লিসের আবার শুরু হল সমুদ্রযাত্রা। তাঁর বিদায় কালে সমগ্র টারসাস নগরীর মানুষ কৃতজ্ঞতাভরে তাঁর জয়গান করল এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল তার শুভযাত্রার কামনায়।

পেরিক্লিসের যাত্রা কিন্তু শুভ হল না — কেননা সমুদ্রে জাহাজ ভাসানোর অল্পকালের মধ্যেই তাঁর জাহাজ পড়ল এক প্রবল ঝড়ের মুখে। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল তাঁর জাহাজ —একটিও প্রাণী বেঁচে রইল না — শুধু পেরিক্লিস নিজে সর্বস্বান্ত অবস্থায় নগ্ন দেহে সেই উত্তাল তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে কোনক্রমে গিয়ে পৌঁছলেন এক অজানা সমুদ্র-উপকূলে। ঐ উপকূলে অজানা পথে কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল একদল দরিদ্র মানুষের।

তাঁরা একটি জেলের দল — মাছ ধরাই যাদের উপজীবিকা। ঐ দরিদ্র মানুষেরা অত্যন্ত আদরে পেরিক্লিসকে নিয়ে গেল তাদের থাকার জায়গায়, তাদের কুঁড়েতে। সেখানে গিয়ে তারা পরম যত্নে তাঁকে পরিধানের উপযোগী বস্ত্র দিল ও তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্য এনে দিল।

মৎস্যজীবীরা পেরিক্লিসকে বলল তাদের দেশের নাম পেন্টাপোলিস এবং তাদের রাজা সাইমোনিডেস —সাইমোনিডেস সবার কাছে পরিচিত ছিলেন সাধু সাইমোনিডেস নামে। সাইমোনিডেসের এই খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর সুষ্ঠু সরকার পরিচালনা ও দেশের সর্বত্র শান্তির পরিবেশ। ঐ মৎস্যজীবীদের মুখে পেরিক্লিস আরও শুনলেন যে রাজা সাইমোনিডেসের এক অতি অপূর্ব সুন্দরী কন্যা আছে, নাম তার থেয়িসা এবং আগামীকালই ঐ কন্যার জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজসভায় আয়োজন করা হয়েছে মহাসমারোহে এক অসিযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগদান করতে ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে দেশ বিদেশের রাজকুমার ও বীরযোদ্ধারা, কেননা প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীরের কণ্ঠে মাল্যদান করবে তিলোত্তমা সুন্দরী থেয়িসা। পেরিক্লিস যখন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শুনলেন তখন স্বভাবতই তাঁর মন ভরে উঠল বিষাদে, কেননা জাহাজডুবির ফলে তিনি তাঁর যুদ্ধ করার বর্মটি হারিয়েছিলেন, নতুবা ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনিও অংশ নিয়ে নিজের বীরত্বের পরিচয় দিতে পারতেন। পেরিক্লিসের এই বিষন্নতার মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হল একজন জেলে। সে জাল নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল এবং তার জালে উঠেছিল ঐ বর্ম। পেরিক্লিস দেখে অবাক হলেন সেটি তাঁরই সন্নাহ, যা ডুবে গিয়েছিল জাহাজডুবির ফলে। পেরিক্লিসের মন আনন্দে ভরে উঠল — তিনি তাঁর ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলেন, কেননা, ঐ সম্পদ তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর পিতার কাছে এবং ওটি তাঁর এতই প্রিয় ছিল যে তিনি যখনই যেখানে যেতেন ঐ বর্ম সর্বদাই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাঁর মনে হল যে —সমুদ্র সেদিন উত্তাল হয়ে তাঁর ঐ মহামূল্য ধন কেড়ে নিয়েছিল আজ শান্ত হওয়ার ফলে সেই সমুদ্রই তাঁকে ফিরিয়ে দিল তাঁর সেই প্রিয় বস্তুটি। পিতার দেওয়া সেই হারানো ধন ফিরে পাওয়াতে তিনি সমুদ্রের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জানালেন এবং জাহাজ-ডুবির দুর্ভাগ্যকে আর তাঁর কাছে কিছুমাত্র দুঃখের বলে মনে রইল না।

পরের দিনেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিযোগিতা। পেরিক্লিস তার দুর্ধর্ষ বীর পিতার সেই বর্মে নিজেকে সুসজ্জিত করে যোগ দিলেন সাইমোনিডেসের রাজসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মল্লভূমিতে। একের পর এক বীরযোদ্ধাদের তিনি পরাজিত করলেন তার দুর্দমনীয় সাহস ও অস্ত্রচালনার কৌশলে। বীরশ্রেষ্ঠ বলে তাঁকে সম্মানিত করা হল সমাগত প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে। ঐ দেশের তৎকালীন রীতি অনুসারে প্রতিযোগিতার শেষে শ্রেষ্ঠ বীর লাভ করতেন রাজকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণের অধিকার। পেরিক্লিসের

ক্ষেত্রেও এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটল না। রাজকন্যা এগিয়ে এলেন। পরাজিত সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের তিনি বিদায় জানিয়ে জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন পেরিক্লিসের কণ্ঠে — সেদিনের সেই জয়মাল্যই পেরিক্লিসের বরমাল্য —তিনিই সেদিনের আনন্দসভার রাজাধিরাজ। পেরিক্লিসের অন্তরও সুখ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হল —রাজকুমারীকে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর মনে হয়েছিল সুন্দরী দেবীপ্রতিমা বলে।

রাজা সাইমোনিডেসও বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন পেরিক্লিসের বীরত্বে। এ ছাড়াও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এই যুবকের মধ্যে সুরুচি ও সুশিক্ষার যাবতীয় গুণের সমন্বয়। কিন্তু পেরিক্লিসের বংশপরিচয় তো অজ্ঞাত। তিনি যে একজন রাজপুত্র সেই আত্মপরিচয় বাধ্য হয়েই পেরিক্লিসকে গোপণ রাখতে হয়েছিল গ্রীক সম্রাট অ্যান্টিয়োকাসের ভয়ে — তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন টাইয়ার নগরী একজন ভদ্রবংশীয় নাগরিক হিসাবে। সে সত্ত্বেও রাজা সাইমোনিডেস নিজের জামাতারূপে পেরিক্লিসকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না — তাঁর কন্যার মনে এই যুবকের প্রতি প্রেমের উন্মেষ। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কন্যার প্রেমই তাঁকে এ বিষয়ে মনস্থির করতে সাহায্য করেছিল।

সুন্দরী থেয়িসার সঙ্গে পেরিক্লিসের বিবাহিত জীবন সুখেই কাটছিল। কিন্তু খুব বেশিদিন অতিবাহিত না হতেই তাঁর কাছে গোপণ সংবাদ পৌঁছল যে গ্রীক সম্রাট অ্যান্টিয়োকাসের মৃত্যু ঘটেছে, অতএব এবার তিনি দেশে ফিরতে পারেন। এদিকে আবার তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে দেশের প্রজাপুঞ্জ ক্রমশই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে — তারা বিদ্রোহী হতে চলেছে, রাজার পরিবর্তে তারা তাঁর প্রতিনিধি হেলিকেনাসকে শূন্য রাজসিংহাসনে বসাতে চায়। পেরিক্লিসের কাছে এই সংবাদ গোপণে পাঠিয়েছিলেন হেলিকেনাস নিজেই, কেননা, তিনি ছিলেন অতি সৎ প্রকৃতির মানুষ ও প্রকৃত রাজভক্ত —রাজসিংহাসনের প্রতি তাঁর কোন আসক্তিই ছিল না। পেরিক্লিস আর কালবিলম্ব না করে সত্বর টাইয়ারে ফিরে আসুন ও তাঁর ন্যায়সম্মত অধিকার গ্রহণ করুন —এই ছিল হেলিকেনাসের ইচ্ছা। প্রজাদের অসহিষ্ণুতা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। সাইমোনিডেস যখন জানলেন তাঁর নবপরিণীতা কন্যার স্বামী যাকে তিনি মনে করেছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল একজন বীর মাত্র, সে প্রকৃতপক্ষে টাইয়ার রাজ্যের অধিপতি তখন তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। কিন্তু এই আনন্দের মুহূর্তে তাঁর মনে দুঃখও হল এই ভেবে যে, পেরিক্লিস যদি সাধারণ নাগরিক হতেন তবে আজ তাঁর স্নেহের কন্যাটিকে দূর দেশে পাঠাতে হত না। কিন্তু এখন তাকে পাঠাতেই হবে — সে এখন টাইয়ার রাজ্যের রাণী। অপর এক দুর্ভাবনায়ও সাইমোনিডেসের মন ভারাক্রান্ত হল। বিপদসঙ্কুল দূর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তবেই তাঁর কন্যাকে টাইয়ারে পৌঁছতে হবে —এদিকে তাঁর কন্যা সন্তানসম্ভবা। পেরিক্লিস এমতাবস্থায় নিজের স্ত্রীকে পেন্টাপোলিসে তার পিতার তত্ত্বাবধানে রেখে যেতেই চাইলেন —কিন্তু থেয়িসা

কিছুতেই স্বামীকে ছেড়ে থাকতে চাইল না —সে অনুনয় বিনয় করতে লাগল স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে। অগত্যা তার পিতা এবং স্বামী উভয়েই স্থির করলেন তার যাওয়াই শ্রেয় এবং তাঁরা মনে করলেন টাইয়ারে পৌঁছানোর আগে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা হয়তো থাকবে না।

মানুষ ভাবে এক হয় আর। হতভাগ্য পেরিক্লিসের প্রতি সমুদ্র নিতান্তই অশুভ শক্তির মত। টাইয়ারে পৌঁছানর অনেক আগেই তাঁর জাহাজ পড়ল আর এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে। সেই প্রবল ঝড়ের তাড়নায় আতঙ্কগ্রস্ত থেয়িসা একটি কন্যাসন্তান প্রসবান্তে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ তার সহযাত্রী ধাত্রী লাইকোরিডা এসে উপস্থিত হল পেরিক্লিসের কাছে। ধাত্রীর কোলে সেই নবজাত শিশু। পেরিক্লিসকে ধাত্রী জানাল ঐ শিশুটি প্রসবের মুহূর্তেই থেয়িসার মৃত্যু ঘটেছে — পেরিক্লিসের পত্নী আর জীবিত নয়। লাইকোরিডার কথাগুলি বড় করুণ। সে পেরিক্লিসকে বলল— এই নিন আপনার শিশুসন্তান—এই দুর্গম সমুদ্রের মত স্থানে একে বাঁচিয়ে রাখা বড় কঠিন। আপনার স্ত্রী থেয়িসা আর নেই। পত্নীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে যে মর্মবেদনায় পেরিক্লিস পীড়িত হয়েছিলেন ভাষায় তা বর্ণনাতীত — বহুক্ষণ নীরব থাকার পর তাঁর কণ্ঠ থেকে যে কথা শোনা গেলো তা-ও বড় মর্মান্তিক। তিনি বললেন — হে ঈশ্বর, কেন তুমি মানুষকে এমন মনের মতো সুন্দর বস্তু হাতে তুলে দিয়ে আবার নিষ্ঠুরের মতো ছিনিয়ে নাও। ধাত্রী লাইকোরিডা রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল — হে প্রভু, কেন আপনি এত উতলা হয়ে পড়ছেন? এই তো আপনার মৃতা স্ত্রী আপনার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন এই অপরূপ দান — এই ছোট্ট মেয়েটি —তার কথা ভেবেই আপনাকে এখন ধৈর্য ধরতে হবে — শক্ত হতে হবে। নবজাতককে পেরিক্লিস কোলে তুলে নিলেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, শান্ত হোক তোমার জীবন — এমন দুর্যোগের অশান্ত মুহূর্তে এই পৃথিবীর আর কোন শিশুর কখনও জন্ম হয়েছে কি না জানিনা। তোমার প্রকৃতি হোক কোমল ও শান্ত কেননা জন্মমুহূর্তে পৃথিবীর কাছ থেকে তুমি যে প্রাণহীন নির্দয় অভ্যর্থনা লাভ করেছ তেমন দুর্ভাগ্য আর কোন রাজশিশুর কখনও ঘটেনি। কামনা করি যেন তোমার আগামী দিনগুলি হয় সুখ ও আনন্দের, কেননা তোমার জন্মমুহূর্তেই ঘটে গিয়েছে চূড়ান্ত ভৎসনা —যতটুকু যন্ত্রণা মানুষ পেতে পারে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের চক্রান্তে। শুধু তাই নয় — তোমার জীবনের এই সূচনা মুহূর্তেই যে দুঃখের লিপি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছ তুমি —মাতৃহারা শিশুর যে দুরপনেয় দুর্ভাগ্য — তা তোমার সারাজীবনের সমগ্র আনন্দ ও পূর্ণতার বিনিময়ে শেষ হবার নয় — সে অভাব সারাজীবনই তোমার পিছনে ফিরবে।

অশান্ত ঝড় কিন্তু এখনও সমানেই বয়ে চলেছে — সমুদ্র এখনও ভয়ঙ্কর, উত্তাল তার জলরাশি। জাহাজের নাবিকদের মধ্যে একটি কুসংস্কার ছিল বদ্ধমূল

— তারা মনে করত যতক্ষণ জাহাজে কোনো মৃতের শব থাকে ততক্ষণ সমুদ্র কিছুতেই শান্ত হয় না। অতএব পেরিক্লিসের নাবিকেরা তাঁর কাছে এসে জানাল মৃতা রাণীর শব অবিলম্বেই জলে নিক্ষেপ করতে হবে। তারা বলল — ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন — প্রভু, আপনি নিজেকে শক্ত করুন, সাহসে বুক বাঁধুন। দুঃখবেদনা পীড়িতপেরিক্লিস বললেন — তোমরা সাহসের কথা আমাকে কী বলছ? ঝড়কে আমি আব ভয় পাই না, আমার যা কিছু ছিল সবই সে কেড়ে নিয়েছে — তবু এই অসহায় ছোট্ট শিশুটির মুখ চেয়ে —এই সদ্যোজাত সমুদ্রযাত্রীর মুখ চেয়ে — আমি চাই এই প্রলয় এবার প্রশমিত হোক — এই ঝড় থেমে যাক। নাবিকেরা তখন বলল — কিন্তু প্রভু, আপনার মৃতা রাণীর দেহ যতক্ষণ জাহাজে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঝড় তো প্রশমিত হবে না। ঝড় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, সমুদ্র যেন আরও উত্তাল হয়ে উঠছে, আব কালবিলম্ব না করে এখনই আপনার রাণীকে সলিল সমাধি দিতে হবে — নচেৎ এ ঝড় থামবে না। পেরিক্লিস জানতেন এই কুসংস্কার কত ভিত্তিহীন ও নিরর্থক। তবু শান্ত চিত্তে তিনি নাবিকদেব ইচ্ছাই অনুমোদন করলেন — বললেন, তোমাদেব যা ভাল মনে হয় তাই করো। রাণীকে সমুদ্রেই বিসর্জন দাও — তার ভাগ্যে যা লেখা ছিল তা-ই হোক। শেষবারের মত রাজা তাঁর প্রিয়তমা রাণীকে দেখতে গেলেন। থেয়িসার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন — কী ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে আজ তোমার সন্তানেব জন্মদানের পর্ব শেষ হল — একটু আলো নেই, সামান্য একটু আগুনের তাপও জুটল না — প্রকৃতির এই দুর্যোগ তোমাকে বঞ্চিত করল ন্যূনতম সুখ ও সুবিধা থেকে। তার চেয়েও বড় — আজ আমি তোমাকে পবিত্র সমাধিতেও শায়িত করতে পারলাম না, তার পরিবর্তে তোমার দীন শবাধার নিক্ষিপ্ত হল এই সমুদ্রে, আর এই সমুদ্রের গভীরে অনর্গল জলকল্লোল দিবারাত্রি তোমার শবদেহের শান্তি বিঘ্নিত করবে — অকিঞ্চিৎ শামুক আর ঝিনুকের মধ্যেই বিলীন হবে তোমার দেহ। ধাত্রী লাইকোরিডাকে ডেকে রাজা বললেন — শোনো, লাইকোরিডা, কোথায় গেল নেস্টর? তাকে বলো নিয়ে আসুক কালি, কলম আর কাগজ — নিয়ে আসুক রাশি রাশি সুগন্ধি সামগ্রী, আমার মণিমুক্তার ঝাঁপি আর যাবতীয় মণিমুক্তা। আর নিকানডোরকে বলো স্যাটিন দিয়ে মোড়া কফিন আমি চাই। লাইকোরিডা, যাও আমার এই শিশুকন্যাকে আমার কোল থেকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখ —আমাকে একটু সময় দাও — আমিই এখন পুরোহিত — আমার থেয়িসার শেষকৃত্যে আমিই করি শান্তির মন্ত্র উচ্চারণ।

পেরিক্লিসের আদেশ অনুযায়ী নাবিকেরা তাঁর সামনে এনে রাখল মস্ত বড় একটি সিন্দুক। ঐ সিন্দুকের ভিতরে দামী স্যাটিনের আচ্ছাদনে আবৃত করে রাজা তার রাণী থেয়িসার মৃতদেহ শায়িত করলেন। মৃতদেহের উপর ছড়িয়ে দিলেন বিবিধ

সুগন্ধি সামগ্রী এবং দেহের পাশে রেখে দিলেন নানা মণিমুক্তার অলংকার ও একটি কাগজ। ঐ কাগজটিতে তিনি লিখে দিলেন মৃতের পরিচয় এবং তৎসহ ছিল অনুরোধ ও প্রার্থনা — যদি শবসহ এই সিন্দুকটি কারো চোখে পড়ে তবে তিনি যেন শবদেহটিকে যথাবিহিত সমাধিস্থ করেন। এর পর তিনি নিজের হাতে সিন্দুকটি ভাসিয়ে দিলেন সমুদ্রের বুকে। ঝড়ের প্রকোপ যখন প্রশমিত হল পেরিক্লিস তখন নাবিকদের নির্দেশ দিলেন জাহাজটিকে টারসাসের অভিমুখে নিয়ে যেতে। তিনি বললেন — এই ছোট্ট শিশুটিকে টাইয়ার পর্যন্ত নিয়ে যেতে গেলে সে ধকল ও সইতে পারবে না, টারসাসেই ওকে রেখে যেতে হবে — সেখানে সেবাযত্নে ও ভালই থাকবে।

যে দুর্যোগের রাতে ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে মৃতা থেয়িসাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই রাতের শেষ হতে-না-হতেই প্রত্যুষের অস্পষ্ট আলোয় সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন এফিসাস নগরীর এক অতি সজ্জন ব্যক্তি, নাম তাঁর সেরিমন। সেরিমন ছিলেন একজন অতি দক্ষ চিকিৎসক। সেরিমনের ভৃত্যেরা থেয়িসার দেহ-সহ সিন্দুকটি এনে হাজির করল তাদের প্রভুর কাছে। তারা বলল সমুদ্রের ঢেউ-এ ঐ সিন্দুকটি এসে গিয়েছে তীরভূমিতে। ওদের মধ্যে একজন বলল — যে বিশাল ঢেউটি ঐ সিন্দুকটিকে এনে আছড়ে ফেলল, সমুদ্রতটে তার মত উত্তাল ঢেউ আমি জীবনে কখনও দেখিনি। সেরিমন ভৃত্যদের আদেশ দিলেন সিন্দুকটি যেন তারা তাঁর গৃহে পৌঁছে দেয়। গৃহে পৌঁছানোর পর সিন্দুকটি খুলে তিনি তো বিস্ময়ে হতবাক — অপরূপ সুন্দরী এক নবীনার দেহ আর তার উপর ছড়ানো নানা সুগন্ধি দ্রব্য এবং তার পাশে বহুমূল্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ একটি গহনার বাক্স! সেরিমন ভাবলেন এই দেহ অবশ্যই উচ্চবংশীয় কোন রমণীর -- জানিনা কেন এই অস্বাভাবিক উপায়ে একে সমাধিস্থ করা হয়েছে। শবদেহটির সম্পর্কে ঔৎসুক্যের ফলে সেরিমন সিন্দুকটির সব কিছু মনযোগসহকারে দেখতে দেখতে তাঁর চোখে পড়ল মৃতের পরিচয়লেখা কাগজখানি। তিনি দেখলেন তাঁর অনুমান সত্য — মৃতদেহ মনে করে যাকে এমন বিসর্জন দেওয়া হয়েছে তা এক রাজরাণীর—টাইয়ারের রাজা পেরিক্লিসের তিনি পত্নী। দেহটি এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁরই কাছে এসে পৌঁছেছে বলে তিনি বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন, কেননা তিনি বিচক্ষণ চিকিৎসক, তিনি দেহটিকে আবার সুস্থ করে তুলতে পারবেন — আবার অন্যদিকে হতভাগ্য রাজা পেরিক্লিসের কথা ভেবে তাঁর মনে বড় বেদনাবোধ হল। তিনি ভাবলেন —যদি জীবিত থাকেন তবে কী দুঃখেই না পেরিক্লিসের দিন কাটছে, বোধ হয় বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে তার বুক। তিনি এবার খুব মন দিয়ে দেহটির মুখের দিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখলেন তার চোখে তখনও উজ্জ্বলতা আছে, মৃত্যুর কোন চিহ্নই নেই। সেরিমন মনে মনে বললেন — ওরা কেমন হঠকারীর মত এই দেহটিকে মৃত মনে করে

জলে ভাসিয়ে দিল — এ তো সম্পূর্ণ জীবিত!

অতঃপর সেরিমন তাঁর ভৃত্যদের আদেশ দিলেন চুল্লিতে ঠিকমতন আগুনের ব্যবস্থা করতে ও প্রয়োজনমত ঔষধগুলি সংগ্রহ করে আনতে। তিনি আরও বললেন যেন সেখানে মৃদু সংগীতের ব্যবস্থা করা হয়, কেননা জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিতার আকস্মিক বিভ্রান্তির ফলে ক্ষতি হতে পারে — সঙ্গীতের ফলে তা রোধ করা সম্ভব হবে। অনেক মানুষ কৌতূহলবশে চারিধারে ভিড় করেছিল। তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন যেন তারা সেই স্থান থেকে দূরে গিয়ে অপেক্ষা করেন, কেননা যথেষ্ট হাওয়া চলাচল প্রয়োজন। তিনি বললেন, আপনারা সরে গিয়ে দাঁড়ান —আমি আশা করছি রাণী এখুনি জীবিত হয়ে উঠবেন, কেননা তাঁর এই মৃতবৎ মূর্চ্ছা খুব অধিক সময়ের নয়, হয়তো ঘণ্টা পাঁচেক হতে পারে --- ঐ দেখুন ওঁর চোখের পাতা কাঁপতে শুরু করেছে — এই অপরূপ নারীর অমূল্য প্রাণ ক্রমশই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে — শীঘ্রই আমরা শুনতে পাবো এঁর করুণ জীবনের দুঃখবহ ইতিহাস। সত্যিই তো, থেয়িসার আদৌ মৃত্যু ঘটেনি, যা ঘটেছিল তা এই যে সন্তান প্রসবের পর সে নিদারুণ মূর্চ্ছায় সম্পূর্ণভাবে অচেতন হয়ে পড়েছিল এবং তার সেই অবস্থা দেখে নাবিকেরা তাকে মৃতা বলেই ধরে নেয়। তাই এখন এই সহৃদয় চিকিৎসকের সেবা ও যত্নের ফলে পুনরায় তার সম্বিত ফিরে এল এবং জীবনের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পেল - সে চোখ মেলে তাকিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করল -- এ আমি কোথায়? কোথায় আমার স্বামী? এ কোন দেশ? অত্যন্ত সাবধানে ধীরে ধীরে সেরিমন তাকে প্রকৃত অবস্থার কথা বুঝিয়ে বললেন এবং যখন তিনি বুঝলেন মহিলাটি এখন অনেক পরিমাণে সুস্থ তখন তিনি তার হাতে সিন্দুকের ভিতরকার কাগজের টুকরোটি এবং যাবতীয় অলঙ্কার তুলে দিলেন। কাগজখানি পাওয়ামাত্রই থেয়িসা বলে উঠল -- এ হস্তাক্ষর আমার স্বামীর। তাঁর সঙ্গে জাহাজে উঠে সমুদ্রযাত্রার কথা আমার মনে আছে, কিন্তু ঐ জাহাজে যে আমার সন্তানের জন্ম হয়েছে তার কিছুই তো আমার মনে নেই। আমার স্বামীর কী ঘটেছে জানি না, তাঁকে আর কখনও দেখতেও পাবো না। তাই আজ থেকে আমার পরিচ্ছদ হবে সন্ন্যাসিনীর বেশ এবং আজ থেকে আমি জীবনের সব আনন্দই বর্জন করব। থেয়িসার কথা শুনে সেরিমন বললেন -- যদি আপনার এই ইচ্ছা অনুসারেই আপনি জীবন যাপন করতে চান, তবে চলুন এখান থেকে অল্প দূরেই আছে দেবী ডায়েনার মন্দির — সেখানে গিয়ে স্বচ্ছন্দেই সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে পারবেন। এছাড়া যদি আপনি আপনার সাহায্যের জন্য কাউকে চান তবে আমার ভাইঝি আপনার দেখাশোনার ভার নিতে পারে। সেরিমনের এই উপকার থেয়িসা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হল। কাজেই কিছু সময়ের পর সে যখন সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠল তখন সেরিমন তাকে নিয়ে পৌঁছে দিলেন দেবী ডায়েনার

মন্দিরে। ঐ মন্দিরেই শুরু হল থেয়িসার সন্ন্যাসিনীর জীবন-দেবী ডায়েনার প্রতি উৎসগীকৃত জীবন। তার দিন কাটতে লাগল নিজের স্বামীর কল্পিত বিয়োগদুঃখে এবং এক নিষ্ঠাচারী সন্ন্যাসিনীর ব্রত উদ্‌যাপনে।

এদিকে পেরিক্লিস তার নবজাত শিশুকন্যাটিকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন টারসাসে। কন্যাটির তিনি নাম দিয়েছিলেন 'মেরিনা', কেননা তার জন্ম হয়েছিল সমুদ্রে। টারসাসে যাওয়ার পিছনে পেরিক্লিসের অভিপ্রায় ছিল মেরিনাকে ঐ দেশের শাসনকর্তা ক্লিয়ন এবং তাঁর পত্নী ডায়োনিসিয়ার তত্ত্বাবধানে কিছু কালের জন্যে রেখে আসা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এককালে তিনি দুর্ভিক্ষের হাত থেকে টারসাসের মানুষদের যেমন করে রক্ষা করেছিলেন সেই কৃতজ্ঞতায় ক্লিয়ন দম্পতি অবশ্যই এই মাতৃহারা ক্ষুদ্র শিশুটিকে দেখাশোনার দায়িত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করবেন। পেরিক্লিসকে দেখামাত্রই ক্লিয়ন কৃতজ্ঞতাসহকারে তাঁকে কাছে টেনে নিলেন এবং তাঁর মুখে তাঁর দুঃখের বৃত্তান্ত শোনার পর বললেন —হায়রে! ঈশ্বরের করুণায় যদি একবার আপনার সেই প্রিয়তমা রাণীকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত দেখতাম তবে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতাম। পেরিক্লিস বললেন — তা তো হবার নয় ভাই, নিয়তির বিধান আমাদের মেনে নিতেই হবে। পরিবর্তে আমি যদি আজ ঐ সমুদ্রের মত অস্থির ও উন্মত্ত হয়ে উঠি — যে সমুদ্রের জলে ঘুমিয়ে আছে আমার থেয়িসা — তবুও ভাগ্য আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না — আমি যা হারিয়েছি, তা চিরদিনের জন্যেই হারিয়েছি। তোমার কাছে শুধু একটা করুণা ভিক্ষা করতে এসেছি — এই আমার শিশুকন্যা মেরিনা — একে তোমার হাতে দিয়ে যেতে চাই — রাজকন্যার উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা ও প্রতিপালনে তুমি একে রক্ষা করো। এর পর পেরিক্লিস ফিরলেন ক্লিয়নের পত্নী ডায়োনিসিয়ার দিকে। তাকে বললেন —ভগ্নি, আমার এই কন্যাটির দায়িত্ব গ্রহণ করে আপনি আমাকে কৃতার্থ করুন। ডায়োনিসিয়া উত্তরে বললেন — আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমারও একটি কন্যা আছে, আমার কাছে আপনার কন্যা তার চেয়ে কখনই কম প্রিয় হবে না। ক্লিয়নও ঠিক একইভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন — রাজা পেরিক্লিস, একদিন আপনি যে নিদারুণ বিপদে আমার দেশবাসীর জীবন রক্ষা করেছিলেন, আপনার দেওয়া অন্নে সেদিন তারা যে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল—কোনদিনই দেশবাসী সেই উপকারের কথা ভুলতে পারে না। তারই কথা ভেবে তারা আপনার শিশু-কন্যার প্রতি সদা কৃতজ্ঞ থাকবে। যদি কোনদিন আমার দিক থেকে ঐ শিশুর প্রতি কোনো অযত্ন ঘটে তবে আমার দেশবাসী আমাকে ক্ষমা করবে না — তারা আমাকে বাধ্য করবে আমার কর্তব্য করতে। যদি সে সত্ত্বেও আমার ত্রুটি ঘটে তবে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন না — শুধু আমার উপরেই ঈশ্বরের সেই রোষ বর্ষিত হবে না — আমার সমগ্র বংশ লোপ পাবে সেই পাপের ফলে। ক্লিয়ন ও তার স্ত্রীর এই সহৃদয় আচরণে নিশ্চিন্ত হলেন

পেরিক্লিস। ঐ দম্পতির কাছে নিজের কন্যাকে সমর্পণ করে তিনি পুনরায় সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাওয়ার আগে ধাত্রী লাইকোরিডাকেও তিনি তাঁর কন্যার সঙ্গে রেখে গেলেন। পেরিক্লিস চলে গেলেন। অবোধ শিশু মেরিনা কিছুই বুঝতে পারল না তার এই পিতৃবিচ্ছেদের দুঃখের কথা। শুধু লাইকোরিডাই অঝোরে কাঁদতে লাগল। রাজাকে হারানোর বিয়োগ-ব্যথায় সে কিছুতেই আত্মসম্বরণ করতে পারেনি। পেরিক্লিস তাকে বললেন — না না তুমি চোখের জল ফেলো না লাইকোরিডা, তোমার ঐ শিশুকন্যাটিকে ভাল করে মানুষ করে তোল — একদিন ওই তোমার সব দেখাশোনার ভার নেবে।

পেরিক্লিস নির্বিঘ্নেই টাইয়ারে গিয়ে পৌঁছলেন। রাজার প্রত্যাবর্তনে প্রজাপুঞ্জ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল এবং তিনি আবার তাঁর রাজসিংহাসনে গিয়ে বসলেন। সবকিছুই ঘটল শান্তিপূর্ণ সহজ পরিবেশে। অপরদিকে কিন্তু তাঁর রাণী, যাঁকে তিনি মৃতা বলে ধরে নিয়েছিলেন, রয়ে গেলেন এফিসাসে — শোক ও দুঃখের এক ছায়ার মত। আবার মেরিনা —যে শিশুকন্যাকে হতভাগ্য রাণী একটি বারও চোখের দেখা দেখেন নি — সে দিনে দিনে বড হয়ে উঠতে লাগল ক্লিয়ন ও তাঁর স্ত্রীব আদরে-পরিপূর্ণ রাজকন্যার মর্যাদায়। ক্লিয়ন মেরিনাকে অতি যত্নের সঙ্গে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তার ফলে যখন সে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সের কিশোরীটি হয়ে উঠল তখনই তার জ্ঞান ও বিদ্যা তদানীন্তন সেরা বিদ্বান ব্যক্তিদের হার মানিয়ে দিতে পারত। শুধু বিদ্যাবত্তাতেই নয়, সঙ্গীতেও যেন তার কণ্ঠে ছিল স্বর্গীয় সুর, নৃত্যে তার দক্ষতা স্বর্গের দেবীদের হার মানায়, আবার সূচিশিল্পেও সে অনন্যা — তাঁর হাতের ছুঁচের কাজ দেখে মনে হত প্রকৃতির ফুল, ফল, পশু, পাখী সবই যেন জীবন্ত ও স্বাভাবিক। মেরিনার এই গুণগুলিই হয়ে দাঁড়াল তার জীবনের অভিশাপ। ক্লিয়নের স্ত্রী ডায়োনিসিয়া দেখলেন তাঁর নিজের মেয়ে জড়বুদ্ধির ফলে কোন কিছুতেই সমবয়সী মেরিনার সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। এর ফলে ডায়োনিসিয়ার মনে দেখা দিল ঈর্ষা ও বিদ্বেষ। তিনি দেখলেন সকলেই শুধু মেরিনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর মেয়েকেও তিনি সমান যত্নেই সব কিছু শিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন নি, অথচ কেউই তার প্রশংসা করে না — বরং পাশাপাশি দু'জনের তুলনায় যেন সে অনেক হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যায়। এই ঈর্ষার ফলে ডায়োনিসিয়া স্থির করলেন মেরিনাকে সরিয়ে দিতে হবে। তবেই তাঁর মেয়ের পথ নিষ্কণ্টক হবে — সে সকলের প্রশংসা লাভ করবে। নিজের মতলবটি কার্যকরী করার জন্যে তিনি এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করলেন মেরিনাকে গোপণে হত্যা করার কাজে। এই অপরাধজনক কাজটি হাসিল করার সময়টিও ডায়োনিসিয়া ঠিকমত নির্বাচন করেছিলেন, কেননা ঠিক এই সময়েই মারা গিয়েছিল মেরিনার সেই অতি বিশ্বস্ত ধাত্রী লাইকোরিডা। লাইকোরিডার মৃত্যুতে যখন মেরিনা শোক ও কান্নায় অভিভূত

ঠিক সেই সময়েই তাঁকে হত্যা করার জন্যে ডায়োনিসিয়া পরামর্শ করছিলেন তার নিযুক্ত লোকটির সঙ্গে। লোকটির নাম লিয়োনাইন। সে প্রকৃতই অতি হীন ও জঘন্য — কিন্তু ডায়োনিসিয়ার প্ররোচনায় সে কিছুতেই মেরিনাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক নয়, কেননা, মেরিনা সবার কাছে এতই প্রিয় ছিল যে একজন অতি নীচ হত্যাকারীরও তাকে হত্যা করতে মন সায় দেয় না। সে বলল — ঐ মেয়ে, ও তো এক স্বর্গীয় শিশু। উত্তরে নির্দয় ডায়োনিসিয়া বললেন — হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো ওকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেওয়া বিধেয়। ঐ যে —ও কাঁদতে কাঁদতে আসছে, ওর ধাত্রী মারা গিয়েছে বলে — আমি জানতে চাই লিয়োনাইন, বলো তুমি আমার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত কী না? লিয়োনাইন একটু ভয় পেল। এই আদেশের সুরে সে বলল — ঠিক আছে, আমি প্রস্তুত। কাজেই এই একটিমাত্র ছোট আদেশের সুরে মেরিনার মত এক অনন্যা শিশুকন্যার অকালমৃত্যুর ভাগ্য চিরদিনের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল।

মেরিনা নিজের মনে এগিয়ে এল ওদের দিকে, তার হাতে একটি ফুলের ডালিতে ভায়োলেট আর মেরিগোল্ড। লাইকোরিডার সমাধিতে ছড়াবে বলে। মনে মনে সে বলতে লাগল — রোজ আমি ছড়িয়ে দেব নীলাভ লাল ভায়োলেট আর মেরিগোল্ড লাইকোরিডার সমাধিতে — সারা গ্রীষ্ম জুড়ে ঐ ফুল কার্পেটের মত বিছিয়ে দেব কবরের উপর — হায়, কত হতভাগ্য আমি! যে তুমুল ঝড়ের সমুদ্রে আমার জন্ম, আমার মাকে আমি হারিয়েছি সেখানেই। আমার সারাটা জীবন শুধু ঝড় আর ঝড় — কোনদিনই সে ঝড় আর শান্ত হবে না — যারা আমার আপনজন তারা সবই একে একে চলে গেল আমাকে একা ফেলে। কৃত্রিম স্নেহের সুরে ডায়োনিসিয়া তার কাছে এসে বললেন — এ কী — তুমি এমন কাঁদছ কেন মেরিনা? তোমাকে এমন একা রেখে আমার পোড়ারমুখী মেয়েটা গেল কোথায়? লাইকোরিডা মারা গিয়েছে তাতে কি হয়েছে, আমি তো আছি — আমি তোমার মায়ের মত। দাও, ঐ ফুলগুলো আমার হাতে দাও দেখি, সাগরের হাওয়ায় ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। ইস্, তোমার মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে, যাও লিয়োনাইনের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে এস। সমুদ্রের ধারে বেশ ভালো হাওয়া দিচ্ছে — ওখানে বেড়ালে তোমার ভালো লাগবে। তিনি লিয়োনাইনকে বললেন — কই, লিয়োনাইন, মেয়েটাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আনো, দেখো ওর হাত ছেড়ো না যেন, সাবধানে নিয়ে যেও। মেরিনা বলল — না না, লিয়োনাইন আমার সঙ্গে গেলে আপনাকে একলা থাকতে হবে, ও-ই তো আপনার দেখাশোনা করে। ডায়োনিসিয়া আবারও স্নেহের ভাণ করে বললেন — লিয়োনাইনের সঙ্গে তুমি যাও, আমার কোন অসুবিধা হবে না। তুমি আমাদের বড় স্নেহের পাত্রী —তোমার বাবাও আমাদের বড় প্রিয়। এই তো কিছুদনের মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন। এসে যদি তোমার এমন ম্লান

ও মনমরা চেহারা দেখতে পান তবে তিনি ভাববেন আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে তেমন যত্নে রাখিনি। তাহলে আমাদের বড় খারাপ লাগবে। যাও, তুমি লিয়োনাইনের সঙ্গে হাওয়ায় একটু ঘুরে এস। তোমাব এত সুন্দর গায়ের রং যেন একেবারে কালো হয়ে গেছে। সবাই তোমার রূপের এত প্রশংসা করে। যাও লক্ষ্মীটি, বেড়িয়ে এস। মেরিনাকে অগত্যা রাজী হতে হল। সে বলল — যাচ্ছি, তবে আমাব যেতে ভালো লাগছে না। ডায়োনিসিয়া লিয়োনাইনের হাতে মেরিনাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় লিয়োনাইনকে উদ্দেশ্য করে বলে গেলেন — 'দেখো, যেমনটি বলেছি যেন খেয়াল থাকে' — অর্থাৎ, সেই ভয়ঙ্কর কথাটি — মেরিনাকে হত্যা করার আদেশ।

লিয়োনাইনের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে হাঁটতে হাঁটকে মেরিনা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে — তার জন্মস্থান। সে লিয়োনাইনকে জিজ্ঞাসা করল — হাওয়া কি পশ্চিম দিক থেকে বইছে? লিয়োনাইন বলল — না, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে। মেরিনা বলল — আমি যখন জন্মেছি তখন হাওয়া বইছিল উত্তর দিক থেকে। একে একে তার মনে পড়ল সেই নিদারুণ ঝড়ের কাহিনী — তার মায়ের মৃত্যুর কথা। তার বাবার দুঃখের কথা —এই সবই তার মনে পড়ল। সে বলল — লাইকোরিডার কাছে আমি সব কথাই শুনেছি — শুনেছি কেমন সাহসী ছিলেন আমার বাবা — সেই ঝড়ের মধ্যে দারুণ সাহস নিয়ে কেমন করে তিনি জাহাজের নাবিকদের শক্ত হাতে হাল ধরতে বলেছিলেন — আর তিনি নিজে তার রাজদণ্ড ধরার মত শক্ত করে ধরেছিলেন মাস্তুল। সেই ঝড়ের মধ্যে কী কী ঘটেছিল তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা সে শুনেছিল লাইকোরিডার মুখে। ঝড়ের বৃত্তান্ত শোনার মত সময় বা ধৈর্য লিয়োনাইনের থাকার কথা নয়। অতএব সে মেরিনার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল — ও সব কথা থাক। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে একবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা সেরে নিতে পারো। মেরিনার মনে ভয় দেখা দিল। সে বলল — কী বলতে চাও তুমি? উত্তরে লিয়োনাইন বলল — আমি বলতে চাই তোমার যদি মন চায় তবে একবারের জন্যে প্রার্থনা করে নিতে পারো। তবে সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। কেননা বেশি সময় দেওয়াটা ঠিক হবে না। তাহলে ঈশ্বরদের কানে পৌঁছে যেতে পারে — ওঁরা বড় চট করে সব কথা শুনতে পান — আর, আমার উপর হুকুম আছে দ্রুত আমার কাজ হাসিল করতে হবে। মেরিনা তো অবাক। সে বলল — কী বলছ তুমি? আমাকে মেরে ফেলবে না কী? কিন্তু কী অপরাধ আমার? উত্তরে লিয়োনাইন বলল — সে সব আমি জানি না — আমার প্রভুপত্নীর মর্জি। মেরিনা বলল — কেন? আমি তো কখনো তাঁর কোনো ক্ষতি করিনি — কখনো তাঁর বিরুদ্ধে একটা কথাও বলিনি। কোনদিনই একটি প্রাণীকে পর্যন্ত আঘাত করিনি, এমন কি একটি ইঁদুর কিংবা একটি মাছিকেও কোনদিন

মারিনি। যদি অলক্ষ্যে কোনদিন কোন পোকামাকড়কে পায়ের তলায় মাড়িয়ে ফেলে থাকি তবে তার জন্যে আমি দুঃখে চোখের জল ফেলেছি। কী এমন অপরাধ করেছি আমি যার জন্যে আমার এই শাস্তি? খুনী লিয়োনাইন বলল — দ্যাখো, আমার উপর হুকুম তোমাকে মেরে ফেলার জন্যে, তোমার সঙ্গে তা নিয়ে যুক্তি তর্ক করার জন্যে নয়। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে মেরিনাকে হত্যা করার জন্যে এগিয়ে গেল। কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ঠিক ঐ মুহূর্তে সেখানে এসে পড়ল একদল জলদস্যু। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরিনাকে ছিনিয়ে নিল — তাদের মনে হল একটা ভাল দাঁও জুটে গেল — বেসাতিটা ভালই হবে। মেরিনাকে নিয়ে তারা গিয়ে উঠল তাদের জাহাজে।

যে জলদস্যুটি মেরিনাকে পণ্য হিসাবে লুট করে নিয়ে গিয়েছিল সে আর অপেক্ষা না করে তাকে বিক্রী করে দিল ক্রীতদাসীরূপে মিটিলিন নামক এক শহরে। সেখানে ঐ হীন ক্রীতদাসী হওয়া সত্ত্বেও অল্পকালের মধ্যে মেরিনার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার অসামান্য রূপ এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের গুণে। মেরিনাকে যে ব্যক্তি ক্রয় করেছিল সে তাকে নিয়োজিত করল নানা কাজে — নাচ ও গানের শিক্ষাদান, সীবন শিক্ষা, অর্থাৎ যে কাজগুলিতে ছিল মেরিনার সম্পূর্ণ অধিকার ও দক্ষতা। কাজেই অতি অল্পদিনের মধ্যেই মেরিনার সাহায্যে তার প্রভু প্রভূত বিত্ত সঞ্চয় করে ফেলল। এ ছাড়া মেরিনার কাছে পাঠ নেওয়ার জন্যেও আসত অনেক শিক্ষার্থী — তাই অতি শীঘ্রই মেরিনার বিদ্যাবত্তা ও অন্যান্য গুণের কথা মিটিলিনের শাসনকর্তা লাইসিমেকাসের কানেও পৌঁছে গেল। আর দেরী নয় — লাইসিমেকাস এই অপরূপ সুন্দরী ও সর্বগুণান্বিতা মেয়েটাকে দেখার জন্যে এসে পড়লেন মেরিনার অতি অকিঞ্চিৎ বাসগৃহে। মেরিনার সঙ্গে কথাবার্তায় লাইসিমেকাস যার-পর-নেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মেয়েটির অনেক গুণের কথা তিনি শুনেছিলেন বটে তবে তিনি ভাবতেই পারেন নি এমন অবস্থার একটি মেয়ের এত বোধশক্তি থাকতে পারে অথবা সে এত ভাল হতে পারে। তাই যাওয়ার সময় তিনি মেরিনাকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন সে যেন নিজের মনে তার কাজ করে যায় এবং আত্মমর্যাদায় অটুট থাকে, এবং ভবিষ্যতে যদি সে তাঁর কাছ থেকে কোন সংবাদ পায় তবে তা হবে কোন শুভসংবাদ। আসল কথা, মেরিনার মধ্যে এমন অভূতপূর্ব রূপ ও গুণের পরিচয় পেয়ে লাইসিমেকাস মনে মনে তাকে পত্নীরূপে বরণ করতে চেয়েছিলেন — তা হোক না সে সামান্য ক্রীতদাসী। তাছাড়া তিনি এ-ও ভেবেছিলেন যে মেয়েটির আসল পরিচয় জানা গেলে হয়তো দেখা যাবে সে প্রকৃতই উচ্চবংশীয়া এবং ভাগ্যদোষে আজ ক্রীতদাসী। কিন্তু নানাভাবে প্রশ্ন করা সত্ত্বেও তিনি মেরিনার মুখ থেকে তার বংশপরিচয়ের কথা কিছুই জানতে পারলেন না — সে মুখ নিচু করে চুপ করে বসে থাকে আর তার চোখ থেকে কেবল টপটপ করে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ে।

এদিকে, লিয়োনাইন পড়ল মহা বিপাকে — সে মেরিনাকে হত্যা করার আগেই মেরিনা তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু ডায়োনিসিয়াকে তো সে কথা বললে তার গর্দান যাবে। তাই সে ভয়ে ভয়ে ডায়োনিসিয়ার কাছে গিয়ে বানিয়ে বলল যে মেরিনাকে সে খুন করে ফেলেছে। ডায়োনিসিয়া ভাবলেন তার উদ্দেশ্য সাধিত হল। কাজেই বেশ ঘটা করে এখন একটা লোক দেখানো অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করা হল বেচারা মেরিনার জন্যে। আর ঐ অন্ত্যেষ্টি শেষ হওয়ার পর গড়ে তোলা হল এক রাজকীয় স্মৃতিসৌধ।

এরপর কিছুদিন যেতে-না-যেতেই টাইয়ার থেকে রাজা পেরিক্লিস তাঁর সচিব হেলিকেনাসকে সঙ্গে নিয়ে এসে পড়লেন টারসাসে। মেয়ের সঙ্গে তার অনেকদিন সাক্ষাৎ নেই— সেই কতদিন আগে ছোট্ট মেয়েটিকে ক্লিয়ন ও তাঁর পত্নীর হাতে দিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন— মেয়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তাই এবার মেয়েকে নিয়ে নিজের দেশে ফিরবেন— এই ছিল তার আকাঙ্খা। পেরিক্লিসের মনে কত আশা, কত আনন্দ— আজ তার রাণী নেই বটে, কিন্তু তার গর্ভের সন্তান মেরিনাকে তিনি দুচোখ ভরে দেখবেন। কিন্তু এই পৃথিবীর সব আলো এক মুহূর্তে নিভে গেল— তাঁর চোখের সামনে নেমে এল অনন্ত অন্ধকার যখন তিনি শুনলেন তাঁর প্রিয় সন্তান আর নেই। রাজাকে ডায়োনিসিয়া দেখিয়ে দিলেন মেরিনার স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধ। রাজা দুঃখ ও শোকে একেবারেই ভেঙ্গে পড়লেন— তাঁর প্রিয় পত্নী থেয়িসার শেষ চিহ্নটুকু তাঁর ঐ প্রিয় সন্তান মেরিনা— সেও আজ নেই— আর এক মুহূর্তও টারসাসে তাঁর থাকার ইচ্ছা রইল না— তিনি আর টারসাসের দিকে ফিরে তাকালেন না— সেই পায়েই জাহাজে গিয়ে উঠলেন। আর, সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁকে আচ্ছন্ন করল প্রাণহীন এক বিষণ্ণতা— তাঁর মুখে একটিও কথা নেই— শুধু চুপ করে বসে থাকা— নিঃসঙ্গ সেই জীবনে চারিধারের জীবন ও জগৎ যেন সম্পূর্ণ অস্তিত্ববিহীন— কোন কিছুই তাকে আর জাগাতে পারে না।

টারসাস ছেড়ে পেরিক্লিসের জাহাজ চলেছে টাইয়ারের অভিমুখে। যাত্রাপথে পড়ল মিটিলিন নগরী— সেই মিটিলিন যেখানে বর্তমানে রয়েছে মেরিনা ক্রীতদাসী হয়ে। মিটিলিনের শাসনকর্তা লাইসিমেকাস সমুদ্রতীর থেকে দেখতে পেলেন দূরে যেন এক রাজকীয় নৌবহর চলেছে। তাঁর মনে ঔৎসুক্য জাগল— জানতে ইচ্ছা হল কোন রাজা চলেছেন জাহাজ নিয়ে। লাইসিমেকাস একখানি বড় নৌকায় গিয়ে জাহাজটির পাশে চলতে লাগলেন। পেরিক্লিসের জাহাজ থেকে হেলিকেনাস তাঁকে দেখতে পেয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তিনিই লাইসিমেকাসকে জানালেন তাঁদের যাত্রার কথা— বললেন— আমরা টাইয়ার থেকে এসেছিলাম, রাজা পেরিক্লিসের সঙ্গে, আবার সেখানেই ফিরে যাচ্ছি রাজাকে নিয়ে। রাজা গত তিনমাস যাবৎ কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি— প্রাণধারণের মত সামান্য কোন খাদ্যও

মুখে তোলেন নি। নিজের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে আত্মপীড়নের মধ্যে দিয়ে দুঃখকে দীর্ঘতর করাই যেন তাঁর একমাত্র সঙ্কল্প। রাজার এই দুঃখের কথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়— তবে এটুকুই শুধু বলি— এই দুঃখের মূলে আছে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ও কন্যাবিয়োগের কাহিনী। একথা শোনার পর লাইসিমেকাস বললেন তিনি একবার বেদনাক্লিষ্ট রাজার সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ করতে চান। হেলিকেনাস তাকে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। লাইসিমেকাস দেখলেন রাজার কন্দর্পকান্তি রূপ নিদারুণ মনোকষ্টে কেমন শ্রীহীন হয়ে গিয়েছে। তিনি পেরিক্লিসকে বললেন— হে রাজন, আপনাকে স্বাগত জানাই, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! লাইসিমেকাসের কোন কথাই পেরিক্লিসের কানে পৌঁছল না— তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না— তিনি যেমন নীরবে ছিলেন তেমনই চুপ করে বসে রইলেন— কোন আগন্তুকের উপস্থিতিই যেন তাঁর মৌন অস্তিত্বকে স্পর্শমাত্র করেনি। লাইসিমেকাসের কী জানি কেন মনে হল হয়তো অপরূপ সুন্দরী মেরিনা এসে যদি তার মধুর কণ্ঠে রাজার সঙ্গে কথা বলে তবে রাজার মুখ থেকে তাঁর নিজের দুঃখের কথা কিছু জানা যেতে পারে। হেলিকেনাসের কাছে তিনি এই প্রস্তাবের কথা বললেন— এবং হেলিকেনাসের অনুমতি নিয়ে ডেকে পাঠালেন মেরিনাকে। কিছুক্ষণ বাদেই মেরিনা এসে প্রবেশ করল জাহাজের কক্ষে— ওর বাবা সেই কক্ষেই চুপ করে বসে আছেন স্পন্দনহীন। মেরিনা আসামাত্রই জাহাজের সকলে তাকে এমনভাবে অভ্যর্থনা জানাল যেন তারা তার মধ্যেই দেখতে পেয়েছে তাদের রাজকন্যাকে— সকলে বলে উঠল — মেয়েটি উচ্চবংশসম্ভূতা। মেরিনার প্রতি এই প্রশংসার উচ্ছ্বাস লাইসিমেকাসের ভাল লাগল। তিনি বলে উঠলেন — এই অনুমান একটুও মিথ্যা নয়, আমি জোর করেই বলতে পারি মেরিনা উচ্চবংশসম্ভূতা— আমি ওকে স্ত্রীরূপে বরণ করতে চাই— ওর অপেক্ষা ভাল কোন মেয়ের কথা আমি ভাবতেই পারি না। অতঃপর লাইসিমেকাস অত্যন্ত সম্ভ্রমসহকারে আহ্বান জানালেন মেরিনাকে। যেন এক অভিজাত নারীর কাছে প্রার্থনার ভাষায় তিনি বললেন— হে সুন্দরী, এক সম্ভ্রান্ত রাজা বড় বেদনাকাতর হয়ে নীরবে বসে আছেন এখানে— যদি তুমি তোমার সেবায় তাঁকে সুস্থ করে তুলতে পার তবে বড় আনন্দের হবে। লাইসিমেকাসের কেমন যেন ধারণা হল মেরিনার মধ্যেই আছে এমন কিছু শক্তি যা আবার সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে রাজা পেরিক্লিসকে। মেরিনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল— তারপর সে বলল— হ্যাঁ। আমার সব শক্তি দিয়ে আমি ওঁকে সুস্থ করে তুলতে চেষ্টা করব, তবে একটি শর্ত আছে— আমি এবং আমার দাসী ব্যতিরেকে অপর কেউ ঐ সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবে না।

মেরিনার কথামতো সেই ব্যবস্থাই হল। রাজার কাছে এসে মেরিনা একে একে

তার নিজের জীবনের দুঃখের কাহিনী বলতে শুরু করল। মিটিলিনে এতকাল সকলের কাছেই সে আত্মপরিচয় গোপণ রেখেছিল— সবাই তাকে এক সুন্দরী ক্রীতদাসী বলেই জানত— পেরিক্লিসের কাছে কিন্তু সে কিছুমাত্র আত্মগোপন করল না— তার নিজের ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা—কেমন করে তার জন্ম হয়েছিল এবং কেমন করে আজ সে এখানে এসে পৌঁছেছে—সবই সে বলতে লাগল। মেরিনা যে তার বাবাকে চিনতে পেরেছে বলে নিজের দুঃখের কথা তাকে জানাতে বসেছে তা নয়— সে ভেবেছিল দুঃখের ইতিহাস শুনলে হয়তো মানুষের ভিতরকার সমব্যথীর অনুভূতি সজাগ হয়ে ওঠে। একটি মেয়ের করুণ কাহিনী শুনে রাজা পেরিক্লিস তার মধ্যে হয়তো নিজের মতো একজন দুঃখীকে দেখতে পাবেন— এবং তার ফলে তিনি আবার সজাগ হয়ে উঠবেন। সত্যিই মেরিনার মধুর কণ্ঠ রাজার বিষাদক্লিষ্ট মৃতপ্রায় চেতনাকে জাগিয়ে তুলল— তিনি আস্তে আস্তে চোখ তুললেন— এতক্ষণ যে দৃষ্টি স্থির ও নিম্নমুখী হয়ে ছিল এখন সেই দৃষ্টি আবার স্বাভাবিক হল— তিনি চোখ তুলে মেরিনার মুখের দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, ঠিক সেই মুখ— রাজা অবাক হয়ে দেখলেন মেরিনার মুখে তাঁর মৃতা রাণীর মুখচ্ছবি। দীর্ঘকাল নীরব থাকার পর আবার কথা শোনা গেল রাজার মুখে। রাজা বললেন— ঠিক এমনটিই দেখতে ছিল আমার প্রিয়তমা রাণী — আর আমার মেয়েটি যদি আজ থাকত তবে তাকে দেখতেও ঠিক তোমারই মত হত — আমার স্ত্রীর সেই সুন্দর ভ্রূযুগল, ঠিক তারই মত দীর্ঘদেহ ঠিক তেমনই ঋজু — কণ্ঠস্বরও তেমনই সুরেলা— দু'টি চোখ তেমনই মুক্তার মত। আমাকে বলতো— কোথায় থাক তুমি, সুন্দরী কিশোরী ? বলতো, কী তোমার বংশপরিচয় ? একটু আগে তুমি না আমাকে বললে জীবনে একের পর এক দুঃখ ও অবিচার জুটেছে তোমার ভাগ্যে। আর আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কোথায় যেন তোমার মিল আছে ? মেরিনা বলল— হ্যাঁ, ঐ রকম কিছুই আমি বলেছি বটে— আর বলেছি তার কারণ আমার মনের ভিতর থেকে আমার অজ্ঞাতেই যেন ঐ কথাগুলি বেরিয়ে এসেছে। পেরিক্লিস বললেন— বলো, তোমার কাহিনী আমি শুনতে চাই। যদি দেখি আমার অন্তহীন দুঃখের এবং সহনশীলতার অতি সামান্যও তুমি অনুমান করতে পেরেছ এবং তোমার নিজের বেদনাও তেমনই সহনশীলতা নিয়ে বয়ে চলেছ তবে জানব তুমি সাক্ষাৎ ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। আমাকে বলো দেখি, কেমন করে তোমার আসল নাম মুছে গিয়ে তুমি আজ এক ক্রীতদাসী মাত্র? তোমার সব কথা আমাকে খুলে বলো। এসো, আমার কাছে এসে বোসো। মেরিনা শুরু করল তার কথা। সে বলল— আবার নাম মেরিনা। একথা শোনা মাত্রই রাজা তো বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন— এই নাম তো তাঁরই দেওয়া— তাঁর মেয়ের যেহেতু জন্ম হয়েছিল সমুদ্রযাত্রায়, তাই এই অদ্ভুত ধরনের নামটি তিনি দিয়েছিলেন তাঁর মেয়েকে। রাজা অস্থির হয়ে উঠলেন—তিনি বললেন—

হায়! না জানি আমাকে নিয়ে ভাগ্য আবার কী পরিহাসের ছক তৈরি করেছে। মেরিনা বলল—ধৈর্য ধরুন, অমন উতলা হলে আমি আর একটি কথাও বলব না। রাজা বললেন— তুমি ধৈর্যের কথা বলছ— তুমি জান না তুমি তোমার যে নামটি বললে তা আমার কানে কেমন লাগতে পারে — 'মেরিনা' নামটি আমার কাছে কিসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মেরিনা বলল— হ্যাঁ। আমার ঐ নামটি দিয়েছিলেন আমার বাবা— একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন আমার বাবা। পেরিক্লিস আরও অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—সত্যিই কি তুমি এক রাজার মেয়ে? আর তোমার নাম মেরিনা? তুমি কি রক্তমাংসের মানুষ, না অলীক একটি পরী? বলো, ঠিক করে বলো, কোথায় তোমার জন্ম হয়েছিল— কেনই বা তোমার নাম দেওয়া হয়েছিল 'মেরিনা'? মেরিনা উত্তরে বলল— আমার নাম দেওয়া হয়েছিল 'মেরিনা' কেননা আমার জন্ম সমুদ্রে। আমার মা ছিলেন এক রাজার মেয়ে, আর আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছিল আমার মায়ের— এই কাহিনী আমি অনেকবার শুনেছি আমার অতি প্রিয় ধাত্রী লাইকোরিডার মুখে— সে কাঁদতে কাঁদতে এই দুঃখের কাহিনী আমাকে প্রায়ই বলত। আমার জন্মের পর আমার বাবা আমার দেখাশোনার ভার দেন টারসাসের শাসনকর্তা ক্লিয়ন ও তাঁর স্ত্রীর হাতে। ঐ ক্লিয়নের নিষ্ঠুর স্ত্রীই আমাকে হত্যার চক্রান্ত করে, কিন্তু দৈবক্রমে একদল জলদস্যুর হাতে পড়াতে আমি রক্ষা পাই— ঐ জলদস্যুরাই আমাকে নিয়ে আসে এখানে—এই মিটিলিন শহরে। এই কথা বলতে বলতে মেরিনা লক্ষ্য করল তার শ্রোতার চোখে জল। সে জিজ্ঞাসা করল আপনার চোখে জল কেন? আপনি হয়তো ভাবছেন আমি এইসব গল্প বানিয়ে বলছি— কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি সেই মহান রাজা পেরিক্লিসেরই কন্যা— জানিনা আমার বাবা আজ জীবিত কী না। পেরিক্লিসের সারা দেহ এই অকস্মাৎ আনন্দে যেন কেমন এক ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল— তাঁর মনে সন্দেহ জাগল— এ কী সম্ভব! সহসা তিনি চিৎকার করে ডাকলেন তাঁর অনুগামীদের। জাহাজের সবাই রাজার এই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে আনন্দে ফেটে পড়ল। পেরিক্লিস হেলিকেনাসকে ডেকে বললেন— হেলিকেনাস, আঘাত কর আমার শরীরে, তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে বিদ্ধ কর আমার শরীর, যন্ত্রণা দাও আমাকে নতুবা হযতো আনন্দের এই উদ্বেলিত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ জীবনের তটরেখা ছাপিয়ে আমাকে নিমগ্ন করবে অতলে। মেরিনাকে ডেকে তিনি বললেন— ওরে এদিকে আয়, তুই-ই একদিন জন্মেছিলি সমুদ্রে, তুই-ই সমাধিস্থ হয়েছিলি টারসাসে, সেই তোকেই আবার খুঁজে পেলাম সমুদ্রেই। ওহে হেলিকেনাস, নতজানু হয়ে বোসো, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, কৃতজ্ঞতা জানাও— মেরিনাকে পাওয়া গেছে— এই-ই তোমাদের মেরিনা। মেরিনাকে বললেন—ঈশ্বর তোকে ভাল রাখুন, তোর মঙ্গল হোক। হেলিকেনাসকে ডেকে বললেন—দাও, আমাকে আমার নতুন পোশাক

দাও, প্রিয় হেলিকেনাস! ঐ দ্যাখ, মেরিনা মারা যায়নি টারসাসে-বর্বর ডায়োনিসিয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। হেলিকেনাস, তুমি মেরিনার কাছে নতজানু হয়ে বোসো, তোমার রাজকন্যা মেরিনা তার সব কথাই তোমাকে বলবে। এতক্ষণে পেরিক্লিসের চোখ পড়ল লাইসিমেকাসের দিকে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— এ কে'? হেলিকেনাস বললেন— আজ্ঞে ইনিই এই মিটিলিন নগরীর শাসনকর্তা, আপনার মানসিক অবসাদ ও বিষন্নতার কথা শুনে ইনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন পেরিক্লিস আলিঙ্গন করলেন লাইসিমেকাসকে। তারপর আবার বললেন— কই, আমার সাজপোশাক দাও— আমি তো আমার সব সম্বিত হারিয়ে ফেলেছি আমার মেয়েকে দেখে— হে ঈশ্বর। তুমি মঙ্গল কর আমার মেয়েটির। কিন্তু, তোমরা শোনো, ওই যে সঙ্গীত ভেসে আসছে— কীসের সঙ্গীত ও'? পেরিক্লিস হয়তো বা ঈশ্বরের অনুগ্রহে কোন সঙ্গীত শুনে থাকবেন, নতুবা তাঁর আনন্দের আতিশয্যে তাঁর কল্পনায় ভেসে আসছিল অশ্রুত কোন সঙ্গীত। হেলিকেনাস বললেন— কই, আমি তো কোনো সঙ্গীত শুনতে পাইনি। পেরিক্লিস বললেন— সে কী! শোননি, শুনতে পাচ্ছ না নক্ষত্রলোক থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীতধ্বনি। যেহেতু প্রকৃতই কোন সঙ্গীত শোনা যায়নি তাই লাইসিমেকাস বললেন— নিশ্চয়ই প্রবল আনন্দের আকস্মিক অভিক্ষেপে বাজা চিন্তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন — এখন আর ওঁকে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না— ওঁর যা খুশি তাই ওঁকে বলতে বা করতে দিন। অতএব এবার সকলে বলল- —হ্যাঁ, আমরাও সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি। পেরিক্লিস বললেন তার চোখ দুটি যেন কেমন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। একথা শোনামাত্র লাইসিমেকাস তাঁকে একটি আরাম কেদারায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন এবং একটি বালিশ দিয়ে দিলেন তাঁর মাথাব নিচে। তীব্র আনন্দের ক্লান্তিতে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন পেরিক্লিস— আর মেরিনা তাঁর শিয়রে বসে ব্যাগ্রভাবে তাকিয়ে রইল নিজেব পিতার মুখের দিকে।

ঘুমের ঘোরে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন পেরিক্লিস এবং তারই ফলে তাঁব মন ব্যাকুল হয়ে উঠল এফিসাসে যাওয়ার জন্যে। পেরিক্লিস স্বপ্নে দেখলেন তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছে এফিসাসবাসীদের দেবী ডায়না। ঐ দেবী তাঁকে যেন আদেশ করলেন এফিসাসে তাঁর মন্দিরে গিয়ে বেদীমূলে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের যাবতীয় দুঃখের ইতিহাস বিবৃত করতে। তাছাড়া দেবী তাঁর রূপার ধনুক স্পর্শ করে শপথ করলেন যদি পেরিক্লিস তাঁর ঐ আদেশ পালন করেন তবে অবশ্যই তাঁর ভাগ্যে দেখা দেবে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সম্ভাবনা। পেরিক্লিসের ঘুম ভেঙে গেল — যেন কোন জাদুমন্ত্রে তাঁর দেহমন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল—তিনি সকলকে ডেকে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন এবং বললেন দেবীর আদেশ অনুযায়ী এফিসাসে যাওয়ার জন্যে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প।

লাইসিমেকাস এগিয়ে এসে পেরিক্লিসকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি এফিসাসের উদ্দেশ্যে যাওয়ার আগে কিছুকালেব জন্য তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং মিটিলিনবাসীদের সামর্থ্যমত আদর আপ্যায়নে নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে আবার সমুদ্রযাত্রা করেন। লাইসিমেকাসেব সাদব অভ্যর্থনা পেরিক্লিস অস্বীকার করতে পারলেন না—স্থির হল দু-একটি দিন তিনি সেখানে অবসর যাপন করে যাবেন। সহজেই অনুমান করা যায় সেই স্বল্প অবকাশে লাইসিমেকাস কী পরিমাণ আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে সমগ্র মিটিলিন নগরীকে উৎসবমুখর করে তুলেছিলেন—আমোদ-আহ্লাদের জোয়াবে ভেসে গিয়েছিল সমগ্র দেশ, কেননা এ উৎসব ছিল লাইসিমেকাসের প্রিয়তমা মেরিনার পিতার সম্মানে—যে মেবিনাকে তিনি সামান্য ক্রীতদাসী জানা সত্ত্বেও রাণীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। লাইসিমেকাসের মনে মেরিনার প্রতি ভালবাসাব এ সংবাদে পেরিক্লিসও অখুশি হলেন না, কেননা সত্যিই তো মেরিনাকে হীন ক্রীতদাসী জেনেও সে তাকে গ্রহণ করেছে। মেরিনার দিক থেকেও লাইসিমেকাসের প্রস্তাব গ্রহণ করায় কোন আপত্তি দেখা গেল না। তবে এই বিবাহে পূর্ণ সম্মতি দেওয়ার আগে পেরিক্লিস একটি শর্ত দিলেন লাইসিমেকাসকে — তাঁকে ও মেরিনাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে এফিসাসে ডায়নার মন্দিরে। অতএব তিনজনে একসঙ্গেই জাহাজে গিয়ে উঠলেন—দেবী ডায়নার কৃপা-দৃষ্টির ফলে অনুকূল হাওয়ার বেগে জাহাজ মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নিরাপদে গিয়ে পৌঁছল এফিসাসের কূলে।

এফিসাসে ডায়নাদেবীর সেই মন্দিরের বেদীমূলে এসে দাঁড়ালেন পেরিক্লিস ও তাঁর সহযাত্রীরা। যে সেরিমন একদিন থেয়িসার প্রাণবক্ষা করেছিলেন তিনিও তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে। সেরিমন এখন বয়সের ভারে বৃদ্ধ। থেয়িসাও দাঁড়িয়েছিলেন মন্দির বেদীমূলে— ঐ মন্দিরেব পূজারিনী তিনি—দেহে তাঁব সন্ন্যাসিনীব বেশ। পেরিক্লিসকে দেখলেন থেয়িসা— যদিও দীর্ঘকালের ব্যবধানে এবং প্রিয়তমা পত্নীকে হারানোর বিয়োগব্যথায় তাঁর চেহারা অনেক কৃশ ও মলিন হয়ে গিয়েছিল তবু থেয়িসার তাঁকে চিনতে ভুল হল না। পেরিক্লিস যখন বেদীর কাছে গিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন তখন থেয়িসা স্পষ্টই বুঝতে পারলেন তাঁর কণ্ঠস্বর এবং যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে শুনতে লাগলেন তাঁর কথাগুলি। পেরিক্লিস যে-কথাগুলি বলছিলেন তা হল— দেবী ডায়না, প্রণাম জানাই তোমাকে— তোমার আদেশ পালন করার জন্যেই এই সত্য ঘটনাগুলি আমি তোমার সামনে তুলে ধরছি— আমিই টাইয়ারের রাজা পেরিক্লিস। প্রাণভয়ে আমি দেশত্যাগ করে যাই পেন্টাপোলিসে এবং সেখানেই আমার সঙ্গে বিবাহ হয় থেয়িসার। সমুদ্রযাত্রার পথে থেয়িসা জননী হয়েছিল এক কন্যাসন্তানের, সেই সন্তানের নাম মেরিনা। মেরিনাকে আমি টারসাসে রেখে গিয়েছিলাম ডায়োনিসিয়ার তত্ত্বাবধানে— সেখানে যখন তার বয়স চৌদ্দ বছর

হল তখন ডায়োনিসিয়া তাকে হত্যার চক্রান্ত করে—কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে অন্যের হাতে পড়ে এসে পড়েছিল মিটিলিনে। ঐ মিটিলিনে আবার আমিও গিয়ে পড়েছিলাম— সৌভাগ্যবশতই আমার জাহাজে উপস্থিত হয়েছিল মেরিনা এবং তার নিজের জীবনের পূর্বকথা সবই তার স্পষ্ট মনে ছিল— তারই সাহায্যে সে আমার কাছে ধরা দেয় আমার মেয়ে বলে।

পেরিক্লিসের এই কথাগুলি থেয়িসার শান্ত হৃদয়কে অকস্মাৎ এমনভাবে আন্দোলিত করে তুলল যে সে মুখে শুধু অস্পষ্ট উচ্চারণ করে বলল— তুমি, তুমি, ও রাজা পেরিক্লিস— এবং তারপর অচেতন হয়ে পড়ল। পেরিক্লিস কিছুই বুঝতে না-পেরে বললেন এই স্ত্রীলোকটি কী বলতে চায়? আরে, ও বুঝি মারাই গেল— আপনারা এগিয়ে আসুন— ওকে ধরুন। ওকে বাঁচান। সেরিমন বললেন— মহাশয়, আপনি দেবী ডায়নার পূজাবেদীতে যে কথাগুলি বললেন যদি তা সত্য হয় তবে এই মহিলাই আপনার স্ত্রী। পেরিক্লিস বললেন— মশাই, তা হতেই পারে না, আমার নিজের এই হাত দিয়ে আমি তাকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। একথা শোনার পর সেরিমন পূর্বাপর সব কথা বলতে শুরু করলেন— কেমন করে একদিন দুর্যোগের সকালে উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গে ঐ মহিলাটি এফিসাসের সমুদ্রকূলে এসে গিয়েছিল, তারপর কেমন করেই বা মৃতের কফিন খুলে তিনি দেখতে পান মনিমুক্তা ও এক টুকরো কাগজ— কেমনভাবে তিনি তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন এবং তারপর ডায়নার মন্দিরে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেরিমনের কথা শেষ হতে-না-হতেই জ্ঞান ফিরে এল থেয়িসার এবং জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলে উঠলেন— প্রভু, আপনিই তো পেরিক্লিস? ঠিক তাঁরই মতো আপনার কণ্ঠস্বর—ঠিক তাঁরই মতো সব কিছু। আপনি কী যেন বললেন— ঝড় উঠেছিল, একটি মেয়ের জন্ম, তার মায়ের মৃত্যু, তাই না? পেরিক্লিস অবাক হয়ে বলে উঠলেন – আরে এ যে আমার যে থেয়িসা মারা গিয়েছিল তারই কণ্ঠস্বর! থেয়িসা বললেন— সেই থেয়িসাই বটে— যাকে মনে হয়েছিল মৃতা বলে এবং যাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সমুদ্রে। বিস্ময় ও ভক্তির আতিশয্যে পেরিক্লিস আবেগভরে বলে উঠলেন— হে দেবী ডায়না, তোমার দেওয়া স্বপ্নই সার্থক হল। থেয়িসা পেরিক্লিসকে বললেন— হ্যাঁ, এবার তোমাকে আরো ভাল করে বুঝতে পারছি— তোমার হাতের ঐ আংটিটাই তো আমার বাবা পরিয়ে দিয়েছিলেন তোমার আঙ্গুলে—যখন পেন্টাপোলিস থেকে চোখের জল মুছতে মুছতে আমরা তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আসি। পেরিক্লিস আবার প্রার্থনা জানালেন ঈশ্বরের কাছে। তিনি বললেন— হে ঈশ্বর। তুমি আজ আমাকে যা ফিরিয়ে দিয়েছ তার জন্যে আমি অতীতের সব দুঃখকে হাসিমুখে মেনে নিলাম। এস, থেয়িসা, আরো একবার তোমার সমাধি আমার এই দুই বাহুর আড়ালে।

মেরিনা বলল, আমার মনও আনন্দে নেচে উঠছে। আমার মায়ের বুকে মাথা রাখতে পেয়ে। মেরিনার দিকে তাকিয়ে পেরিক্লিস থেয়িসাকে বললেন— দ্যাখ, নতজানু হয়ে কে তোমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তোমারই রক্তমাংস দিয়ে গড়া সমুদ্রে জন্মেছিল তোমার গর্ভে আর সমুদ্রে ওর জন্ম বলেই ওর নাম মেরিনা। থেয়িসা এগিয়ে এলেন মেরিনার দিকে, সস্নেহে ঝুঁকে পড়ে আদর করতে গেলেন তাকে। আর পেরিক্লিস ডায়না দেবীর বেদীমূলে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে বললেন— হে দেবী তুমি আমার পূজা গ্রহণ করো— তোমার দেওয়া স্বপ্নই সত্য হল। আজ থেকে প্রতি সন্ধ্যায় আমি তোমার আরতি করব। এই কথা বলার পর পেরিক্লিস থেয়িসাকে ডেকে তাঁদের কন্যা মেরিনার বিবাহ সম্পর্কে তাঁব সম্মতি নিলেন এবং এই শুভ মুহূর্তে সর্বগুণান্বিতা মেরিনাকে সম্প্রদান করলেন তার যোগ্য পাত্র লাইসিমেকাসের হাতে।

পেরিক্লিস, তাঁর রাণী এবং কন্যার এই কাহিনী হয়ে রইল ভাবীকালের কাছে এক জ্বলন্ত উদাহরণ— যারা প্রকৃত পবিত্র তারা দুর্দিনের দুর্বিপাকে পড়তে পারে। তবু যদি ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়ে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে অটুট থাকে তবে ঈশ্বরই একদিন তাদের সব দুঃখদুর্দশা মোচন করে অধিকতর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী করেন। হেলিকেনাসের চরিত্রে প্রতিভাত হল অপর এক মহত্ব--- বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও প্রভুভক্তির প্রতিমূর্তি সে, কেননা রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে প্রলুব্ধ হয়নি। আবার, মহৎপ্রাণ সেরিমনের চরিত্রে দেখলাম থেয়িসাকে পুনরায় জীবনদানের মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হল মানুষের সততা ও শিক্ষা যখন একসঙ্গে যুক্ত হয় তখন তা কেমন করে মানুষের উপকার সাধন করতে পারে এবং যে ব্যক্তির মধ্যে এই সমন্বয় ঘটে সে-ই দেবতা। আর, ক্লিয়নপত্নী শয়তানী ডায়োনিসিয়ার ভাগ্যে কী জুটল তাও আমরা দেখলাম— তার অপরাধ যেমন বীভৎস, তার শাস্তিও তেমন কঠিন, কেননা, যে মুহূর্তে টারসাসের জনসাধারণের কানে পৌঁছল ডায়োনিসিয়ার নৃশংস চক্রান্তের কথা— কেমন করে সে মেরে ফেলতে চেয়েছিল মেরিনাকে— তৎক্ষণাৎ তারা দলবদ্ধ হয়ে উন্মত্তের মত আগুন লাগিয়ে দিল ক্লিয়নের প্রাসাদে— সেই আগুনে পুড়ে শেষ হল ক্লিয়ন ও তার স্ত্রী ডায়োনিসিয়া— পুড়ে গেল সমগ্র প্রাসাদ। স্বর্গলোক থেকে ঈশ্বরেরা এই ধ্বংসলীলায় আনন্দিতই হলেন— কেননা অভিসন্ধিপ্রণোদিত এক নৃশংস হত্যার চক্রান্ত — যদিও তা সার্থক হয়নি— তবু এমন শাস্তিই তার যোগ্য প্রাপ্য।

রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট

ক্যাপুলেট আর মন্টেগু ভেরোনার দুই প্রধান ধনী পরিবার। ওদের মধ্যে একটা পুরানো ঝগড়া ছিল। এই ঝগড়া এমন এক পর্যায়ে ওঠে আর ওদের মধ্যে শত্রুতা এমন মারাত্মক রূপ নেয় যে উভয়পক্ষের আত্মীয়-পরিজন এমনকি নামমাত্র অনুগামী আর পোষ্যদের মধ্যেও তা সংক্রামিত হয়। মন্টেগু পরিবারের কোন চাকরই ক্যাপুলেট পরিবারের কোন চাকরের সঙ্গে কিংবা কোনো ক্যাপুলেট কোন মন্টেগুর সাথে দৈব্যৎ দেখাসাক্ষাৎও করতে পারত না ; ওদের দেখা হওয়ামাত্রই অশালীন বাকবিনিময় চলত আর কখনও কখনও তা খুনখারাপিতেও পর্যবসিত হত। এরকম দৈব্যৎ দেখাসাক্ষাৎ-এর ফলে ঝগড়াঝাটি ও মারামারি লেগেই থাকত, আর ভেরোনার রাস্তাঘাটের শান্তিও তার ফলে প্রায়শঃই ব্যাহত হত।

এরই মধ্যে একদিন বৃদ্ধ লর্ড ক্যাপুলেট এক বিশাল সান্ধ্য ভোজের আয়োজন করলেন। ভোজসভায় অনেক সুন্দরী রমণী আর সম্মানী অতিথিরা আমন্ত্রিত হলেন। ভেরোনার সমস্ত নামকরা সুন্দরীরাই হাজির হলেন আর মন্টেগু পরিবার ভিন্ন অন্যসকল অভ্যাগতদেরই অভ্যর্থনা জানানো হোল। ক্যাপুলেটদের এই ভোজে বৃদ্ধ লর্ড মন্টেগুর পুত্র রোমিও-র কাম্য প্রণয়িনী রোজালিনও উপস্থিত হোল। যদিও এরকম একটা সমাবেশে একজন মন্টেগুর উপস্থিতি তার পক্ষে বিপজ্জনক, তবুও রোমিও-র বন্ধু বেনভোলিও তাকে বলল — আরে তুমি মুখোশের ছদ্মবেশে ওখানে যেও আর এতে তুমি তোমার রোজালিনকেও দেখতে পাবে এবং যখন ওকে দেখে ওর সাথে ভেরোনা নগরীর বাছাই করা সমস্ত সুন্দরীর সঙ্গে তুলনা করবে তখন তোমার মোহ ঘুচে যাবে — তোমার মনে হবে যে তোমার রাজহংসী এক সামান্য কাকের মতই তুচ্ছ।

বেনভোলিও-র কথায় খুব একটা বিশ্বাস রোমিও-র ছিল না। তবুও রোজালিনের প্রতি ভালবাসার টানে সে যেতে রাজী হল। রোমিও ছিল একজন খাঁটি, আবেগপ্রবণ প্রেমিক। কেননা যে রোজালিন তাকে তাচ্ছিল্য করত, যে রোজালিন তার ভালবাসাকে কখনও মূল্যই দিল না, সামান্যতম শিষ্টাচার কিংবা প্রীতিও দেখাল না সেই রোজালিনের কথা ভেবে ভেবে ভালবাসার টানে সে ঘুম হারিয়েছিল, আর সবাইকে ছেড়েছুড়ে বেছে নিয়েছিল এক নিঃসঙ্গ ও একাকী জীবন। নানাধরনের নারী আর সঙ্গ দেখিয়ে বেনভোলিও চেয়েছিল ওর বন্ধুকে এই ভালবাসা থেকে মুক্ত করতে, সেই উদ্দেশ্যেই বেনভোলিও যুবক রোমিও আর ওদের এক বন্ধু মারকিউসিয়ো মুখোশ পরে ক্যাপুলেটদের এই ভোজসভায় এল। বৃদ্ধ ক্যাপুলেট ওদের অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি বললেন, — ওহে সুন্দরীরা আপনাদের পায়ের কড়া যদি আপনাদের না

স্থালায় তাহলে ওদের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিন। দিলখোলা আর আমুদে বৃদ্ধ আরও বললেন—দেখুন আমার কাঁচা বয়সে আমি মুখোশ পড়ে সুন্দরী নারীর কানে কানে এক চোট গপ্পোও করে নিতে পারতাম। এরপর ওরা নাচে মেতে উঠল। এমন সময় নৃত্যরতা এক নারীর অসামান্য রূপমাধুরী হঠাৎ রোমিও-কে বিমুগ্ধ করল। ওর মনে হল মেয়েটি যেন মশালকে শিখিয়ে দেবে উজ্জ্বলতা কাকে বলে। কৃষ্ণাঙ্গীর পরণে যেমন মহামূল্যবান আভরণ ঠিক তেমনিই রজনীতে ওর রূপচ্ছটা—এই স্বর্গীয় রূপমাধুরী যেন অন্য এক জগতের — দৈনন্দিনতার গ্লানি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ওর সৌন্দর্য ওর সঙ্গিনীদের মধ্যে এখনই উজ্জ্বল যে রোমিও তো বলেই উঠল—তুমি যেন বায়সকুল এক তুষারশুভ্র কপোত। যখন ও এই প্রশংসাসূচক কথাগুলো উচ্চারণ করছিল লর্ড ক্যাপুলেটের ভাইপো টাইবল্ট তা শুনতে পেল। ও জানত এ রোমিওরই গলার আওয়াজ। আর এই রগচটা আর বদমেজাজী টাইবল্ট—মুখোশের আড়ালে একজন মন্টেগুর আগমন সহ্য করতে নারাজ, কেননা, তার মনের বদ্ধমূল বিশ্বাস তাদের উৎসবের পবিত্রতা কলুষিত হয় মন্টেগু পরিবারের অবজ্ঞা মিশ্রিত উপস্থিতির ফলে। টাইবল্ট ক্ষোভে ও ক্রোধে ফেটে পড়ল। যুবক রোমিও-কে তো সে মেরেই ফেলতো। কিন্তু তার জ্যেষ্ঠতাত বৃদ্ধ লর্ড ক্যাপুলেটের ইচ্ছা নয় যে ঐ উৎসবের মধ্যে টাইবল্ট কোন মারামারি করুক—উপস্থিত অতিথিবৃন্দের প্রতি তা সম্মানজনক নয়। তাছাড়া রোমিওর আচরণে ছিল স্বভাব শালিনতা, যার ফলে সমগ্র ভেরোনার মানুষ তাকে একবাক্যে প্রশংসা করত অতি সৎ ও মধুর স্বভাবের যুবক বলে। এর ফলে টাইবল্ট—তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুপ করে থাকতে এবং নিজেকে সংযত করতে বাধ্য হল। কিন্তু মনে মনে শপথ নিয়ে বলে উঠল —অনধিকারে প্রবেশ করার জন্য অন্য কোন সময় এই জঘন্য মন্টেগুকে যথোচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।

নাচ সমানেই চলছিল, মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেইখানটায় দৃষ্টি পড়ল রোমিওর, মুখোশ নেওয়ার সুবিধায় সে ওর হাত আলতোভাবে ধরার ঝুঁকি নিল। ও বলে উঠল—তোমার হাত আমার কাছে পবিত্র তীর্থস্থান, যদি আমি ওই হাত ছুঁয়ে অপবিত্র করি তবে আমি লজ্জায় রাঙা এক তীর্থযাত্রী আর সেইজন্য প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে আমি তোমার করপল্লবে এঁকে দেব চুম্বন।

মেয়েটি উত্তরে বলল, —হে পবিত্র তীর্থযাত্রী, সন্দেহাতীতভাবে আপনার ভক্তিপ্রবণতা অতিরিক্ত বিনয়ী আর শিষ্টাচারসম্পন্ন। সাধুদের হাত তীর্থযাত্রীর ছুঁতে পারে কিন্তু চুম্বন করতে পারে না।

রোমিও বলল—কিন্তু সাধুসন্তদের কিংবা তীর্থযাত্রীরা তো দুটি ঠোঁটও থাকে?

হ্যাঁ তা থাকে বটে, মেয়েটি বলল, তবে সেই ঠোঁট দুটি এরা ব্যবহার করে প্রার্থনার উদ্দেশ্যেই।

রোমিও বলল—তবে ওহে আমার প্রিয় পবিত্র নারী, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর, আমায় হতাশ কোরো না।

এই রকম পরোক্ষ উল্লেখ আর প্রেমপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় ওরা মেতে উঠল, এরপর তার মা ডাকার জন্যে মেয়েটি চলে গেল। ওর মায়ের পরিচয় খোঁজ নিতে গিয়ে রোমিও জানতে পারল যে, যে নারীর অতুলনীয় রূপমাধুরীতে সে মুগ্ধ হয়েছিল সেই মেয়েটি মণ্টেগু পরিবারেরই প্রধান শত্রু লর্ড ক্যাপুলেটের কন্যা ও উত্তরাধিকারী যুবতী জুলিয়েট। আর এইভাবেই ও তার হৃদয় নিজের অজান্তেই তার শত্রুকে দিয়ে বসেছে। এহেন ঘটনা ওকে খুবই অসুবিধায় ফেলল, কিন্তু তবু তাকে ভালবাসা থেকে নিরস্ত করতে পারল না। অন্যদিকে জুলিয়েটও জানতে পারল যে, সে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল সে মণ্টেগু পরিবারেরই রোমিও। এই রোমিও যখন ভালবাসার উপঢৌকন নিয়ে তার সম্মুখে হাজির হয় তখনই রোমিওর প্রতি হঠাৎই এক হঠকারী, অবিবেচক গভীর প্রণয় তাকে সজোরে নাড়া দেয়। ওর মধ্যে এক বিশাল বিস্ময়কর ভালবাসার যেন জন্ম হল। যদিও পারিবারিক বিবেচনায় রোমিও-কে দারুণ ঘৃণা করাই তার উচিত তবুও সে ঠিক করল সে তার শত্রুকে ভালবাসবে। তার প্রেম ও ভালবাসা রোমিওর প্রতি অটল থাকবে।

এরপরের ঘটনা ঘটল সেদিন মাঝরাতে। রোমিও তার সঙ্গীসাথীসহ বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু সঙ্গীরা শীঘ্রই রোমিওকে হারিয়ে ফেলল। কেননা যে গৃহে তার প্রেমাস্পদ রয়েছে সেখান থেকে রোমিও আর দূরে এগোতে পারে নি। তাই জুলিয়েটের বাড়ির পিছনের ফলবাগানের প্রাচীর সে টপকালো এবং তার নতুন প্রেম নিয়ে সে গভীরভাবে চিন্তায় মশগুল হয়ে পড়ল। এইভাবে বেশীক্ষণ কাটেনি। এমন সময় উপরের জানালায় জুলিয়েটকে দেখা গেল। আর মনে হল যেন পূর্বাকাশে সূর্যালোকের মত ওর অপরূপ রূপচ্ছটা ওই জানালার মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হল। রোমিওর মনে হল এই নতুন সূর্যের অধিকতর ঔজ্জ্বল্যে ফলবাগানে স্তিমিত আলোয় উদ্ভাসিত চাঁদ বুঝিবা ম্লান আর বিবর্ণ হয়ে পড়ল। জুলিয়েট তার হাতের উপর চিবুক রেখে ঝুঁকে ছিল। রোমিও ভাবল হায় যদি আমি ওর হাতের দস্তানা হতাম তাহলে ওর চিবুকের স্পর্শ আমি পেতাম। এতক্ষণ জুলিয়েট নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছিল আর জুলিয়েটের ঐ নিঃসঙ্গতায় তার অজ্ঞাতেই এক গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সে নিজের মনেই বলে উঠল—হায় আমি কত হতভাগ্য! ওই কথাটুকু শোনামাত্র রোমিও আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ল এবং ও যাতে না শুনতে পায় এমন মৃদুস্বরে বলল — যেমন স্বর্গের পক্ষযুক্ত দূতকে দেখে মানুষ পিছু হটে যায়, তেমনি আমার মাথার উপরে থাকা হে উজ্জ্বল দেবদূত কথা কও, কথা কও। জুলিয়েট জানত না যে রোমিও তার কথা শুনতে পেয়েছে। তার দেহমন তখন ঐ রাতের অপ্রত্যাশিত ঘটনাতে এক গভীর প্রণয়ে পরিপূর্ণ ছিল। তার প্রিয়-র নাম ধরে ডেকে (রোমিও

যে ওখানে উপস্থিত, তা সে জানত না) সে বলে উঠল—ও রোমিও, রোমিও কোথায় তুমি রোমিও? আমাকে পাওয়ার জন্য তুমি তোমার বাবার কথার অবাধ্য হও। তোমার নামও পরিত্যাগ কর—আর তা যদি না পার তবে শুধু আমার নিখাদ, নিটোল ভালবাসা হও এবং আমিও আর ক্যাপুলেট রইব না। এই উৎসাহ পেয়ে রোমিও তো তক্ষুনি কথাই বলে ফেলত, কিন্তু সে আরও শুনতে আগ্রহী ছিল। মেয়েটি আনমনে গভীর ভালবাসার কথাবার্তা বলতে থাকল। সে রোমিওকে রোমিও আর মন্টেগু হওয়ার জন্য তখনও পর্যন্ত তিরস্কার করছিল। সে চাইছিল রোমিও-র যেন অন্য কোন নাম থাকে অথবা ওই ঘৃণ্য নাম যেন সে পরিত্যাগ করে, আর শুধু নতুন নাম যেটি তার সত্ত্বার কোনো অংশই নয় তার মাধ্যমে রোমিও জুলিয়েটকে সম্পূর্ণভাবে পেতে পারে। এই ভালবাসাবিভোর কথায় রোমিও আর ঠিক থাকতে পারল না। কথাগুলিকে সে ব্যক্তিগতভাবে তারই উদ্দেশ্যে বলা বলে ধরে নিল। শুধু নিজের মনে মনেই নয়, সে জুলিয়েটকে মুখেও বলে দিল—যদি তোমার ও নাম ভাল না লাগে তবে আমি আর রোমিও ই নই। তুমি আমায় 'ভালবাসা' বলে ডেকো অথবা তোমার ভাললাগা অন্য যে কোন নামেই আমায় ডেকো। বাগানে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে জুলিয়েট ভয় পেল। রাত্রের অন্ধকারের জন্য সে প্রথমটায় তো বুঝতেই পারল না কার কণ্ঠস্বর। যদিও ওর বাকমাধুর্যের সঙ্গে জুলিয়েটের শ্রবণেন্দ্রিয় তখনও পরিচিত নয় তথাপি প্রেমসত্ত্বার শ্রবণশক্তি এতই প্রখর যে রোমিও যখন আবার কথা বলল তখন তার আর বুঝতে বাকী রইল না যে সে যুবক রোমিও-ই। রোমিও যে বিপদ মাথায় করে ফলবাগানের প্রাচীর বেয়ে উঠেছিল তার জন্য জুলিয়েট একটু বকাবাকও করল। কেননা যদি ওখানে তাকে জুলিয়েটের কোনো আত্মীয় দেখতে পেত তবে মন্টেগু হওয়ার কারণে রোমিওকে মরতে হত। রোমিও বলে উঠল — হায় প্রিয়ে, কুড়িটা তারোয়ালের চেয়েও বেশী বিপদ তো তোমার ওই দুটি চোখে। হে নারী, তুমি কেবল আমায় করুণাভরা দৃষ্টিতেই দেখবে? দেখ আমি ওদের শত্রুতাকে তুড়ি মারার ক্ষমতা ধরি। তোমার ভালবাসা ছাড়া সুদীর্ঘ এক ঘৃণ্য জীবন যাপনের চেয়ে ওদের ঘৃণায়, ওদের শত্রুতায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়াও অনেক ভাল।

জুলিয়েট বলল—তুমি এখানে এলে কি করে? কেই বা পথ দেখাল?

উত্তরে রোমিও বলে উঠল—আমার ভালবাসাই আমায় পথ দেখাল।

রোমিওর প্রতি ভালবাসা আবিষ্কার করে জুলিয়েট উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু তখন ছিল রাতের অন্ধকার তাই রোমিও এসব কিছুই দেখতে পেলনা। রোমিওর কথাগুলো আবার শোনার জন্য জুলিয়েটের খুব ইচ্ছা করছিল। কিন্তু তা তো অসম্ভব। বিচক্ষণ মেয়েদের স্বাভাবিক রীতিতে অনিচ্ছার ভাণ দেখিয়ে সে তার প্রেমিককে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতো। এই সেয়ানা মেয়েরা

তাদের প্রণয়প্রার্থীদের প্রথমে কর্কশভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তাদেরকে পাওয়া যে অত সোজা নয় — এটা বোঝাবার জন্য ওরা কৃত্রিম লজ্জা আর উদাসীনতার আশ্রয় নেয় আর দূরে সরে থাকে। কেননা কোন জিনিসের মূল্য তখনই বাড়ে যখন তা পেতে অসুবিধা হয়। কিন্তু জুলিয়েটের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান অথবা বিলম্ব অথবা প্রলম্বিত পাণিপ্রার্থনা-এর কোন প্রথাগত কায়দাকানুনেব অবকাশ ছিল না। যখন সে স্বপ্নেও জানত না যে রোমিও তাবই কাছে রয়েছে, তখন রোমিও জুলিয়েটের মুখ থেকেই তার ভালবাসার স্বীকারোক্তি শুনেছে। অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিব এই অনভিপ্রেত অবস্থার মধ্যে রোমিও পূর্বে যা শুনেছে তা জুলিযেট খোলাখুলি স্বীকার করল এবং তাকে সম্বোধন করল 'প্রিয় মণ্টেগু' বলে (ভালবাসার গুণে কত তিক্তই না মধুর হয়) এবং সে রোমিও কে অনুনয় করে বলল সে যেন তার এই সহজ ভালবাসাকে এক নিম্নমনা নারীব চপলতা বলে ভুল না করে এবং যেন এই ভুলটুকুর জন্যে—যদি একে ভুল বলে মনে হয়—সে দায়ী করে আজ রাতের এই আকস্মিক ঘটনার উপলক্ষ্যটিকে। সে আরও বলল — নারীর স্বভাবের নিরিখে তোমাব প্রতি আমার ব্যবহার যথেষ্ট বিচক্ষণ নাও হতে পারে, তবুও আমি প্রমাণ করে দেব যে অনেকেব কপটতায় বিচক্ষণতার চেয়ে আমি অনেক খাঁটি আর সত্য। এও প্রমাণ করে দেবো যে, ওদের বিনয় শুধু কৃত্রিমতা আর চাতুর্যে ভবা।

এই দৃশ্য দেখবাব জন্য রোমিও সমগ্র আকাশ বাতাস সবকিছুকে আমন্ত্রণ জানাল। যদিও জুলিয়েট রোমিওকে পেয়ে দারুণ আনন্দ পেয়েছে তবুও সে রোমিওকে বলল—না না, তুমি চুপ কর এই মুহূর্তে ভালবাসার শপথ নিয়ো না। একথা সত্যি রাতের এই দেখাটুকু জুলিয়েটকে আনন্দে অভিভূত করেছিল, কিন্তু তার মনে কোথায় যেন কাঁটার মত বিঁধছিল একটা বোধ, তার মনে হচ্ছিল যত মধুরই হোক তবুও এ বড় হঠকারী ও অবিবেচনাপ্রসূত এবং অতিমাত্রায় আকস্মিক। কিন্তু রোমিও জুলিয়েটের সঙ্গে সেই রাতেই প্রেম অঙ্গীকাব বিনিময়ের জন্য উতলা হয়ে উঠেছিল। তাই জুলিয়েট বলল তুমি আমায় অনুরোধ করার আগেই আমি তোমায় আমার প্রেমের অঙ্গীকার দিয়েই দিযেছি। বলাই বাহুল্য রোমিও তার এই স্বীকারোক্তি আগেই আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছিল। জুলিয়েট আরও বলল—তোমায় দেওয়ার আনন্দে তোমায় তখন যা দিয়েছি তা আবারও ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, কেননা আমার দান সাগরের মতই অসীম আর আমার প্রেম অতলান্ত সমুদ্রের মতই গভীর।

তখন প্রায় ভোর হয় হয়, এই সময়টা তার বিছানায় থাকার সময় — এই ভেবে জুলিয়েটের পরিষেবিকা (যে তার সঙ্গেই একই ঘরে শয়ন করত।) জুলিয়েটকে ডেকে নিয়ে গেল। কিন্তু ও খুব তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এল। সে রোমিওকে আরও কয়েকটি কথা বলল, যার সারবত্তা হল এই যে যদি তার ভালবাসা সত্যিই সম্মানের যোগ্য হয় আর সে যদি তাকে বিয়ে করতে চায় তবে বিয়ের দিনক্ষণ

ঠিকঠাক করার জন্য জুলিয়েট আগামীকাল তার কাছে এক দূত পাঠাবে আর সেই নির্দিষ্ট দিনে রোমিওর পায়ে সে তার প্রাণমণ, সঁপে দেবে ও তারই হাতে এই পৃথিবীতে নিজের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ করে ভারমুক্ত হবে। যখন ওরা এই ব্যাপারটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল তখন পরিষেবিকা জুলিয়েটকে আবার ডাকল। জুলিয়েট ভেতরে গেল আর ফিরেও এল। আবারও সে ভেতরে গেল কিন্তু পুনরায় ফিরে এল। ঠিক যেমন একটা ছোট্ট মেয়ে তার হাত থেকে পাখীটাকে একটু উড়তে দিয়েই আবার তাকে তার রেশমী সুতো দিয়ে টেনে ফিরিয়ে আনে ঠিক তেমনি সেও রোমিওকে চোখের আড়াল করতে পারছিল না আর তার জুলিয়েটকে ছেড়ে আসতে রোমিও-রও মন চাইছিল না। রাত্রিতে ওরা একে অন্যের সঙ্গে যে কথাবার্তা বলছিল তার শব্দই ওই প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে মধুরতম সঙ্গীত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরস্পরের জন্য মিষ্টি ঘুম আর বিশ্রাম কামনা করে ওরা ওই রাতের মত একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিল।

যখন ওদের এই প্রথম প্রণয় পর্বের শেষ হল তখন সকাল হয়ে আসছিল। রোমিও তার প্রেয়সী আব ঐ সৌভাগ্যজনক সাক্ষাৎ-এর ভাবনায় এমন মশগুল হয়ে পড়েছিল যে তার ঘুমই আসছিল না। বাড়ি যাওয়ার পরিবর্তে খ্রীষ্টান ভিক্ষু লরেন্সের খোঁজে সে উপাসনালয়ে যেতেই মনস্থ করল। ইতিমধ্যেই সেই সজ্জন খ্রীষ্টান ভিক্ষু তাঁর আরাধনা সেরে ফেলেছেন, কিন্তু এত সকালে রোমিওকে বাইরে দেখে তিনি ঠিকই ধরেছিলেন যে সে ঐ রাতে ঘুমোয়নি আর তারুণ্যের আবেগজাত অসুস্থতাই তাকে জাগিয়ে রেখেছিল। প্রেমই যে তার জাগরণের কারণ এই অনুমানও তিনি ঠিকই করলেন। কিন্তু কার সঙ্গে তার প্রেম—এই অনুমান করতে তার ভুল হল, কেননা, তিনি ভেবেছিলেন রোজালিনের প্রতি ভালবাসাই তাকে নিদ্রাহীন রেখেছিল। কিন্তু যখন জুলিয়েটের সঙ্গে তার নতুন ভালবাসার কথা রোমিও জানাল আর খ্রীষ্টান ভিক্ষুটিকে ওই দিনই তাদের বিয়ের বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ করল তখন রোমিওর প্রেমের হঠাৎ পরিবর্তনে সাধুটির তো বিস্ময়ের অবধি রইল না, কেননা রোজালিনের প্রতি রোমিও-র ভালবাসার কথাই তিনি একান্তভাবে জানতেন আর রোজালিনের তাচ্ছিল্যের বিরুদ্ধে রোমিও তাঁর কাছে অনেক সময় অভিযোগও জানাত। তিনি তো বলেই উঠলেন — যুবকদের ভালবাসা মনে হয় চোখেই থাকে। কিন্তু রোমিও প্রত্যুত্তরে জানাল --- দেখুন, রোজালিন যে কীনা আমাকে কোনদিনই ভালবাসতে পারল না তাকে অন্ধভাবে ভালবাসার জন্য আমি প্রায়ই নিজেকে তিরস্কার করেছি, অন্যদিকে দেখুন, জুলিয়েট আমাকে ভালবাসে আর আমিও ওকে ভালবাসি। তার যুক্তিতে সজ্জন ব্যক্তিটি কিছুটা সম্মত হলেন। তিনি ভাবলেন যুবক রোমিও আর যুবতী জুলিয়েটের বৈবাহিক সম্পর্ক ক্যাপুলেট আর মন্টেগুদের মধ্যেকার বহুদিনের বিরোধ সুন্দরভাবে মিটমাট হয়ে যাওয়ার একটা উপায় হবে। দুই পরিবারের

বন্ধু এই সজ্জন সাধুটি ওই দুই পরিবারের বিরোধে অন্যদের থেকে বেশীই দুঃখ পেয়েছিলেন। কিভাবে সহজেই ওদের কলহ মিটিয়ে ফেলা যায় তাই নিয়ে তিনি প্রায়ই গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতেন। আবার রোমিও তাঁর এতই প্রিয় ছিল যে তাকে তিনি কোন কিছুতে নাও বলতে পারতেন না মূলতঃ এই দুই কারণেই বৃদ্ধ লোকটি বিবাহের মাধ্যমে তাদের দুটি হাত এক করে দিতে সম্মত হলেন।

ভাগ্যদেবী এতদিনে সত্যিই মুখ তুলে চাইলেন রোমিওর দিকে। আর জুলিয়েট তার কথামতো পাঠানো দূত মারফত রোমিওর অভিপ্রায় জেনে সময় নষ্ট না করে সাধু লরেন্সের কক্ষে উপস্থিত হল। ওখানেই তাদের পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। এই সজ্জন ভিক্ষুটি দেবলোকে প্রার্থনা জানালেন যেন তাবা আশীর্বাদ বর্ষণ করেন এই দুটি প্রাণীর প্রতি। আর এই যুবক মন্টেগু আর যুবতী ক্যাপুলেটের মিলনে দেবতারা যেন তাদের পরিবারের পুরানো শত্রুতা আর বহুদিনের বিবাদের অবসান ঘটান।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর জুলিয়েট দ্রুত ফিরে গেল তার বাড়িতে আর অস্থির চিত্তে রাত্রেব জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। কেননা বোমিও কথা দিয়েছিল যে গতরাতে ফলবাগানে যেখানে ওদের দুজনের দেখা হয়েছিল সেখানেই আজ রাতে সে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কিন্তু বড দীর্ঘ মনে হচ্ছিল এই অন্তর্বর্তী সময়টুকু তার কাছে---যেন এক অশান্ত শিশুর কাছে এক মস্ত উৎসবের রাতের প্রাক্ মুহূর্ত। রাতটুকু সে আঁকড়ে ধবে রাখতে চায়---সে রাতের শেষে ফুরিয়ে যাবে তার নতুন নতুন সব খেলনাগুলো, তার নতুন পোশাক-আশাক।

সেইদিনই দুপুর নাগাদ রোমিওর বন্ধু বেনভোলিও আর মারকিউসিয়ো যখন ভেরোনার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন ওদের সঙ্গে ক্যাপুলেটদের দলবলের দেখা হল। আর ওই ক্যাপুলেটদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিল বলদৃপ্ত টাইবল্ট। এই রগচটা টাইবল্টই বৃদ্ধ লর্ড ক্যাপুলেটের ভোজসভায় বোমিওর সঙ্গে মারামারি করতে যাচ্ছিল। মারকিউসিয়োকে দেখে মন্টেগু পরিবারের রোমিওর সাথে জড়িত থাকার অপরাধে সে মারকিউসিয়োকে রুক্ষভাবে দোষারোপ করতে শুরু করল। টাইবল্টের মতো মারকিউসিয়োরও ছিল কড়া মেজাজ। তাই টাইবল্টের দোষারোপ ও অভিযোগের একটা ধারালো জবাবও সে তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিল। তাদের ক্রোধ সংবরণ করাবার জন্য বেনভোলিও-র হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ঝগড়া বেধেই গেল। আর ঠিক এই সময় রোমিও ওই পথ দিয়েই যাচ্ছিল। ক্রুদ্ধ টাইব ট মারকিউসিয়োকে ছেড়ে দিয়ে রোমিও-র উপর পড়ল আর ওকে পাজী হতভাগা ইত্যাদি যাচ্ছেতাই বলে অপমানও করল। যেহেতু টাইবল্ট জুলিয়েটের আত্মীয় আর জুলিয়েট রোমিওকে দারুণ ভালবাসে তাই রোমিও টাইবল্টের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি এড়াতেই চাইছিল। এছাড়া এই মন্টেগু যুবক কোনদিনই পারিবারিক ঝগড়ায় তেমনভাবে অংশ নেয়নি। প্রকৃতিগতভাবে

রোমিও ছিল বুদ্ধিমান আর ভদ্র। তাই একজন ক্যাপুলেটের পদবীর (যা কীনা ওর প্রেয়সীরই) কথা মনে পড়াতে সে ক্রোধে উন্মত্ত তো হলই না বরং ওই ক্যাপুলেট শব্দটি—এখন তার কাছে ক্রোধ উপশমের এক জাদুমন্ত্র হয়ে উঠল। তাই সে টাইবল্টকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে লাগল। সে তাকে 'সজ্জন ক্যাপুলেট' বলে নম্রভাবে নমস্কার জানালো। নিজে মণ্টেগু হলেও ঐ নাম উচ্চারণ করতে সে যেন গোপণ আনন্দ খুঁজে পেল। কিন্তু টাইবল্ট সমস্ত মণ্টেগুদেরই নরকের মত ঘৃণা করত। তাই সে কোনো যুক্তিতর্কোই শুনলো না, সে তার অস্ত্র বের করল। মারকিউসিয়ো রোমিওর মনে টাইবল্টের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের এই গোপণ অভিপ্রায় সম্পর্কে জানতো না। ওর এই চুপ করে থাকাটা একধরনের শান্ত অসম্মানজনক আত্মসমর্পণ বলেই মারকিউসিয়ো মনে করল। অনেক অবজ্ঞাসূচক কথাবার্তা বলে মারকিউসিয়ো টাইবল্টকে প্ররোচিত করল। ফলে টাইবল্ট আর মারকিউসিয়ো মারপিট শুরু করে দিল। রোমিও আর বেনভোলিও ওদের দু'জনকে ছাড়াবার বৃথাই চেষ্টা করল। মারকিউসিয়ো মারাত্মক আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এবার আর রোমিও মেজাজ ঠিক রাখতে পারলো না। টাইবল্ট যেভাবে যাচ্ছেতাই বলে রোমিও-কে অপমান করেছিল ঠিক সেভাবেই রোমিও ওকে প্রত্যুত্তর দিল। উত্তর প্রত্যুত্তর ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পৌঁছে গেল লড়াই এ এবং বহুক্ষণ লড়াই এর পর টাইবল্ট রোমিও-র হাতে নিহত হল। দুপুরবেলা ভেরোনা নগরীর মধ্যস্থলে এই মারাত্মক ঝগড়ার ঘটনায় ঐস্থানে ধীরে ধীরে জমে উঠল ভিড়— জনতার মধ্যে বৃদ্ধ লর্ড ক্যাপুলেট আর মণ্টেগু এবং তাদের পত্নীরাও ছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হলেন রাজা স্বয়ং। টাইবল্ট যাকে হত্যা করেছিল সেই মারকিউসিয়ো ছিল রাজার আত্মীয়। মণ্টেগু আর ক্যাপুলেটদের বারবার কলহে তাঁর সরকারের শান্তি প্রায়ই বিঘ্নিত হয়। তাই তিনি এবার ঠিকই করে এসেছিলেন যে, যে পক্ষ দোষী সাব্যস্ত হবে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করবেন। ঘটনাটির উৎস জানাবার জন্য এই কলহের প্রত্যক্ষ সাক্ষী বেনভোলিও-কে ডাকা হল। বেনভোলিও সাক্ষ্য দিল। যতদূর সম্ভব সত্য ঘটনাই সে সবিস্তারে বর্ণনা করল, তবে তার বর্ণনার ফলে রোমিও-র যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেটুকু সে সাবধানে বলল। তাছাড়া উপস্থিত অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের যাতে হয়রানি হতে পারে এমন কিছুও সে উল্লেখ করল না। নিজের বংশোদ্ভব আত্মীয় টাইবল্টকে হারানোর তীব্র শোকের ফলে লেডি ক্যাপুলেট যেন প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে উঠলেন— টাইবল্টের হত্যাকারীর উপর কঠোর ন্যায়বিচার করার জন্য তিনি রাজার কাছে একান্ত অনুরোধ জানালেন। বেনভোলিও যেহেতু রোমিওর বন্ধু আর সে নিজেও একজন মণ্টেগু তাই ওর সাক্ষ্য পক্ষপাতমূলক— এই অভিযোগ জানিয়ে লেডি ক্যাপুলেট অনুরোধ জানালেন রাজা যেন বেনভোলিও-র বিবৃতিকে কোন পাত্তা না দেন। এইভাবেই নিজেরই

অজান্তে জুলিয়েটের স্বামী অর্থাৎ তার নতুন জামাই-এর বিরুদ্ধেই লেডি ক্যাপুলেট সওয়াল করে বসলেন। অন্যদিকে লেডি মণ্টেগু তার পুত্রের জীবন বাঁচানোর জন্য সওয়াল করতে লাগলেন। যুক্তি তক্কো দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে টাইবল্টকে হত্যা করে রোমিও কোনও শাস্তিযোগ্য অপরাধই করেনি। কেননা, টাইবল্ট মারকিউসিয়োকে হত্যা করার অপরাধে নিজেই অপরাধী। আবেগের আতিশয্যে মহিলাদের চীৎকার অথবা হাহুতাশে রাজাকে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখা গেল না। তিনি সমস্ত ঘটনা অতি সাবধানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁর রায় দিলেন। ঐ রায় অনুসারে ভেরোনা নগরী থেকে নির্বাসিত হতে হল রোমিওকে।

কিশোরী জুলিয়েটের কাছে বড় মর্মান্তিক এই সংবাদ। এই আদেশ জারির ফলে মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে বিবাহিত নববধূ জুলিয়েট যেন চিরকালের জন্য বিবাহবিচ্ছিন্না হয়ে গেল। কিন্তু যখন সমস্ত খবরাখবর তার কাছে পৌঁছাল তখন তার প্রিয় খুল্লতাতকে হত্যার কারণে রোমিও-র প্রতি সে প্রথমটায় দারুণ ক্রুদ্ধ হল। সে তাকে গাল দিতে লাগল এক কপট সুদর্শন অত্যাচারী বলে- দেবদূতের সৌন্দর্যের আড়ালে যেন এক শয়তান, হিংস্র ও লোলুপ কপোত, নেকড়ের স্বভাববিশিষ্ট মেষ, কুসুমকোমল মুখমণ্ডলের আড়ালে যেন ক্রূর এক বিষধর এরকম আরও কত কী পরস্পরবিরোধী নামে সে রোমিওকে গালাগাল দিল। আর মনের মধ্যে একদিকে প্রেম আর অন্যদিকে ক্ষোভ এই দুই এর যে সংগ্রাম চলছিল তারই প্রকাশ তার এই ব্যবহারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পেল প্রেমই। টাইবল্টের হাতে যে তার স্বামী মারাও যেতে পারত তাই তার স্বামী যে বেঁচে আছে এই আনন্দে যে অশ্রু সে তার খুল্লতাত নিহত টাইবল্টের জন্য ফেলেছিল সেই অশ্রুই আনন্দাশ্রুতে পরিণত হল। পরক্ষণেই আবার রোমিও-র নির্বাসনের শোকে তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। অনেক অনেক টাইবল্টের মৃত্যুর খবরের চেয়েও ঐ শব্দটি অর্থাৎ রোমিও-র নির্বাসন - এই কথাটি তার কাছে অনেক বেশী ভয়াবহ হয়ে উঠল।

মারামারি ও হানাহানির পরই রোমিও নিজে আশ্রয় নিল সন্ন্যাসী লরেন্সের কুটীরে আর সেখানে গিয়েই সে যখন রাজার দণ্ডাজ্ঞার কথা শুনতে পেল তখন তার মাথায় যেন বাজ পড়ল, এ শাস্তি যেন তার মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। ভেরোনা নগরীর প্রাচীরের ওপারে কোন বিশ্ব বা জুলিয়েটের দৃষ্টির বাইরে কোন মানুষজন থাকতে পারে রোমিও যেন তা ভাবতে পারে না। জুলিয়েট যেখানে সেখানেই তো স্বর্গ, জুলিয়েট ছাড়া সে স্থান তো শুধুই যন্ত্রণাময় এক নরক। তার শোকে সজ্জন সন্ন্যাসীটি প্রবোধবাক্য শোনাতে পারতেন কিন্তু এই অবোধ যুবকটি কোন কিছুই শুনতো না। পাগলের মতো সে চুল ছিঁড়তে লাগল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে বারবার শুধু একটি কথাই উচ্চারণ করতে লাগল--- মৃত্যু---মৃত্যুই তার একমাত্র পথ। এই অসহায় আর্তির মধ্যে রোমিও জেগে উঠল তার প্রেয়সীর কাছ থেকে আসা

এক বার্তায়। এই বার্তা পুনরুজ্জীবিত করে তুলল তাকে। আর এই সুযোগে সন্ন্যাসীটি অপুরুষোচিত দুর্বলতার জন্য রোমিওকে মৃদু ভর্ৎসনাও করলেন। সে টাইবল্টকে হত্যা করেছে, কিন্তু সে কি নিজেকে তথা তার প্রেয়সীকেও হত্যা করবে? কেননা জুলিয়েট তো রোমিও-র মধ্যেই বেঁচে আছে। তিনি আরও বললেন— একমাত্র শক্তি ও সাহসের দ্বারাই মানুষ তার দুর্বল নমনীয়তাকে জয় করে দৃঢ়তার সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে পারে। তিনি বললেন—দ্যাখ, তোমার প্রতি অতি শিথিলভাবেই আইন প্রয়োগ হয়েছে, মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে রাজার মুখ থেকে কেবলমাত্র নির্বাসন দণ্ডের কথাই উচ্চারিত হয়েছে। তুমি টাইবল্টকে হত্যা করেছ কিন্তু টাইবল্ট তো তোমাকেই হত্যা করতে পারত। এক্ষেত্রে এও তো এক ধরনের সান্ত্বনা। জুলিয়েট তো জীবিতই আছে আর আশাতীতভাবেই সে তোমার প্রাণের বধূ হয়েছে, এদিক থেকেও তো তুমি দারুণ সুখী। সন্ন্যাসী যত কিছুই বলুন না কেন তাঁর কোন আশার বাণীতেই রোমিও-র মনের ক্ষোভ দূর হল না। সে চুপ করেই রইল, তার প্রতি যে বিচার করা হয়েছে তা যেন অবিচার বলেই তার মনে হল। সন্ন্যাসী আবারও তাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন— দ্যাখ, হতাশার ফলে মৃত্যু বড় বেদনাদায়ক। তাই সাবধান। তারপর রোমিও যখন একটু ঠাণ্ডা হল তখন তিনি রোমিওকে বললেন— দ্যাখ তুমি এই রাতেই গোপনে জুলিয়েটের কাছে গিয়ে ওকে বলে বিদায় নাও। তারপর সোজা মণ্টুয়াতে চলে যাও এবং গিয়ে ওখানে কিছুদিন থাক। তারপর আমি সুযোগ বুঝে তোমার বিয়ের কথা প্রকাশ করে দেব: আর এটাই হতে পারে তোমাদের দুই পরিবারের মিলনের পক্ষে আনন্দের এক উপলক্ষ্য। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিঃসন্দেহে তোমাকে তখন ক্ষমা করতে রাজা রাজী হয়ে যাবেন। আর আজ যে দুঃখ তুমি পেয়েছ তার চেয়ে সহস্র গুণ বেশী আনন্দ নিয়ে তুমি ফিরে আসবে। সন্ন্যাসীটির জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ রোমিও র মনে ধরল; ঐ রাতটা তার প্রেয়সীর সঙ্গে কাটাবে আর ভোরবেলা মণ্টুয়ার উদ্দেশ্যে একাকী যাত্রা শুরু করবে এই স্থির করে সে তার প্রেয়সীর সন্ধানে ঐস্থান পরিত্যাগ করল। সন্ন্যাসী তাকে কথা দিলেন যে তিনি তাকে মাঝে মধ্যে চিঠি দেবেন। এবং তার মাধ্যমেই সে এখানকার খবরাখবর পেতে পারবে।

সেই ফলের বাগান যেখানে গতরাতে রোমিও তার প্রেয়সীর ভালবাসার স্বীকারোক্তি শুনেছিল সেখান থেকেই সে গোপণে তার প্রিয়তমা স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করল। এবং দুটিতে মিলে রাত যাপন করল। সে রাত বিহ্বল আনন্দ আর ভাবাবেগের এক বর্ণনাতীত রাত; কিন্তু পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় আর অতিক্রান্ত দিনের মারাত্মক ঘটনার স্মৃতিতে এই রাতের সব পাওয়ার আনন্দও যেন অনেক পরিমাণে ম্লান হয়ে গেল। মনে হল যেন অনভিপ্রেত ঊষা খুব তাড়াতাড়িই শেষ করে দিল রাতের মুহূর্তগুলি। যখন জুলিয়েট ভরতপাখির ভোরের গান শুনতে

পেল তখন সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল না, এ ভরতপাখির গান নয় এ অবশ্যই বুলবুল পাখীর গান যে কিনা রাতেই গায়। কিন্তু সত্যি সত্যিই এ-গান ভরতপাখিরই গান। তার কাছে এ সঙ্গীত বড়ই বেসুরো আর নিরানন্দময় মনে হল। পুব গগনে দিবসের উজ্জ্বল গতিপথও পরিষ্কার জানিয়ে দিল এই প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় উপস্থিত। মণ্টুয়া থেকে প্রতি ঘণ্টায় তার কাছে চিঠি লিখবে এই কথা দিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে-তার প্রাণের বধূর কাছ থেকে বিদায় নিল রোমিও। শয়নকক্ষের জানালা দিয়ে সে নেমে এল। যেহেতু সে মাটির উপর দাঁড়িয়েছিল তাই উপরের জানালা থেকে জুলিয়েটের মন অমঙ্গলের আশঙ্কায় বেদনাবিধুর হয়ে উঠল। রোমিওকে দেখে তার মনে হল বুঝি সে সমাধিক্ষেত্রের তলদেশে কোনও মৃত ব্যক্তি। রোমিওর বুকও দুরুদুরু করছিল অমঙ্গল আশঙ্কায়। কিন্তু এবার সে জোর করেই অতি দ্রুত বিদায় নিল, কেননা, ভোরের পর ভেরোনা নগরীর সীমানার মধ্যে তাকে পাওয়া গেলে তার মৃত্যু অবধারিত।

ভাগ্যবিড়ম্বি এই দু'টি প্রেমিক প্রেমিকার দুঃখের শুরু এখানেই। রোমিও চলে যাওয়ার পর খুব বেশীদিনও হয়নি, এর মধ্যেই, বৃদ্ধ লর্ড ক্যাপুলেট জুলিয়েটের জন্য পাত্র মনোনীত করলেন। জুলিয়েটের যে ইতিমধ্যেই বিয়ে হয়ে গেছে তা এই পাত্রটি স্বপ্নেও জানত না। লর্ড ক্যাপুলেট মনোনীত এই বরটি কাউন্ট প্যারিস। জুলিয়েট যদি রেমিওকে কোনওদিন না দেখত তবে এই সাহসী, সম্ভ্রান্ত ও সদ্‌বংশীয় যুবকটিকে সে তার যোগ্য প্রার্থী বলে সহজেই মেনে নিতে পারত।

তার বাবার প্রস্তাবে আতঙ্কগ্রস্ত জুলিয়েট দুঃখে ও বেদনায় কী করবে কিছুই ভেবে পেল না। সে অজুহাত দেখাতে লাগল যে তার এই অপরিণত বয়স বিয়ের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয় আর তাছাড়া টাইবল্টের সাম্প্রতিক মৃত্যু তার উৎসাহ উদ্দীপনা এমন নিস্তেজ করে দিয়েছে যে তার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক আনন্দে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎও সম্ভব নয়, অধিকন্তু টাইবল্টের শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটতে না মিটতেই বিবাহের আনন্দোৎসব উদ্‌যাপন করাটা ক্যাপুলেটদের পরিবারের পক্ষে হবে নিতান্তই অশোভন। এইভাবে নানা যুক্তি দিয়ে বিয়ের বিপক্ষে তার বাবাকে সে বোঝাতে লাগল। বলাই বাহুল্য তার এই ওজর আপত্তির মূলে ছিল আসলে যে সত্য তা ইতিমধ্যেই তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার ঘটনা। কিন্তু লর্ড ক্যাপুলেট তার কোন ওজরেই কর্ণপাত করলেন না। উদ্ধত কর্তৃত্বপূর্ণ ঢঙে তিনি তাকে বিয়ের জন্য তৈরি হতে বললেন। কেননা আসছে বৃহস্পতিবারই একে কাউন্ট প্যারিসের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে হবে। লর্ড ক্যাপুলেট মনে করলেন বুঝিবা তার কন্যা কুমারীসুলভ লজ্জা ও সংকোচে ঐ ওজর ও আপত্তির অবতারণা করছে, তাই তিনি মেয়ের কথায় কোন গুরুত্বই দিতে চাইলেন না— কেননা এমন ধনী ও সম্ভ্রান্ত পাত্রকে স্বামীরূপে লাভ করা ভেরোনার যে কোন কন্যার পক্ষেই এক দুর্লভ ভাগ্য।

এই চরম দুর্দশায় জুলিয়েট গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করল বন্ধুসুলভ সেই সন্ন্যাসীর কাছে। কেননা আপদে-বিপদে দুর্দশায় সবসময়ে তিনিই জুলিয়েটের উপদেষ্টা। মরিয়া কোন এক উপায় অবলম্বনের দৃঢ়তা তার আছে কিনা তা এ সম্বন্ধে সন্ন্যাসী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। প্রত্যুত্তরে সে বলে উঠল আমার স্বামী যদি কবরেও থাকেন তবে কাউন্ট প্যারিসকে বিয়ে করার চেয়ে আমি সেই কবরেও জীবিত অবস্থায়ই চলে যেতে প্রস্তুত। তারপর সন্ন্যাসীটি জুলিয়েটকে বললেন, তবে বাড়িতে চলে যাও আর আনন্দের ভাণ করে তোমার বাবার ইচ্ছামাফিক কাউন্ট প্যারিসকে বিয়ে করার মত দিয়ে দাও। তারপর বিয়ের আগের দিন রাতে আমার দেওয়া এই শিশির ওষুধটা তুমি খেয়ে ফেলবে। এর প্রতিক্রিয়া থাকবে বিয়াল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত আর তখন তোমাকে শীতল আর প্রাণহীন বলে মনে হবে। বরটি যখন সকালবেলায় তোমাকে নিয়ে যেতে আসবে তখন তোমাকে সে মৃত বলে মনে করবে। এরপর দেশের রীতি অনুযায়ী তোমাকে আচ্ছাদনহীন শবযানে বাহিত করে সমাধিস্থ করবার জন্য পারিবারিক সমাধিস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে ; যদি তুমি নারীসুলভ ভয় ঝেড়ে ফেলতে পার আর এই ভয়ংকর পরীক্ষায় রাজী হও তবে বিয়াল্লিশ ঘণ্টা পর তুমি আবার নিশ্চিতভাবে জেগে উঠবে, মনে হবে যেন স্বপ্নের থেকে জেগে উঠলে। আর এর মধ্যেই আমি তোমার স্বামীকে সমস্ত খবর জানিয়ে দেব আর তুমি জেগে ওঠার আগেই সে ওই রাতে এসে তোমায় মন্টুয়াতে নিয়ে যাবে। একদিকে প্রেম আর অন্যদিকে কাউন্ট প্যারিসকে বিয়ে করার ভয়াবহতা এই দুই বিরোধ জুলিয়েটকে এই ভয়ংকর ঝুঁকি গ্রহণ করতে শক্তি যোগাল। সে শিশিটি সন্ন্যাসীটির কাছ থেকে গ্রহণ করল। আর কথা দিল যে সে তাঁর নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

উপাসনালয় থেকে ফিরে এসে সে যুবক কাউন্টের সঙ্গে দেখা করল। কপট বিনয়ের সঙ্গে সে তাকে কথাও দিল যে সে তার বধূ হবে। লর্ড ক্যাপুলেট আর তার স্ত্রীর কাছে এ এক সুখের খবর, আনন্দের খবর। বৃদ্ধের দেহে যেন নতুন করে যৌবনের উন্মেষ ঘটল। আর কাউন্টকে প্রত্যাখ্যান করে যে জুলিয়েট তাকে দারুণ অসন্তুষ্ট করেছিল সে আবার ঐ বৃদ্ধের অতি প্রিয় পাত্রীতে পরিণত হল। এখন থেকে তার কথা মতোই চলবে এই কথাও সে দিল। আসন্ন বিয়ে উপলক্ষ্যে বাড়ীর ঘরে বাইরে সর্বত্রই হৈ চৈ পড়ে গেল। এরকম একটা আনন্দোৎসব পালনের প্রস্তুতির জন্য শুরু হয়ে গেল দুহাতে অর্থ ব্যয়। সত্যিই এরকমটা ভেরোনাবাসীরা আর কখনো দেখেইনি।

বুধবার রাতে জুলিয়েট ঔষধটা সম্পূর্ণই খেয়ে নিল। এর আগে অবশ্য সে অনেক অমঙ্গলের আশংকায় শংকাগ্রস্ত হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল রোমিওর সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়ার অপরাধে সন্ন্যাসী দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন আর তাই সেই দোষ এড়াবার ভয়ে তিনি তো তাকে বিষও দিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি

তো ধার্মিক আর পবিত্র মানুষ বলেই বরাবর পরিচিত। আর এই ভয়ও জুলিয়েটের মনে এল যে যদি তার কাছে রোমিও পৌঁছানোর আগেই সে জেগে ওঠে তবে ঐ ভয়ংকর স্থান, মৃত ক্যাপুলেটদের অস্থিপূর্ণ সমাধিস্থল আর শবাচ্ছাদন বস্ত্রের আড়ালে শুয়ে থাকা রক্তাক্ত টাইবল্টের গলিত শবদেহ-— এইসব মিলে তাকে উন্মাদ করে দেবে না তো! যেখানে মৃতদেহ রাখা হয় সেখানে নাকি তাদের আত্মা ঘুরে বেড়ায় প্রচলিত এই গল্পকথাগুলোও তার তখন মনে পড়ল। কিন্তু তখনই আবার তার মনে রোমিও-র প্রতি প্রেম আর প্যারিসের প্রতি বিরূপতা ফিরে এল, আর সে মরিয়া হয়ে ঐ ওষুধের পুরোটাই খেয়ে নিল এবং সংজ্ঞা হারাল।

ভোর হতে না হতেই কাউন্ট প্যারিস সুর ভাজতে ভাজতে তার ভাবী বধূকে জাগাতে এল। কিন্তু প্রাণোচ্ছল জুলিয়েটের পরিবর্তে তার চোখে পড়ল জুলিয়েটের শয়নকক্ষে এক প্রাণহীন শবদেহের করুণ দৃশ্য। হায়, তার আশার কী নির্মম মৃত্যু! গোটা বাড়িটাতে কি সর্বনাশই না ঘটে গেল। বেচারী কাউন্ট তার ভাবী বধূ-র জন্য বিলাপ করতে লাগল। তার মনে হল, জঘন্য মৃত্যুই তার কাছ থেকে তার ভাবী বধূকে ছলনা করে কেড়ে নিল, তাদের দুই হাত একত্রিত হওয়ার আগেই তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল। কিন্তু বৃদ্ধ লর্ড আর লেডি ক্যাপুলেটের বিলাপই মনে হল সবার বেশি মর্মান্তিক। তাঁদের এই এক ও একমাত্র প্রিয় সন্তানের মধ্যেই তাঁরা সকল আনন্দ আর সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন। তাঁদের মনে হল ঠিক যখন জুলিয়েট একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক সেই সময়েই নিষ্ঠুর মৃত্যু তাকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। যে সমস্ত জিনিসগুলি উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেগুলো বিষাদময় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজে লাগল—পরিণয়ের উল্লাস পরিণত হল এক করুণ সমাধিদানের অনুষ্ঠানে—বিবাহের স্তোত্র রূপান্তরিত হল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালীন প্রাণহীন স্তোত্রে—প্রাণচঞ্চল বাদ্যযন্ত্রগুলি রূপান্তরিত হল বিষাদমাখা ঘণ্টায়। যে ফুল নববধূর পথের উপর বিছিয়ে দেওয়ার কথা ছিল তা-ই এখন ছড়ানো হল তারই শবের উপর। এখন তার বিবাহের পরিবর্তে ডাক পড়ল সমাধিস্থ করার জন্য পুরোহিত। তাকে গীর্জায় ঠিকই নিয়ে যাওয়া হল কিন্তু নবজীবনের আনন্দঘন আশা বাড়িয়ে তুলতে নয়, মৃতের জন্যে গীত নিরানন্দ স্তোত্রকে সরবে উচ্চারণের জন্য।

সজ্জন সন্ন্যাসীটি ঠিক সময়েই মণ্টুয়াতে রোমিওর কাছে দূত মারফত সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে এসব শুধুমাত্র অন্ত্যেষ্টির ভাণ, জুলিয়েটের মৃত্যু একটি ছলনামাত্র। রোমিও কখন এসে জুলিয়েটকে ঐ নিরানন্দময় সমাধি থেকে মুক্ত করতে আসে সেই আশাতেই তার প্রেয়সী ঐ সমাধিতে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য মৃতের মত শুয়ে আছে। কিন্তু দুঃসংবাদ সুসংবাদের চেয়ে অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সন্ন্যাসী প্রেরিত দূতটি পৌঁছাবার আগেই জুলিয়েটের করুণ মৃত্যু সংবাদ রোমিওর

কাছে পৌঁছাল। ঠিক এর আগে পর্যন্ত রোমিওকে অসাধারণ আনন্দোচ্ছল আর হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। ঐ রাতে সে স্বপ্নে দেখছিল যে সে মারা গিয়েছে (এ এক অদ্ভুত স্বপ্ন সে স্বপ্নের মধ্যে মৃত ব্যক্তিও তার ভাবনার শক্তি হারায় না)। আর তার প্রেয়সী এসে তাকে মৃত দেখে তার ওষ্ঠে চুম্বনে চুম্বনে তার মধ্যে এমন জীবনীশক্তির সঞ্চার করল যে সে পুনরুজ্জীবিত হল এবং সে আর পরিণত হল এক সম্রাটে। ঠিক এই সময়ে ভেরোনা থেকে এক দূত এল। রোমিওর মনে হল কিছু সুসংবাদ দিতেই বুঝি ও এসেছে, যে সুসংবাদটি তার স্বপ্ন আগেই তাকে জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যখন এই আত্মতৃপ্তিকর দৃশ্যের উল্টোটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হল অর্থাৎ সে শুনল তার প্রেয়সী সত্যি সত্যিই মারা গিয়েছে আর তাকে সে চুম্বন দিয়েও কোনমতে বাঁচাতে পারবে না তখন সে ঘোড়াগুলিকে তৈরি করার জন্য আদেশ দিল, কেননা সমাধিস্থলে তার প্রেয়সীকে দেখার জন্য ঐ রাতেই তাকে ভেরোনায় যেতে হবে। যেহেতু হতাশাগ্রস্ত বেপরোয়া মানুষের ভাবনায় সর্বনাশের চিন্তা দ্রুত প্রবেশ করে তাই রোমিওর মনে পড়ল মণ্টুয়াতে যে লোকটির দোকান সে একটু আগেই অতিক্রম করে এসেছে সেই দরিদ্র ঔষধ বিক্রেতার কথা। দারিদ্র্যজর্জর চেহারা দেখে তাকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বলে রোমিওর মনে হয়েছিল। নোংরা তাকের উপর সারি দিয়ে রাখা খালি বাক্সগুলোয় তার চরম দুর্দশা আর দারিদ্র্য ফুটে উঠেছিল, তার এই চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার স্বাক্ষর বিক্ষিপ্ত ছিল আরও অনেক স্থানে। ঐ সময়ে সে মনে মনে বলেছিল (সম্ভবতঃ ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায়) যদিও আইন অনুসারে মণ্টুয়া নগরীতে বিষ বিক্রি করলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয় তবুও যদি কারো বিষ দরকার পড়ে তবে এখানে এক চরম দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি আছে যে নিশ্চয়ই তাকে বিষ বিক্রয় করতে প্রস্তুত। এই কথাগুলো এখন রোমিওর মনে পড়ল। সে ওই ঔষধবিক্রেতাকে খুঁজে বার করল। প্রথমটায় লোকটি কিছু দ্বিধার ভাণ করছিল, কিন্তু যখন রোমিও তাকে স্বর্ণমুদ্রা দিল তখন তার দারিদ্র দশা তাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। লোকটি রোমিওকে বিষ বিক্রি করল। সে রোমিওকে এও বলল যে যদি সে ওটা খায় তবে কুড়িটা মানুষের শক্তি থাকলেও ঐ বিষ তাকে নিমেষেই শেষ করে দেবে।

সমাধিস্থলে তার প্রেয়সীকে দেখবার জন্য রোমিও বিষ সঙ্গে করে ভেরোনার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। তার উদ্দেশ্য ছিল আশ মিটিয়ে তাকে দেখে সে বিষ খাবে এবং তারই পাশে সমাধিস্থ হবে। মধ্যরাতে সে ভেরোনায় পৌঁছাল। গীর্জাসংলগ্ন কবরখানার মধ্যে সে দেখতে পেল ক্যাপুলেটদের প্রাচীন গম্বুজগুলি। যখন সে আলো, কোদাল আর লোহার সাঁড়াশি নিয়ে স্মৃতিসৌধ ভাঙতে উদ্যত হল তখনই কে যেন বলে উঠল— জঘন্য মণ্টেগু, ওই বেআইনি কাজ থেকে বিরত হয়। এ কাউণ্ট প্যারিসেরই গলা। সে রাতের এই অসময়ে এসেছিল জুলিয়েটের সমাধিতে

ফুল দিতে আর কাঁদতে, কেননা এই জুলিয়েটের তো তারই বধূ হওয়ার কথা ছিল। মৃতাকে নিয়ে রোমিওর কী লাভ সে বুঝতে পারল না, কিন্তু যেহেতু ও মন্টেগু আর (সে অনুমান করেছিল) সমগ্র ক্যাপুলেটদের কাছে ও একটা জঘন্য শত্রু তাই তার মনে হল মৃতদেহগুলিতে জঘন্য কলঙ্কজনক কিছু একটা করবার জন্যই সে ওই রাতে এসেছে। তাই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে ওকে বিরত হবার জন্য হুকুম দিল। সে জানিয়ে দিল, যেহেতু রোমিও একজন আসামী আর ভেরোনা নগরীর আইন অনুযায়ী তাকে নগরীর মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে মরতে হবে, তাই সে রোমিওকে গ্রেফতার করবে। রোমিও কাউণ্ট প্যারিসকে বলল— আমাকে ছেড়ে দাও, নয়ত তোমার অবস্থা ওই কবরে শুয়ে থাকা টাইবল্টের মতোই হবে। তোমাকে হত্যা করতে বাধ্য করে আমায় আর একটা পাপ কাজে লিপ্ত করো না। কিন্তু ঘৃণায় কাউণ্ট তার সাবধানবাণী শুনলই না। হত্যাকারী দুর্বৃত্তের মতো তার উপর হঠাৎই আক্রমণ করে বসল। রোমিও তার আক্রমণ রোধ করল। ওদের মধ্যে লড়াই বেধে গেল। রোমিওর আঘাতে কাউন্ট প্যারিস মারা গেল। এবার আলো নিয়ে রোমিও দেখতে চাইল নিহত ব্যক্তিটি কে — কাকে সে আঘাত করল। সে ভাবতেই পারেনি ঐ যুবক কাউন্ট প্যারিস যার সঙ্গে জুলিয়েটের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল (মণ্টুয়া থেকে যাওয়ার পথে রোমিও এ সংবাদ জেনেছিল)। দুর্ভাগ্যের শিকার মৃত যুবকটিকে আঁকড়ে ধরে রোমিও বলল— আমি তোমায় বিজয়ীর কবরে সমাধিস্থ করব— অর্থাৎ জুলিয়েটের কবর— যেটি আমি এখন খুলেছি এখানেই তোমাকে সমাধিস্থ করব। কবরে মৃতের মত শুয়ে আছে রোমিওর প্রণয়িনী। সৌন্দর্যে অতুলনীয়া এই নারীর চেহারায় বা বর্ণে মৃত্যু কোন পরিবর্তনই আনতে পারেনি। অথবা যেন মৃত্যুই ওর প্রেমে পড়েছে, আর ওই রোগা লিকলিকে মৃত্যুদানবটা নিজের আনন্দের জন্য ওকে ওখানে রেখে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তরুণ অচৈতন্যকর ঔষধটি খাওয়ার পর থেকে জুলিয়েট এখনও পর্যন্ত তরতাজা ও উজ্জ্বল। জুলিয়েটের কাছেই, পড়ে রয়েছে শবাচ্ছাদনে রক্তাক্ত টাইবল্ট। ওকে দেখেই রোমিও ওর শবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। জুলিয়েটের জন্যই টাইবল্টকে 'খুড়তুতো ভাই' বলে সম্বোধন করে রোমিও বলে উঠল— তোমার শত্রুকে হত্যা করে এবার তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করতে চলেছি। তার প্রেয়সীর ঠোঁট দুটি চুম্বন করে রোমিও তার কাছে বিদায় নিল। তার ক্লান্ত দেহ ও মনের উপর থেকে অবাঞ্ছিত ভাগ্যের বোঝা নামিয়ে দিতে রোমিও এবার সেই হাতুড়ে ডাক্তারের বিষের শিশিটি থেকে সবটুকু তরল পদার্থ নিঃশেষে পান করে নিল। বিষটি সত্যিই ছিল মারাত্মক। এটি জুলিয়েটের খাওয়া কৃত্রিম সেই বিষের মত নয়। এদিকে জুলিয়েটের খাওয়া বিষের রেশ এখন প্রায় কাটতে চলেছে। আর তারই ফলে জুলিয়েটের জেগে ওঠার সময় হল, আর রোমিও সময় সঠিক রাখতে পারেনি বলে অথবা খুব আগেই চলে এসেছে বলে

এবার হয়তো সে নালিশ জানাবে। কিন্তু সবই যেন ওলট পালট হয়ে গেল।

সন্ন্যাসীর কথানুযায়ী জুলিয়েটের জেগে ওঠার সময় উপস্থিত। আর এদিকে সাধুটি যখন জানলেন তিনি যে চিঠি মণ্টুয়াতে পাঠিয়েছিলেন তা দূতের দুর্ভাগ্যজনক বিলম্বের কারণে যথাসময়ে রোমিওর হাতে পৌঁছায়নি তখন মেয়েটিকে তার বদ্ধদশা থেকে মুক্ত করার জন্য লণ্ঠন আর শাবল নিয়ে তিনি নিজেই তাড়াতাড়ি সমাধিস্থলে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কাছেই ক্যাপুলেটদের স্মৃতিসৌধে আলো দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি আরও দেখলেন ঐ স্মৃতিসৌধের কাছে পড়ে রয়েছে তরোয়াল, রক্ত আর রোমিও আর কাউন্ট প্যারিসের প্রাণহীন, নিথর দেহ।

এই সমস্ত মারাত্মক দুর্ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটল তা বুঝে ওঠার আগেই জুলিয়েট তার গভীর ঘুমের শেষে জেগে উঠল। সাধুকে তার কাছেই দেখে সে কোথায় আছে আর কী জন্যেই বা সে এখানে এই সবই তার মনে পড়ে গেল। সন্ন্যাসীর কাছে সে জানতে চাইল রোমিওর খবর। কিন্তু একটা গোলমাল শুনে সন্ন্যাসীটি তাকে ঐ কবর আর কপট নিদ্রার স্থান থেকে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন, কেননা তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুব পরিবর্তে যেন এক বিশাল শক্তি তাদের অভিপ্রায়কে বাধা দিল, যে শক্তিকে বাধা দেওয়ার মত ক্ষমতা তাদের ছিল না। আগন্তুক মানুষের কোলাহল শুনে ভয় পেয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন। এদিকে তার প্রাণপ্রতিমের হাতের কাছেই পেয়ালাটি যখন জুলিয়েট দেখল তখন সে বুঝতে পারল বিষই তার মৃত্যুব কারণ। যদি ঐ পাত্রে সামান্যতম তলানিও পড়ে থাকত তবে জুলিয়েট তাই খেয়ে নিত। সামান্যতম বিষও যদি রোমিওর ঠোঁটে থাকে এই চেষ্টায় সে রোমিওর নিথর ঠোঁট দুটিতে চুম্বন করল। লোকজন যখন আরও কাছাকাছি এল তখন ঐ কোলাহল শুনে জুলিয়েট তার সঙ্গে থাকা ছোরাটা দ্রুত বের করলো এবং নিজেরই শরীরে বিঁধিয়ে দিল আর তার অকৃত্রিম ভালবাসার পাত্র রোমিওর পাশেই তার প্রাণহীন দেহ পড়ে রইল।

এরই মধ্যে ওখানে এসে হাজির হল প্রহরী। কাউন্ট প্যারিসের এক বালকভৃত্য তার প্রভু আর রোমিওর মধ্যে লড়াই নিজের চোখে দেখে বিপদসংকেত ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই বিপদসংকেত ভেরোনা নগরীর রাস্তাঘাটে চলাচলকারী নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সঠিক কোন সংবাদ যেহেতু ওদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছয়নি তাই ওরা হতবিহ্বল দিশাহারার মতো এক প্যারিস! এক রোমিও! এক জুলিয়েট! বলে চীৎকার জুড়ে দিল। এই চীৎকার চেঁচামেচিতে লর্ড মণ্টেগু আর লর্ড ক্যাপুলেট বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। রাজাও হৈ চৈ শুনে শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সকলেই গণ্ডগোলটার সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়ে পড়লেন। এদিকে, সন্দেহজনক হাবভাব দেখে রক্ষীদের কয়েকজন সন্ন্যাসীকে ধরে ফেলল কারণ ঐ সময়ে তিনি গীর্জার সংলগ্ন কবরস্থান থেকে ফিরছিলেন আর ভয়ে কাঁপছিলেন। তার সঙ্গে ছিল দীর্ঘশ্বাস

ও কান্না। এক বিশাল জনতা ক্যাপুলেটদের স্মৃতিসৌধে জমা হল। এই অদ্ভুত আর সর্বনাশা ঘটনা সম্পর্কে সন্ন্যাসী যা জানেন তা বলার জন্য রাজা তাঁকে হুকুম করলেন।

এবার বৃদ্ধ লর্ড মণ্টেগু আর ক্যাপুলেটের উপস্থিতিতে সন্ন্যাসী তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিদারুণ প্রেমের সবকথাই অকপটে জানালেন। ওদের মিলন বুঝি বা দুই পরিবারের দীর্ঘ কলহের অবসান ঘটাবে এই আশায় ওদের দু'জনকে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার কথা, মৃত রোমিও কেমন স্বামী ছিল অথবা মৃত জুলিয়েটই বা কেমন পতিপ্রাণা ছিল তার সবই তিনি জানালেন। তিনি আরও বললেন— ওদের বিয়ের কথা প্রকাশের জন্য আমি যখন একটা উপযুক্ত সুযোগ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছিলাম ঠিক সেই সময়েই জুলিয়েটের জন্য আর একটি পাত্র ঠিক হল আর দ্বিতীয় বিয়ের অপরাধ এড়াতেই ও আমার কথামতো ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল; আর সকলেই তখন জুলিয়েট মারা গিয়েছে বলে ধরে নিল। এরপর আমি রোমিওকে চিঠি লিখলাম, তাতে জানিয়েছিলাম ওষুধের রেশ গেলে জুলিয়েটকে এখান থেকে নিয়ে যেতে ও যেন এখানে আসে। কিন্তু হায়, কী দুর্ভাগ্য! দূত চিঠি নিয়ে রোমিওর কাছে পৌঁছাতেই পারল না। কাহিনীর এর চেয়ে বেশী কিছু তিনি বলতে পারলেন না। তবে এটুকু জানালেন যে, মৃত্যুর স্থান থেকে জুলিয়েটকে মুক্ত করার জন্যই তিনি নিজে ওখানে আসেন আর নিহত কাউন্ট প্যারিস ও রোমিওকে দেখতে পান— এর চেয়ে আর বেশী কিছু তিনি জানেন না। বাকীটুকু সেই বালকভৃত্য আর ভেরোনা থেকে রোমিওর সাথে আসা ভৃত্যটির বর্ণনা থেকে জানা গেল। প্যারিসের ঐ বালকভৃত্যটি কাউন্ট প্যারিস আর রোমিওর লড়াই দেখেছিল। আর রোমিও তার ভৃত্যের মারফত তার বাবাকে দেবার জন্য চিঠি দিয়েছিল, যে চিঠিতে সে লিখেছিল জুলিয়েটকে বিয়ে করার সংবাদ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল তাঁদের কাছে। মণ্টুয়ার দরিদ্র ঔষধের দোকানদারের কাছ থেকে বিষ কেনার সংবাদও চিঠিতে ছিল। সে লিখেছিল জুলিয়েটের স্মৃতিসৌধে চললাম। ওখানেই আমি আমার জুলিয়েটের পাশে চিরটাকাল শুয়ে থাকব। — এই সমস্ত কথা সন্ন্যাসীর দেওয়া বিবৃতির সঙ্গে মিলে গেল। এতে আরও পরিস্কার হল যে জটিল এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে সন্ন্যাসীর কোন অসৎ অভিপ্রায় ছিল না— তাঁর পরিকল্পিত কৌশলের ছকটি যদিও বড় কৃত্রিম ও অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম তবু তার উদ্দেশ্য ছিল সৎ।

রাজা মণ্টেগু এবং ক্যাপুলেট এই দুই বৃদ্ধ লর্ড-এর দিকে ফিরে বললেন— ছিঃ ছিঃ, আপনাদের নিষ্ঠুর আর যুক্তিহীন শত্রুতা কি সর্বনাশটাই না ঘটাল! দেখলেন তো এই অপরাধের জন্য ঈশ্বর কত বড় যন্ত্রণাই না দিলেন। আপনাদের অস্বাভাবিক ঘৃণা আপনাদেরই সন্তানদের ভালবাসার মাধ্যমে শাস্তি পেল। এই বহুদিনকার প্রতিদ্বন্দ্বীরা এবার তাঁদের ভুল বুঝতে পারলেন। এখন আর তাঁরা পরস্পরের শত্রু

নন। সন্তানদের সমাধিতে দীর্ঘ বিবাদের সমাধি দেবার জন্য ওঁরা দুজনেই একমত হলেন। যুবতী ক্যাপুলেট আর যুবক মণ্টেগুর বিয়ের ফলে ওদের দুই পরিবারের মিলনের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ভাই' বলে সম্বোধন করে লর্ড ক্যাপুলেট হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য লর্ড মণ্টেগুকে অনুরোধ জানালেন। লর্ড ক্যাপুলেট বললেন হে লর্ড মণ্টেগু আমার মেয়ের যৌতুকের জন্য আমি আপনার মৈত্রীর হাত কামনা করি। (মিলনের প্রতীকস্বরূপ) লর্ড মণ্টেগু বললেন— কিন্তু লর্ড ক্যাপুলেট, আমি তো আরও বেশী কিছু দিতে চাই, আমি চাই জুলিয়েটের একটি খাঁটি সোনার প্রতিমূর্তি গড়ে দিতে। যতদিন পৃথিবীতে ভেরোনা নগরীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন ঐ প্রতিমূর্তিই হবে ভাস্কর্যে ও স্বর্ণমূল্যে অনন্য, ঠিক যেমনটি মহার্ঘ জুলিয়েটের ভালবাসা। প্রত্যুত্তরে লর্ড ক্যাপুলেট জানালেন যে, তিনিও রোমিওর অনুরূপ একটি প্রতিমূর্তি গড়ে দিতে ইচ্ছুক। এইভাবে পারস্পরিক শিষ্টাচারের মাধ্যমে এই দুই দুর্ভাগ্যপীড়িত লর্ডেরা উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের ঐকান্তিক চেষ্টায় ব্রতী হলেন। কিন্তু এই মিলন হল বড় বিলম্বে। এতকাল ওদের রোষ আর শত্রুতা এতই মারাত্মক ছিল যে ওদের সন্তানদের ভয়াবহ পরিণতি ছাড়া অন্য কিছুই ওই অভিজাত পরিবার দুটির শিকড়গাড়া ঘৃণা আর ঈর্ষাপরায়ণতা দূর করতে পারত না। ওদের মৃত্যু দুটি পরিবারের কলহ আর বিরোধের এক অতি মর্মান্তিক পরিণতি— এক মহার্ঘ বলিদান।